অভিনা

জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন
যুগ্ম সংখ্যা ১৯৮৫

- ১৭টি গল্প
- ১১টি প্রবন্ধ
- ১টি উপন্যাস

মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা

অতিথি সম্পাদক
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দীর ভাবনা

শুধু রুজি-রোজগারের জন্য নয়, কলকাতার আকর্ষণ শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের কাছেও কম নয়। তাঁদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা, ঘটনা ইত্যাদির খোরাক এই কলকাতা শহরে অনেক পাওয়া যায়।

শুধু বিয়ালিস্টিক বা বাস্তবধর্মী ছবিই নয়, এমনকি নৈসর্গিক দৃশ্যও বিরল নয়। গঙ্গা এককালে কেবল নদী হিসেবেই বিখ্যাত ছিল, তার দুপাশে ইতিহাসের অনেক স্মারক ছাড়াও বর্তমান যুগে গজিয়ে উঠছে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজের চিহ্ন। দিকচক্রবালে দেখা যায় বড় বড় বাণিজ্যিক অট্টালিকা, কলকারখানার চিমনী, সেতু এবং সৌধ।

যেমন গঙ্গার এপাশে ওপাশে দুটি বড় রকম জলপ্রকল্প তৈরী হয়েছে,—একদিকে গার্ডেনরীচে আর অন্যদিকে বোটানিকের কাছে। সূর্যাস্ত দেখতে গিয়ে মুগ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়ত নজরও করেন না কিন্তু এই ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প কলকাতার চেহারা অন্যভাবে পাল্টে দিচ্ছে। এই শহরের ওপর নির্ভর করে যে লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছেন তাঁদের শহর জীবনের চাহিদা মেটানো যে দরকার সেটা না বললেও চলে।

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে এখনও কলকাতার সমস্যার দিকেই তুলি এবং কলম চলে। সমাধানের যে চেষ্টা এবং অল্প হলেও যে সাফল্য সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না। অথচ যে শহর আমাদের এতদিনের এবং এত ভালবাসার, সেই শহর একটু ভালর দিকে যাচ্ছে সেটা বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার করবার দায়িত্ব কেন যে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের ওপরই পড়বে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায় শিল্পে এবং সাহিত্যে কলকাতার বাঁচবার চেষ্টা এবং ভাল হবার চেষ্টার ছাপ কোথায়?

আমরা অনেক সময়েই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু নিজের দায়িত্বটুকু পালন করি না। অভিযোগটা কেবল শিল্পী-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই নয় এই শহরের প্রত্যেকটি লোক এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

এই শহরে জন্মতী এবং শতাব্দী পালন কম হয় না কিন্তু আগামীকাল এই শহর কেমন হবে বা কি রকমভাবে বদলাবে সে সম্বন্ধে সচেতন এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা কোথায়? কারণ, এই শহরটা শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থাকবে, সেটাই তো আমাদের সকলের আশা।

(সি-এম-ডি-এ কর্তৃক প্রচারিত)

With Best Compliments from

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

CALCUTTA-700071

M. ELIAS GROUP OF COMPANIES

M Elias Private Limited
18, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001
Phone 22-2691/92/3740/9831/23-6840
DCK—55 & 87 (HALDIA)
Telex : 2676/4105
Gram **BUDDASAHIB**

Alex Miller (Shipchandlers) Pvt. Ltd.
7, OLD COURT HOUSE CORNER,
CALCUTTA-700 001
Phone : 26-7846/6609
Telegram **'REPLENISH'**

Graduate Friends'
Shipping Agency Private Limited
53, RADHA BAZAR LANE (2nd Floor),
CALCUTTA-700 001
Phone : 26-6098/6894 Telex : 4105
Gram : **Graduate**

KEEP THE AIR CLEAN
TRAVEL BY TRAM
THE SMOKELESS VEHICLE

THE CALCUTTA TRAMWAYS COMPANY (1978) LIMITED

(A GOVT OF WEST BENGAL UNDERTAKING)
12, R. N. Mukherjee Road
Calcutta-700001.

with
compliments
from

IOL

Indian Oxygen Limited

মানুষের সেবাতেই আমাদের অস্তিত্ব

জীবনের ঝুঁকি অনেক, দুঃখ কষ্টও সীমাহীন, তবুও সমস্ত জীবনের কখনও প্রাণের স্পন্দন থেমে নেই, আমাদের ঠিক তাই। প্রতিদিন ভোর না হতেই আমাদের পথ চলা শুরু আর শেষ অনেক রাতে যখন গৃহস্থের দরজা হয়ে যায় বন্ধ। চাকায় ভর দিয়ে আমাদের অবিরাম ছুটে চলা মাইলের পর মাইল নিকটে অথবা দূরে। আসলে আমাদের জন্ম হয়েছে সেইসব মানুষের সেবা করার জন্য জীবনচক্রের অবিচ্ছিন্ন আবর্তে যাদের বার বার ফিরে ফিরে আসতে হবে জীবন পথে। এদের সাথে আমাদের জীবনের অস্তিত্ব জড়িয়ে গেছে।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

মনোমুগ্ধকর দৃশ্যানুভূতি থেকে গভীর ভাবানুভূতি—যে কোন রঙের রূপে রসে আপনার অবসরের দিনগুলিকে রাঙিয়ে তুলতে চান—ঘর থেকে শুধু দুই পা ফেলে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ুন। ঊর্মিমুখর ছায়াসুনিবিড় দীঘা-বক্‌খালি, তুষারশুভ্র মহিমা লালিত দার্জিলিং-কালিম্পং, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাবাহী বিষ্ণুপুর-শান্তিনিকেতন, কিংবা অতীত স্মৃতিচারিতায় অনুরণিত মালদহ-মুর্শিদাবাদ—যেখানেই মন ছুটে যেতে চাইবে প্রাত্যহিকতার চার দেওয়ালের গণ্ডী ছাড়িয়ে—নির্দ্বিধায় নির্ভাবনায় লঘু পায়ে পাড়ি দিন। আহার, বাসস্থান, স্বল্প প্রবাসের দিনগুলির নানা রকম টুকিটাকি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্বভার দিয়ে দিন পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যটন উন্নয়ন নিগমের উপর। আপনার পছন্দসই প্রতিটি পর্য্যটন কেন্দ্রে রয়েছে কর্পোরেশন পরিচালিত পর্য্যটন আবাস—যা কোন সময়েই আপনার রুচি ও সামর্থকে অতিক্রম করবে না।

অগ্রিম আসন সংরক্ষণ ও বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

রিজার্ভেশন এ্যাণ্ড ইন্‌ফরমেশন অফিস
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম্‌ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৩/২ বি, বা, বী, বাগ (পূর্ব), দ্বিতল
কলিকাতা—৭০০ ০০১

টেলিফোন : ২৩-৫১৬৮ / ২৩-৫১১৭

Books on Anthropology

MICHAEL CARRITHERS
The Forest Monks of Sri Lanka **Rs 155**

VERRIER ELWIN
Maria Murder and Suicide **Rs 75**

SIR EDWARD EVANS-PRITCHARD
A History of Anthropological Thought **Rs 160**

C. V. FURER-HAIMENDORF
Tribes of India **Rs 100**

J. H. HUTTON
Caste in India **Rs 55**

AKOS OSTOR ET AL
Concepts of Person **Rs 150**

LUCY MAIR
An Introduction to Social Anthropology **Rs 50**

K. S. SINGH
Birsa Munda and his Movement 1874-1901 **Rs 125**

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta-700013

With Best Compliments from

Hindustan Motors Ltd.

Manufacturers of

Contessa and Ambassador Cars, Hindustan Driveaway Chassis Hindustan Normal Control & Full Forward Control Trucks Passenger Coach, Mini Bus, Trekker and Portable

Excavators, Electric Overhead Travelling Cranes Upto 400 Tonnes Capacity, Dumpers, Front End Loaders, Crawler Tractors, Scrapers

Registered Office at
9/1, R. N. Mukherjee Road,
CALCUTTA-700 001

Factories at
HINDMOTOR (West Bengal) TRIVELLORE (Tamil Nadu)

মহাশ্বেতা দেবীর দীর্ঘায়ু কামনা করি
উত্তরবঙ্গের একমাত্র নাট্যকের পত্রিকা

"উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ"

★

সম্পাদক—বিপদ ভঞ্জন সরকার
[illegible]ভূমি" / সর্বমঙ্গল[illegible]রাও / আশ্রমপাড়া
[illegible]লিগুড়ি (৭৩৪০১)

শুভেচ্ছা সহ—

●

আবির্ভাব

ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা ও পত্রিকা : শিলিগুড়ি

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রাম বাংলার সমাজেতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ ও সন্ধানী বিশ্লেষণের সুসংবদ্ধ চালচিত্র ; অথচ এই মূল্যবান গ্রন্থটি কোথাও তথ্যের ভারে নুয়ে পড়েনি, বরং তথ্য যেন এই গ্রন্থে রক্তস্রোতের মত বাধাহীন প্রাণধারা :

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় **গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস** পনের টাকা

গণনাট্য আন্দোলনের বিপুল বৈচিত্র্য নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজন আজও জরুরী :

দর্শন চৌধুরী **গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়** দশ টাকা

সত্তর দশক বোধহয় তথাকথিত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দশক সমগ্র দশকটির বিশাল বৈচিত্র্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ও কর্মকাণ্ড এই গ্রন্থটিতে আলোচিত।

সত্তর দশক ॥ প্রথম খণ্ড ॥ পনের টাকা

সত্তর দশক ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ পনের টাকা

তপোবিজয় ঘোষ **নীল-বিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী** পনের টাকা

জর্জ টমসন **মানব সত্তা** পনের টাকা

উপন্যাস গল্প ও কবিতা :

উদ্যোগপর্ব ॥ উপন্যাস ॥ সাধন চট্টোপাধ্যায় ॥ পনের টাকা

প্রসব ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ স্বর্ণ মিত্র (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী) ॥ বারো টাকা

বোকাবুড়োর ছেলেরা ॥ গল্পগ্রন্থ ॥ শঙ্কর সেনগুপ্ত ॥ বারো টাকা

মহাদেব নায়েক মা'র কাছে যাচ্ছে ও অন্যান্য গল্প ॥ মোহিত রায় ॥ বারো টাকা

ঈশ্বরের মা উল্লাসিনী ॥ গল্প সংকলন ॥ অসিত চক্রবর্তী ॥ পনের টাকা

প্রতিশ্রুতি সময় স্বদেশ ॥ কবিতা সংকলন ॥ সব্যসাচী দেব ॥ ছ' টাকা

বৃদ্ধ মানুষটি এবং সমুদ্র ॥ কবিতা সংকলন ॥ জয়ন্ত চৌধুরী ॥ পাঁচ টাকা

নিষিদ্ধ বৃক্ষ ॥ কবিতা সংকলন ॥ রঞ্জিত গুপ্ত ॥ চার টাকা

ঝড়ের কাব্য ॥ কবিতা সংকলন ॥ অভীক গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চার টাকা

সত্তর আশির কবিতা ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শোভন সোম ॥ পাঁচ টাকা

ধানা গারদ থেকে মাকে ॥ কবিতা সংকলন ॥ সৃজন সেন ॥ ছয় টাকা

সংবাদ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধূলা, ছাত্রজগত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহুমুখী পাক্ষিক পত্রিকা

কৃষি সাহিত্য

পড়ুন, গ্রাহক হোক, বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পাঠান।

সম্পাদক স্বপন কুমার ভৌমিক / মাজদিয়া / নদীয়া।।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তার অনেকটা অংশ জুড়েই ছিল পল্লী উন্নয়ণের চিন্তা। তাঁর সেই চিন্তার বাস্তবরূপ নেয় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আজ আমরা তাঁর সেই চিন্তাধারার শরিক। গ্রামগুলিতে যদি সভ্যতার আলো না পৌছোয় তবে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পল্লী বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মানুষের সেবায় ব্রতী। ইতিমধ্যে এরাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া হয়েছে এবং পর্ষদ সপ্তম যোজনাকালের মধ্যেই পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার লক্ষ্যে স্থির। প্রসঙ্গতঃ বিগত বছরগুলিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় পল্লী বাংলার কৃষি কুটির শিল্প স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের পরিসংখ্যান বর্দ্ধমান। বিদ্যুতের ছোঁয়ায় শত শতাব্দীর অন্ধকার কেটে নুতন দিনের আবির্ভাবের শুভক্ষণ ত্বরান্বিত করেছে।

পল্লী সংগঠনে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ ষ্ট্রিট / কলিকাতা : ৭৩ / ৭০০০৭৩

ছোটদের মনের মত কয়েকটি উপহার

— গল্প—

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত সোনার নদীর রাজা
প্রফুল্ল রায় কাবুল আর টাবুল
মহাশ্বেতা দেবী হারে-রে-রে
নির্বেদ রায় মুছে গেল পদচিহ্ন

—অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনী—

কবিতা সিংহ চার পলাতকের কাহিনী
প্রণয় সেন অভিশপ্ত চুনার
অনিল ভৌমিক অদৃশ্য জলদস্যু
শচীন দাস আবিষ্কারের গল্প
সুজিতকুমার সেনগুপ্ত রক্তমাখা গুপ্তধন (২য় সংস্করণ)
সুন্দরবনের শয়তান
শিশির মজুমদার পাতালপুরী অভিযান
সংকর্ষণ রায় কাল নাগিনীর আক্রোশ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডব গোয়েন্দা—১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড
৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড প্রতি খণ্ডে ৯-০০

— ছবি ও ছড়া—

চিত্তরঞ্জন মাইতি ছোটদের রামায়ণ

—বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প—

সংকর্ষণ রায় রক্ত প্রবাল

—পুরাণের গল্প—

সুনির্মল বসু ছোটদের পদ্মাপুরাণ
কমল লাহিড়ী ভক্তের ভগবান (১ম খণ্ড)
(২য় খণ্ড)

—জীবনী—

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাহিনী	৬-০০
	গল্পে বিবেকানন্দ	৬-০০
	শ্রীমা	৬-০০
	গল্পে নিবেদিতা	৬-০০
	রবার্ট ব্রাউনিং	১২-০০
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়	পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া	১৫-০০

—বিবিধ—

কর্মব্রত	কাজের কথা	৭-০০

১লা বৈশাখ ১৩৯২ প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ

কালীপদ সরকারের ।। আনন্দমঠ : প্রতিশ্রুতি ও প্রতিষ্ঠা ১৬৲

ডঃ রামবহাল তেওয়ারীর ।। সূরপদ রত্নাবলী ৪০৲

(মহাকবি সূরদাসের ২৫৫টি পদের বিশ্লেষণ ও জীবনী)

অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থ

আলোচনা

প্রবোধ চন্দ্র সেনের

আধুনিক বাংলা ছন্দ সাহিত্য ৩০৲

ছন্দ সোপান ৫৲

ডঃ রামবহাল তেওয়ারীর

আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ ৮৲

শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের

শরদঃ শতম্ ৩০৲

(শরৎ চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন)

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের

অশোকের বাণী ১০৲

কমলকুমার সান্যালের

ভারতের অপরাধের ধারা ১২৲

আইন বিষয়ক

টোডর মলের

ভূমি রাজস্ব ও জরীপ (৩য় সং) ২৫৲

পঃ বঃ ভূমি সংস্কার আইন ১০৲

পঃ বঃ বর্গাদার আইন ও অপারেশন বর্গা ৫৲

পঃ বঃ পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মাবলী ২০৲

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ৩৲

Land Holding Revenue Act & Rules 10/-

দ্বিজদাসকর অনূদিত

কপি রাইট আইন, ১৯৫৭ ৮৲

পঃ বঃ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন,১৯৭৯ ৪৲

উপন্যাস

বাণি দেবীর ॥ অন্য ঠিকানায় ১৫৲

বাণিক রায়ের ॥ বেদনার্ত স্রোত ১৫৲

বিমলেন্দু চক্রবর্তীর ॥ সোপান ৭৲

কিশোর উপন্যাস

মঞ্জিল সেনের ॥ পরশমণি ৬৲

বিমলেন্দু চক্রবর্তীর ॥ গনগণির গুপ্তধন ৮৲

অনিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রিট কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মাস এডুকেশন

পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার

[বি. এ, বি. এস. সি, বি. কম, (পাশ ও অনার্স) সকল স্তরের বই (ইংরাজী ও বাংলা) পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইংরাজী ও বাংলা এম. এ, স্তরের জন্যও বই পাওয়া যায়।]

যোগাযোগ কেন্দ্র

১৪/১, টাউন সেণ্ড রোড

কলিকাতা-৭০০০২৫

সময় : সকাল ১০টা—৪টা

পড়ুন ও পড়ান

পৃথিবীর পাঠশালা

একটি নির্ভীক ও সামাজিক মাসিক পত্রিকা।

প্রতি সংখ্যা—	১·০০ টা
ষান্মাসিক চাঁদা—	৬·০০ টা
বাৎসরিক চাঁদা—	১২·০০ টা

প্রতি মাসের ৮ তারিখে প্রকাশিত হয়।

মাস এডুকেশন প্রকাশিত গণশিক্ষা সিরিজের বইগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

১। শিশু শ্রমিক	৩·০০ টা
২। বার্ধক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সমীক্ষা	৩·০০ টা
৩। প্রতিবেশী	২·০০ টা
৪। স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর	২·০০ টা
৫। রাষ্ট্র নায়কদের কাব্য ভাবনা	৩·০০ টা
৬। ভারতের আদিবাসী পরিস্থিতি	২·৫০ টা
৭। প্রতিবন্ধী মানুষের সামাজিক সমস্যার রূপরেখা	৪·০০ টা
৮। বাংলাদেশের বাম পন্থীরা	১·০০ টা
৯। অপরাধী অপরাধ প্রবাহ এবং সমস্যা	২·০০ টা

PRASA/POF-131/84

murphy

Delights the home!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

আমার কবিতা (ছোট কবিতার সংকলন) ১৪·০০ নির্বাচিত কবিতা (পুলক চন্দ সম্পাদিত) ১২·০০ শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪·০০ আর এক আরম্ভের জন্য ৬·০০ পৃথিবী ঘুরছে ১·০০ দিবস রজনীর কবিতা ১·৫০ বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা (২য় খণ্ড) ১২·৫০) (৩য় খণ্ড) ১২·৫০ ভাতে পড়লো মাছি (সামসুল হক সহ) ৩·০০ এই হাওয়া (অরুণ ভট্টাচার্য সহ) ৪·০০ সত্তর আশির কবিতা (শোভন সোম সহ) ৫·০০ উচ্চারণ (মানস রায় চৌধুরী সহ) ৭·০০ ঐতিহাসিক পদযাত্রা / আমার যজ্ঞের ঘোড়া (মণিভূষণ ভট্টাচার্য সহ) ১২·০০ চিড়িয়াখানা (ছোটদের জন্য / সম্পাদিত) ৮·০০ অথচ ভারতবর্ষ তাদের ৫·০০

প্রাপ্তিস্থান

উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

কথাশিল্প, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

সবাইকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পিয়ারলেস

আজ আমি সত্যিই সুখী। ছোট হলেও নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে পেরেছি।

কিছুদিন আগেও বাড়ী তৈরীর কথা আমার কাছে দিবাস্বপ্ন বলেই মনে হতো। কারণ, এমন কিছু বড় চাকরী তো আমি করতাম না. এরই মধ্যে ছেলেকে মানুষ করেছি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। ঘটনাচক্রে কিনে ফেলেছিলাম পিয়ারলেসের অল্প টাকার একটা সার্টিফিকেট। সম্বল বলতে তখন ছিল ঐ কটা টাকাই।

সেই সূত্রেই পিয়ারলেসের সঙ্গে যোগাযোগ। ওঁরাই আমার বহুদিনের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুললেন, তাকে বাস্তবায়িত করবার পথ দেখালেন।

আজ আমি একজন পিয়ারলেসের ইন্সপেক্টর। একটা বিশাল পরিবারের একজন। সবার আশীর্বাদে আজ আমি সুদিনের মুখ দেখতে পেয়েছি। পিয়ারলেসেরই সহায়তায়। আমার বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক।

সামান্য সঞ্চয় যে ভবিষ্যতের এতবড়ো সহায় হতে পারে — আমার চেয়ে একথা আর ভালো কে বুঝবে?

ভারতের বৃহত্তম বন্ড-আর্থিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯৩২

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ঈস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সরকারী তহবিলে মোট জমা ৫০০ কোটী টাকার উর্দ্ধে

এই সংখ্যাকে অভিনন্দন ও
শুভেচ্ছা জানাই

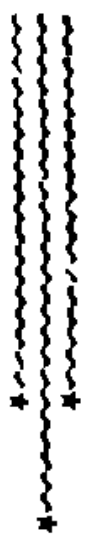

জনৈক শুভার্থী ॥

মহাশ্বেতা দেবীর বই

শৃঙ্খলিত—	১০·০০
সিধু কানুর ডাকে—	১৮·০০
ঘরে ফেরা—	১৫·০০

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন / কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হল :

ই. এম. ফরস্টারের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া— ৩০·০০

বঙ্গানুবাদ : রবিশেখর সেনগুপ্ত

মহাশ্বেতা দেবীর নতুন স্বাদের উপন্যাস—

বিবেক বিদায় পালা— ১৫·০০

আশ্রয়— ১২·০০

আজকের অগ্রগতির আমরাও শরিক

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সফল রূপায়ণে লক্ষ লক্ষ অবহেলিত মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষদের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচির সফল রূপায়ণে তৎপর। আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই খাতে বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ৮৪-৮৫ সালে ৬৩·৮০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নানা প্রকল্পে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা তফশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ব্যয় করছেন।

কৃষি, কুটির শিল্প, সেচ, মৎস্য, পশু পালন, বন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী, বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনগ্রসর মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য, এ রাজ্যে আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশনের অধীনে ৬৮টি বহুমুখী সমবায় সমিতি সক্রিয়। ছোটখাট ব্যবসা, দোকান ইত্যাদি খোলার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ তফশিলী ও আদিবাসী উন্নয়ন বিত্ত নিগম এবং আদিবাসী সমবায় কর্পোরেশন অল্প সুদে ঋণদানের কর্মসূচী নিয়েছেন।

তফশিলী ও আদিবাসী জনগণের বৃহত্তর অংশ গ্রামীণ পটভূমির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণে এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত। খাজনা মকুব ছাড়াও পাট্টা-প্রাপ্ত এবং বর্গাচাষীদের স্বনির্ভরতার জন্য চাষের সময় সরকার ঋণ এবং অনুদান সমেত নানারকম সাহায্য দিয়ে চলেছেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৭২টি পরিবারকে মোট ১৪ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য সরকারের বননীতিও উপযুক্ত ভাবে সংশোধন করা হয়েছে। তার ফলে ১৯৮৩-৮৪ সালে আদিবাসীদের জন্য ১২ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা গেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ছাত্রাবাস ও আশ্রম ছাত্রাবাস তৈরী, বিনা খরচে বই, ছাত্রাবাসের খরচ, পোশাক ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। তফশিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া, সুন্দরবন ও ঝাড়গ্রামের উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সুন্দরবন উন্নয়ন পরিষদ ও ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন গঠনমূলক বিশেষ কার্যসূচি গ্রহণ করেছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমাজের দুর্বলতর মানুষদের উত্তরণের প্রচেষ্টায় আগামী দিনে আরও বলিষ্ঠ কর্মসূচী রূপায়ণে সক্ষম হবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৯৭৮-তথ্য/এ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামবাংলা এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে।

স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে আমরা, চেয়েছিলাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো এই আকাঙ্খিত সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে পটপরিবর্তন ঘটল। রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল এক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যাতে শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হল গ্রামাঞ্চলে। গ্রামের মানুষেরাও অনুভব করতে পারলেন যে স্থানীয় শাসন আসলে তাঁদেরই হাতে।

পঞ্চায়েতের নানান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনে এল নবজীবনের জোয়ার। ভূমিহীন শ্রমজীবীদের মধ্যে চাষের জন্য বণ্টন করা হল সরকারের অধিকৃত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি, আর গৃহহীনদের দেওয়া হল বাস্তু ভিটা। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে জমির ওপরে ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, তৈরি হল নতুন রাস্তা, এল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সুবিধা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য গৃহীত নতুন নীতিও সুফল এনে দিয়েছে। সমবায় ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্প, মৎস্য-চাষ ও পশুপালনের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে নতুন সুযোগ। গ্রামের শ্রমজীবীরা এখন পাচ্ছেন নির্ধারিত নিয়তম মজুরী। তফশিলী জাতি ও উপজাতি সহ সমগ্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা। সমাজভিত্তিক বনসৃজন এবং নতুন বনভূমি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখার বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাংলাকে প্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৭১-তথ্য/এ

"খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কর্মসূচী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিজীরই চিন্তা প্রসূত, আর খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় অবস্থিত সমাজের দুর্ব্বল অংশের অসংখ্য মানুষের সেবাই আমাদের ব্রত।

পশ্চিমবাংলার অন্যতম বৃহত্তম অভিজাত খাদি প্রতিষ্ঠান

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ : পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : বি. এইচ. বি. ২০৮ এবং ২৬৭

কলিকাতা শাখা :

খাদি সিল্ক এম্পোরিয়াম

১নং সেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন : ৪৩-১৯১৮

Always use
"White Elephant" Brand
Cocoanut Oil

★

Manufacture by :

New India Cocoanut Oil Mills

P. O. Banjethia, Cossimbazar

DIST. MURSHIDABAD. (W. B.)

With Best Compliments from

M/s. METALFAB (INDIA)

Chatterjee International Centre

33A, J. L. NEHRU ROAD

12TH FLOOR, FLAT No. A-10,

CALCUTTA-700 071

Phone : 24-7270

মানুষকে চেতনাগত ভাবে আঘাত দিতে·····
জীবনের সঠিক পথ নির্দেশ করতে·····

যুগাগ্নি নাট্যসংস্থা

৯৬ নেতাজী রোড ঃ খাগড়া ঃ মুর্শিদাবাদ

চলতি প্রযোজনা ঃ

মহাশ্বেতা দেবীর বিছন

মহাশ্বেতা দেবীর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ জানাই

নতুন প্রযোজনা

ধরমবীর ভারতী'র **অন্ধযুগ**

নির্দেশনা ঃ পম্পা মজুমদার

ধরিত্রী
১৩৬/১ অমর চক্রবর্ত্তী রোড, (নবনতার গলি)
খাগড়া ঃ মুর্শিদাবাদ

গ্রাম মুর্শিদাবাদ যখন সদরে এসে বিচারের বাণীর নীরব নিভৃত কান্না শোনে তখন আমরা তার বাসযোগে বাসার ফেরার পথে ওত পেতে থাকি দস্যু ঠ্যাঙারের মত। শেষ সম্বল হারিয়ে সে হাতে তুলে নেয় এক প্যাকেট প্রত্যাশা। তার সজল চোখে চিকমিকিয়ে ওঠে প্রত্যয় নির্ভেজাল গুণ ও মান তাকে বার বার টেনে আনে সদরে।

সমবায়িকা

বহরমপুর : ফোন ৩৩৫

শাখা কেন্দ্র : লালবাগ পাঁচমাথার মোড়

মুর্শিদাবাদ হোলসেল কনজ্যুমার্স কো-অপাঃ সমিতি লিঃ

ফোন : ৫৩৪

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

শাখা—ইসলামপুর

স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের একমাত্র বৃহত্তম সমবায় প্রতিষ্ঠান

মুর্শিদাবাদ জেলার চাষী ভাইদের জন্য—

★ কলাচাষ, পানচাষ ও পেঁপে চাষ

★ রেশমশিল্প

★ ভূমি সংস্কার

নবপত্রে প্রকাশিত বই

দুর্লভ গ্রন্থ

রেভারেণ্ড জেমস লঙ্	: প্রবাদমালা (১ম)	১২-০০
	: প্রবাদমালা (২য়)	১০-০০
	: প্রবাদমালা (৩য়)	১৫-০০
চণ্ডীচরণ সেন	: মহারাজ নন্দকুমার	৩০-০০
চণ্ডীচরণ সেন	: অযোধ্যার বেগম	৩০-০০
ভরত নাট্যশাস্ত্র (৪র্থ খণ্ড)		প্রতিখণ্ড ৫০-০০
রজনীকান্ত গুপ্ত	: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	২৫-০০
রজনীকান্ত গুপ্ত	: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (২য় খণ্ড)	২৫-০০
রজনীকান্ত গুপ্ত	: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)	২৫-০০
রজনীকান্ত গুপ্ত	: সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)	২৫-০০
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	: বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	২৫-০০
বিহারীলাল সরকার	: বিদ্যাসাগর	৩৫-০০
বরেন বসু	: রঙরুট	২৫-০০

বিবিধ

দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	: দ্রব্যগুণ	৪০-০০
সম্পাদনা : কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ	: আয়ুর্বেদ প্রদীপ	১৮-০০
ক্ষিতিমোহন সেন	: সীমা ও অসীম	৭-০০
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	: উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ	২৫-০০
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	: প্রাচীন ভারতের অপরাধতত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞান	১৬-০০
: অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	: বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা	৩৫-০০
বদরুদ্দিন উমর	: পূর্ব-বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	৮-০০
	: সাম্প্রদায়িকতা	১০-০০
ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত	: পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ	
অলকা চট্টোপাধ্যায়	: অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	

নবপত্র প্রকাশন

৮, পটুয়াটোলা লেন : কলিকাতা-৭০০০০৯

নবান্ন নাট্যগোষ্ঠী

W. S. 3. 1/1, গলফগ্রীন
কলিকাতা—৪৫

নতুন নাটক

"জনি ও উর্বশী"

মহাশ্বেতা দেবীর নাটক অবলম্বনে
প্রস্তুতির পথে

● করুণা প্রকাশনীর বই মানেই তৃপ্তির আমেজ।

ইটের পর ইট / মহাশ্বেতা দেবী

চরিত্রের পর চরিত্র সাজিয়ে কাহিনী। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এই নবতম গ্রন্থে ইটের পর ইট গেঁথে গড়ে তুলেছেন সমাজ জীবনের বাস্তব ইমারত। যার বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা ভবিষ্যৎকে অন্য এক উজ্জ্বলতা দিতে চাইছি। মূল্য ১২-০০

লেখিকার অন্য একখানি গ্রন্থ ॥ শালগিরার ডাকে ॥ যন্ত্রস্থ

জীবে দয়া / নবনীতা দেব সেন

শ্লেষাত্মক রচনার দিন নাকি শেষ হয়েছে। আজকালকার সাহিত্যে সেই মজা, শ্লেষ, স্নিগ্ধ বিদ্রূপের প্রলেপ পাওয়া যায় না। আমরা এর সঙ্গে একমত নই। নবনীতা দেব সেনের লেখাগুলি পড়লেই জানা যাবে তিনি কত অনায়াসে সাহিত্যের এই দিকটিকে উদ্ভাসিত করছেন।

ভাতের গন্ধ / প্রফুল্ল রায়

উপন্যাস নামে প্রচুর বই প্রকাশিত হয়, যার তিনভাগই আদপে উপন্যাস নয়। কারণ উপন্যাস রচিত হয় প্রাথমিক একটি ক্যানভাসের মধ্যে। সকলের কলমে এই ক্যানভাস ধরা পড়ে না। ভাতের গন্ধ আকারে ছোট হলেও প্রফুল্ল রায় তাঁকে অনবদ্য রূপ দিয়েছে আপন অভিজ্ঞতার অসামান্যতায়। মূল্য ॥ ১৪

ঈশ্বরের বাগান / অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনা টিলজির শেষ খণ্ড ঈশ্বরের বাগান। তার প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়ে পাঠককে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। এমন লেখা প্রতিদিন হয় না। কখনো কখনো হয়—তাই বেঁচে থাকে চিরকাল। মূল্য ॥ ৩০-০০

আগুনের চারপাশে / সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আগুনের চারপাশে সিরাজের নবতম বই। তার অন্যান্য বইয়ের মতোই এ গ্রন্থে পাবেন নতুন এক স্বাদ যা সিরাজের জাদুকরী ভাষা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। মূল্য ॥ ১৬-০০

আলোর ঠিকানা নাই / সুকন্যা

মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস রচনায় একটি প্রসাদ গুণ থাকা দরকার। যা পাঠককে ধরে রাখে, তারপর বক্তব্যের দিকে চালিত করে। এমনই এক উপন্যাস লিখেছেন লেখিকা। মূল্য ॥ ১৫-০০

উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন / কমল দাশ

কমল দাশ জীবনে যেমন ঘুরেছেন অনেক তেমনি দেখেছেন আরো বেশি। সেই দেখাকেই তিনি তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। মূল্য ॥ ১৪-০০

করুণা প্রকাশনী

১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ ফোন ॥ ৩৪-৬২৬৮

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছেন

প্রতি সাপ্তাহিক বেলায়

প্রথম পুরস্কার	১	১,৫০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৯	১০,০০০ টাকা (প্রতিটি)
তৃতীয় পুরস্কার	৮৫০	১,০০০ টাকা (প্রতিটি)
চতুর্থ পুরস্কার	১৫০০	৫০ টাকা (প্রতিটি)
পঞ্চম পুরস্কার	১৫০০	২০ টাকা (প্রতিটি)
ষষ্ঠ পুরস্কার	১৫০০০	১০ টাকা (প্রতিটি)

পুরস্কারের সংখ্যা ৩৬ হাজারেরও বেশী

টিকিট, এজেন্ট এবং বিক্রয়কারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। এজেন্টদের এই ঠিকানা থেকে পুরস্কারের জন্য যোগাযোগ এবং বিক্রয়কারের এই ঠিকানা থেকে পুরস্কারের জন্য যোগাযোগ।

প্রতি টিকিট ১ টাকা

শেষ প্রতি বুধবার

বিস্তারিত বিবরণের জন্য টিকিটের পেছন পৃষ্ঠার দেখুন

[illegible]

A/WBSL-5

এই সংকলন বিষয়ে

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা নিয়ে সংকলন বের করার বিস্তর ঝামেলা আছে। যে প্রশ্নটা প্রথমেই উঠে পড়বে, তা হল : কোন্ মহাশ্বেতা দেবী ? সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে মহাশ্বেতা দেবী মানে 'অগ্নিগর্ভ', 'অরণ্যের অধিকার', 'চোট্টি মুণ্ডার তীর'। তাঁদের জানা আছে, গ্রামবাঙলা, হরিজন জীবন আর আদিবাসী সমাজ নিয়ে প্রচুর খোঁজখবর রাখেন এই ছটফটে রাগী মানুষটি। ঘোরাঘুরিও বিস্তর। কিন্তু যাঁরা আর একটু বেশি জানেন, তাঁরা বলবেন, মহাশ্বেতা কি শুধু এইটুকুই ? মেদিনীপুর—পুরুলিয়া থেকে শুরু করে রাঁচি-পালামৌ পর্যন্ত মাটি আর মানুষের সঙ্গে এমন যোগ, গাঁয়ের মানুষের নিজে হাতে গড়া অজানা অনামা সব সমিতি আর সংগঠনের এত খোঁজ কজন রাখেন ? আর গ্রামগঞ্জের সেই সব মানুষ—মুমূর্ষু-মুণ্ডা, কোটাল-সর্দার আর বাঁশফোড়-পাশোয়ানরা তখন সায় দিয়ে বলবেন, মহাশ্বেতা একজন লেখিকা বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল—তাদের 'দিদি'। আর সেচ, অরণ্য, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সরকারী কর্তারা জানাবেন, হ্যাঁ লিখিয়ে বটে ভদ্রমহিলা—শুধু চিঠি-পত্তরই যা লেখেন তাতেই···

'ভদ্রমহিলা' ! খুব বেখাপ হয়ে গেল শব্দটা। ভদ্রমহিলা, লেখিকা, অধ্যাপিকা !—কোনটাই যেন ঠিক আঁটে না মহাশ্বেতাকে। ভদ্রমহিলার মতো রেখে-ঢেকে কথা তিনি বলেন না। লেখিকার মতো দিনরাত শুধু লেখা আর প্রকাশক নিয়েই পড়ে থাকেন না ; এই সেদিন পর্যন্ত যে তিনি কলেজে ইংরেজী পড়িয়েছেন—বলে না দিলে জানবে না কেউ। প্রথম জীবনে বুন্দেলখণ্ড ছুটেছিলেন ঝাঁসীর রাণীর জীবনী লিখবেন বলে ; আর আজ ছুটে বেড়ান মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পালামৌ। এক সময় সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন ; আর আজ গল্প লেখেন হরিজন আর আদিবাসী সমাজের বঞ্চনা নিয়ে ; আবার সেই হাতেই দিব্যি চিঠি লিখে পাঠান সরকারী দপ্তরে—কোথায় কোন্ গাঁয়ে কুয়ো নেই—কোথায় গোটা কয়েক ফলগাছের চারা আর আট-দশটা করে ছাগল মুরগী দিলে কোন রকমে বাঁচার কথা ভাবতে পারে একদল চিরবঞ্চিত মানুষ।

এ ভারী মজার কথা। মহাশ্বেতার ঘরের দরজায় ইংরেজীতে লেখা আছে : লেখার ঘর। প্রবেশ নিষেধ। আর তাঁর ঘরে দিনরাত লোক। লেখক অধ্যাপক, প্রকাশকরা নন—যাদের নাম কেউ জানে না—এমন সব মানুষ—কেউ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন, কেউ গাঁয়ে সমিতি গড়েছেন, কেউ বা ছোট পত্রিকা বের করেন। দেখা যায়, মহাশ্বেতা একাই কথা বলে যাচ্ছেন—অনর্গল—কিভাবে এগোতে হবে—সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে—পাওনা আদায় করতে হবে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে নিয়ে লিখছেন। কখনও গল্প-উপন্যাস, কখনও ইংরেজিতে রিপোর্ট, কখনও বর্তিকার বিজ্ঞাপনের তাগাদা, কখনও বা সরকারী দপ্তরে চিঠি।

এই সব কিছু মিলিয়ে যে মহাশ্বেতা, কোন একটা সংকলনে তাঁকে নিশ্চয়ই পুরোটা ধরা যায় না। তবু আমরা চেষ্টা করেছি, গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি অন্য ধরণের কিছু লেখাও দিতে। এই সংকলনে সেই সব লেখাই আছে, যেগুলো আগে বই হয়ে বেরোয় নি। এ রকম লেখা আরও অনেক আছে। আমরা কয়েকটা বেছে নিয়েছি। এই বাছাইয়ের কাজে সম্পাদককে সাহায্য করেছেন বর্তিকার অন্য বন্ধুরাও। জায়গার অভাবে অনেক ভালো লেখা দেওয়া গেল না। এ সংকলন সেদিক থেকে নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ।

আর আমন্ত্রিত সম্পাদকের নিজের বিচারে এই অসম্পূর্ণতা আরও বড়, তা শুধু এই সংকলনেই নয়, মহাশ্বেতার সমস্ত রচনায়। স্বভাবে মেজাজে অসম্ভব ছটফটে এই মানুষটি লিখতে বসেও যেন একটু শান্ত হতে জানেন না। তাঁর অনেক লেখাই তাই পড়ে মনে হয়, আরও অনেক ভালো যেন হতে পারত। মহাশ্বেতা নিজে অবশ্য এসব মানতে চান না। অনেক সময় রেগে ওঠেন শিশুর মতো। এক 'সূর্যসমান ক্রোধ' নিয়ে মহাশ্বেতা লিখতে এসেছেন। তাঁর দাবী : শিল্প তিনি বোঝেন না। বোঝেন যে ভালোই, তার প্রমাণ—দ্রৌপদী, জল, দেওয়ান খইমালা ও ঠাকুরঝটের কাহিনী, স্তনদায়িনী, বিহন, অরণ্যের অধিকার। এই তালিকা আরও অনেক লম্বা হতে পারত, যদি মহাশ্বেতা শুধু লেখার জন্যে আর একটু সময় দিতেন। অবশ্য তাহলে বোধহয় আমরা এই মহাশ্বেতা—প্রমাণমাপের একপাল লেখকের মাঝখানে দারুণ লম্বা এই মহাশ্বেতাকে পেতাম না।

আমন্ত্রিত সম্পাদক সম্পর্কে ঃ

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৯৫৪, কলকাতায়। ইংরেজী সাহিত্যের অনার্স। বর্তমানে স্কুল শিক্ষক। গল্প-প্রবন্ধ দুই-ই লেখেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'উটপাখি' (১৯৭৬) ছোট গল্পের সংকলন। এর পর 'পট-পুতুলের বাংলা'—লোকশিল্পের ওপর ছোট একটি বই। 'গ্রাম বাংলার গড়ন' (১৯৮২)—গবেষণা-গ্রন্থ; বিষয়ঃ গ্রামবাংলার সমাজ অর্থনীতি আর তার ক্রম-বিবর্তনের রূপ। এ পর্যন্ত গল্প লিখেছেন 'পরিচয়' 'সাহিত্যপত্র' 'সপ্তাহ' 'অনুষ্টুপ' 'অনীক' 'বর্তিকা' 'প্রতিক্ষণ' ও আরও অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনে। সমীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন প্রতিক্ষণ, ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি।

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তিকা বের করার প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রাম ও শহরের নিম্নবিত্ত পাঠকের হাতে বই পৌছান। বই কিনে পড়ার ক্ষমতা সকলের নেই। বহরমপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘের পরিচালকমণ্ডলীর অসীম সৌজন্যতায় ও সহৃদয় আন্তরিকতায় স্বত্বাধিকারী স্থায়ী সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবীকে দিয়েছেন বলে প্রকাশকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিজ্ঞাপনদাতা, প্রেস ও বাঁধাই কর্মী, গ্রাহক, পাঠক সকলকে জানাই ধন্যবাদ।

এই সুবিশাল সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যাই হবে পূজা সংখ্যা। এই সংখ্যা ছাপতে নানা ন্যায্য কারণে বিলম্ব হল বলেই আমরা এটিকে জানুয়ারী-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ১৯৮৫ যুগ্ম সংখ্যা রূপে প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

যাঁরা ১৯৮৩'র বার্ষিক চাঁদা তাগাদা সত্ত্বেও দেননি, তাঁদের বই পাঠান গেল না বলে দুঃখিত।

বিজন ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক বর্তিকা

বর্তিকা

(ত্রৈমাসিক)

গ্রাহক হবার নিয়ম :

গ্রাহক চাঁদা : বার্ষিক ১২ টাকা। সডাক ১৬ টাকা। রেজেস্ট্রি ডাক ২৭ টাকা। গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই, গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হয় এবং নিয়মিত ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয় যিনি ১০ টাকা দেবেন তিনি যথাসময়ে পত্রিকা আপিস থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করবেন। ৪ সংখ্যার নিচে গ্রাহক করা হয় না।

এজেন্সি নেবার নিয়ম :

১। অন্ততঃ ৫ কপি পত্রিকা নিতে হবে। কমিশন ২৫%।

২। অন্ততঃ ২০ কপি বা তার চেয়ে বেশি পত্রিকা নিতে হলে ১০ টাকা এজেন্সি জমা রাখতে হবে। পত্রিকা পাঠান হবে ভি, পি, তে।

৩। ২০ কপির কম পত্রিকা নিলে এজেন্সি—জমা প্রতি কপি পিছু ২ টাকা। পত্রিকা পাঠানো হবে বুকপোস্টে। উভয়ক্ষেত্রেই ডাক খরচ আমরা বহন করব।

৪। প্রতি সংখ্যার দাম পত্রিকা পাবার ১৩ দিনের মধ্যে অবশ্যই পাঠাতে হবে। না হলে পরের সংখ্যা পাঠানো হবে ভি, পি, তে—আগের সংখ্যার+নতুন সংখ্যার দাম ধরে নিয়ে এবং ডাক খরচ বহন করতে হবে এজেন্টকেই।

৫। আর ভি, পি, প্যাকেট (২ ও ৪ নং নিয়ম অনুসারে প্রেরিত) ফিরে এলে এজেন্সি বাতিল ও এজেন্সি জমা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এজেন্সি বাতিলের খবর জানিয়ে দেওয়া হবে।

৬। **ডাকযোগে পত্রিকা নিতে হলে গ্রাহক চাঁদা ও এজেন্সি জমা সম্পাদককে পাঠাতে হবে ॥**

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

বিজন ভট্টাচার্য / ১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড (লালদীঘি) / পোঃ বহরমপুর (পঃ বঃ)

গ্রাহক ও এজেন্ট সর্বদা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

এই সংখ্যার সৌজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের ধন্যবাদ জানাই

দৈনিক বর্তমান—কলকাতা ॥
দৈনিক সত্যযুগ—কলকাতা ॥
সরণ / ফুলডাঙা / বাঁকুড়া ॥
সাপ্তাহিক দিদিভাই / কোটাসুর / বীরভূম ॥
রণভরী (মাসিক কবিতাপত্র) / স্কুল রোড / বনগ্রাম / ২৪ পঃ গঃ ॥
রাঢ়দর্পণ / সালার / মুর্শিদাবাদ ।।
কর্ণসুবর্ণ / খাগড়া / মুর্শিদাবাদ ।।
অনীক / খাগড়া / মুর্শিদাবাদ ।।
কান্দীবান্ধব / কান্দী / মুর্শিদাবাদ ।।
নাগরিক / খাগড়া / মুর্শিদাবাদ ।।
গোপন তথ্য / হলদিয়া / মেদিনীপুর ।।
সমাহার / ঝাড়গ্রাম সমাচার / ঝাড়গ্রাম ।।
প্রগতিবার্তা / কল্যাণী / নদীয়া ।।
প্রতিবাদী চেতনা / শান্তিপুর / নদীয়া ।।
জলপ্রপাত / দুর্গাপুর / বর্ধমান ।।
প্রতিলিপি / বালুরঘাট / পশ্চিম দিনাজপুর ।।
এঁদের এবং
প্রতিটি পত্রপত্রিকাকে, যাঁরা সৌজন্য বিজ্ঞাপন দানে আমাদের
কৃতজ্ঞ ও ঋণী করেছেন ।।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজন ভট্টাচার্য

With Best Complements of :

M/s. G. D. Electro Plating Works

P-78 Beehive Garden
Cal—700056

All Sorts of Electroplating Job

ফর্ম ৪ ও ৬ রুল অনুযায়ী

ত্রৈমাসিক বর্তিকা সম্পর্কীয় তথ্যাবলী

প্রকাশের স্থান : ভ্রাতৃসংঘ, বহরমপুর, গোরাবাজার, মুর্শিদাবাদ।

প্রকাশনার সময় : ত্রৈমাসিক

মুদ্রাকরের নাম : বিজনকুমার ভট্টাচার্য্য, জাতি ভারতীয়,
বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশকের নাম : ঐ

সম্পাদকের নাম : মহাশ্বেতা দেবী, জাতি ভারতীয়, ফ্ল্যাট নং ৫
১৮এ, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোড, কলিকাতা-১৯।

স্বত্বাধিকারী : মহাশ্বেতা দেবী

আমি বিজন কুমার ভট্টাচার্য্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ বিজনকুমার ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বর্তিকা
১৫-৩-৮৫

গল্প

সূচীপত্র

জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫

গল্প	পৃষ্ঠা নং
জল (শারদীয়া অমৃত / ১৯৮১)	১
তরাস (শারদীয়া প্রসাদ / ১৩৮৮)	১০
ভাতুয়া (১৩৮৯)	২১
পিতাপুত্র (শারদীয়া নবরং / ১৯৮০)	৪৩
এইচ. এফ. ৩৭ : রিপোর্টাজ (সমতট / ১৯৭৭)	৫২
সমাজবাদ ববুয়া (শারদীয়া প্রমা / ১৯৮৩)	৬৪
চড়ক (শারদীয়া শিল্পাশিত্য / ১৩৮৯)	৭৭
ভীষণ যুদ্ধের পর (শারদীয়া কিশোর ভারতী / ১৩৮৯)	৯১
জাতুধান (১৯৭৮)	১০২
গিরিবালা (প্রসাদ / ১৩৮৯)	১১৮
ভাড (১৩৯০)	১৩৬
চড়ক (১৯৭২)	১৪৭
বড়াম মায়ের থানে (শারদীয়া পক্ষীরাজ / ১৩৯০)	১৫৫
ভাসাভাসি (শারদীয়া কলেজ স্ট্রীট / ১৩৯১)	১৬৪
মানত (শারদীয়া বিভাব / ১৩৯১)	১৮৮
কুড়োনির বেটা (শারদীয়া অনুষ্টুপ / ১৩৮৯)	২০৩
অর্জুন (দৈনিক বর্তমান / ৭-১২-৮৪)	২২৫

জল

মহাশ্বেতা দেবী

বাকুলি গ্রামটা একটা লাল ডাঙাজমির গামলার পেটে বসানো। হেলিকপটার থেকে দেখে অপারেশন-বাকুলির নায়কদের তাই মনে হয়েছিল। রিপোর্টে লেখা হয়েছিল কূর্ম-পৃষ্ঠের গড়ন বেসিনের মত। একটা বিশাল বেসিনের পেটের মধ্যে গ্রাম। চারদিকে জমি উঁচু ও গোল। পূবদিকে দেড় মাইল দূরে ক্যানাল। গ্রামে ১১টি পরিবার বাস করে, জনসংখ্যা ১০১। উৎপন্ন শস্য ধান। কর্ষণযোগ্য জমি বেসিনের কানার বাইরে। একটি বড় তেঁতুল গাছ, কয়েকটি আম, কাঁঠাল, শিরীষ ও পলাশ গাছ আছে। এ গ্রামের ধর্ম-ঠাকুরের থান প্রসিদ্ধ। লক্ষণ সামন্ত সবটুকু কৃষিভূমির মালিক। গ্রামের ১৮টি পরিবার লক্ষণের ভাগচাষী। গ্রামে জলের অভাব খুব বেশি। লক্ষণের বাড়ির চৌহদ্দিতে দুটি ইঁদারা ও একটি গভীর নলকূপ আছে। গ্রামের প্রাচীন পুকুরটি বর্তমানে মজা, জলশূন্য। চার মাইল পশ্চিমে খরস্রোতা নদী। আমরা যখন দেখি, লক্ষণের বাড়ি ও ধানের টাল থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।

তারপর অপারেশন-বাকুলি আকাশ থেকে মাটিতে নেমেছিল। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা টেলিফোন যোগাযোগ ও রেডিও-সিগনালের মাধ্যমে হয়।

গোকুল, নিরাপদ ও তারিণী লক্ষণ সামন্তের ধানের টাল থেকে ধান টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তেঁতুল গাছের নিচে জমা করছিল, গোকুলের বাবা নির্ভরসা ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছিল।

গোকুল সরযূকে বলেছিল, রাতে হোক দিনে হোক পালাতে হবে। পালাবার পথ আছে কিনা আজ দেখে আয়।

আঁধারে-আঁধারে যাব।

সরযূ গিয়েছিল। অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল।

অনেক বাদে ফিরে এসেছিল মুখ শুকনো করে। বলেছিল, কোনো দিক হতে বেরাবার পথ নাই। সকল দিক ঘিরা। সক—ল দিক!

কেননা তখন অপারেশন-বাকুলি অন্য হাতে চলে গিয়েছিল। গ্রাম ঘেরা হয়েছিল, দেখবে যেন একটি মাছিও না বেরোতে পারে নির্দেশ দিল।

সকালে ১৮টি পরিবার দেখেছিল চারিদিক থেকে গোল হয়ে মানুষের, সারি সারি মানুষের বেড়াজাল বাকুলির দিকে নামছে, জালটা ছোট হচ্ছে।

সরযুর আর কিছু মনে নেই। অনেকগুলি লোক নামছে। এগোচ্ছে, সংকল্পে ভয়াল। পবিত্র শপথে কঠিন। নিঃশব্দ। কাঁকরের ওপর ক্রাঁচ-ক্রাঁচ শব্দ, বুটের নিচে কাঁকর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ক্রাঁচ-ক্রাঁচ-ক্রাঁচ শব্দ। ক্রমে বালকরা চুপ করল। শিশুদের চোখে বিস্ময়। গোকুল অস্ফুটে বলল, সরযু! দীঘির ধারে কোপ-জঙ্গল সেথা পলাতে পারলি না?

না। সরযুর পা নড়ল না। বুটের শব্দ বুটের শব্দ, বুটের শব্দ, হল্‌ট। হুকুম। কার নাম গোকুল দাশ? যান্ত্রিক গলা। তারপর সরযুর চেতনায় একটি কালো পর্দা। নিরুত্তর বিশিষ্ট, অবাধ্য একটি পর্দা। কার নাম গোকুল দাশ? পর্দা নেমে এল।

পর্দাটা পড়েছে, পড়েই আছে। সরযু অনেক চেষ্টা করেছে পর্দাটা তুলে ভালো করে দেখতে, বুঝে নিতে, কার নাম গোকুল দাশ? এই প্রশ্নের পর কি হয়েছিল জেনে নিতে পারেনি। স্মৃতি থেকে পর্দাটা নড়ে না। অবাধ্য, বিশিষ্ট, ভীষণ প্রতিবাদে অনড় হয়ে থাকে। যেন সরযুর স্মৃতিটা কোনো সেনসর-করা চিঠি। খানিকটা আছে। খানিকটা কালি ঢেলে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা পড়া যায়। মাঝখানের অন্ধকার অধ্যায়ের পর সরযু যখন আবার মনে করতে পারে আবার যখন বিশ্বভুবন ও বাকুলি ওর চেতনায় ধরা পড়ে তখন বাকুলির চেহারা অন্যরকম।

গ্রামে বুড়ো-বুড়ি মেয়ে-শিশুতে বাইশজন লোক। প্রতিটি বাড়ি নিশ্চিহ্ন। আকাশে ছাই। ছুটি ইঁদারা ইঁট ও কাঁকরে বোজানো। গভীর-নলকূপটি উপড়ানো মাটিতে শুয়ে আছে। তেঁতুল গাছটি ছাড়া অন্য ছায়াতরুগুলি জ্বলে ছাই। খরা চলছিলই। সব শুকনো হয়েছিল।

অপারেশন—বাকুলি সাকসেসফুল।

গামলার পুব কানায়, ক্যানালের পথ আটকে একটি অস্থায়ী অ্যালুমিনিয়ামের ঘর। সূর্য যখন ওঠে পুব দিগন্ত থেকে রাগে জ্বলতে-জ্বলতে সাদা হয়ে থাকে সূর্যের চোখ। সূর্য কোটি কোটি কারেনহাইট উত্তাপ ঢালতে-ঢালতে ওঠে। তাই সূর্য উঠলেই সরযুরা দেখতে পায় অ্যালুমিনিয়ামের ঘরটি নিখাদ রুপোর মত জ্বলছে। ঘরের জানলায় দেবতার মত গৌরদেহ, তেজস্বী এক যুবক বসে থাকে। তার চোখে দুরবীন।

গভীর নলকূপটি ঘরের নিচে বসানো। ঘর ও টিউবওয়েল কাঁটাতারে

ঘেরা। কুলিরা সারাদিন কল টেপে। জল তোলে। ঘরের চালে অ্যালুমিনিয়ামের ঘরের চালে নির্ভরসার ঘরের চাল ও ছাউনি ঝলসানো। কুলিরা হোসপাইপ দিয়ে চালটি ভেজায় বারদশেক। ঘর ঠাণ্ডা রাখার অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি। এ বছর এ অঞ্চলে দুরন্ত খরা। বৃষ্টি নেই ফাল্গুন থেকে এখন আষাঢ়। সূর্য সব সময়ে কোটি কোটি ফারেনহাইট ঢালছে তো ঢালছেই। আটটা বাজলেই দিগন্তরেখা ও আকাশের মাঝখানে বাতাস উত্তাপে কাঁপে মনে হয় দিগন্ত ব্যেপে প্রেতপ্রেতিনী নাচছে। বাতাসে কাঁকড় ওড়ে, আকাশ ধুমল ও ভয়ঙ্কর দেখায়।

লক্ষণ সামন্তের ছেলে শরদিন্দু ওই যুবকটির কাছে বসে থাকে। ওই ঘরে বাকুলির অস্থায়ী-ঈশ্বরকে চলন্ত-সংবাদ পরিবেশন করে।

এই গ্রামের ওপাশে, ক্যানেলের গায়ে যত জমি সব আমাদের। বাবা করেছিল।

চাষ হয় ?

এ বছর হয় নি। জল ছিল না।

ক্যানালে জল ছিল না ?

ক্যানালের জল কে নেবে ?

ওরা ?

কার টানা তিন বিঘে জমি আছে ? কে খাজনা দেবে ? ওদের তো এখানে পাঁচ কাঠা। দেড় মাইল দূরে এক বিঘে। এই হাল।

তোমার বাবা জল নিতে পারত।

শরদিন্দু মাথা নাড়ে। না। টানা জমি ছিল টাকা ছিল কিন্তু বাবা জল নিতে পারত না। কেন পারত না। কেন পারত না। সে কথা বাবা শরদিন্দুকে বুঝিয়ে বলেছিল।

বলেছিল, তুইও দেখি খেপা ওই গোকুলের মত। গোকুল এতক্ষণ চেঁচাল। তুইও চেঁচাচ্ছিস।

বাবা কখনোই চায়নি ভাগচাষীর জল নিয়ে চাষ করে তাকে বিঘা-প্রতি ধান বেশি বেশি দিক। নিজেদের খোরাকি পাক বাবুরাও চায়নি চাষ ভালো হোক, দুর্ভিক্ষ ঘুচুক। কেননা, দুর্ভিক্ষ থাকলে তবে সাহায্য খয়রাতি আসে।

বাবা বলেছিল, ক্যানালের জল এনে বান ভাসাতে পারি। কিন্তু জলে আমার দরকার কি ? ইঁদারা আমার। চাষের জন্যে টিপকল সরকার

আমারে দেখে দিয়েছে। আমার ঘরে কল বসাছি। জল! জল দিয়ে কি হবে? ধান হবে? ধান দেখাস না শরৎ। ধান বেচে কত পাব? বিশ হাজার টাকা? জল নিব না। ধান বাড়াব না। দেখবি এ বছরই তোর সামনে বসে পঁচিশ হাজার টাকা দশটা গ্রামে ধার দিব। ধার দিব সুদ নিব। এই সুদ হতে সকল সম্পত্তি করেছি। ক্যানালে জল আছে সে মোর অজানা?

ওদের কি বলব?

সে তুই ভাবগা যেয়ে। এদিকে আকাল হয় বুঝি সদরে যেতে হবে। খয়রাতির টাকা আসবে সে কি গোকুলের কথায়? মোরা গ্রাম-প্রধানরা রিপোর্ট দিব তবে আসবে।

শরদিন্দু বেরিয়ে এসেছিল। কি বলা যায় গোকুলকে? দুরন্ত খরা জলাভাবে পোড়তলায় চারা ধান খাক হয়ে যায়। জল পেলে তবে ধান নাড়া চলত। ক্যানালে অনেক জল। সকলের চোখের সামনে দিয়ে ক্যানাল দিয়ে জল বয়ে যায় রাতে জলের গর্জন শোনা যায়। জলের অভাবে চাষ হবে না। ক্যানালের দু-তীরে বিঘার পর বিঘা জমি বন্ধ্যাত্বের ক্ষোভে ও বেদনায় ফেটে চৌচির হবে। গোকুলকে কি বলা যায়?

গোকুল বলছিল, বাবা কি বললেন? ক্যানালের জল আনতে অনেক হাঙ্গামা।

হাঙ্গামা বলতে সদরে আজি বিড্ডি আপিসে খবর, ক্যানালের খাজনা।

বাবা বলেন, হাঙ্গামা বিস্তর।

সব যে মরে গেল মরে যায়?

লক্ষ্মণ সামন্ত বেরিয়ে এসেছিল। বলেছিল, কে ওখানে? গোকুল? কি হয়েছে বাবা?

আপনি ক্যানালের জল নিচ্ছেন না কেন?

ক্ষমতা নাই বাবা! তোমাদের ক্ষমতা থাকে নাও গা। আজি লিখ। আজি তো তুমি আমার ঘরে কল বসাবার সময়েও লিখেছ। আজি তুমি ভালই লিখ। খাজনার টাকা যোগাড় কর, আমি বিড্ডি আপিসে দিয়া দিব।

জমি আপনার খাজনা দিব আমরা।

আমার ক্ষমতা কি?

ক্ষমতা আমাদের আছে?

ক্ষমতা নাই ? ক্ষমতা অনেক। এই কল বসাবার সময়ে তোমার ক্ষমতা দেখি নাই আমি ? বাবা গোকুল ! এটা বুঝলে না আমার জমি হলে বা বাড়ির জমি, তাতেই কল বসল। নইলে বিডিও তাল তুলেছিল ক্যানাল আছে। কল দিব কেন ?

আপনি ক্ষমতাবান লোক, তাই চাষের জন্য সরকার কল দেয় আপনার ঘরে কল বসে। বেশ, জল নিবেন না। মানুষ যে মরে যায়। তার কি হবে ?

বাবা ! এই যে মরে যায় কথাটা বললে এটা কি ঠিক বললে ? বাকুলিতে কারেও আমি মরতে দিই ? কখনো দিয়াছি ? টাকা কে দেয় ? ধান-বাড়ি কে দেয় ?

জল বিনা চাষ জ্বলে যায়। তবু আপনি জল নিবেন না ?

বাবা। আমি সেকালা মানুষ। আমার বুঝ-সম্বিত আরেক রকম। দোষ নিওনা বাবা একটা কথা শুধাই। ভগবান জল না দিলে চাষ হয় খালের জলে ? কখনো হয়েছে ? কোথাও হয়েছে ?

কুড়াসিমায় হচ্ছে।

ঠেঁটা তর্কে লাভ নাই গোকুল। কথার কুকথা বাড়ে। এখন বল, চিরকাল খরা হলে তোমার ঠাকুরবানে পূজা দিয়াছ জল হয়েছে। এবার হল না কেন ?

কেন হল না আমি কি বলব ?

এবার তোমার চেটাং-চেটাং কথায় মাহাত্ম্য ছেড়ে গেল। ঠাকুরের নামে তুমি চেটাং কথা বল। তোমা হতে বাকুলিতে পাপ ঢুকল।

তবে এই আপনার শেষ কথা ?

হ্যাঁ।

গোকুল চলে গিয়েছিল। বাবা শরদিন্দুকে বলেছিল, চিঠি দিচ্ছি। সদরে চলে যা শরৎ। আমার কথা না পেলে আসবি না। গোকুলের গতিক আমি ভালো বুঝি না। এই জন্যেই তোর মা-বউ সব সদরে রেখেছি। বাস ধরে চলে যাবি। রিপোর্ট লিখাবি সদরে।

সদরে থাকতেই খবর পেয়েছিল শরদিন্দু। লক্ষণ সামন্ত নেই। ওদের বাড়ি জ্বলছে।

শরদিন্দু সব কথাই বলল এখন। বলল, বাবারও জেদ ছিল খুব। ওই জল হতে সব গণ্ডগোল বাঁধল।

ওরা রাতে কোথায় যায় ?

দীঘিতে। দীঘির বুক খুঁড়ে। বিহানে মেয়ে জল আনে। আপনি ভাববেন না সাও। বিহান না হতে জল টেনে যায়।

তবু ওরা গ্রাম ছাড়ছে কেন ?

বাকুলিতে বসে সরযূ নির্ভরসাকে সেই কথাই বলল। বলল, গ্রাম ছেড়ে যাওনা কেন ?

কোথা যাব ?

সদরে যাবে, ভিক্ষা করবে।

তোরা ?

মোরাও ভিক্ষা করব।

কেও জল দিল না ?

না। কুড়সিমায় মোদের নাম শুনলে ডরায়। সাহেব স্নান করে, জল বহে পড়ে যায়। সে জলও দিল না। তুমি যে মাটিতে কাঠি টেনে জলের সুলুক জানতে। তোমারে যে গ্রামে গ্রামে ইঁদারা কাটবার আগে ডেকে নিয়ে যেত। তুমি জানতে। ওই ডাঙ্গাজমিতে কল বসালে জল উঠবে ? এই এত জল ?

হোথা কোনদিন দেখি নাই।

হেথা বসে বসে কল টানে, শব্দ শুনি। রাতে ক্যানালে জল বহে যায়, শব্দ শুনি। আজ তেরদিন মাথায় জল নাই। সব যেন জ্বলে গেল।

নির্ভরসা চোখ বুজে বসে রইল। একটা জালা আঁকড়ে ও বসে থাকে। জালা আঁকড়ে ঘুমোয়। মেয়েরা শেষরাতে মজাদীঘির বুক খুঁড়ে জল আনে। জালায় ঢালে। আজ তেরদিন সেই জল মেপে মেপে নির্ভরসা সকলকে দেয়। ওরা সবাই পোড়া ধান নখে খুঁটে চাল বের করে খায়। ওরা সব'ই তেঁতুল গাছের নিচে বসে থাকে দিনে ও রাতে। সরযূ মাঝে মাঝে গাছে উঠে তেঁতুল পাতা ছেঁড়ে। সকলকে দেয়। টক তেঁতুল পাতা চিবোলে মুখে লালা কাটে। গলা ভেজে। কিন্তু এখন আর শরীরে জল নেই। তাই মুখে লালা তেমন কাটছে না।

নির্ভরসা বলল, একবার গেলে আর ফিরতে পারব ? নূতন প্রজা বসাবে সরং।

নূতন প্রজা বসাবে, বাস-পারমিট পেয়েছে, টাকা দিবে সরকার।

তবে ?

তোমারে আর প্রজা রাখে ? এখন কারে বা প্রজা রাখবে। কে বা চাষ করবে বল ? মেয়েরা বুড়িরা, কোলের ছেলেরা ? তুমি বুঝ না কিছু ?

যে একবার গ্রাম থেকে খোরোষে, তাকে আর ফিরতে দিবে না, নয়তো বেরালে আমি বেবস্থা করতাম।

কি করতে ? জল নামাতে ?

বেবস্থা করতাম। নির্ভরসা অবাধ্য জেদে বলল।

সরযূ নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, লোচনের পরিবার, ছিরিপদর মা, সোনা মাঝির পরিবার, এরা চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে ?

সদরে যাবে। হেথা পড়ে জীয়ন্তে মরবে ?

নির্ভরসা চোখ বুজে বসে রইল। তারপর বলল, আজ রাতে দেখতে বল।

কেন ?

ধর্মঠাকুরের পূজা আমার হাত হতে হত। জীবনে মিথ্যা বলি নাই, আজ রাতে জল ডেকে দেখি। ঠাকুর জল দেয় কিনা।

রক্ত দিবে কে ?

তুই দিবি।

সরযূর বুকে শেল বিঁধল। গোকুলের মুখ, গোকুলের কথা বুকে বিঁধে আছে। গোকুলের যে তার ওপর খুব বিশ্বাস ছিল ? সে কেমন করে বুক চিরে রক্ত দেবে। জল ডাকবে ?

পারবি না ?

সরযূর বুক ঠেলে নিরুদ্ধ কান্না উঠে এল। মাথা নাড়ল ও। গোকুল তো এক কথাই বলে যায়নি, শুধু তো বলেনি, ধর্মঠাকুর মিথ্যে ? সে তো বলত, যে কাজে পাঁচজনের ভালো হয়, সে কাজ করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয় ? গোকুলের কথা মনে করতে গেলেই কেন কাঁকরের প্রতিবাদ বুটের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ মনে হয় সরযূর ? কার নাম গোকুল দাশ কথাটা কেন শুনতে পায় ও ? কেন মনে হয়, ওই কার নাম গোকুল দাশ ? প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে ওর চেতনা ঢেকে একটা কালো পর্দা নামিয়ে দিল কে ?

সরযূ মাথা নাড়ল। বলল, পারব।

নির্ভরসা যেন ভরসা পেল। বলল, অনেক রক্ত লাগে, তাই কারে

বলতে পারি নাই।

সরযূ মাথা নাড়ল। বলল, তবে সেই কথা।

তা বাজে জল হবে।

হবে?

কখনো বাধা যাই নাই।

সরযূ চুপ করে রইল। অপারেশন-বাকুলি সাকসেসফুল। সব নিশ্চুপ। কালাও হচ্ছে কোথাও, মুগাও হচ্ছে। সব নিশ্চুপ। ক্যানালে জল বয়ে যায়, তার শব্দ। ওদিকে কল টেপার শব্দ। জল কত জল। নিরভ্র কানাভরা রক্তাক্ত চোখ দুটি দিগন্তের দিকে মেলে দিল সরযূ। দিগন্তে বাতাস কাঁপছে। যেন প্রেতোৎসবে প্রেতপ্রেতিনী নাচছে দিগন্তে, আকাশের গায়ে। সূর্য জ্বলছে। আকাশ থেকে কোটি কোটি ফারেনহাইট উত্তাপ ঢালছে। বেলা দশটা হবে।

হাত দশটা বাজল। হঠাৎ অ্যালুমিনিয়ামের ঘরে বসে যুবকটির মনে হল বাকুলিতে বাইশটি মানুষ যেন কি করছে। কি করছে? নিশ্চয় ক্যানালে অথবা নদীতে যেতে চেষ্টা করছে না? দু-দিকেই পাহারা। তবে কি করছে ওরা?

যুবকটি কোমরে রিভলবার নিল। হাতে দূরবীন। নেমে এল ও সিঁড়ি ধরে। কাঁটাতার পেরিয়ে গামলাটার কানায় এসে দাঁড়াল। চোখে দূরবীন তুলল।

চাপা ও অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না। কিন্তু দূরবীন সব স্পষ্ট দেখা যায়। মেয়েরা। বুড়িরা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শীর্ণ কঙ্কালের মত চেহারা চুল রুক্ষ। কোনো-কোনো মেয়ের কোলে শিশু।

একটি মেয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সেই বুড়োটা। ন্যাড়া গোকুল দাসের বাবা। মেয়েটার বুকের আঁচল নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে দিল।

ভয়ংকর, নিষ্ঠুর। এক আদিম দেবতার মত দেখাচ্ছে বুড়োটাকে। বুড়োটা হাত জোড় করে কি বলল। তারপর যুবকটি শিস্ দিল উত্তেজনায়। বুড়োটা একটা ছুরি দিয়ে মেয়েটার বুক চিরে দিচ্ছে। হোআট ক্রুয়েলটি! মেয়েটার বুক দুটো কেঁপে উঠল। বুড়ো ওর হাতে একটা পাত্র দিল। মেয়েটা দু-হাত বুকের কাছে পাত্রটা ধরল। রক্ত পড়ছে নিশ্চয়ই। মেয়েটা মাথার ওপর মালসাটা তুলল। তারপর রাতের জ্যোৎস্না ও ক্যানালের জলের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে, কান্নাভরা গলায় ডেকে উঠল, জল দাও। জল

দাও গো ঠাকুর।

মেয়েটা 'জল দাও'। বলতে বলতে ঘুরতে লাগল বিশ্বভুবন জুড়ে গেল ঠাকুর জল দাও।

যুবকটিকে সব রকম সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা বলে ব্রিফিং করে দেওয়া হয়েছে। ওরা আরো গোলমাল করলে কি করতে হবে, ওরা ক্যানাল বা নদীতে যাওয়ার চেষ্টা করলে কি করতে হবে। সব নির্দেশ পেয়েছেন যুবকটি। কিন্তু তের দিন একটা গ্রামকে এক আঁজল জলও না দিলে রাতে গোকুল নিরাপদতারিণীর বাবা শুকনো চোখে গোকুলের সঙ্গিনী মেয়েটার বুক চিরে দেবে, মেয়েটা বুকের রক্ত পাত্রে ধরে জল ডেকে ডেকে চেঁচাবে। এর জন্যে কোনো ব্রিফিং তাঁকে করা হয়নি।

ব্রিফিং হয়নি। নির্দেশ পাননি। ডিলপ্যারেড্ করে করে যুবকটির রক্ত-মজ্জা-মন ওপরঅলার নির্দেশ ছাড়া কিছু করতে পারে না। হল্ট—চার্জ—স্টপ—অ্যাডভান্স এই সব নির্দেশ তিনি চেনেন ও নির্দেশ পেলে কাজ করতে পারেন। এখন এই পরিস্থিতিতে তিনি অসহায়, নির্দেশ নেই বলে অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। তাই তিনি সরাসরি দাঁড়িয়ে রইলেন। সারারাত, সারারাত মেয়েটি জল দাও বলে ডাকতে লাগল।

তারপর সকাল হল। সূর্য উঠল। সাদা, ক্ষুব্ধ, নির্মম সূর্য। কোটি-কোটি ফারেনহাইট বাতাস জ্বলছে।

তারপর লোকগুলি গ্রাম ছেড়ে বেরোল। যুবকটি ফিরে এলেন। ধ্বস্ত বিশাল ধরিত্রী। এখন শরবিন্দু নতুন প্রজা বসাতে পারবে। ওরা চলে যাচ্ছে বুড়ো-বুড়ি-মেয়ে-শিশু। কোনো বালক-যুবক-প্রৌঢ় নেই। নেই কোনো কিশোর বা তরুণ। থাকার কথাও নয়।

রুক্ষ ও দগ্ধ প্রান্তর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা সড়কে উঠল। বাস আসবে। বাস ওদের নিলে ওরা বাসে যাবে। নইলে সাত মাইল হেঁটে সদরে যাবে।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সরযূ বলল, যারা গোকুলদের ধরাল। তারা বাঁচল না। জল ডেকে বুক চিরে রক্ত ফেলালাম, জল হল না। তারা বা গোকুলদের ধরাল কেন, আমি বা রক্ত দিলাম কেন?

কেউ উত্তর দিল না। এ প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে ছিল না। ওরা দূরে বাসের ধুলো দেখতে পেল। বাস আসছিল, লাল ধুলো উড়ছিল। বাতাস জ্বলছিল, বাতাসে ক্যানালের জলের শব্দ।

(পূজা / অমৃত / ১৩৮১)

তরাস

মহাশ্বেতা দেবী

ধুমধামে, মহা ধুমধামে পরীক্ষিৎ দত্তর শ্রাদ্ধ হচ্ছিল। পরীক্ষিৎ মরেছে ষাট বছর বয়সে। তখনো ও দেহে প্রচুর শক্তি ধরে। মুরার কথা নয়। কিন্তু মরল।

ডাকাত ওর পায়ে কাস্তে মেরেছিল। ডাকাত সর্দার। নাম ডাকাত, পদবী ও উপাধি সর্দার। ছোটবেলা ও খুব মোটাসোটা ছিল। ওকে কাঁখে নিয়ে ওর মা দত্তবাড়ির খামারবাড়ির উঠোন গোবর নিকোতে যেত। খামারবাড়ির উঠোন মস্ত বড়। নিকোতে হত খুব যত্নে। পরীক্ষিতের বাবা উপীন দত্ত দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাত।

সে উঠোন শুকোলে তাতে ধান এনে ফেলত মাহিন্দাররা। উপীন বলত ও ছেলে কি খায় ?

ভাত। ভাতের ফ্যান।

তাতেই এত মোটা ? বড় হলে ডাকাত হবে।

নামই হয়ে গেল ডাকাত। সর্দার ওদের উপাধি। এখন পদবী হয়ে গেছে। কবে কোন্ আমলে কোন্ জমিদারের হয় লড়ে বাগদীরা। দশজন 'সর্দার' পদ পায়। সেই থেকে ওরা সর্দার।

এখনো ওরা লড়ে, লড়ে চলে। জমিজমা কবে কৌত। অথচ একদিন সেই জমিদার জমি দিয়েছিল। এখন দত্তদের, সেথদের ও মাল্লাদের জমি সব ফুরনে চষে। জমির ভাগ চাষী পেতে পারে এ সম্ভাবনা তিরিশ-বত্রিশ বছর আগেই হয়েছিল। যখন এ অঞ্চলে তেভাগা লড়াই হয়। সেই থেকেই বুদ্ধিমান তিন জোতদার বছর-বছর একটা লোক ডেকে ফুরনে কাজ করায়।

গত চার বছর ধরে ওরা ফুরন কাজের খাতা রাখছে, মজুরি দিয়ে টিপছাপ নিচ্ছে। যাতে কখনো কেউ, 'আমি ভাগচাষী, নাম লেখাব' এ কথা বলতে না পারে। যা করবার ফুরনে কর। তার পরের কাজ করতে মাহিন্দার আছে।

না, জমিজমা নিয়ে কোন বিবাদ লড়াই হয়নি। সে জন্যে ডাকাত কাস্তে মারেনি পরীক্ষিৎকে।

দত্ত, সেখ ও মাল্লা তিন ঘরে সমঝোতা খুব। ঘরের হাঁস, বাগানের কলা, পুকুরের মাছ আদানপ্রদান চলে। ফুরনের কাজ করাবার সময়ে খাতা রাখার বুদ্ধি দেয় সুশীল মাল্লা।

খাতা রাখুন। ভাগচাষী আর বর্গাদারের হাঙ্গামা ঠেকানো গেছে। খেতমজুর হিসেবে নিলে তাদের রেট দেবার কথা উঠবে।

কথা উঠেছিল। দিনু সেখ পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রাম কেন, এক ছড়ানো এলাকায় তার সাম্রাজ্য। কয়েকটা ঝড়ফড়ে ছেলে, যেমন গোবিন্দ নস্কর বলেছিল, খেতমজুরকে খেতমজুরি দিতে হবে।

খেতমজুর কোথায় পেলে বাপ সকল ?

গ্রামে খেতমজুর নেই ?

না, ফুরনে খাটে।

ফুরনে খাটলে সে হয় খেতমজুর।

বাপ সকল ! এখন ধর্মের রাজ চলছে। তোমার কথাও কথা নয়, আমার কথাও কথা নয়। আইনে লেখা আছে কি না দেখাও। হ্যাঁ, সে যদি হয় খেতমজুর, আর তারপর ফুরনে কাজ করে, তাকে একটা রেট দিবে সরকার।

আপনি তো নিজেই মানছেন।

শোন আগে। এরা তো বরাবরই ফুরনে খাটে। খাতা দেখ আমাদের। যা চলে আসছে তাই যদি প্রথায় দাঁড়ায়, যে করে বর্গাদারের হক দাঁড়াল—তাহলে তো এটা মানতে হবে। চলে আসছে ফুরনে কাজের নিয়ম, সেটাও প্রথায় দাঁড়াল।

এ সব কথা গোবিন্দর মোটা মাথায় ঢোকেনি। সে ভালো ছেলে, গরীবের বন্ধু। সে গিয়েছিল ব্লক আপিসে। ফিরে এসে বলল, ওঃ, পঞ্চায়েতের প্রতাপ কি ! ব্লক আপিসে ওরা শুধু সই করে খালাস। পঞ্চায়েত যা বলছে তা-ই করছে।

অন্য ছেলেরা বলল, কি হল তাই বল।

অফিসার সিধা বলে দিল, গ্রামে যে প্রথা চলে আসছে—যার খাতা রাখছে জমিমালিক, সেখানে আমি খুঁচিয়ে ঘা করতে যাব না। এ সব কথা জিজ্ঞেস বা করছেন কেন ?

থানা দারোগাও তখন পঞ্চায়েতের মহিমা বুঝেছে। ব্লক আপিসে সে আড্ডা মারতে এসেছিল। কথাবার্তা শুনে সে ঘাড় বাড়াল। গোবিন্দ

কি বলে তাই জানার ইচ্ছে।

গোবিন্দ বলল, পঞ্চাশ টাকা আর মৌলায় খেতমজুরকে সরকারি মজুরী আদায় করে দিয়েছে আমাদের মত ছেলেরা। সে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তাতে ডাকাত বলল, আমরা কেন পাই না?

দারোগা বলল, অশান্তি কোর না গোবিন্দবাবু। চাষকাজের সময়ে কামালি তুলো না।

ধুর মশাই, আমি কি আইন শৃঙ্খলা ভাঙতে যাচ্ছি নাকি? শুধোচ্ছি শুধু। শুধোলে আইন ভাঙা হয় নাকি?

তাই বলছি। ডাকাত বলছিল? ডাকাত সর্দার? অলঙ্কার সর্দারের বেটা তো? বেটা জব্বর পাজি। সেদিন বললাম থানার গাছটা কেটে দে। বলে, কত দিবেন তাই বলেন।

গোবিন্দ তেতে বলে, বেশ বলেছে। থানা যেন বাপের ঠাকুর। বুড়ো আমগাছ কাটবে, তার দিনটা যাবে। না দিলে সে খাবে কি? আপনার ও সব পুরনো চালচলতি ছাড়ুন।

চলে যায় গোবিন্দ। দারোগা বলে, পুরনো চাল ছাড়ব কেন? পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, বেদে লিখেছে। এ গোবিন্দ নস্কর ছেলে টেঁটন। সর্বদা ঘুষ ধরছে আর রিপোর্ট পাঠাচ্ছে।

জানি। তবে দীনু সেখের পেছনে লেগে সুবিধে হবে না।

লাগবে বা কেন? সে পঞ্চায়েতের মাথা নয়?

তা বটে।

কম কাজটা করছে? অপারেশন বর্গায় নাম রেকর্ড করাচ্ছে।

নিজের তো বর্গাচাষ নেই।

তাহলেও—!

বকেন কেন? নাম রেকর্ড করাচ্ছে, মালিকের টাকা খাচ্ছে, বর্গাদারের টাকা খাচ্ছে, জাল রেকর্ড করাচ্ছে জানেন তো সবই।

দারোগা খুব গম্ভীর হয় ও বলে, কবে আর জলে-ধোয়া পুজোর ঘটি ছিল দীনু সেখ? সব জেনেশুনে তাকে যদি পঞ্চায়েতের মাথা করে এরা, তাহলে কি বুঝতে হবে?

কি বুঝব?

গোবিন্দর কাকা মনি নস্কর পার্টির লোক আর নাম-করা গ্রামকর্মী। তাকে পঞ্চায়েত প্রধান করলে গরীব খুশী থাকত। তা জেনেই তো তাকে

করলে না। দীনু শেখ চিরকাল মারদাঙ্গা করেছে আর মনি নস্করের নামে মামলা করেছে। মনি নস্কর চিরকাল দত্ত, শেখ আর মাল্লার সঙ্গে চাষী-বাসী লোক নিয়ে লড়েছে। খুব খুরবীর মানুষ। তা এরা সোনা ফেলে আঁচলে পিতল বাঁধল যখন, আমাকেও বুঝতে হবে যে হাওয়া কিছুই বদলায়নি।

মনি নস্কর কোথায় ?

দারোগা সানন্দে হাসে, হাসপাতালে। পেটে ঘা।

ডাকাতকে গোবিন্দ গ্রামে ফিরে সব কথাই বলে। ডাকাত নিরানন্দ হাসে। বলে, পদ্দোচাকা আর মৌলায় যখন সরকারি বেট দেয় না তখনো ছয় টাকা দেয়। আমাদের কপালে ভাত মুড়ি আর দু'টাকা যেন ঘুচল না। ঘরে এতগুলো মুখ, দু'টাকায় এক কিলো চাল হয় না বর্ষায়। বলবে কাকে ? যিনি রাখবে তিনিই খাচ্ছে।

তুমি তো দত্তবাবুর ফুরানে।

ওই হল। দত্তবাবু, শেখ আর মাল্লা একজোট তা জানো না ? এবার কিছু একটা করতে হবে। যাব মাটি কাটতে। রোয়ানটা তুলে দিয়ে যাব। মৌলার ওদিকে কাজ হচ্ছে।

সে কাজেই যেত ডাকাত। কিন্তু সমর্থ বউ সাজুমণিকে নিয়ে তার ভাবনা। অত্যন্ত চেহারা ভাল সাজুমণির। দুটি পেটে খাবে বলে দিদির বরকে বিয়ে করেছে। ডাকাতের বয়স পঞ্চাশ। বউ মরেছে বছর তিনেক। সেই থেকে সাজুমণির ওপর ঝোঁক। গত ফাল্গুনে সাজুকে সে বিয়ে করে এনেছে।

সাজুমণি এখনো আফলা বাঁজা গাছ। দিদির ছেলেদের সে দেখে, ক্ষেত থেকে ঝরে পড়া ধান গুড়োয়, হাঁস পালে, ডিম বেচে। কচু, ওল, ডুমুর আজ্ঞায় ও বেচে। শাশুড়ির সঙ্গে দত্তবাড়ি পাট করে। ভূতগত খাটে, খেটেই ও খুশি। এবং খুবই অবাক কথা, উনিশ বছরের সাজুমণি তার প্রৌঢ় বর ডাকাতকে ভালবাসে। সাজুমণির একবার বিয়ে হয়েছিল, বর নেয়নি। বহুকাল ও বাপের বাড়ি খাটছে, পেটের ভাত তুলছে। বিয়ের আগে মা বলেছিল, জোয়ান যুবো কপালে নেই তোর।

সাজুমণি সতেজে বলেছিল, উতেই অ্যানেক।—অর্থাৎ ডাকাতই সাজুর কাছে আশাপূরণ। আসলে ডাকাতের মত খুরবীর মানুষটি তিন বছর ধরে বিয়ের আশায় ঘুরছে, এতে সাজুর মন খুব নরম হয়েছিল।

দত্তবাড়ির পাট করত সাজুমণি আর পরীক্ষিৎ দত্ত দু'চোখে নয় করত ওকে। সে কথা জানত ডাকাতও। তাই মৌলার ওদিকে মাটি কাটতে যাবার আগে ও গোবিন্দকে নিজের দুশ্চিন্তার কথা বলল। পরীক্ষিতের এ স্বভাব আজকের নয়। বছর তিন-চার আগে বুড়ো বয়সে, নিজের বাড়ির দোতলা তোলার সময়ে ও মতি মিস্ত্রীর বউকে নিয়ে এক হাঙ্গামায় পড়ে। পরীক্ষিৎ সগর্বে বলে, সময়ে খেয়েছি তার প্রমাণ এই শরীর। শরীরে বল আছে, ইয়ে আছে, বুঝলে ?

মেয়েছেলে ঘটিত কেলেঙ্কারিতে পরীক্ষিৎ লজ্জা পায় না। এক ধরণের গর্ব অনুভব করে।

গোবিন্দ ডাকাতকে ভরসা দিল, অত সোজা নয়। দিনকাল পাল্টে গেছে। তুমি নিশ্চিন্তে যাও। কাকা এসে পড়চে হাসপাতাল থেকে। সে লোক গ্রামে থাকলেও ভরসা।

তা বটে।

ডাকাতের মনে হল, গোবিন্দর কাকা মনি নস্কর পার্টির পুরনো লোক। বত্রিশ বছর আগে আবাদে গিয়ে তেভাগা করেছিল। কিন্তু আজ কি তার কথায় কোন ওজন আছে ? পঞ্চায়েতের মাথা যদি মনিবাবু হত, তাহলে হ্যাঁ, কথার দাম থাকত।

কিন্তু সে কথা বলল না ডাকাত। বলল, তোমরা রইলে, দেখো। যেতাম না। পেট চলে না, তাতেই বেরোতে হয়। নিয়ে যেতাম, জানলে ? সেও খাটত, আমিও খাটতাম। কিন্তু মা বিছানায় শুয়ছে। ছেলেগুলোকে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেয় কে, হাঁসগুলো দেখে কে।

দোনামোনা হয়ে কাজে গেল ডাকাত। যাবার আগে পরীক্ষিতের সঙ্গে যেন উট্ বলতে খুট করে বচসা হয়ে গেল ওর। বিষ্টি থেমে ঝনঝনে রোদ উঠেছে। পরীক্ষিৎ মাহিন্দারদের সঙ্গে বাস ধরতে যাচ্ছিল। দু'গ্রাম বাদে ইরফানপুর গঞ্জে পরীক্ষিতের আটা ভাঙ্গা চাকি, খড়কাটা কল।

কি রে ডাকাত, মৌলা যাচ্ছিস শুনলাম ?

ডাকাতের মনে চট করে সন্দেহ দেখা দিল। এ কথা বলে কেন ? সে সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ।

সেখানেই কাজ-কাম দেখগা তুই। আমি তো তোদের ফুরনে ঠকাই, সরকারি ক্ষেতমজুরি দিই না।

মন খারাপ নিয়ে এবার কাজে যাচ্ছে ডাকাত। মন খারাপের হেতুটি

পরীক্ষিৎ দত্ত। সেই পরীক্ষিৎ দত্তকে পরে দেখে ওর মাথা ঝনঝন করে ওঠে। কথাবার্তা ওদের সমাজে রুক্ষই হয় ডাকাত নিরস গলায় বলল, মিছা কথা। এমন কথা আমি বলিনি, আপনিও শোনেনি। গোবিন্দ-বাবুকে বললাম, হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু সে কথা আপনাকেও বলেছি কতবার। যে দু'টাকায় কিছু হয় না আজ। এক কিলো চাল মিলে না। আরো বলেছি মৌলা আর পদ্মচাকার পার্টির বাবুছেলেরা এ সব মুশকিলের আসান করছে। তাতে আপনি বলে দিলে, দেখা কাজ-কাম দেখগা তুই।

তোর কথা তো বড় চড়া কড়া রে ডাকাত ?

পেটের জ্বালায় বাবু, কথা হতে গুড় শুকিয়ে যায়।

না, তোকে আর নিব না।

দেখা যাবে। আপনি যাদের অন্ন দাও না, তারাও তো বেঁচে থাকে। তেমন হলে দেখা যাবে।

ডাকাত চলে গেল। ও যাবে ঠিকাদারের জরিতে। পরীক্ষিৎ শুধু মেরে রইল। তারপর ইরফানগঞ্জ পৌঁছে গেল খানায়। ডাকাত চলে ডালে ডালে, সে চলে পাতায় পাতায়। একটা খবর দিয়ে রাখা দরকার।

ডাকাত মৌলা গিয়ে দু'দিন বাদে ফিরে এলো। সাজুকে বলল, বুঝি বা কপাল ফিরে সাজু। ঠিকাদার বলল দু'দিন ঘুরে এস ঘর থেকে। তারপর টানা ছেড়মাস কাজ চলবে। দিন ছয় টাকা দিবে। খেতে দিবে আটা, লবণ, আলু, তেল, লঙ্কা। যে যার মত খাওগে।

রুটি করতে জানো না।

আমি জানি না আর কেউ জানে, সে করবে। নয় সিজে খাব। নয় খানিক বেচে চাল কিনব। টাকায় হাত দিব না আমি। হপ্তা পাব, দিয়ে যাব।

মা বলল, তুই মন স্থির করে কাজে যা। ঘর আমি দেখব এখন।

মৌলা ফেরার আগে ডাকাত গোবিন্দর কাছে ঘুরে গেল। হ্যাঁ. খবর আছে একটা। মৌলা ও পদ্মচাকার ছেলেরা কাজের কাজ করেছে। ফুরনে খাটানোটা খেতমজুরের পর্যায়ে পড়ে। তারা জেনে এসেছে। গোবিন্দদের টিটকিরি মেরেছে তারা। বলেছে, তারা হলে শেখ, দত্ত, মান্না— তিনজনকে দিয়ে মজুরি দিইয়ে ছাড়ত।

মণি নস্করের প্রাচীন রক্ত জেগে উঠল। সে বলল, তুই ঘুরে আয়। ফট করে আমি খেতমজুর সংগঠন করিয়ে দিচ্ছি একটা। দিতে হবে—

খেতমজুরকে মজুরি দিতে হবে। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গড়তে হবে শোষণমুক্ত এক সমাজ, সেদিন আগত ওই—খেতমজুররা কই ?

ডাকাত চলে গেল। যাবার আগে গোবিন্দকে বলে গেল, একটা নারকোল তেলের টিন ঘরে কিনে দিও বাবু, পরের বারে পয়সা দিয়ে যাব।

ডাকাত হপ্তা পেয়ে ফেরার আগেই মণি নস্করের ঘোরাঘুরির ফলে ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল। দীনু শেখ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সংগঠন কর না কেন মণিবাবু। তবে তুমি-আমি তো ভিন্ন নই এখন। যা করবে, ঘাট বেঁধে কর। দলের মুখ যেন হাসে না। এই বললাম।

পরীক্ষিৎ বলল, সবের মূলে ডাকাত।

তুমি তো তার মা-বউকে বলতে গেলে পুষছ।

গরীবের দুঃখ দেখতে পারি না।

সত্যি, ঘুঁটে গোবর দেওয়া, খিড়কি পুকুরের পাড়ে মানকচু বাগানে গাছের গোড়ায় ছাই চাপা দেওয়া, এ সব কাজের জন্যে ভাত দেওয়া, কেরোসিন দেওয়া, কে কবে শুনেছে ? অ ডাকাতের মা, ভাগ্যি ভালো তোর—তরে গেলি।

মা বলে সাজুকে, মানুষ দেহা-পোরাটা দেখে। ঘুঁটে গোবর মানে যে তিরিশটা গাই গরুর গোবর কুড়ানো তা দেখে না। মানগাছ যে শত শত তা দেখে না। হ্যাঁ, খাটনির কাজ। খাটনির কাজ বলেই তো ক্রমে ক্রমে ভাতের ওপর ডালের সঙ্গে আলুপোস্ত দেখা দিল। একদিন গিন্নিকে লুকিয়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে একটা নারকোল দিয়ে এলো পরীক্ষিৎ সাজুকে। খা তোরা, গাছের ফল বই তো নয়। সাজু ভাবল, ডাকাত মিছেই সন্দেহ করত এই দেবতুল্য লোকটিকে। ডাকাত টাকা আর আটা দিতে এসে সব শুনল। বলল, এ লোক সিধা নয়, মনে রাখিস।

কোমরে কাটারি থাকে।

কিন্তু মান্না বাড়ি যেদিন সন্তোষী মায়ের পুজো, জেনারেটরে যেদিন 'সন্তোষী মা' ছবি দেখানো হবে, সেদিন দত্তবাড়িরও সবাই দৌড়য় সেখানে। সাজুমণিরও তাড়া থাকে। কিন্তু তাকে ধানের বস্তা কাচতে হয় পুকুরে। বেড়ায় মেলতে হয়। সব সেরে ঘরে যেতেই শাশুড়ি বলে, আমরা গেলাম, তুই আয়। নইলে দেখা হয় না।

সবাই যাব, ঘর ?

সে আমি জানি ?

অনেক কেচাকেচির পর ঠিক হয়, শাশুড়ি খানিক 'ছিনেমা' দেখে চলে আসবে, সাজু যাবে তখন। শেষ অবধি দেখবে।

সেদিনই সাজুর ঘরে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে পরীক্ষিৎ। সেদিন সাজুর কোমরে কাটারি থাকে না।

ডাকাতের কাছে খবর যায় পরে। আগে গোবিন্দরা পরীক্ষিৎকে পেটায় না। অবসন্ন, রক্তের আঁচড়ে ছেঁড়াখোঁড়া সাজুকে নিয়ে যায় থানায়। থানার দারোগা সম্ভাব্য ধর্ষণ কেসের বাদী সাজুমণিকে বিবাদী পরীক্ষিৎ দত্ত বিষয়ে এজাহার দেবার জন্যে থানায় আটক রাখে।

রাতে দারোগা বিবাদী পক্ষে যোগ দেয়, সাজুমণিকে যথেচ্ছ ছিঁড়েখুঁড়ে এজাহার নেয়। তারপর তুলে দেয় কনস্টেবলের হাতে।

প্রাক্ত বহু দূর গড়াতে পারত। কিন্তু ছিন্নভিন্ন সাজুমণির দেহে ডাক্তার ধর্ষণের চিহ্ন পায় না কিছুতে। সাজু থাকে বোবা মেরে ভোঁ হয়ে। লেখা হয় সানন্দে, সম্মতিক্রমে সাজুমণি সর্দার টাকা নিয়ে পরীক্ষিৎ দত্তকে দেহ দিয়েছিল। সাজুমণি নষ্ট চরিত্র, দেহ দেওয়া তার অভ্যাস।

ডাকাত এত কথা বোঝেনি। গোবিন্দকে, মণি নস্করকে সে যথেচ্ছ গাল দিয়েছিল এবং কাস্তে হাতে পরীক্ষিতের খোঁজে দৌড়েছিল। তখনই সে টাঙি মারে ছুঁড়ে, পরীক্ষিতের পায়ের হাড়ে বসে যায় টাঙি। মাহিন্দাররা প্রথমে ধরে ডাকাতকে, পরে ধরে পুলিস।

পরীক্ষিতের ডায়েরি করানোই ছিল। তাতে ডাকাতচরণ সর্দার, পিং অলঙ্কার সর্দার যে পরীক্ষিতকে মারার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে তা থানায় লিপিবদ্ধ ছিল। আর এ আমলে থানা কোন অন্যায় করে না। সৎভাবে কাজ করে। থানা কখনো নেয় না ধনীর পক্ষ। কেন না থানাও শোষণ-মুক্ত সমাজ গড়ছে।

ডাকাত জেলে বিচারাধীন আসামী হয়ে থাকে। বস্তুত বড়ই হাপা হয় তার। কেননা যেমতা পরীক্ষিৎ মরে যায় রক্ত বিষিয়ে, মাসখানেক বাদে। ডাকাতের বিরুদ্ধে কেস জোরদার হয়। সাজুমণি গ্রামে ফেরে হাসপাতাল থেকে। ডাকাতের চিহ্ন, তিন মাসের ভ্রূণটি বিসর্জন দিয়ে।

শাশুড়ি বলে, এখন কি করব মা? না খেয়ে মরব?

ক্লান্ত সাজু খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। যেন বহুদূরের অচেনা মানুষ ও, এমন গলায় বলে, জল দে মা।

জল খায় সাজু।

কোথা যাব, কি খাব, না খেয়ে মরব ?

না, মরব কেন ?

গোবিন্দ চাল আটা দিয়েছিল খানিক।

আর দেয় না।

না।

খেত খুড়াব, কচু ঘেঁচু খাব।

যাবার জায়গা নেই।

যাবি কোথা, সে যদি আসে ?

এতেই বুড়ি যেন সামলে যায়, যেন ভেসে যাচ্ছিল স্রোতে। মাথা নেড়ে নেড়ে চারটি আটা জলে সেদ্ধ করে। তারপর বলে, দত্তবাবুর শ্রাদ্ধ হবে। অনে—ক লোক খাবে

সাজুমণি নিঃশ্বাস ফেলে। দরজা বন্ধ করে শোয়। সবই যেন শেষ হয়ে গেছে তার জীবনে। ডাকাত ফেলে, কবে বেরোবে কে জানে। বেরোবে কি ? যদি না বেরোয় ? জেল হাজতে নেবার আগে ডাকাত চেঁচাচ্ছিল, সাজু ! সাজু ! বলে।

উকিল দিতে পারবে না সাজু। যার ক্ষমতা থাকে না, সরকার তার হয়ে উকিল দেয়। সে উকিল কেমন হবে ? বাদী সাজুমণি, বিবাদী পরীক্ষিতের কেস ঘুরপাক খেয়ে এ কি হল ? বাদী সরকার, বিবাদী ডাকাতচরণ সর্দার ? ফেলেই রাখবে কেস, তুলবে না আদালতে হয়তো।

গ্রামে সবাই ওদের এড়িয়ে যাচ্ছে। যাবেই। সবার টিকি সেখ, দত্ত, মাল্লা বাড়ি বাঁধা। কি করবে সাজু ? এ গ্রামে কাজ তো পাবে না। মৌলা যাবে, মৌলা ? মাটিকাটা, মাটিফেলা কাজে ডাকাত তাকে নিতে চেয়েছিল সকালে মণি নস্করের কাছে গেল সাজু। মণি নস্কর বলল, বিশ্বাস রাখতে হত।

কিসে, বাবু ?

তোমাকে দিয়ে কেস দাঁড় করাতাম পরীক্ষিতের নামে। এদিকে খেতমজুর দল করে মজুরি আদায় হত। আইনের পথে চলবে তো। ডাকাত এসে মেরেই দিল লোকটাকে। এখন ফলটা ভাল হল কি ?

বিশ্বাস রেখেছিলাম তো। আপনারা নিয়ে গেলে, থানায় গেলাম। তারপর কি হল জানো না ?

জানলে হল ? প্রমাণ কোথা ?

থানার দারোগা পুলিসে দত্তের বাড়া বেইজ্জত করল, পেটের ছেলে খসে গেল, এতেও প্রমাণ হয় না ?

না, হয় না। কি করে বোঝাই।

থাক, বুঝিও না আর। খুব বুঝেছি আমি। এরপর বল আমার আর ঘরের তিনজনার পেট চলে কি করে।

দেখি···দেখছি। দীনু সেখকে বলে··

বুঝেছি।

সাজু বাড়ি এসে খড়া নিল, বড় ছেলেকে বলল, চল দিকি, খাম আলু খুঁজি।

কোথা ?

বুনোপাড়ায়। বাবলা বনে।

খাম আলু ছিল না, কচুর লতি তুলে নিয়ে ফিরল ওরা। খানখেতের খানিকটা পরিষ্কার করে নিকোচ্ছে কারা।

কি হবে, ছেপা ?

তরাস দেবে।

তরাস ?

এখন সাজুমণির মনে পড়ল, পরবর্তিক পরীক্ষিত দত্তরা পনেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধ করে নতুন মাটির হাঁড়ি-পাতিলে ভাতব্যঞ্জন পান তামাক সাজিয়ে দিয়ে তরাস দেয় বটে। পিদিম জ্বেলে দেয়। এদিকে তরাস নিয়ে বেরোও, ওদিকে ঘরে বালি ছড়িয়ে দোর আটকে রাখো, একটি দোর খুলে রেখো। যে মরেছে সে সাপ হয় তো বালিতে সাপের চিহ্ন পড়বে, নয় পাখির পা, নয় শিয়ালের থাবা।

তরাস !— সাজুমণি বলল।

বড় ছেলে বলল, হ্যাঁ গো। এই এত এত দেবে।

অনেক রাতে, তাই না ?

হ্যাঁ। তরাস দিলে নিষ্যস ভূতপিচাশ খেয়ে যায়, ঠাকুমা বলছিল। তখন পালাতে হয়। দেখতে নেই।

চল্, ঘরে চল্।

পরীক্ষিতের শ্রাদ্ধের দিন যখন এলো, তখন সাজুমণির প্রায় দুটো দিন উপোসে কেটে গেছে। শুশনির আর কলমির শাঁশটে ঝোল শাশুড়ি ছেলেদের খাইয়ে নিজে খানিক খেয়ে সাজু দাওয়ায় শুয়ে ছিল। এই এত

লাইনা, ডাকাতের জেলহাজত, কিছুই যেন কিছু নয় পেটের জ্বালার কাছে। উচ্ছে বেগুন ভাতে দিয়ে গরম ভাত একবার পেট ভরে খেতে পারলে সাজুমণি গুছিয়ে ভাবতে পারত।

শাশুড়ি কাঁদছিল বিনবিন করে। সাজু চোখ বুজল। ঘুম এলো গা ঢেলে। ঘুমের মাঝে ভাতের স্বপন। সে আর ডাকাত এক থালা থেকে ভাত খাচ্ছে। ঘুম ভাঙল যখন তখন রাত হয়েছে। শ্রাদ্ধবাড়ির কোলাহল স্পষ্ট কানে আসে। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত। ভরাস দেবে এখন।

ভরাস! ধানখেতে নিকানো জায়গা, কুশাসন, কলাপাতা, জল, ভাতব্যঞ্জন, তামাক পান। অশরীরিরা তেলভরা পিদিমের আলোয় সে ভাতব্যঞ্জন খায়। শোনা কথা, কেউ—চোখে দেখেনি। সাজুমণি উঠে বসে। উপোসে উপোসে হালকা মাথা, শরীরে ওজন নেই। সে কি মানুষ আছে না কি আর? আঁচল গোছায় ও, রুক্ষ চুলে মুটি বাঁধে।

ভরাস দিয়ে লোকগুলি চলে যাচ্ছিল, লণ্ঠন হাতে হনহনিয়ে হেঁটে। ধানখেত ধরে সাজুমণির হাঁটার খসখস শব্দ। শিয়াল খাবে, কুকুর খাবে, সাজুমণি ব্যগ্র ব্যাকুলতায় ছুটেছিল। আর লোকগুলি তার সাড়া পেয়ে সভায় দৌড়ল। জলজলে পিদিম। অনেক ভাত, মস্ত হাঁড়ি, অনেক ব্যঞ্জন। নেবে কি করে? সাজুমণি বইবে কি করে? ওরা তো আসল দু-তিনজনে। ভাত, মৌরি সম্বরা কলাই ডাল, পোস্ত চচ্চড়ি, সে যা যা ভালবাসত, আমড়ার টক। ক্ষুধায় হিংসায় জ্বলে উঠল সাজুমনি। বেঁচে থাকতে পরীক্ষিৎ সব খেয়ে গেছে, সাজুর ধর্ম, সংসারের নিরাশক্তা, স্বামীসুখ, রোজগারের ভরসা—দশ-এগারো ঘর মানুষকে নিজের দরকারে গোলাম বানিয়ে রেখেছে একরকম।

মরেও পরীক্ষিৎই খাবে?

তারার আলোয়, প্রেতের জন্য নির্দিষ্ট অন্ন অপার ধনেখেতকে সাক্ষী রেখে সাজুমণি সর্দার খেতে থাকে। আগে যাবে সে। তারপর সব ভাত-ব্যঞ্জন একটা হাঁড়িতে ঢেলে ঘরে নিয়ে যাবে। শাশুড়ি খাবে, ছেলেরা খাবে। আজ ভাত, কাল বাসি। কাল বাসি ভাত খেয়ে শরীরে বল করে সাজু মোলা যাবে। ঠিক জোগাড় করে নেবে কাজ। ঠিক ধরে রাখবে সংসার।

ভাত খেতে খেতে সাজু বুঝল কত স্বাভাবিক ও মানুষী তার আচরণ। বাতাস শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওকে সমর্থন জানাচ্ছিল। একটা তারা খসল।

(প্রসাদ / পুজা / ১৩৮৮)

ভাতুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

এবার ছিল দুরন্ত খরা, খেত-মাঠ জ্বলে গিয়েছিল। ধান তো হয়ই নি বলতে গেলে। কিন্তু কালী গরায়ের জমিগুলিতে পাকা ধানের শোভা দেখতে দেখতে কালীর ভাতুয়া পবনের মনে হল মনিব তার ডাং-পিশাচসিদ্ধ বা হবে। নইলে খাল নেই, বড় নদী নেই, এই খরা! আকাল এল বলে—একা তার মনিবের খেতে এত ধান হল কেমন করে? মনিবের খেতে এত ধান! টাহালগুলি এবার ভরে যাবে। পবন টাহাল ঝেড়ে নিকিয়ে রেখেছে সেই কবে। পৌষে মনিব্যান টাহাল পুজো করে রেখেছে। ধান উঠলে নবান্ হবে, তখন নোট বাঁধা হবে।

আর নবান্! আকাল বুঝি এল। বড়ান্ মায়ের অঙ্গ কেটে রক্ত ঝরেছে, নিশিন্দা বুড়ি দেখে এসেছে মায়ের কাটা অঙ্গে লাল পিঁপড়ে বাইছে। গ্রামলক্ষ্মী দেবী তো, আকাল এলে জানিয়ে দেন।

এ সব কথা শুনলে পবনের স্কুলে বিদ্যি-পড়া ছেলে ভগীরথ বলে, হাঃ! জানায়ে দেয়। আকালের কথা জানায় তো আকালের উপায় কিসে তা জানায় না কেনে?

পবন বলে, মায়ের রক্তে লাল চুটি যায়। জানিস?

পিঁপড়ার বাসা কি চারিদিকে। তুমার মনিব মায়ের থানে দুধ ঢালে, তাতে ডি পিঁপড়া যায়।

তু সব জানিস?

পিঁপড়া সরাব। দেখ কেনে?

কি করবি?

"লাওমা জনুনী" বলো মায়ের মাথায় কেরাচিনি ঢেলে দিব। দেখি পিঁপড়া থাকে কেমুন?

পবন এ কথায় মাথা নেড়ে বলেছিল, সকল কেরাচিনি মনিবের ঘরে। উ পঞ্চায়েতে সামিল হচ্ছে, খাতিরের মানুষরে দেয়। তু কুথা পাবি কেরাচিনি?

উ কুথা হতে পেল? মোরাদের তরে কেরাচিনি, রসিদ দেখায় হপ্তা

পিছু দিতেছে, কিন্তুক কারে একবার মাসে, কারো দশবার, উর ঠেঙ্গে লিব।

উর সাথ বিবাদ করো না ভগীরথ!

বড় কাতর শোনায় পবনের গলা, বড় আর্ত। দু চোখে ওর ভয় চমকায়, দুই ঘোলা চোখে। একবেলা জল খাই, একবেলা ভাত আর বছরে একশো বিশ টাকার কড়ারে যে ভাতুয়া খাটে কালী গড়ায়ের বাড়ি, সেই ভাতুয়ার মনে "মনিব" শব্দটি সম্পর্কে এমন ভয় থাকে বটে।

ভগীরথের বুকে ওই লোকটার জন্যে দুঃখ আর লোকটার চোখে ভয় দেখে রাগ একই সঙ্গে ফোঁসে ভগীরথ ঘরের জীর্ণ ঝনকাঠিটি চেপে ধরে নিজেকে সামলায় ও বলে, না না বাবা, বিবাদ করব কেনে? কথার কথা বললাম বই তো লয়। আর—একটু হেসে পরিস্থিতিটি হালকা করে বলে, তুমার উ বড়াম মা মরুক কেনে পিঁপড়া কামড়ে? আমার কি? আমি উরে দেখতে যাব?

ই-ভি তু আগে বলিস নাই, এখুন বলিস। জামু গ্রামের জনুনী উ বড়াম মা! বান এলে উনি থামাবে, খরা এলে রঙ্গে টেনে নিবে—

উ তুমি যা শুন্যে বড় হলো, তাই বল বাবা! আমি ভি যা শুনছি তাই মেনে গিছি এতকাল—

এখুন মান না কেনে বাপ?

মন লোয় না

উ অধর বাবু তুমারে লাচায়। উর কথায় লোচে না, অ মোর বাপ, এযকাল সবারে লাচাল, লকসালীতে জেহেল গেল বুঢ়া বয়সে— তার বেত্তান্ত জানে না কে? এখুন ভি ঘরে রয় না। ছাইকেল লয়ে ঘুরে বুঢ়াদের ধরে এনে পড়াতেছে— উরে ডরে মনিব।

ডর্যো ডর্যো তুকি পোকপতংরে ভি ডর খাও বাবা। অধর বাবুরে ডরা কেনে? কুনো মন্দ কাজ করে না সে, নিজ ঘরের দামুতে মানুষজনরে পড়তে শিখায়, আইন বুঝায়।

বই হাতে ঘুর্যো কেনে? তখুন উর ঘরে বই দেখলে দারোগা কত লাচত মনে নাই?

বাবা! ই সকল গোরমেনের নই। আইনের বই। বর্গাদারের হকটো বুঝি নিতে পারে আইন জানলে—খেত মজুরটো হক বুঝি নিতে পারে আইন জানলে—মোরা কিছু জানি না বাবা।

মোরা বর্গাদার লই ভগীরথ। খেত মজুর লই— ভাতুয়ার তরে কুনো

আইন নাই।

আমি শুধাব তবে ?

আজ, মাচায় বসে মনিবের পাকা ধান পাহারা দিতে দিতে পবনের সব-কথা আবার মনে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলল ও। ভাতুয়া কি মানুষ না কি ? বর্গাদার বা খেত মজুর নয়—তাই তাকে বাঁচাতে কোন আইন থাকে না। ভাতুয়া আছে, ভাতুয়া থাকে, কিন্তু ভাতুয়ার কথা কোন সরকার ভাবে না। ভাতুয়া থাকতে আছে, সমাজে স্বীকার করতে নেই তার অস্তিত্ব।

একটা মানুষ কিছু জানে না, সে ছোট ছেলে। তার বাপ গরাইদের ঠেঙে আটশো টাকা ধার নিল। না নিলে তার জমি বাঁচে না। আটশো টাকা সে শুধতে পারবে না, ছোট ছেলেকে করে দিল ভাতুয়া। বলল, এক বেলা ভাত দিবেন বাবু, এক বেলা জল খাই। আর বছরে এক শত বিশ টাকা মাইনা।

বাবুরা বলল, সাত বছরের ছেলে তোমার। এখন ছাগল চরাবে হাঁস চরাবে, বাড়ির কাজে। এখন মাইনে হয় না। এখন ওকে দিয়ে ক পয়সার মজুরি পাব ?

বাপ বলল, ভাতে জলপানে থাকুক। বারো বছর হলে মাইনা দিবেন মশায় হাতে দিবেন না। উ টাকা কাটান দিবেন ধার হতে।

তাই হল। টিপছাপ দে।

সে আদ্যিকালের কথা। ছাগল চরাত পবন, হাঁস চরাত। দিনে ভাত খেত, রাত হলে কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরত।

পবন কাঁদত। বলত, মারে বাবু ! দুপার যেয়ে বিকাল হয়। তখুন ভাত দিবে। খিদা লাগলে কিছু দেয় না, চড় মারে, লাথ মারে। আমি রব না হোথা।

বাপ প্রবোধ দিত, ক বছর বাপ ? তোর বয়স এক কুড়ি না হতে টাকা শুধে যাবে। বাস। ঘরের ছেলা ঘরে রবি।

বাপ হিসেব করে নিয়েছিল অধর বাবুর বাপের কাছে। অধর বাবুর বাবা বলেছিল, বারো বছর বয়েস থেকে উনিশ বছর বয়েস অব্দি সাত বছরে আসল টাকা শোধ হবে গো। মজুরিতে সুদ কেটে যাবে। যদি ওরা শর্ত মানে।

উনিশ কেন, আজ পবনের বয়েস বিয়াল্লিশ হল। তিরিশ বছরে রাতদিন খেটে সেই আটশো টাকা শোধ হয়নি। পবনের বিয়ের সময়ে দুশো

টাকা ধার নিতে হয় বাইশ বছর আগে। তাতে না কি সুদে আসলে অসাগর টাকা জমে গেছে। পবন মাইনের টাকাও হাতে পায় নি, বাপের সে জমিও গরাই বাবুদের পেটেই গেছে। বউটা গরাই বাবুদের বাড়িতেই গোয়াল কাড়ে। বাইরের পাট কাজ করে। আর খেত শুড়োয়। ঘরে পড়া ধান শুড়োয়। মনিবরান অনেক বলে দেখেছে, বউ ভাতুয়া হতে রাজী হয় নি।

ভাতুয়া হব নাই। গুলাম করে রেখ্যে দিবে গ! ভগীরথের বাপ মোরে জনম দুখ দিল।

খরখর করে বউ। খর দক্ষ গতিতে কাজ করে। বউই অধর বাবুর কাছে হেঁটে হেঁটে তাঁর পা ধরে ভগীরথকে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকিয়েছিল। মনিব তাতে রেগে যায়। কিন্তু অধর বাবুর বাবাও ছিল স্বদেশী করা মানুষ, ছেলেও তাই। ওর বাড়িতে ভগীরথ ভাতও খেত। স্কুলে ঢোকার সময়ে ভগীরথের বয়স দশ। অধরবাবু বলল, তুমি বাপু স্কুলঘর রোজ ঝাঁটপাট দেবে, কাজ হল তোমার। পড়বে, আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই খাবে।

স্কুলও অধরবাবুর তৈরি। তাঁরই বাড়িতে। আর পোড়োদের জমির ধানের ভাত খাইয়ে ছাত্র ধরে রাখার পরিকল্পনাও তাঁর। তাঁর অলৈল কাণ্ড-কারখানায় বিতশ্বিরক্ত হয়ে বউ অনেক দিন ধরেই বাপের বাড়ি প্রবাসী। অধর বাবু জেলে থাকতে থাকতেই বউ মরে গেল।

ভগীরথের মত অনেক ছেলেই ওই স্কুলে এল গেল। কিন্তু ভগীরথটা যেন ওঁর চেলা হয়ে গেছে। অধর বাবুকে মুরুব্বি ধরে কি হবে কে জানে? উনি বললে কি ভগীরথের কোন কাজকর্ম হবে কোথাও? এখন না কি ওকে টিকে ইস্কেশান দিতে শেখাবেন সদরে পাঠিয়ে।

অধরবাবু ভগীরথের মানামান্যির লোক। অধরবাবু সকলকে আইন বোঝাচ্ছেন, পড়তে শেখাচ্ছেন, "হকটো বুঝি নিতে পারে" যাতে। ভাল। খুব ভাল। কিন্তু অধর বাবুও পারে না সব কিছু। ভাতুয়া পবনের জীবনের দাসত্ব ঘোচাতে পারে না অধরবাবু।

মাচায় বসে পবন মাথা নাড়ল বার বার। আঃ। কত ধান! চোখটা কেমন করে যেন, তাই সোনালী ধান মনে হয় সোনার নাচন্ত সাগর যেন। অধর বাবু অনেক পাল্টত এক সময়ে। গ্রামেই থাকত না তখন। কোথায় কি করে বেড়াত কে জানে) কিন্তু গ্রামে এসে যখন মনিবকে বলল, কালীবাবু! সময় খুব মন্দ। ধান কাটাচ্ছে, বেশ করছ, সবারে সরকারী হিসাবে মজুরী দিবে। নয় তো ধান গোলায় উঠবে না।

পবন ভয়ে চোখ বুজেছিল। বাপ রে। মনিবকে অমন তেড়ে শাসিয়ে কথা বলা? কিন্তু মনিব মেনে নিয়েছিল সব। তিন বছর মনিব খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। পবনকেও খেতমজুরদের সঙ্গে দুপুরে ছুটি দিত। জলখাই দিত গরম ভাত।

এ সব সাহসের কাজ অধর বাবু পেরেছিল। কিন্তু ভাতুয়াটো, গুলামটো করি দিছে বাপ—ভাতুয়া জীবন হতে বাহার করি আনতে তুমি ভি পার না গ অধরবাবু। পুব আকাশ লাল হতে মনিব বাড়ি আসব, আর বিহানের জলপান "শালা কামচোর ভাতুয়া" গাল! আর পুরা দিন রাত অবধি খাটব গ। লাথ খাব, গাল খাব, ই হতে বাহার করি আনতে পার না গ অধরবাবু।

এমুন চক্ষে ভাল দিশি না সি বলতে ভি ডরো যাই। এত আইন দেখতেছ ভাতুয়ার তরে আইন নাই? ধান পওরা দিতে দিতে—মনিবের ধান পওরা দিতে দিতে—আমি কত হিসাব করি।

সুদের হিসাব নয় ভাতের হিসাব। ধানটো তো ভাতই হল, না কি বল? তা ভাতের সাগর পওরা দেই।

কত ভাত। কত ভাত—আর ই সব জমিনের মাঝে তো বাপের তিন কুড়া ভি সামিল আছে—তা এত ভাত দুনিয়াতে—ভাতের তরে ভাতুয়া তবে কেনে পবন? কেনে এমুন বেহিসাব ই হিসাবটো? অধরবাবু! ভগীরথ মোর বেটা। তুমার কথা চিন্তো মোর বুকে ভি ধান ডাকে কিন্তুক। চক্ষে বিশে না ভাল—আর ভাতুয়া হয়্যে কোমরটো ভাঙি গিছে, তাতে সব বুঝাতে পারি না। ডরো যাই। নিজেরে ডর খাই। ই কি। ভাতুয়া এত কথা চিন্তে কেনে? মনিব জানলে কাঁচা কঞ্চিতে চাম ছিঁড়ি দিবে যি?

আঃ! ধান দেখলে পবনের এত কথা মনে হয়। মাচায় বসে বসে ও ভাবে আর ভাবে।

২

অধরবাবু বললেন, ভগীরব, তোমাকে যেন চিন্তিত দেখছি ভীষণ। কেন বল ত?

ওরা হাঁটছিলেন। বনের পথ ধরে। জামু গ্রামটি খুবই ভিতরে ঢোকানো। বেলে নদীর এ-পার ও-পার জুড়ে এখনো জঙ্গল আছে। বনের

পথে চলাফেরা করাই সুবিধের। ব্লক অপিস, বড় স্কুল, পঞ্চায়েত আপিস, সবই বেলেগ্রামে। বেলে আর গ্রাম নয়, গঞ্জ এখন। থানাও ওখানে। ওঁরা বেলে থেকেই ফিরছিলেন। অধর বাবু হাঁটাহাঁটি করছেন যাতে এ বছর জামুর মত অরাজনীতিক, পিছিয়ে থাকা জায়গায় সরকারী খেতমজুর শিবির হয়, সে জন্যে। সেটলমেন্ট অপিসে। ভগীরথ ওঁর সঙ্গেই থাকে। অধর বাবুর প্রশ্নে ভগীরথ চমকে উঠল না। অপ্রতিভ হেসে বলল, বাবার কথাটো ভাবি।

কি ভাব ?

অনেক কথা মনে উঠি গিছে।

কি হয়েছে পবনের ?

আপনি তো আমাদের হক লয়ে লড়—

কি ব্যাপার, বল তো ?

আগে আপনার মুখে এত আইন বুঝাবার কথা শুনি নাই। শিখাবার কথা শুনি নাই—

এখন কেন শোন। তাই তো ?

হাঁ মাপায়, তুমি বল, আমি শুনি।

চল, নদীর পাড়ে বসি।

ঘরে চল আপনি। বাতাসটো হিম ছাড়া লুন।

চল। তবু তো এখানে ঠাণ্ডা পড়ছে। ঠাণ্ডা পড়বে। কিন্তু শহরে ঠাণ্ডা নেই, জল না হইলে ঠাণ্ডা পড়ে ?

হিম ছাড়ার দিন মানে রোদ সেঁকি। সাঁঝে কাঠলতা জ্বালি, আর গরাই বাবুরা শীতে সাজন করে কত। বাবারে কুনো দিন শুধায় না, হাঁ পবন, গায়ে দিতে কিছু আছে ? ছিঁড়া পিঁজা লেপ একটো চেয়েছিল বাবা, বলল, কিনে লে।

ওরা বন পেরিয়ে জামু ঢুকল। ভগীরথ বলল, আপনি আগাও, আমি মায়েরে কেরাচিনটো দিয়ে আসি। না, ই ঠিক হচ্ছে নাই, কালী গরাই বড় মাতব্বরী করতেছে। কেরাচিনি দেয় না কেনে ?

ওর বা কি দোষ বল ? চিরকালের বড় চাষী, চির কালের মাতব্বর কেমন সুড় সুড়িয়ে ঢুকল পঞ্চায়েতে—অ্যাঁ ? পার্টির দিলীপ, রাজেনবাবু সব জেনেও কেমন মেনে নিল। আর তোমরা কি দেখলে ? এ সরকারের আগেও কালী গরাই ছিল মাতব্বর। এখনো সেই মাতব্বর।

ভোটে ইরাই জিতবে। না জিতলেও কালীবাবুই মাতব্বর র'ত হেথা! উ জামু গ্রামের সুরজ। উয়ারে না দেখে মোরাদের উপায় নাই। সরকার বদল, পার্টি বদল, কালীবাবুর রবরবা একোই থাকে।

গম্ভীর হয়ে গেলেন অধরবাবু। বললেন, বলেও এসেছি। হাঁটছিও অনেক। কালীকে বলব না আমি, তাহলেই বলে, আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কেরোসিন এখনি। বাপরে, আপনি নিজে এলেন কেন?

ভয় খায়। ভাবে তখন লকপালী উঠেছিল, মৌজা কাঁপায়ে দিচ্ছিল, এখুন ভি আর আর মৌজা গরম, জঙ্গল মহালে বাস—কি করে আবার! তখুন তো পলায়ে গিছিল সেই হাওড়া।

ভগীরথ বাড়ির দিকে গেল। অধর নিজের বাড়ি ঢুকলেন। বাড়ির সামনের ঘরে স্কুল। পিছনের ঘরে ওঁর আর ভগীরথের বাস। চৈতক ধান জমি উনি বহুকাল হল মাহিন্দারদের দিয়ে রেখেছেন। ওরাই ওঁকে খোরাকী ধান দিয়ে যায়। পুরনো মাহিন্দার গোকুলের বউই রাঁধে। ওঁর, ভগীরথের ও পোড়োদের ফ্যানভাত। স্কুলের মঞ্জুরি মিলেছে, এখন মাস্টারের মাইনেও সরকার দেয়। মাস্টারটি গরাই বাড়ি থাকে ও ও-বাড়ির ছেলেদের পড়ায়। অধরের গর্ব, মাস্টারও একদিন এ স্কুলে পড়ত।

ভগীরথ ফিরে এল, দুজনে খেলেন ওবেলার ভাত ও কাঁচকলার তরকারি। কাঁচকলা, পেঁপে, এগুলি ভগীরথের চেষ্টায় ও শ্রমে বাড়িতেই হয়।

বিড়ি ধরিয়ে অধরবাবু বললেন, তুমি তখন বললে ভগীরথ, কথাটা এই রকম—তখন আন্দোলন করতে গিয়ে এটা বুঝেছি—কোন্ কোন্ হকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তা তাকে বুঝতে হবে। আইনটুকু বাংলায় লেখা, সেটা পড়ার মত লেখাপড়া শিখতে হবে। যাদের লড়াই তারাই লড়াইয়ের কারণ-টারণ বুঝে নিক। নিজেরা লড়তে পারবে। খেতমজুরদের কথাই ধরনা কেন

আইনের পথে বিশ্বাস যেহ যদি, ভোটটা মানি নিছ না কেনে?

ভোট দিয়ে কিছু হবে বলে বিশ্বাস করি না ভগীরথ। ভোটে যে জিতুক, তোমাদের হক তো বুঝে নেবে?

হাঁ, তা বুঝছি।

আইন-টাইন জানার জন্যে পড়তে শিখুক না। পড়তে শিখলে পড়ার জিনিস আরো আছে।

তা তো জানি মশায়। পড়তে জানি নাই বলে তো মোরা মালিকের

হাতে মরি, আদালত যেয়ে ভি মরি।

তবে আর কি। বুঝলে তো।

আমি শুধাই বাবাটোর কথা।

কি কথা ?

খেতমজুর, বর্গাদার—হ'া হক মিলে নাই বটে, তবে নামে চিনা যায় ই জন কারা। আর আইন ভি হচ্ছে। কিন্তুক মাশায়—ভাতুয়াটো, সেও তো আছে ? ভাতুয়া করি রাখে, যেমুন গোলাম করি রাখে। ভাতুয়ার দিন-রাত খরিদ করি লেয়। ভাতুয়াটোর কথা ভি স্বীকার যেছে না কেনে গোরমেন ? আইন করি দিছে না একটো ? নাই কেনে আইন ?

কি বললে ? আবার বল ?

আইন ক'লে ভি হক মিলে না। খেতমজুরের মিলে না। হ'া সাচাই কথা, কিন্তুক আইন তো করছিল ? বর্গাদার লয়ে তো আকাশ ফাটায়ে দিল, ভাতুয়া গুলান কি মানুষ লয় ?

ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ তুমি ভগীরথ।

ভাতুয়া লিয়মটো কলঙ্ক। তা লয়ে তো তুমরা ভি লকসালী উঠাও নাই ? ভাতুয়া যি, সি জনাও তো জমি খুয়ায়ে করজের দাদে ভাতুয়া বনে, লয় ? জমিন-জীয়া মানুষ সি জনা। খেতমজুর যেমুন জমিন-জীয়া। তা ভাতুয়া লয়ে কেনে আগুন জ্বলে নাই ? গোলাম করতেছে মানুষরে ?

দাঁড়াও, দাঁড়াও ভগীরথ—

অধরবাবু উত্তেজনায় ঘুরতে শুরু করলেন ঘরে, কি যেন একটা, হ'া, ঠিক বলছে, ঠিক বলেছ। দাস প্রথা এটা, এখনো চলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আইন···দাসপ্রথা যদি হয়···ভগীরথ ! আমি সদর থেকে জেনে আসব। আমার মনে হচ্ছে, অথচ মনে হচ্ছে না—জেলে বসে কথা করেছিল কে যেন···নিশ্চয় ! কে হয় খেতমজুর, কে হয় ভাতুয়া—

—আর ঋণমকুবী আইন ভি তো হচ্ছে ! ঋণের লেগে মানুষটো গোলাম বনি যাবে ? বাবা সাত বছর হতে ভাতুয়া। দুই কুড়ি পার করল সবে, চক্ষু যায় যায়, শালো নিজে দেখাবে নাই, আমি নিব সদরে হাসপাতালে সি ছুটি ভি দিবে নাই—আর কি হিসাব করি রাখছে, টাকা আর শুধে না। ই পিশাচ কালীবাবুরে পার্টির বাবুরা মদত দিল, পঞ্চায়েতে উঠাল। সুদখিয়া মহাজন মালিক ছাড়া সি সরকারের পঞ্চায়েত চলে নাই, ই সরকারের ভি চলে না ইয়ার জমিতে বর্গাদার নাই, সবারে টুপি পরাল। ই ঘরে গোলাম পুষে

যাহারে ফরট মারায়।

দেখছি আমি, দেখছি।

তুমার কথা কে মানবে?

দেখছি। সদরে যেতে হবে।

আমারে লয়ে চল।

চল। পবনকে নিয়ে যাব।

কুথা?

কেন? হাসপাতালে?

কালীবাবু ছুটি দিবে নাই।

কালীর ঘাড় দেবে

ভগীরথ এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অধরবাবুর ওপর ওর অপার বিশ্বাস। অধরবাবুর ঘুম চলে গেল কোথায় ভগীরথ ওঁর বুকে ঘা মেরে চোখ খুলে দিয়েছে। ভাতুয়া! দাসপ্রথা! জমি খুইয়ে হোক বা ঋণের কারণে হোক, ভাতুয়া হয় মানুষ নিরুপায় হয়ে। দেশের মাটিতে দাসপ্রথা চলে যদি, সে কথা সর্বহারার হকের জন্যে লড়বার পার্টি জানবে না? তিনি জানবেন না?

জানবেন না কেন, জানতেন। কিন্তু এখন তিনি ভারতের মাটিতে জন্মাবার ভয়ঙ্করতা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বিপ্লবী। তিনি জীবন দিতেই প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর কাছেও "ভাতুয়া" এক স্বীকৃত, প্রচলিত প্রথা বলে এটি থাকা যে বর্বরতা, তা তিনিও ভাবেন নি ভাতুয়া তো থাকেই, দেশে ঘরে কতই থাকে। ভগীরথ বুঝিয়ে দিল, ভাতুয়া থাকতে পারে। আছে বলেই তাদের কথাও হিসাবে রাখো খেতমজুররা ন্যূনতম মজুরি পেল কি না শুধু তাই নিয়ে লড়াই কোর না। সরকার তো ভাতুয়া প্রথার কথা ভাববেই না। ভাতুয়ারা সংখ্যায় কতজন বা জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে ওরা তো সরকারী ভাষায় "অসংগঠিত" অংশের লোক লক্ষ লক্ষ বর্গাদার নয় যে একটা "অপারেশন" চালিয়ে হইচই তোলা যাবে, ভোট কেনা যাবে। খেতমজুরও নয়। তাদের কথাও সরকার মাঝেমধ্যে ভাবে। তবু, নইলে এবার নেতাদের চেষ্টায় নয়, নিজেদের তাগিদে ওরা ক্রমে নকসাল বনতে পারে। হকের জন্যে হেঁসো ধরলেই তো আজকাল সরকারী অভিধানে সে হয় "নকসাল"। নকসাল সংজ্ঞার বেলা সব সরকার একই অভিধান অনুসরণ করে চলে। "তিনিই ভারত, তিনি ভারতমাতা"র প্রদর্শিত পথ এটি।

ভাতুয়া মানে দাস। ঋণের দায়ে বাঁধাপড়া দাস। "গোলামটো"—ভগীরথ বলেছে।

৩

পবনকে আনতে কোন বেগ পেতে হয়নি অধরবাবুকে। কালীকৃষ্ণ বলেছিল বটে, কি হইছে উয়ার, যি সদরে যেয়ে চোখ দেখাবে? হাটে যায়, হাটে কত অষুদ বিচে, চক্ষে দিলে আরাম হয় না?

অধরবাবু বলেছিলেন, নিজেও ব্যবস্থা করবে না—অপরকেও করতে দেবে না? তোমার ঘরে তো চিরকাল গোলাম খাটছে, তা চোখ দুটো গেলে কি তুমি দেবে? গরু-মোষটার ব্যামো হলেও তো বদ্যি ডাকো, একে একবার সদরে নিয়ে চোখ দেখনো উচিত ছিল না তোমার?

কৃষকসভার নির্ভা আর সন্তোষ কি কাজে এসেছিল কালীকৃষ্ণের কাছে। তারাও বলল, নিশ্চয় যাবে। অধরদা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এর পরে আর কথা কি?

যাক না, যাক—কালীকৃষ্ণ অগত্যা বলেছিল।

সদর শহর জামু গ্রাম থেকে মাত্রই তিন ঘণ্টার পথ, এটুকু পথও পবনের আসা হয় না কখনো, শহর দেখে এমন উত্তেজিত হল ও যে চোখের কষ্টের কথাও ভুলে গেল যেন

ভগীরথ বিব্রত হচ্ছিল, আবার মমতাও হচ্ছিল ওর।

উ দেখ ভগীরথ, হোথা কত বড় বাড়িটো। উঃ। দালান বটে, উঁচা কত? পাঁচিলটো?

অধরবাবু মুচকি হেসে বললেন, ওটা জেলখানা। ওখানেই ছিলাম কিছুদিন।

অাঁ? জেলখানা? আর ই দালানটো?

ওটা সিনেমা।

—ই দেখ ভগীরথ, কত ফলের দোকান দিছে। বল্ দেখি ওগুলান্ কি? লাল কত?

—আপেল, বাবা।

হাঁ হাঁ, নামটো ভুলি যাই, বাবু আনে তো! পউষ মাসে এত ফলে ঘর ভরি দিবে। এ-ও!

ভগীরথের বুকের নিচে কোথায় ব্যথা করছিল। ফলের দোকান দেখে বাবার হাসিভরা মুখটা দেখে বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্যথায়। ধুলোপড়া ঘেন্নো বিবর্ণ ফল। তা দেখেও বাবা খুশি কত। চোখ দুটি যেন ঘোলাটে। বাবার চেহারা দেখে মনে হয় কবেকার মানুষ যেন, কোথা থেকে এসেছে সদর শহরে। যেন সুদূর ও ধূসর অতীত থেকে উঠে এসেছে ও. বিশ শতকের ধুলোটে ও অবহেলিত সদর শহর দেখে এমন অপরিচয়ের বিস্ময় ওর চোখে।

ঠিক এক কথাই মনে হয় অধরবাবুরও, অত্যন্ত অস্বস্তি হয় তাঁর। ফাটাচটা পা, চ্যাটালো আর ফাটা-চটা হাতের থাবা, গলায় উড়নি, রুক্ষ চুল, পবনকে দেখে কেন মনে হচ্ছে ও অন্ধ শতকের মানুষ! দাস বলে? কোথা থেকে আসছে ও? বল্লালসেনী বাংলা থেকে? শশাঙ্কের বাংলা থেকে? যে সময়ে গঙ্গারিডই নাম ছিল, সে সময়ের গহ্বর থেকে? যখন দাসরা রচনা করত সভ্যতা? অতীতের বাংলার কিছুই অপরিবর্তিত টিঁকে নেই আজকের পশ্চিমবঙ্গে। একা পবন কালজয় করে টিঁকে আছে। যা ছিল নিচু তা টাকা হয়, জমিব্যবস্থার পরিভাষা পালটায়, রূপনারায়ণ স্রোতোপথ বদলায়, তাম্রলিপ্ত হয় তমলুক—কিন্তু হ্যাঁ পবনটো পবন থাকি যায় তা দেখলে অধরবাবু, কালী গরাইটো কালী গরাই থাকি যায় তা দেখলে নাই? উ ভি আছে, আমু ভি আছি। উ নইলে আমু এলম কুথা হতে? ভাতটো. বুঝলে অধরবাবু. বড় দুঃখ দিতেছে ভাতটো শত-শত-হাজা-র বৎসর ধরি। বড় দুখ! এগুন চক্ষে সব ধুমা বন্ন দেখি। জানি আগুন লাগি জ্বলে কি বা. এ-ই ধুমা বাতাসে-এ-ই ধুমা আকাশে—ধুমাকার বন্দুর—যা দেখি সকল ধুমাবন্ন, আগুন তাতে নাচতেছে।

অধরবাবুর এক পুরনো ছাত্র এখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেচে। জীর্ণ ও গরিব দোকান। তার বাসায় উঠলেন ওঁরা। হোটেলে ভাত খেলেন অধরবাবু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। চোখের ডাক্তারের কাছে পবনকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বাড়িতে রোগী দেখে। ডাক্তারকে পবন ওই কথাই বলল।

চক্ষে সব ধুমাবন্ন দেখি বাবু। যেমন ধুমা উঠতেছে আগুন তাতে। স-ব ধুমাকার। আর এই নাচে, এই চমকায়। ধানটো, মাচানটো, ভগীরথের মুখটো যেন আগুন তাতে বাতাস জ্বলে, পিথিমি নাচতেছে। চমকাতেছে।

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, মনে হচ্ছে মুকোমার পরীক্ষা করতে হবে।

সে তো সময় লাগবে।

তাই করুন।

অতক্ষণ বসবেন আপনি?

না আমার কাজ আছে।

পবনকে রেখে অধরবাবু ও ভগীরথ বেরিয়ে এলেন. ভগীরথ বলল, চক্ষু সারবে?

দেখা যাক।

অধরের মনে কালীকৃষ্ণের ওপর প্রজ্জ্বলন্ত রাগ। চোখের এমন অবস্থা লোকটার তো একদিনে হয় নি। দিনে দিনে—"দিনে দিনে" শব্দ দুটি যেন এক সাবানের বিজ্ঞাপনকে মনে করিয়ে দেয়। দিনে দিনে, একটু একটু করে পবনের চোখের আলো ক্ষীণ হয়েছে। ভাতুয়া মহাজনের কাজ করতে করতে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাতুয়ার চোখের চিকিৎসা করাবার জন্যে ভাতুয়াকে ছুটি না-দেবার অধিকার মহাজন রাখে। দাস। ক্রীতদাস।

অধর ভগীরথকে নিয়ে আদিবাসী-কল্যাণ আপিসে গেলেন। জেলাটিতে আদিবাসী অনেক। আর অধরবাবুরা সত্তরের দশক পড়তে আদিবাসীদের নিয়ে ধান খেতে নেমেছিলেন। আদিবাসীকল্যাণ দপ্তর এখানে আপিস রেখেছে। ভগীরথ বলল, হেথা এলাম কেনে?

জানলে এ জানবে।

পলুস মুমূ শিক্ষিত, চটপটে যুবক। সে বলল, ভাতুয়া বলুন, মাহিন্দার বলুন, ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়। একটা লোকের সঙ্গে সময় সাপেক্ষে, বাৎসরিক একটা টাকার কড়ারে, ভাত ও জলপান দেবার শর্তে চুক্তি করা হল। কার্যকালে সে মনিবেরবাড়ির চব্বিশ ঘন্টার গোলাম হল। ক্ষেত্রবিশেষ এই শ্রমিকের নিজস্ব কিছু জমি থাকতেও পারে। তা অবশ্য কম।

এখানে ঋণের ব্যাপার।

বুঝলাম। ঋণ নিল একজন। সে নিজে অথবা তার আপনজন কেউ ভাতুয়া হল। বছরে এত টাকা, দৈনিক ভাত ও জলপান।

ঋণমুক্তি তো হয় না।

হবে কি করে? ভাতুয়া বা মাহিন্দার হচ্ছে নিরন্ন ও নিরক্ষর লোক। সেই মুহূর্তে বাঁচার জন্যে সে নিজের দাসখতে টিপছাপ দিচ্ছে। আপনি বুঝছেন না, কি হওয়া উচিত ছিল?

আপনি বলুন।

পলুস মুমূর্ষুর মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। হাসিটি ধরে রেখেই সে বলল, ঋণগ্রহীতাকে জেনে নিতে হত সে কি ভাবে ছাড়ান পাবে। ধরুন পাঁচ বছরের জন্যে চুক্তি হল, ধার ছিল এক হাজার টাকা। পাঁচ বছর সে কি কাজ করবে এবং কি হারে তার দৈনিক বা মাসিক মজুরি ধরা হবে? যদি দিন দু টাকা মজুরি হয়, তাহলে মাসে ষাট টাকা কাটান যাচ্ছে। বছরে তিনশো ষাট টাকা। পাঁচ বছরে তো মালিক আঠারোশো টাকা তুলে নিল।

বুঝলাম।

না, বোঝেন নি।—হাসি লেগে থাকল পলুস মুমূর্ষুর মুখে, গলাটা ধারালো হল, বোঝা কি অতই সহজ? কাজটা যদি খেতমজুরী হয়, তাহলে একভাবে হিসেব করা চলে। খেতমজুরের একটা মজুরি রেট আছে বটে—পাক, বা না পাক। কিন্তু ক্ষেতমজুর তো খাটবে আট ঘণ্টা—ভাতুয়া চৌপর দিনের গোলাম। কাজ যদি হয় বাগান সাফ, কাঠ কাটা, গোয়ালের কাজ, তার মজুরি কি?

তাহলে?

সে সব হিসেব এ লোকটির আছে?

না বাবু। কুন্-অ হিসাব নাই।

হিসেব-টিসেব করলে মালিককেই টাকা ফেরত দিতে হবে হয়তো। আমি যা বুঝি, বললাম। দেখুন, কি বোঝেন!

খেতমজুরদের তো তবু কোন রেট হয়েছে। আর কোন কোন জায়গায় তারা এখন তবু পাচ্ছে। পুরো না হোক, কাছাকাছি। অথচ খেতমজুররা—

শুনতে তো পাই, অনেক আন্দোলন হয়েছে তাতে এতটুকু পাচ্ছে। আপনিই ভাল জানবেন।

হ্যাঁ। আমরা আন্দোলন করেছিলাম।—অধরবাবু চোখ তুললেন। মনের নিচে জবাব পাচ্ছেন। ভাতুয়াদের জন্যও—অধরবাবু বললেন, কিন্তু এরা তো...

এরা শ্রমিক হিসেবে আমাদের ভাষায় "অসংগঠিত অংশে" পড়ে, তাই তো? ক্ষেতমজুরও তাই। আন্‌অর্গানাইজ্‌ড্ সেক্টর।

খেতমজুরদের চেনা সোজা।

এদের চিনে বের করা কঠিন।

এদের কোন আইনের আওতায় ফেলা চলে না।

চলে বই কি।

চলে ?

পলুস মুর্মু'র হাসিতে শাণ পড়ছে, ফুলকি উড়ছে। সে বলল, এরা বনডেড লেবার। বাঁধা শ্রমিক। দাস।

বনডেড লেবার! পশ্চিমবঙ্গে ?

নয় কেন ? দেখুন না, এখানে পরিষার লেখা আছে, "পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত চেহারার দাসত্ব অনুপস্থিত। বাৎসরিক চুক্তি-মাফিক শ্রমিক নিয়োগ, এই নামের ছদ্মবেশে বনডেড লেবার প্রথা চলে।" নয় কেন অবরবাবু ? বনডেড লেবার অ্যাক্ট পড়ে দেখুন—যে যে কারণে বনডেড লেবার হয় মানুষ, সেই কারণে মানুষ হয় ভাতুয়া।

আইন আছে, আছে বাবু ? ভগীরথ বলে।

আছেও বটে, নেইও বটে। পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা আছে বলে তো সরকার বলছে না। কিন্তু ভাতুয়া প্রথাই হল গে সেই প্রথা।

তাহলে ?

আমি জানি না ভাই। তুমি ওঁর কাছে জেনে নিও। ভাতুয়া আর বনডেড লেবার এক, তা প্রমাণ করবে কে ? প্রমাণ করে প্রথা উচ্ছেদ করবে কারা ? বিহারে এমন হামেশা ঘটছে, বনডেড লেবারকে মুক্ত করা হল রামের খপ্পর থেকে। অভাব, জমিহীনতার কারণে, সামাজিক প্রয়োজনে সে ঋণ নিল শ্যামের কাছ থেকে এবং তার বনডেড লেবার হয়ে গেল। ঠেকাবে কি করে ? ভাতুয়ারাট হয়তো মারতে উঠবে, আপত্তি জানাবে।

বনডেড লেবার অ্যাক্টটা পাই কি করে ?

আপনি মশাই মার্কামারা হয়ে গেছেন। সাহায্য করাও মুশকিল।

মানতে পারলাম না।

শুনুন, জিগ্যেস করলে অস্বীকার করব "দিয়েছি" বলে- কিন্তু ছোট অ্যাক্ট, একটা কপি আপনাকে দিয়ে দেব কোন সময়ে। নিয়ে করবেন কি ? সাজিয়ে রাখবেন ?

বলুন, বলুন। ভগীরথ বলছে, আপনি বলুন, শুনতেই হবে। আর যাকে নিয়ে প্রশ্ন, তিনি চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসে আছেন। তোমাকেও বলি ভগীরথ, আগে তো দেখবে ?

পলুস মুর্মু'র হাসিতে যেন জলন্ত রোদে ইস্পাতের ছুরি ঝলকে উঠল, সে কি ? আপনার চেনাজানার মধ্যে একজনই 'ভাতুয়া" না কি ? "যাকে নিয়ে প্রশ্ন" বলছেন ? আচ্ছা, আরেকজন প্রাক্তন ভাতুয়ার খোঁজ দিচ্ছি।

শিবচাঁদ মুর্মু, গ্রাম সলপাড়া, তারও চোখ অন্ধ। আমার কাকা। নিন, চা খান, চা এসে গেছে।

ভগীরথ অভিভূত হয়ে তাকাল। পলুস মুর্মু বলল, হাঁ হে। ভাতুয়ারা বসন্তরোগে, মকোমায়, এতে-তাতে অন্ধ হয়। অন্ধ হয়ে তবে কাকা খালাস পেয়েছিল।

অধরবাবু বললেন, যুগলের বাবা।

হাঁ। জানেন দেখছি।

চা খেয়ে ওঁরা উঠে পড়লেন। অধরবাবুর মাথায় নানা প্রশ্ন, যুগলের স্ত্রী?

গ্রামেই আছে।

যুগলটা!

ভগীরথ বলল, মারি দিছিল তারে, লয়? হাঁ, আমি জানি, আমি শুনছি।

পলুস মুর্মু সে কথার জবাব দিল না। অধরবাবুকে বলল, বন্ধুদের লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছেন—এই বইগুলো একজন দিয়েছিল পাঠিয়ে, নিয়ে যাবেন।

ঘাড় হেলিয়ে অধরবাবু বেরিয়ে এলেন। এখন বিকেল হয়-হয়। সব ধুলোটে, বিবর্ণ। ভগীরথ বলল, এখুন ইরা খুব সিধাসাফা বাত করে।

তা করে।—সদুঃখে হাসলেন অধরবাবু। ক্ষমতা এদের বড় কম, বড় কম।

দপ্তরটো রাখি দিছে কেনে?

রাখতে হয়। এ সরকার এ জেলায় চেষ্টা করছে, কিন্তু ক্ষমতা বড় কম এদের।

কি বুঝলে বাবু?

পরে ভগীরথ, পরে।

ডাক্তার বলল, কাল আবার আসুক। পবন, তুমি বারান্দায় যেয়ে বোস। আমি এঁর সঙ্গে কথা বলি।

পবন বলল, অধরবাবু! মোরে চশমা দিবে মশায় হাঁ! চশমা লিলে স—ব সপষ্ট দেখব যেমুন! উঃ! জল খাওয়াছে আর চক্ষু দেখছে সি কত রকমে!

ভগীরথ বাবাকে নিয়ে বাইরে এসে বসল। বারান্দাটি উঁচু। পবন বলল, ফিরব কখুন, আঁ ভগীরথ? নাড়া কুচাতে আছে, ঘসির মাচাংটো

বাঁধতে বলছিল—

এখানে বসুন। নাও, বিড়ি খাবে ?

পবন সসজ্জ হেসে বলল, একটো সিগারেট আন্ কেনে, উ দোকানে যা ? কতুনো খেয়ে দেখলম না—

দেয়ালে পিঠ রাখি বস কেনে,আমি লয়ে আসি। বিস্কুট খাবে ? বিস্কুট ?

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, অনেক কথা বলে লাভ নেই মশাই। কে হয় আপনার ? গাঁয়ের লোক ?

হাঁ। বলুন না

মকোমা ভয়ানক এগিয়ে গেছে। নার্ভগুলো..ডাক্তার সংক্ষেপে বোঝাতে থাকল। মনে হয় প্রাইমারি টাইপের মকোমা, আর প্রাইমারি টাইপের মকোমা হবার কোন জানিত কারণ নেই। চোখের স্নায়ুমণ্ডলী-ক্ষয়িষ্ণু পবনের। পবনের কি বহুমূত্র আছে ? অধরবাবু জানেন না। অ্যাটোফি বা ক্ষয়িষ্ণুতার এই কারণ দীর্ঘদিনের পুষ্টিহীনতা। পবন রোজ কি খায় ? অধরবাবু জানেন না, আন্দাজ করতে পারেন। নন্‌কো-অপারেটিভ টাইপ। চিকিৎসায় কাজ হওয়া দুষ্কর।

অপারেশন তো হয় মকোমায় ?

সে কথা ভেবে দেখুন।

তাতে বিপদ আছে ? মানে...

দেখুন, বছর পাঁচেকের পুরনো ব্যাপার। প্রথম দিকে যদি আসত..

কি করবেন ?

কলকাতায় নিয়ে দেখাতে পারেন।

লাভ হবে ?

মনে হয় না।

তাহলে ?

আপাতত চশমা দিয়ে দিই।

অন্ধত্ব আটকানো যাবে না ?

পাঁচ বছর আগে হলে অপারেশন চলত।

আজ থাকতে বললেন ?

আজ তো হবে না। কাল সকালে ব্লাডসুগারটা খালি পেটে, খাবার পর, দুবার করান। পেচ্ছাপটাও দেখিয়ে নিন। বহুমূত্র থাকলে তার চিকিৎসা চালান। ওষুধ থাক। তাতে চোখটা আর ক দিন থাকবে।

আপনার টাকাটা ?

অধর বাবু দিকে তাকাল ডাক্তার। অধর মাইতিদের জন্যে এক সময় না কি ডাক্তাররা দক্ষিণা কমাতে বাধ্য হয়েছিল। শোনা কথা। এখন লোকটি ভেঙে পড়েছে। খাকি, গলা ছেঁড়া সোয়েটার, ধুতিটা আধ ময়লা, মোটা চটি—গ্রামের লোকদের দেখে অবশ্য টাকা আছে কি নেই, বোঝা যায় না। তবু, এ তো গরিব—সবাই বলে। গরিব হও যদি, ডাক্তারকে রুগী এনে দেখাও কেন ? হাসপাতালে যাও না কেন ?

তিরিশ টাকা দিন।

টাকা দিল অধর বাবু। জীর্ণ ব্যাগটি চিমসে হয়ে গেল তিনটে নোট বেরোতে।

চশমা করতে কত লাগবে ?

পঞ্চাশ বেকসুর।

আচ্ছা।

অধর বাবু মনে মনে আশ্বস্ত হন। হাত ঘড়িটা এখনো আছে। ভগীরথই তখন সামলে রেখেছিল। অধর বাবুর বাবার হাত ঘড়ি। ওষুধ-বেচা ছাত্রটি নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দেবে।

ছাত্রটি বলল, রক্ত আর পেচ্ছাপ হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে দিই। খরচ কম লাগবে।

তাই কর।

দুদিন থাকতে হল আরো। বহুমূত্র নেই পবনের। চশমা তৈরির ফরমাস দিয়ে ওরা বাসে চাপলেন। অধর বাবু বললেন, আবার নিয়ে আসব ক দিন বাদে।

কেনে, বাবু ?

চশমা পরে দেখে নিতে হয়।

চশমাতে কিন্তুর টাকা লাগবে, লয় ?

সে হয়ে যাবে।

ঘড়িটো তুমার—

হয়ে যাবে।

কে শুধবে বাবু এত টাকা ? কত খরচ করলা ?

ভগীরথ বলল, আমি। ইবার চুপ যাবে ?

হাঁ। চুপ যেলম।

আর, আর তুমি গরাইবাড়ি যাবে না।

যাব নাই।

না।

কি বুঝল পবন, কে জানে। ভগীরথের কণ্ঠের ক্ষোভে ও রাগে কি ছিল? ও একবার ছেলের দিকে চাইল। একবার অধর বাবুর দিকে। তারপর ওর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল।

বলল, ই কথা আজ তুই বলিস কেনে?

বললাম।

কেনে?

না। গরাই বাবু তুমারে বেআইনে খাটাছে, মজুরি ভি হিসাবে কাটে নাই, উর করজ দশ দফা শুধে গিছে, বুঝলা? দশবার শুধছ তুমি?

বাবু! অধর বাবু! ভগীরথ কি বলে?

ঠিক বলে পবন হ্যাঁ, ঠিক বলে।

শুধে গিছে?

সমগ্র পরিস্থিতির নির্মমতায় ভগীরথ এখন নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ। আইনের কথা যা বুঝেছে, তাতে ওর বুকে এখন রক্তের জোয়ার। ভগীরথ বলল, আর কখুনো যাবে না, কুনো দিন নয়।

বাবু পঞ্চায়েতী, হাতে অনেক ছেলা। মারে যদি? কতদিন তো মারছে।

অধর বাবু বললেন, কেউ কিছু বলবে না।

কেনে? কেনে আমার হয়ে বলবে? কেনে বাবুর সাথ বিবাদ উঠাবে? বল? বলবা না? বুঝি পারছি আমি অধর বাবু। বুঝি পারছি আমি ভগীরথ? আমার চক্ষু আর ভাল হবে না:—সি কথাই বলবি তুরা। বলবি তুমার কাজে পবনটো কানা হই গেল, আর সি তুমার হয়ে খাটবে না। বুঝি গিছি আমি বাবু গো! আমার আর বুঝতে বাকি নাই!

পবন হো হো করে কাঁদে ও ভগীরথ তার মাথা সাপটে কাঁধে টেনে নেয়। ভগীরথও নীরবে কাঁধে ও জাপটে ধরে রাখে বাপকে। অধর বাবুর মনে চেনা পৃথিবী ভেঙে যেতে থাকে। প্রজ্বলন্ত ক্রোধ। ভাতুয়া কতজন? কি হিসেবে কাজ করে? ভাতুয়াই বনডেড লেবার এবং তাঁর পকেটের বাদামী কাগজটি বলে দিচ্ছে, ১৯৭৬ সালের দি বনডেড লেবার সিসটেম অ্যাবোলিশন) অ্যাকুট-এর আওতায় ভাতুয়াকেও ফেলা যায়

এক বিশেষ উপধারা প্রয়োগে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা নেই, আছে কনট্রাক্ট লেবার। সামনে অনেক কাজ। সংগ্রাম ফুরায় না।

পবন চোখ মুছল, মাথা তুলল। নাক ঝেড়ে, জামার মুখে বাইরের দিকে তাকাল। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। যেন আগুন জ্বলছে কোথায়, ধোঁয়ায় ধুমল বাতাস। সব দেখাচ্ছে ধোঁয়াবর্ণ, সব যেন চমকাচ্ছে, লক্‌লকাচ্ছে, আগুন তাতে বাতাস কাঁপে যেমন। এত আগুন লেগে গেছে, কই পবন তো বোঝে নি আগে ?

৪

আর গেল না পবন গরাইবাড়ি, একবারের জন্যেও নয়। অধরবাবু কি বললেন কৃষকসভায় নিত্য আর সন্তোষকে, কার সঙ্গে কি কথা হল তা পবন জানল না। তবে ওর বউয়ের মুখে সব কথাই শুনল। অধরবাবু না কি নিত্যদের ডেকে রীতিমত আলোচনা করেছে। সরকারী কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। গ্রামের ছেলে তোমরা, পার্টির ছেলেও বট। মানুষকে দাস বানিয়ে ব্যবহার চলছে, তা তোমরা দেখবে না ? কেমন লোককে রেখেছ পকায়েতে ? পবনের চোখ দুটো যে চলে যাচ্ছে, মালিক কোনদিন পবনকে চিকিৎসা করিয়েছে ? তোমাদের চেনাজানা চিরকালের মানুষ না পবন ?

ছেলেরা গ্রামেরই ছেলে। তারাও আলোচনা করে থাকবে। তারা টাকা এনে দিয়েছে অধরবাবুকে। বলেছে, গরাইয়ের ঘাড় ভেঙে আমরা পরে তুলে নেব।

সব শুনেও পবন চঞ্চল হয় নি। শহর থেকে ঘুরে এসে ও সেই যে ঘরে বসেছে, বসেই আছে। এত কথা, এমন কাণ্ড, তাতেও ও এতটুকু বিচলিত হয় নি। বলেছে, উয়ারা টাকা দিল ? ভাল।

হা তুমার চেত-ভেত নাই ? যা বলি সব শুনি বসি থাক ?

কি করব ? লাচব ?

হা, কিছু তো করে ?

ভাবি বউ ! কত খাটলম, বর্ষার আল ভাঙলে বান্‌তাম, তাতের কালে গরাইবাবুর মাথে ছাতা ধরে দৌড়াতাম। পায়ে ঘা হই গিছে ইটা-পাথর বেজে।

লাও, খাতের দড়িটো পাকাও বসি।

পারি না বউ।

অত ভাব কেনে? একটো বকনা নিব পালনি। সি হতে দেখবে সুসার হবে।

নিবি? নিম। বকনা ভি মাগছিলাম একটো, দেয় নাই। বর্ষার মাথাল দিল, বলে, লিবে রাখল ম। ইয়ার দাম দু টাকা। কিছু দিল না কখুনো। খালি গতরটো মাটি করি দিল, চখ দুটা—

বউ ভগীরথকে বলল, ই কেমুন হয়ে যেছে রে ভগীরথ? আমি তো ভাল বুঝি না। এত কাজের মানুষ, এমন কালিমাড়া মুখে কি ভাবে? অাঁ?

ভগীরথ বলল, কি ভাব বাবা?

হিসাব ভাবি।

কিসের?

দেনাটো শুধল করে, আমি বা কত পাব। অনেক কথা মনে উঠে ভগীরথ রে! মনিব ভি বলছে তু বিনা কাম হবার লয়, আমি ভি জানান দিয়া কাম উঠাছি। এখুন দেখ্, সি ধান ভি কাটা হবে, সকল কাম হবে, তা আমার চখ দুটা নিল কেনে?

ভগীরথ বলল, তালপাতা ডেগো লয়ে পাখা বান্ধা শিখবে? আমি ভি করি, তুমি ভি কর, চালান দিবে গোকুল দলুই, কিনে লিবে নগদে?

না রে! সি কামটা দেখ্, কানাতেও করে। এখুনো চক্ষু আছে, টু'নি দেখে লই?

"কানা-কানা" বল কেনে? কলকাতা লয়ে তোমার চক্ষু দেখাবে অধরবাবু।

পবন মাথা নাড়ল। বলল, কুথা হতে? কি করে? না ভগীরথ, সি জনা অনেক করছে। আর ঋণ বাড়াস না। চক্ষে কিছু হবার লয় রে, সকল ধুমধয় দেখি। যেমুন ধুমা উঠতেছে বাতাসে।

সদরে চশমাটো পরি দেখবে, চক্ষে ভাল দেখ। শুন বাবা, ভাল দেখবে।

না তোরে দেখছি কুনোদিন, না তোর মা-রে। বিহান কাড়তে ছুটি চলি গিছি, আর অসাগর কাম! কেনে বা লয়ে যাই নাই তোরে, তু গাঁদাটো ছিলি, মেলায় যাবি বলে কানছিলি কত! হা!

বাবা! চেটাই বুন, পাখা বাঁধ, ঘরে বসে বা রবে কেনে? কামে র'লে ভাল রবে মন।

দূর ! কানা হই, করব !

অধরবাবুর কাছে গেল ভগীরথ। অধরবাবু সব শুনে বললেন, প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। চোখের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। চশমাটা নিয়ে আসি ওকে নিয়ে।

চশমা পরে পবন বলল, হাঁ ধুমা-ধুমা বটে ! লাচতেছে, ললকাতেছে, কিন্তুক, সপষ্ট দেখি।

চশমা পরে পবন বড়াম মায়ের থানে ঘুরে এল। অধরবাবুকে বলল, ভগীরথটো সাচাই বলছিল গ। মায়ের থানে লাল চুটির বাসা। তাতেই মায়ের রঙ্গে লাল চুটি যায়। গরাই বলছিল মায়ের দেহ ফাটি চুটি বাইতেছে গ।

এই তো সব ঠিক-ঠিক দেখছ।

সি কথাটোর কি হল বাবু ?

কি কথাটার পবন ?

আমারে বেআইনী খাটাছে উ ?

সে কথাও হবে, জবাব দিতে হবে ওকে। আমি হিসেবটা করে নিই ?

হিসেব করতে-করতে দিন গেল অনেক। বহু বছরের হিসেব। এর মধ্যে পাশের গ্রামে ধানকাটা মজুরি নিয়ে হাংগামা বাধল। মজুররা খেত-মজুরি নেবে, জমিমালিক দেবে না চেনা হাংগামা। মালিক বাইরের মজুর আনবে। চেনা নিয়ম। যারা মজুরি চাইতে তাদের ক জনাকে ধরবে। চেনা পদ্ধতি।

অধরবাবু সেখানে গেলেন। এক সময়ে মহল্লাটিতে ধানের নাম রক্তে লেখা হয়েছিল, বারবার। এখন নির্বাচনের আগে ধানকাটা নিয়ে হাংগামা বাঁধলেই আবার পুলিশ ঢুকবে গ্রামজীবনে। পঞ্চায়েতকর্মী ছেলেরা সঙ্গে গেল।

পবন বলল, ভগীরথ ? তু যাস না কেনে ? অধরবাবু একা, লয় ?

ভগীরথ গেল।

আর পবন গেল গরাইবাবুর বর্ণশালী ধানের ক্ষেতে। ওই তো তার হাতে বাঁধা মাচা। ওই উঁচে বসে ও খেত পাহারা দিত। ধান কাটছে, পালা দিচ্ছে পণ্ডিত, সাগর, নিবারণরা। খেতমজুর সব। আঃ ! অসাগর ধান গো, অসাগর ধান। এই সব কাজ তো সেও করেছে এক সময়ে। এখন চশমা পরে সব দেখতে পাচ্ছে পবন সপষ্ট।

তুই হেথা কেনে, পবন ? —গরাইবাবু ধানকাটার কালে দেখতে আসে, পবনের খেয়াল ছিল না।

দেখতেছি বাবু। —ভয় করছে গো, ভয় করছে। এতদিনের অভ্যেস কি যায় ? গরাইবাবুকে ভয় করা পবনের অভ্যেস। ভয় করছে।

এঃ! অধর মাইতি চশমা করে দিছে, তা পরি দেখতেছ শালো! দেখতেছ না চুরাবার তালে আছ, বুঝি নাই ? বোকাটো ভাবিস, অাঁ ?

চুরি ? আমি ?

লয় তো কে ? শালো মুরুব্বি হল উ অধর মাইতি, সি মোরে আইন দেখায়, হিসাব দেখায়। কি করবে সি ? ধানটো ভানারে লই, তা বাদে যেয়ে তুমার নাম আমি থানায় দিব।

কেনে ?

চুরির নালিশ দিব শালো। তুমি মোর মুখ হাসাছ, তুমারে আমি ছাড়ব ?

কি চুরি করছি আমি বাবু ?

থানায় বলবে।

আমি তুমার মুখটো হাসা করাছি ?

হাঁ।

আজ দেড় কুড়ি বছর খাটি, তুমার সি আটসং টাকা উঠল নাই, আমার কড়ারের টাকা ভি দিলানা কুনো দিন—তুমি, তুমি এখুন আমারে টাকা দিবে তা জান ?

কে বলছে ? অধর মাইতি ?

দিবে। বেআইনে খাটায়ে নিছ বাবু। চক্ষু চলি যায়, কুনো বেবস্তা কর নাই।

চক্ষু যায় নাই, জেহ্লে বসি কাঁদি কাঁদি ইবার যাবে। তুমার গরম বড় বাড়ছে পবন!

চোর! চোর যদি হতে পারতাম বাবু। মনিষ্যানের হারটো কে খুঁজি দেয় ? একটো টাকা দিছিলা তারপর ? তুমার টাকার ব্যাগ আনি নাই কুড়ায়ে ? হাটে যখুন হারায়ে যায় ? চোর যদি পবন হবে বাবু, তবে তার উপর ঘর ছাড়ি পালায়েছিলে লকসালী কালে কেমন করি। চোর আমি ? চোর ?

হেই, হেই পবন, ঠিক ?

চোর আমি ?

মারা করবি ?

গরাই পেছন ফেরে ও আবা দৌড়ে চলে যায়। পবন রাগে ক্রুদ্ধ ক্ষোভে কাঁপে। কাটা ধানের পাঁজা এখন চমকায়, ঝিলিক মারে।

ধান কাটা হতে না হতে আকাশে মেঘ জমেছিল। ধান এবার সবার খেতে হয় নি, বড় ধরা গিয়েছে। যে ধান উঠেছে তাও বুঝি জলে নষ্ট হয়। কাটা চলছিল, ঘরে তোলা হচ্ছিল ধান।

পবন আকাশ দেখছিল। তার হাতের মেরামত করা টালে গরাই বাবুর ধান সুরক্ষিত থাকবে। এক ফোঁটা জল লাগবে না, তা পবন জানত। এও জানত, গরাই বাবুর জান ওই ধান। আকাল আসছে। ধান কর্জ দেবে গরাই বাবু, বহু জনকে বাঁধবে ঋণের দায়ে। ধানের বলে ওর বল।

রাতে দুর্যোগ নেমেছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ, প্রবল বৃষ্টি, দুরন্ত হাওয়া। পবন ওর দা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। চেনা, সব ওর রক্তে রক্তে চেনা। এমন দুর্যোগে কেউ বেরোবে না। গরাই বাবুরা সবাই সেপের ওমে ঘুমোবে। ওরা ভাত খায়। তপ্ত ভাতের ভারে ঘুম ঢেলে আসে চোখে।

পবন কোন বোকামি করে নি। খুব সুকৌশলে ও টালের চাল বেয়ে উঠেছিল। তারপর ধারালো দায়ের কোপে ও টালের বেড়ার ঝাঁপের ঘন, আঁটসাঁট চালা কেটে ফেলে দেয়। দুটি টালেরই। ধান ভিজতে থাকে। তখন ও টালের ঘের কাটতে থাকে ও হিঁচড়ে নামাতে থাকে। তাতেও হয়তো কারো কানে যেত না। টিনের ঘর গরাই বাবুর। ঝমঝম করে জলের শব্দ হচ্ছিল।

কিন্তু এখন পবন চেঁচাতে থাকে।

—হেই গেল তুমার ধান !

—ইবার কি করজ দিবে ?

—বুন বাঁধনে বাঁধবে গ ?

হড়হড়িয়ে ধান পড়ছিল। পবন লাথি মেরে ধান ফেলছিল।

তখন গরাই বাবুদের ঘুম ভাঙ্গে।

পবনকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। পবনের গায়ে কেউ হাত দেয় নি। হাতে দা ছিল ওর। চোখ ছিল লাল অসীম, অপার ক্ষমতায় দুটি টালের বহু ধান নষ্ট করে পবন যখন অবসন্ন হয়, তখনি ওকে ধরা গেল।

তার আগে নয়।

আশ্চর্য, পবন কোন বাধা দিল না। ওকে ধরতে দিল। সবাই নীরবে সভয়ে দেখছিল পবন একা কি করে এত বড় সর্বনাশ করেছে।

ধানের ছড়াছড়ি মাটিতে। বৃষ্টিতে ভিজে গোবর। গরাই বাবু মাথায় হাত রেখে কাঁদছিল।

বর্ণশালী ধান মাড়িয়ে যেতে যেতে পবন চোখ তুলে ভগীরথকে দেখল। পবনের চোখ ঘোলাটে, তবুও বুঝল, ভগীরথের চোখে আজ পিতার বিপন্ন অসহায়তার কারণে দুঃখ নেই। অন্য কিছু বলছে ভগীরথের চোখ। অন্য কোন জরুরী খবর জানাচ্ছে। ভগীরথ মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" জানাল। বাবার আচরণে ওর সম্মতি।

পবন বলল, নইলে গ্রামটো ধান বাড়ি দিয়া বাঁধি ফেলি দিত ভগীরথ।

হ্যাঁ বাবা।

উর জাহান উ করজ দিয়া কামে। বাস্, কোমর ভাঙি দিছি।

জানি বাবা।

ইয়াদের বুঝাস।

পবন আর একবারও পেছনে না চেয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলে গেল জামু গ্রাম থেকে।

(১৩৮৯)

পিতা পুত্র

মহাশ্বেতা দেবী

চার নম্বর গেট পেরিয়ে বিস্তীর্ণ একটা দীঘি বা জলার মাঝের ঘরগুলির সুবিধে অনেক। দু দিকে জলা। ফলে জলচোঁড়া সাপদের জল বদলাবার ইচ্ছে হলে এই ঘরগুলি দিয়ে শর্টকাট করে। জলচোঁড়া সাপদের সপক্ষে বলা চলে, ওরা শেষ অবধি জলই ভালবাসে, শুকনো ঘরে থেকে যায় না। পদ্মগোখরো বা জলকেউটে শর্টকাট করার সময়ে মাঝেমধ্যে ঘরেই থেকে যায়।

আরেক সুবিধে হল, বর্ষা পড়লেই দু জলার জল ও পথের জল ঘরে ঢোকে, খাটা পায়খানার মলও ঢোকে।

এইসব সুবিধে দেখে রতন ঘরটি নেয়। কচি-কাঁচা নিয়ে বাস। এগারো টাকায় ঘর পাবে কোথা? রতনকে শহরে আনল যে, সেই মহেশ বলল, "কাচেভিতে থাকলি, দেকতে পারব। আর তোর হাপিস যাতে, ছেলের ইস্‌কুল পেচনে।"

"ভাল ইস্‌কুল? গাঁয়ে মাস্টার বলেচে ভাল ইস্‌কুলে পড়ালে দেশো অনেক ওপরে যাবে।"

"ভাল নয়ত কি? হাই ইস্‌কুল। বিত্তি পাশ ছেলে। এ ইস্‌কুলে টিকে থাকার লোক আমার আচে, ফিরি করে দেব।"

"দেশোর মা বলছিল……"

"তাও দোব।"

এমনি করেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল রতনের। ভাগের জমিও এবার পায় নি, বাবুদের মধ্যে মমলা। দাশু গ্রামের স্কুলে বৃত্তি পাশ করে থেকেই রতনের মনে হচ্ছিল, ওকে আরও পড়ালে হত। কিন্তু প্রাণে বাঁচলে ছেলের পড়া!

মুশকিল-আসান হয়ে মহেশ দেখা দিল। গাঁয়ে ও অবরে-সবরে আসে, শহরবাসী, এবং গত কয়েক বছরের কল্যাণে ওয়াগান-ব্রেকারদের মাল শুদামজাত-এন্‌ডের কমাণ্ডার ঘোঁতন সান্যালের প্রোটেকশান পাবার ফলে ওর হাতে এইচ, এম, টি।

মহেশ দেশ ও তরুণ প্রেমী। দেশের বেশকিছু তরুণকে এনে ও তাদের তার চুরি, রেশনের মাল পাচার, ভেজাল ঠেকিয়ে তোলা আদায় প্রমুখ সমাজহিতৈষণার কাজে লাগিয়েছে। 'সমাজহিতৈষণা' কথাটি এ-ক্ষেত্রে তামাশা নয়। কেননা, তরুণরা এ-সকল কাজ থেকে চাট্টি পায় বলে পরিবার পুষতে পারে। পরিবারবর্গ সমাজভুক্ত। ফলে সমাজের হিত হয়।

রতনের আভ্যন্তর অবস্থা, সংসারে অবিলি ইত্যাদি দেখে মহেশ খুবই কাতর হয়। স্যাংগৈবেলার বন্ধু দুজনা। মহেশ রতনকে নানা লাভজনক কাজে ব্রতী করার চেষ্টা করে, কিন্তু রতন ভয়ে সিঁটকে যায়। অতঃপর মহেশ তাকে কলকাতা আনে, লাইসেন্স বের করিয়ে লোকাল ট্রেনে লজেন্স বেচার কাজ দেয়। ঘর ভাড়া করে দেয়, রতনের বউকে তিনটে ঠিকে কাজ ধরে দেয়। এভাবেই রতন মহানগরে ফুটিং পেয়ে যায়। দাস্ত স্কুলে যেতে থাকে, ও রতন তাতে অত্যুজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ মনশ্চক্ষে দেখতে দেখতে লজেন্স ফেরি করতে পারে। এভাবেই ওদের থিতু করে দিয়ে, হাতে এক স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন তুলে দিয়ে, মহেশ সহসা উধাও হয়। কারণটি বড় মর্মবিদারী ও মহেশের কাছে বোধাতীত। গত রেজিমে যে পুলিস তার দোস্তি ছিল, এবং "হম্ নেহী ছোড়েঙ্গে" গোছের অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল, এ রেজিমে সেই পুলিসই, "শালার মহেশ বৈরাগী কোথা?" বলে শোর তুলে দেয়। মহেশ দেখে, অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্রর দোস্তি অনেক সাচ্চা ছিল, এ দোস্তি কপট দোস্তি। মনোকষ্টে সে আটাত্তাঙা কলের ক্যাশ লুট করে উধাও হয়ে যায়। রতন একা পড়ে। তাতেও তার চলে যায় দিন। কেননা সহসা তার বউ এক বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে, স্ব-ডিসিশানে, স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়। গিন্নি ও গৌরী, দু মেয়েকে দু বাড়িতে খাওয়া-পরা, আট টাকা মাইনের কাজে দেয়। পাঁচ বছুরে মেনির হাতে দু বছুরে গণেশের দায়িত্ব তুলে দেয়, নিজে পাঁচ বাড়ি কাজে লাগে। সর্বত্রই সে সততার সঙ্গে কাজ করে ও প্রত্যহ ভাত-রুটি-পান্তা, কিছু না কিছু এনে সংসারের খাদ্যসমস্যা খানিক সমাধান করে, নিজের পাওনা পুজো ও শীতের কাপড় ছাড়াও, ছেলে-মেয়ের জন্যে চেয়েচিন্তে জামা-প্যান্ট আনে। সমগ্র পরিবারটি একমুখী আশায় বাঁচে। দাস্ত পড়বে।

দাস্ত পড়ে। স্ব-মেধাতেই সে ক্লিক হয়, এবং মায়ের চেয়ে আনা বড় শার্ট ও ছোট প্যান্ট, তালিমারা জুতো পরে তাকে স্কুলে যেতে-আসতে দেখে, পাড়ার এক প্রভাবশালী, প্র্যাক্টিস-সম্পন্ন, প্রভাতে লেকে দৌড়নো ডাক্তার-

জননী খুবই ইম্‌প্রেস্‌ড হন। ভদ্রমহিলার অগাধ বৈভব, অগাধ অবসর, বারান্দার ঝুলে পাকা ছাড়া অন্য কাজ নেই, এবং মাঝে মাঝে দয়ায় আপ্লুত হওয়া তাঁর স্বভাব। এক্ষেত্রে দয়া-বৃষ্টি যোগ্যক্ষেত্রে বর্ষিত হয় এবং তিনি যখন জানেন, উক্ত মেধাবী, পিলে-কোলা বালক তাঁরই ঠিকে ঝির ছেলে। তিনি খুবই অভিভূত হন। দাশুর সমস্ত বই, খাতা, স্কুল-ব্যাগ, এবং "হ্যাপি বয়" লেখা স্কুস-ব্যাগ, জলের রঙিন বোতল, রঙিন টিফিন বক্স, সবই কিনে দেন। দাশুর ঘরে বোতল ও বাক্স গৃহসজ্জা হিসেবে থাকায় গায়ে ঝোলে ও সেটি দেখিয়ে মেনি গণেশকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। দাশু পড়বে বলে গিন্নি ও গৌরীর পরঘরে দাসীত্ব, দাশুর মার অসুমার খাটুনি, রতনের রাত অবধি পরিশ্রম, কিছুই কারো কাছে অসংগত মনে হয় না, বরঞ্চ রতন অত্যন্ত গর্বিত ও সার্থক মনে করে নিজেকে। সন্ধ্যায় দাশু যখন বাড়ির একমাত্র হ্যারিকেন নিয়ে পড়তে বসে, তার মা প্রায়ান্ধকারে রাঁধে এবং রতন খুব মন দিয়ে "থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে" ইত্যাদি শুনতে শুনতে ভাবে, "ওঃ! দাশু কত পড়তেছে!" সে ওঁড়ো সাবানে দাশুর শার্ট-প্যান্ট নিজে কেচে দেয়, এবং জুতো কিনে দেয় নতুন।

দাশুর কাছেও এ-সকলই খুব স্বাভাবিক মনে হয়। বস্তি অঞ্চলের হাই স্কুলে পড়তে পেয়ে সে খুবই খুশী এবং সিক্সে ওঠার পর এসে সগর্বে বলে, "ফাস্‌ হইচি বাবা। যানাদের নামে ইস্‌কুল, তানাদের ছেলে সিক্সে পড়তে মরেছিল বলে, ফাস্‌ বয় মাসে পাঁচ টাকা জলপানি পায়, আমিও পাব।"

এ সংবাদে রতন ও তার বউ খুবই অভিভূত হয়। দুজনেরই মনে পড়ে মহেশের কথা। পুলিসে-মহেশে ভুলবোঝাবুঝি হয়ে লোকটা কোথায় যে গেল! আটা কলের মালিকের বা ক্যাশ খোয়া যেতে কি রাগ হল, মহেশের নামে ওয়ারেন্ট বের করে দিল। মহেশ ওদের এনেছিল বলেই ত সংসারটা দাঁড়াল। রতন বলল, "আর এ জলার ধারে থাকবু নি। ব্যাঙ মুতলে ঘরে জল দাঁইড়ে যায়। ঘর দেকে এইচি। নোব।"

শুকনো জায়গায় ভাল ঘর নেবার ইচ্ছে তার ফলবতী হয় না, কেননা চলন্ত ট্রেনে ভেণ্ডারে-ভেণ্ডারে মারামারি হবার ফলে রতন গড়িয়ে পড়ে পার্ক সার্কাস ষ্টেশনে, গুরুতর জখম হয়, ও স্যাশনাল মেডিক্যালে ভর্তি হয়। বাঁ পা উরু থেকে বাদ দিতে হয়, ক্রাচ নিতে হয়।

অপ্রত্যাশিত এ আঘাতে পরিবারটি ভেঙে পড়ে। রতনের বউ চুল ওঠা কপালে সিঁদুর পরা ফ্যাকাসে মুখ সাদা করে বসে থাকে। কয়েকদিন অবধরণ

অবস্থায় কাটে। রতন যে পোড়ো-পঙ্গু হয়ে গেল, সেই আক্রোশে ভগবান ভাগ্য-ট্রেন-ডেণ্ডার-বউ-মশা-আক্রা বাজারদর, সবকিছুকে গাল পাড়তে থাকে। তারপর বউ বলে, "অনেক তো পড়ল, দেশো একন কাজে নাগলে হত্ন না?"

এ-কথায় রতনের মাথায় প্রজ্বলন্ত লালচে বিভ্রান্তি কাটে। সে থম্ মেরে বসে থাকে ও বহুক্ষণ বাদে বলে, "ঘুরে এসতেছি এট্টু"

জনৈক সেবা প্রতিষ্ঠানের দয়ায় প্রাপ্ত ক্রাচ নিয়ে ও বেরিয়ে যায়, কি করে আসে, তা বলে না। পরদিনও সকালে বেরোয়, তার পরদিনও। তৃতীয় দিন জানা যায়, লাইনের ওপারে, ও জনৈক ভদ্রলোকের বারান্দায় বসে আলু বেচছে। পাঁচ কিলো আলুতে ঝাঁট দিয়েছে। লেগে থাকতে পারলে দশ কিলোয় উঠবে।

"অত দুরে কেন?"

এ-কথা শুধোতে রতন শুকনো ও কঠিন গলায় বলে, "পাড়ায় বসব, দেশো আসতে-যেতে দেকবে, সকলা ওরে বলবে কি?" বোঝায় যায়, তার মূল্যবোধে ট্রেনে লজেন্স ফিরি থেকে রকে আলু বেচা, অধঃপতনের সামিল।

বউ বলতে যায়, "বাপ আলু বেচতে পারে, ছেলে বেখলে ত্যাত দোষ?" কিন্তু বলে না। রতনের মুখে-চোখে আশাভঙ্গ-বেদনা-কঠোর প্রতিজ্ঞা, কিসের-কিসের যেন রেখা মুখের পাথরে গ্রাফ এঁকে রেখে গেছে। দেখে সে কিছু বলে না বটে, কিন্তু মনিববাড়ি যাবার কালে দু পাশের জলাভূমিকে হারা উদ্দেশ্যে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ওভগারের বয়স হল, একনো পড়লে ভাল হত্ন। কিন্তুক বাপ পোড়ো হয়ে থাকলে তবু পড়তে হবে? পড়ে কি হবে? চাগরি করবে?" এবং এই প্রথম তার অবস্থা মনে হয়, দাশুর পড়ার কারণে, দাশুর চেয়েও ছোট গিরি ও গৌরীকে খাওয়া-পরা কাজে লাগতে হয়েছে। মেনিকে পাঁচ বছরে গণেশ-জননী হতে হয়েছে। গণেশের বয়স দুই থেকে তিনে পৌঁছল, আজও ও দুধের স্বাদ কি, তা জানতে পেল না। দাশুর স্কুলের মাইনে বা বই-পত্র লাগেনি। কিন্তু এ-বয়স থেকে সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট স্কুলের পোষাক। জামা সাদা রাখা বড় কঠিন। স্কুলে বন্ধু-বান্ধব পাঁচদিন খাওয়ায়, ওকেও একদিন খাওয়াতে হয়। সবই সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবু বাপ ছেলেকে কাজ করতে দেবে না।

কাজ করতে ত দিল নাই রতন, উপরন্তু ছেলের পড়ার বিষয়ে সে হঠাৎ সাধ্যমত মনোযোগী হল।

"দেখো, তোর কোন্ ক্লাস হল রে ?"

"সেভেনে উঠব।"

"পাশ দিতে কদ্দেরি ?"

"টেন ক্লাসে এট্টা পরীক্ষা, তারপর বারো ক্লাসে আরেকটা।"

"ও বাবা !"

"তারপর কলেজ।"

"তা এত এত পড়া রয়েচে, তুই পড়িস না তো ? বিকেলে নাকি ঘুড়ি ওড়াতে যাস ?"

"নিপু বললে, ধরতাই দিয়ে যা !"

"না !" হঠাৎ ধমক মেরে চেঁচিয়ে উঠল রতন। বলল, "বিকেলাও পড়বি। নিপুর কি ? ও দেকেচে তু ফাস্ হস, তোরে বাঁশ দিতেছে।"

তারপর বলল, "এট্টা জামা পরে যাস্ কেন ? আজই আরেকটা জামা এনে দোব। আর হ্যাঁ, আজ থাকতে তুলে দোব, তকন পড়া ভাল হয়।"

দান্ত বাবাকে ভয় করে। তবু আস্তে বলল, "একন তো পরীক্ষা নি বাবা।"

"পরীক্ষা কি ? শুখেগো ছেলে, তুমি পড়বে বলে আমি খোঁড়া পায়ে বিশ্বভুবন ঘুত্তেছি, তুমি পরীক্ষা এলে তবে পড়বে ? আজে-দিনে পড়বে, বুজলে ?"

ক্রমে দান্তর পড়াই রতনের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। আলু বেচতে-বেচতে, বিকেলবেলা সে যখন তখন ঘরে চলে আসে, এবং দান্তকে খেলতে দেখলেই নির্মমভাবে মারে। মারার পরই ব্যথার জায়গায় পিদিমের পোড়া তেল মালিশ করে, দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা মিষ্টি খাওয়ায়, আবার এনে পড়তে বসায়। কাক-ভোরে তুলে দেয় ছেলেকে, পড়তে বসায়। ফলে পড়া বিষয়ে দান্তর মনে আতংক জন্মায় ও ক্লাসে খারাপ রেজাল্ট করতে থাকে। পরিণামে বাপের হাতে আরো মার খায়। বাপ মারে যেমন, তেমনি খাতা না ফুরোতে নতুন খাতা, জামা থাকতে নতুন জামা আনে, এবং দু পাশের জলাভূমির কচুরিপানাগুলির উদ্দেশ্যে বলে, "বেটা বলতে পারবেনি, বাপ পোড়ো হতে নিজের কোন অসুবিধে হইছিল, না চাইতে কোন পড়ার সামিগ্রি পায়নি।"

দান্ত বোঝে না, বাবার নিজের জীবন শৈশব থেকে ছিল অসুমার পরিশ্রমের জীবন। সে নিজে যা যা পায়নি, সবই দিতে চেয়েছিল ছেলেকে,

—পড়ার সুবিধে, ভাতের নিরাপত্তা, বইপত্তর। যতদিন বাবা কর্মক্ষম ছিল, ততদিন ছেলের জীবনে তার জীবনের দুঃসহ ভার চেপে বসেনি। দেখে সে আনন্দ পেয়েছে। এখন, পোড়ো হয়ে যাবার পর, ছেলেকে সে ঈর্ষা করছে। নিজে মাটিতে থেকে, ছেলের জীবনকে ঘুড়ির মত হাল্কা ও স্বচ্ছন্দ করে দিতে চেয়েছিল। আজ সে ছেলেকে ঈর্ষা করছে, নিজের কাছে, নিজের দুঃখ ও গ্লানি তারে কাছে পেতে চাইছে।

এত কথা দাশু বোঝে না। অপুষ্টিজনিত শরীরে মার খেয়ে খেয়ে তার মনে স্কুল-ভীতি জন্মায়। সিক্স থেকে সেভ্‌নে উঠতে থার্ড হয়েছে জেনে দাশু স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে না, পালায়। রতন স্কুল থেকে জেনে আসে দাশু থার্ড হয়েছে, এবং "আজ ওরে কেটে ফেলব" বলে নেচে নেচে চেঁচায়। ঘরে ফিরতে দাশুর মা বলে, "কাটতে হবে নি, তুমি কাটবে বলে সে পাইলে গেছে।"

"কোতা? কোতা পালাল?"

"জানি নি।"

এতকাল যে বউ চুপ করে সব দেখেছে আর সয়েছে আর অসাগর খেটে গিয়েছে, সে আজ দরজার দু কপাটে হাত রেখে দাঁড়ায় ও অন্ধকারের উদ্দেশ্যে চেঁচাতে থাকে, "যেতা থাকিস, ঘরে ফির না বাপ! চাঁড়াল তোরে কেটে ফেলবে। এত দুক্কের ধন আমার, যেতা থাকিস, প্রাণে বেঁচেবর্তে থাকো বাপ, ঘরে এসো নি। আমি জানতু, এই পড়া নিয়ে সব্বনাশ হবে। এক নাঙল জমিসায় একমাঠ চষতে গেলে এই হয়। কোমরের জোর নি, তুই কি পড়তে চেইছিলি? কাজ কল্লে এ্যাদ্দিনে সোয়সার দাঁইড়ে যেতু। জোর করে তোরে পড়ালে। এত ভাল কত্তেছ বাপ, তাতেও মন ওটে নি, নিরসংশ মার মারে, ও খেটে মত্তেছে, তুমি পড়তেছ, সেই রিষে। মা হয়ে বলতেছি বাপ, ঘরে এস নি আর!"

শেষ কথাগুলি বলে সে হা হা করে কাঁদে ও মেঝেয় বসে দরজায় মাথা কোটে। রতন খুব মন দিয়ে কথাগুলি শোনে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন পাড়াপড়শিও আসে, এবং চেতন গোয়ালা, রামলগন ছাতুওয়ালা, সবাই রতনকে বকতে থাকে। এমন ভাল ছেলে, সুশীল ছেলে, তাকে মেরে মেরে শেষ করছে কেন? কেন বা তাকে বাবু ইস্কুলে পড়ানো? সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট, সবই ভাল জিনিস। যাদের ভাল, তাদের ভাল। রতনের ছেলের পক্ষে তা ভাল হবে কেন? সোজা হিসেব, রতন সে ভার টানতে পারবে না।

একটি শার্ট, একটি প্যান্ট, বস্তেকটি বইয়ের ভার, পৃথিবীর ভার। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সে ভার রতনকে টেনে রাখবে, মাথা তুলতে দেবে না। এ-সকল কথার মাঝে রতনও হো হো করে কেঁদে ওঠে, ও সকলে তাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়। অবশেষে চেতন গোয়ালার চুল-লপেটা, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা ছেলে দিলীপ বলে, "কিছু শোচ না চাচী। কাল উস্‌কো নিশ্চয় লিয়ে আসব। যাবে কোথা ?"

সত্যিই কোথাও যায় না দাশু। পরদিন ভোররাতে তাকে কস্‌বার অসমাপ্ত ওভারব্রিজের নীচে নিদ্রিত দেখা যায় এবং সকাল সাতটা নাগাদ তাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

রতন, রতনের বউ, দাশু, মেনি ও গণেশ সবাই চুপ করে থাকে। বউ বলে, "কাটবে ? ইটি এনে দোব ? না দা আনব ?"

রতন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, "নাও, ভাত চড়াও। ওরে দাও, আমরাও দু গাল খাই। তা বাদে আজই যাব ওরে নে।"

"কোতা ?"

"লাইসেন্ করিয়ে আনব।"

"কিসের ?"

"কেন ? ল্যাবেন্‌চুষ বেচবে টেরেনে ? ও হুতে ছোট ছেলারা করচে, ও পারবে নি ? ও বলুক না, পারবে নি ?"

দাশু মাথা হেলিয়ে জানায়, পারবে। রতন বলে, "ঘাঁতঘোঁত শিকিয়ে দেব।"

দাশু সম্মতি জানায়, বাপের দিকে চায়, এক চাহনিতে পিতা-পুত্র চিরদিনের মত কাছাকাছি আসে ও একসূত্রে গ্রথিত হয়।

(নহবৎ ১৯৮০)

এইচ. এফ. ৩৭ঃ রিপোর্টাজ

মহাশ্বেতা দেবী

১। শুক্রবার ৬ঠা জুন পদ্মমণি কলকাতা পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল ওর বর, দেওর, চার ছেলে, তিন মেয়ে। এতগুলো লোক নিয়ে আজকাল কেউ দিদির বাড়ি এসে ওঠে না, দিদি যেকালে ঠিকে কাজ করে খায়। কিন্তু পদ্মমণির বর হঠাৎ আবাদের ওপারে বোনের সম্পত্তি পেয়েছে! গাঁ-বসতি তুলে সেখানে চলে যাবার আগে পদ্মমণি জেদ ধরল একবার তারামণিকে দেখতে কলকাতা আসবে। কলকাতা আসা কম খরচান্ত ব্যাপার নয়, এ কথা বলতে গিয়ে ওর বর মুখ শুনল।

আমার ছাগলের দুধ-বেচা টাকায় আসব যাব।

তাই ওর বর কিছুই বলল না। ওর দেওর বলল, এই দিনকালে দশটা মানুষ কোথা গিয়ে ওঠে? কী খাওয়াবে শুনি তোমার দিদি?

পদ্মমণি বলেছিল, সে গমিা আমার আছে।

পদ্মমণি বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমেছিল। সেখান থেকে লেকের রেল-বস্তি অব্দি হেঁটেই এসেছিল। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি কথা হল, পদ্মমণি কলকাতায় কখনো আসেনি। ওর বর বা দেওর এসেছে মাঝে-মধ্যে। কলকাতার পথঘাট দেখে ওর ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। দিদিকে মনে হচ্ছিল মহা সুখী, কিন্তু দিদির ঘর-বাসা দেখতেই তারামণির অবস্থা বুঝতে ওর দেরি হল না। তখনি পদ্মমণি বুঝেছিল তারামণির চেয়ে ও অনেক সুখী।

তখনি পদ্মমণি পেটকাপড় থেকে চালের পোঁটলা, গত-সনের জই থেকে এ-সনে ভাঙানো ছাতু নামিয়ে দিয়েছিল দিদিকে। তা ছাড়া মানকচু, তালপাটালি, একটা কুমড়ো। বরের গেঁজে থেকে বের করে এগারোটা টাকা।

এই এত দিতেছিস পদ্ম?

তুই তোকে দিতেছিস বল?

পদ্মমণি আর তারামণি হেসেছিল। তারামণিই বোনের বিয়েটা দিয়েছিল। ঘর-বসত করাবার সময়ে নিবারণের সংসার দেখে বলেছিল, জান্তলা সুখ হবে পদ্ম। যখন হবে, মনে জানবি দিদির জন্যে এত সব হল।

ক-দিন থাকবি, ও পদ্ম ?

সোমবার চলে যাব।

সোমবার যাসনি। কিসের মিছিল, কিসের বা ছাংনামা হবে।

তবে তার পরদিনকে ?

২। শনিবার, ৫ই জুন তারামণির প্রতিবেশিনীর ভাষায় পদ্মমণির 'অঙ শুনাইল, যম আইয়া বলল ওঠ্ ছেমরি চল্।'

ট্রেন আসে আর যায়, দেখে-দেখে পদ্মমণির আশ মিটছিল না। সেদিন ট্রেনে আর টাকে বাইরে থেকে লোক আসছিল, পদ্মমণি দেখছিল আর দেখছিল। লাইনের দক্ষিণে তারামণির বাসা। বাসার হাঁড়ি-বাসনও ট্রেন এলে গেলে কাঁপতে থাকে। লাইনের উত্তরে লেকা পদ্মমণির ছেলেরা, বর, দেওর, সবাই স্নান করছিল, হাতে কাপড়-গামছা নিয়ে পদ্মমণি লাইন পেরোতে যাবে, তখনি ট্রেন আসছিল।

সবুজে-ক্রীম রঙে সুন্দর, উদ্ধত, বেগবান ট্রেন। ট্রেন দেখে পদ্মমণি দাঁড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মাথায়, তারামণির প্রতিবেশিনীর ভাষায়, 'ঘোর চক্কর লাইগা ছেমরি পড়ল'। প্রতিবেশিনী বয়েসে রাবণের মা নিকষা। সাত ছেলের মা পদ্মকে ও কাল থেকেই 'ছেমরি' বলছিল। ঘুরে পদ্মমণি লাইনের পাশে খোয়ায় কপাল ঠুকে পড়ে ও কপালাস্থিতে বাড়ি খায়। সে আঘাতের খা করোটির ভেতর সযত্নে রাখা-মস্তিষ্ককে দমকলের ঘন্টা বাজিয়ে ভয় খাইয়ে দেয়। মহাশিরা ও অন্য রক্তবাহ শিরা ছিঁড়ে মাথার রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়। পদ্মমণির মস্তিষ্কের রক্ত-সংবহন ব্যবস্থা এমন ভয় খেয়ে যায়, যে কান দিয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে গলগলিয়ে। দুর্ঘটনা ঘটে সকাল ন-টায়।

তারপর ভয়ার্ত বিপন্ন তারামণি আর পদ্মমণির দিশাহারা বর পদ্মমণিকে নিয়ে দক্ষিণের হাসপাতালে যায় কিন্তু 'এখানে এ-সব কেস ভর্তি হয় না' তাড়া খেয়ে প্রথমে তারা 'ধরা কর বাবু গো' বলে মাথা কোটাকুটি করে, তারপর পদ্মমণিকে নিয়ে ধর্মপিতাদের হাসপাতালে আনে বেলা তিনটেয়। রাত ন-টায় পদ্মমণি আর পদ্মমণি থাকে না। এইচ, এফ, বয়স ৩৭ ; হিন্দু ফিমেল : ৩৭ ভর্তি হয়। প্রতিটি ওষুধ ইঞ্জেকশনের জন্যে টাকা চাওয়া হয় ও বলে দেওয়া হয় বেডের টাকা কম করতে হলে সকালে এসে কর্তাদের ধরতে হবে।

৩. রবিবার, ৬ই জুন সকালে এইচ, এফ, ৩৭কে তারপর ফোঁড়াফুঁড়ি,

খোঁড়াখুঁড়ি চলে ও তারামণি মনিবদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ওষুধ-ইঞ্জেকশনের টাকা তুলতে থাকে। পদ্মমণির বরকে বুক ও মাথা চাপড়াতে দেখে কর্তৃপক্ষ টাকার অঙ্ক কমিয়ে দেন বেশের। তারামণি ও পদ্মমণির বরের মুখে পদ্মমণির আঘাত লাগার কথা শুনে লেখা হয় এইচ, এফ, ৩৭ অ্যাডমিটেড। এমার্জেন্সি কেস। ট্রেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'ট্রেনের গায়ে লাগেনি গো বাবু। শরীলে কোতা কাটেনি দ্যাকো—তারামণির বিলাপ শুনে ভর্তি-বাবু কিছুমাত্র বিচলিত হন না। খেঁকিয়ে বলেন, 'ট্রেন না এলে মাথা ঘুরে পড়ত কি?' কিন্তু তারপরই, তারামণি যখন ফুটপাথে অবসন্ন হয়ে বসে থাকে, তার মিস্তিরি ছেলে বলে, 'সর্বনাশ করে এলে? মাসি যদি মরে, তবে কী হাংনামা হবে ভেবে দেখেচ? ও কথা কেউ লেখে? বলতে হয় কলার খোসায় পা পিছলে গেছল, নয় তো হোঁচট খেয়ে পড়েছে।'

তারামণি সে কথা শুনে হাপুসে কাঁদে আর বলে, 'বুদ্ধি হরে গেল যে ও বাপ! মরবে বলতেছ কেন?'

পদ্মমণির বর, 'উ কি বলতেছিস' বলে আরো বিশ্রী ও অসভ্যভাবে কাঁদে। যেন পদ্মর বোনপো 'মরে' বলেছে বলেই পদ্মমণি মরবে। হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে ও এবং তারামণি দুজনেই কাঁদতে থাকে কপাল চাপড়ে। তারামণির ছেলে ডাক্তারের লেখা কাগজ নিয়ে ওষুধ কিনতে ছোটাছুটি করে ও বিয়াল্লিশ টাকা জোগাড় করতে পারে না কিছুতে। ওষুধ না নিয়ে হাসপাতালে ফেরা ঠিক হবে কি না ও ভেবে পায় না, ওর বয়েস মাত্রই সতেরো। আবার পারে-পায়ে ও ডাক্তারের কাছে ফিরে আসে এবং আরেকজন ডাক্তার আরেকটি প্রেসক্রিপশন ওর হাতে ধরিয়ে দেন। এবার ও তেইশ টাকা জোগাড় করে ওষুধ কিনে ফিরে আসে। তারামণি কান্না থামিয়ে পদ্মর বরকে বলে, 'অ্যাত ট্যাকার ওষুধ দিতেছে। নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে।' ওরা দুজনেই ফুটপাথে ছায়া খুঁজে নিয়ে শুয়ে থাকে, শুয়েই থাকে। তারামণির মিস্তিরি ছেলে ওদের কাছে এসে বসে বটে, কিন্তু কথা বলে না।

সময় যায়, সময় যায়, মাঝে-মাঝে পদ্মর বোনপো ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসে। এই ভাবেই রাত হয় রাত ঘনায়।

রাত দেড়টায় পদ্ম মরে যায়। এইচ, এফ, ৩৭ একসপায়ার্ড অ্যাট ওআন এ. এম. অফ·····। এই সার্টিফিকেটটি পরদিন লেখা হয় ও থানায় পাঠানো হয়।

৪. রবিবার ৬ই জুন, সেই রাতেই পদ্মর বোনপোকে ডাক্তার বলেন, কাল লাশ পেয়ে যাবে। পুলিশ কেস হবে না।

কিন্তু সোমবার, ৭-ই জুন জানা যায় ময়না না করে লাশ ছাড়া হবে না। ভোরবেলাই খবর জানা যায় এবং থানা থেকে খবর না আসা অব্দি কিছুই করা সম্ভব নয় বলে ডাক্তার পদ্মর বোনপোকে তাড়া মারেন।

রাতে যে বলেছিল লাশ পেয়ে যাবে সেও ডাক্তার। এখন যে বলছে লাশ পাবে না সেও ডাক্তার। সন্ধের যে বিয়াল্লিশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার, রাতে যে তেইশ টাকার প্রেসক্রিপশন লিখেছিল সেও ডাক্তার। পদ্মর বোনপোর সব দেখে ধাঁধা লেগে যায়। যদিও ও বাবরি ও জুলপি রেখেছে, এবং অত্যন্ত ময়লা গেঞ্জি ঢেকে নকল টেরিলিন পরে আছে, তবুও ভদ্রলোক, বাবু, এদের সমীহ করে চলা ওর রক্তের অভ্যেস।

একই সঙ্গে, থানা-পুলিশকে ভয় করা আয়ত্ত-করা ওর অভ্যেস। এখন ওর মনে পড়ে যায় গোপাল আলুওয়ালা সুবাসীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ফলিডল খাওয়ার পর লাশ বের করতে, ওর ভাষায়, 'ডমকে' টাকা খাওয়াতে হয়েছিল। বর্তমানে ও টাকা পয়সায় নেহাৎ কাহিল। মা তারামণিও মনিববাড়িতে-বাড়িতে এমন কোন গুডউইল তৈরি করতে পারেনি যে ঘুষ দেবার টাকা পেতে পারে। মেসো যথাসর্বস্ব ত্রিশ টাকা বের করে দিয়ে বলে, যা পার কর বাপ মোর। তুমি শউরে ছেলে। মোরা গেঁয়ো মুখ্যু। সাঁঝ হবার আগে শ'সই না করলে সকনাশ হবে।

'সর্বনাশ!' তারামণির প্রতিবেশিনী গভীর তৃপ্তিতে টেনে বলে। পদ্মর মৃত্যুসংবাদ জেনেই ও সকাল-সকাল পদ্মর ছেলেমেয়ে দেওর সবাইকে নিয়ে এসে পড়েছে। তারামণির দেশ-ঘরের যত ঝি আশে-পাশে কাজ করে, সবাই আসে। প্রতিবেশিনী বয়সে নিকষা হয়েছে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশি। তা ছাড় কালীঘাটে এক ধনী-পুরুত বাড়ীর বউরা বুকের গড়ন নষ্ট হবে বলে ছেলেদের দুধ খাওয়াত না। ওর দুধে মানুষ ছেলেরা এখন দলপতি, নেতা, মিসায় আটক, বেনামী শুঁড়িখানার মালিক। অতএব মৃতাশৌচ সংক্রান্ত সব খবরই ও জানে।

ও বলে 'সর্বনাশ! দাহ না অইলে ছেমরি তোমার পাছে ফিরব। পোলাপানগো কাছে চাইব।' এ কথা শুনে সকলেই কাঁদে। বুক চাপড়ায়। পদ্মর বোনপোকে বলে, 'বেবস্থা কর বাপ।' বোনপো থানায় যায়। মেসো ও মেসোর ভাই থানার বাইরে বসে থাকে। বোনপো ঢুকে যায়।

৫. সোমবার ৭ই জুন সকালে থানাবাবুর মুখে-চোখে প্রসন্নতা, পরা, মানবিক বিবেচনা খেলা করতে থাকে কেন না তিনি জানেন, যে সব কথা দিচ্ছেন, তা তাঁকে রাখতে হচ্ছে না, অচিরে তাঁর ডিউটি শেষ হবে আটটার পর থেকে অন্য ডিউটি। আজ সব মন্ত্রী ও মাতব্বর লোকরা মিছিল করে বেরোবেন। সারাদিন কলকাতায় শান্তিপূর্ণ মিছিল চলবে। অতএব সমস্ত পুলিশ সকল লালপাগড়ী গাড়ি দমকল আজ অর্জুন, মিছিলটি তাদের একাগ্র দৃষ্টি ও মনের সামনে মাছের চোখ।

তিনি আরো জানেন, দুটোর পরে লাশ পৌঁছলে সরকারি নিয়মে সে লাশ ময়না হয় না, ডাক্তারও মানুষ। শহরের কল্যাণে প্রত্যহই ডাক্তারকে বহু লাশ ময়না করতে হয়। হিম-কুঠরিতে লাশ জমেই থাকে তিনি জানেন, এইচ. এফ. ৩৭ আজ ময়না হতে পারে না। তাই তিনি স্নেহবিগলিত কণ্ঠে পদ্মর বোনপোকে সান্ত্বনা দেন ও আগেই আঁচ করে নেন, এর দ্বারা এ-পকেট ও-পকেট ফুটকিফাটকি সম্ভব নয়। আজকাল এই দরিদ্র দর্শনধারীদের বিশ্বাস করা গোখুরি। এরাই দশজন ছেলে ও এম. এল. এর চিঠি এনে হাজির করতে পারে।

তাই তিনি, একেবারে কেতামত কথা বলতে থাকেন, আইন বাঁচিয়ে। এখন আর তেমন সর্বনেশে দিন নেই যে টেবিলের সামনে অচেনা ছেলের ছায়া পড়লে চমকে আঁতকে পকেটে হাত দিতে হবে। সে-সময়ে যুবকদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বললে তাতে আন্তরিকতা থাকত না। এখন তাঁর কথা-বার্তা কেতামাফিক হলেও আন্তরিক। তিনি মানুষ হিসেবে ভালই। তা ছাড়া, আজকাল, নতুন জ্যোতিষীকে দিয়ে, বিলডিং তৈরির সময়কে লম্বা সময় ধরে নিয়ে, এই থানা-বাড়ির কোষ্ঠীপত্র করিয়ে নেবার পর থেকে— এ থানাবাড়ির বৃহস্পতি এখন তুঙ্গী, তা জানার পর থেকে— এখন তিনি থানায় ঢুকলেই বাতাসে, ঘাম-রক্ত-মূত্র-সিগারেটের গন্ধে, পরমা শান্তির ভাসমান অস্তিত্ব টের পান। আশ্চর্য এই অদৃশ্য 'অ্যুরা' বৎসলা জননী হয়ে তাঁর অন্তরের অন্তরকে কী যেন মুখে দিয়ে শান্ত করে ফেলে।

মনের ভেতরে সেই পরমা শান্তি ফোঁটায় ফোঁটায় উছলে পড়ে। চোখ চাইতেই ধুলোমাখা ফাইলের চারপাশ ও কোনা-কানাচ থেকে লক্ষ্মী, গণেশ, কালীর ছবি দেখতে পান থানাবাবু। তিনি পদ্মর বোনপোকে বলেন কী বলছ বল ?

আজ্ঞা, ময়না না করলে……

তা কি হয় বাবা ? ময়না কত্তেই হবে। নয়তো আমাদের মহাবিপদে পড়তে হয়।

ময়না কত্তে টাইম চলে যাবে।

আহা, হাসপাতালের খবর আমরা পেয়ে গেছি। টাইম যাবে কেন ? আর গেলই বা। মরা মানুষ ত ফিরে আসবে না। বাস্ত কেন ? মঙ্গলবার পেয়ে যাবে।

আজ্ঞা, রবিবার মরেছে, মঙ্গলবার হলে তিনদিন হয়। তা ত হলই।

অপঘাতে মিত্যু ত ! মড়া বাসি হলে দোষ পায়, শান্ত শান্তি তাড়াতাড়ি সারা দরকার।

সি কি। বামুনের মড়া ত নয় !

আমার মেসো হরি সংকীর্ত্তন গায়। উনির সকল কাজ বামুনের নিয়মে।

থানাবাবু বোঝেন এ ছেলেটি নেহাৎই বিভ্রান্ত, দিশাহারা। কেমন যেন মনে হয়, এর পেছনে দলবল নেই। বোধহয় ছেলেটা একা। আবার ওঁর মনে দয়া উছলে উঠে আসে। সহৃদয় মমতায় বলেন, দেখ, পুলিশ হলে কি হয়। দয়ামায়া এ সব ক্ষেত্রে সবাই করে। হট করে ময়না সারা কি আমার হাতে ? আগে রেলপুলিশের অনুমতি চাই।

রেলপুলিশ কেন ?

বা, মড়া ত এখন রেলপুলিশের সম্পত্তি। দেখ, তুমি শেয়ালদা চলে যাও। রেলপুলিশের কাছ থেকে চিঠি এনে আন। ইদিকে আমরা হাসপাতালে বলে কয়ে রাখব। তোমার হাতে রেলপুলিশের চিঠি পেলে তবে আমরা সরেজমিন ইংকুয়েষ্ট করে লাশ কাঁটাপুকুর পাঠাব।

আজ হবে সব ?

নিশ্চয় নিশ্চয়। দেখো, বিকেলের মধ্যে লাশ ময়না হয়ে পেয়ে গেছ।

পদ্মর বোনপো কাল সকালথেকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছে আর ঘুরছে। এখন ওর শরীরে ঝিম মেরে আসে, পেটের ভেতর নাড়ীগুলো পাকায়, পেঁচিয়ে ওঠে, জড়ায়, পাক খোলে। এখন একটু ঘুমোতে পারলে শরীর বাঁচত কিন্তু মেসো ও মেসোর ভাইয়ের অগাধ বিশ্বাসের উক্তি 'তুমি শউরে ছেলে, সব জান', ওর ওপর যেন আরো গুরুভার দায়িত্ব তুলে দেয়। এইচ. এফ. ৩৭ যেন যাত্রাদলের অধিকারী। ওর ওপর এক বয়স্ক, অভিজ্ঞ, জ্ঞানু, এলেমদার, চালু, হয়কে-নয় করবার ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের ভূমিকা সেই

অধিকারী চাপিয়ে দিয়েছে। অতএব ও যে ঠিকে ঝিয়ের হতভাগা আধ-ভাতার হাফমিস্তিরি ছেলে, সে কথা ভুলে গিয়ে আরোপিত ভূমিকার কাজ করতে থাকে। মেসোদের বাসায় পাঠিয়ে দেয় ও। বলে, আমি আছি, ভাব কেন? যেয়ে চান কর, যা হয় খাও।

ও নিজে এক কাপ চা ও দুখানা লেড়ো বিস্কুট খেয়ে নিয়ে শেয়ালদা চলে যায়। কিন্তু প্রথমত ও জায়গাটি চিনতে পারে না। তারপর ট্রেনের পর ট্রেনে শুধু মিছিলধারী জনতা আসছে বলে ভিড় ঠেলে ঢুকতেও ওর দেরি হয়। এই সময়েই বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

রেলপুলিশের থানাবাবু প্রথমে, ক্যা……? বলে হাঁকড়ে ওঠেন, কিন্তু হাঁকড়ানির পরিশ্রমে ঘাম গলগলিয়ে বেরোয় বলে পার্বতীর ভূমিকায় তামিল অভিনেত্রীর উত্তুঙ্গ চেহারা-আঁকা ক্যালেণ্ডারের দিক চেয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়েন, ঝিমিয়েই থাকেন। তারপর বলেন, বাতি জ্বলুক, পাখা চলুক, নইলে কাজ করতে পারব না।

পদ্মর বোনপো বলে, থানা থেকে যে পাঠিয়ে দিল।

দিক গে। এ কি তাদের মড়া? আমাদের মড়া, আমাদের সুবিধেরু কাজ হবে। বুঝেছ বাপ?

মড়া বাসি হচ্ছে বাবু।

যাও যাও বাইরে যাও।

দুটোর পরে কাঁটাপুকুরে লাশ নেবে না।

কে বললে? থানায় বলেছে বুঝি? কাঁটাপুকুরের টাইম আমায় দেখাচ্ছে। কাঁটাপুকুরে হপ্তাই কটা লাশ আমি পাঠাই জান? আমাকে কাঁটাপুকুর দেখাতে এসেছ?

বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয় একটায়। দেড়টায় ছেলেটি একখানা কাগজ পায়: ময়নার পরই এইচ. এফ. ৩৭ এর লাশ আত্মীয় বৈরাগীচরণ নাইয়াকে দেওয়া যেতে পারে! মে বি স্থানডেড ওভার……

আড়াইটেয় ছেলেটি থানায় গিয়ে কাগজটি দেয়। ডিউটি-বদলি অঙ্ক থানাবাবু, থানার সকলে এখন বেজায় ব্যস্ত। শান্তিপূর্ণ মিছিল সুরু হয়ে গেছে। এখন সকলের মন-প্রাণ-কাণ-চোখ অর্জুন। মিছিলের খবর মীনচক্ষু। থানাবাবু বলেন, কাগজ এনেছ, রেখে যাও। মঙ্গলবার খোঁজ করবে।

ছেলেটি বোঝে এইচ. এফ. ৩৭-আরোপিত ভূমিকার প্রতি সে সুবিচার

করতে পারল না। সহসা কেঁদে ফেলে ও। সতেরো বছরের বয়ঃসন্ধি পেরনো, চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটিকে কাঁদবার সময়ে ভারি বিশ্রী দেখায়।

থানাবাবু, ওরে বাবাঃ, বলে চেঁচিয়ে হেলান দিয়ে বসেন।

বলেন, দেখ! হবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এক করতে পার।

কি কাজ?

আলিপুরে পুলিশ কেস হাসপাতালে মেয়ে ডাক্তারবাবুর হাত পা ধরে ঝুলে পড়। এখন ময়না হয় না। তবে যদি উনি রাজী হন, তবে আমরা লাশ কাঁটাপুকুরে কাল সকাল ন-টার মধ্যে পাঠাব।

আচ্ছা, আজ হয় না?

না না, আমাদের লোক যাবে, সরেজমিনে ইংকুয়েষ্ট করবে তবে ত!

সকালে বাবু বললেন……

যাও, যাও, মেলা দেরি কর না। আর দেখ, ডাক্তার কি বলেন, এখানে বলে যেও। তোমাদের কি! যত……।

ছেলেটি এখন বোঝে, ভিনটে বাজতে চলল, আলিপুরে ওকে হেঁটেই যেতে হবে। এক-কেরতা হেঁটে গেলে ফিরে-কেরতা ও বাসে ফিরতে পারবে। দুবারের ভাড়া দিলে জুলবে না। তাই ও প্রখর রোদে, গলন্ত পিচে সস্তার হাওয়ায় চটি ছটকে চলতে থাকে। ওর মাথা ও শরীর দিয়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কখনো আসে, কখনো মস্তিষ্কে লোডশেডিং হয় ঘন-ঘন। কাল থেকে পেটে দানা নেই, কয়েকবার চা ও লেড়ো বিস্কুট খেয়েছে শুধু, কিন্তু কিছুতে ও এখন বেরতে পারে না। চক্রব্যূহে ধৃত। ওকে ভেতরে ঢুকতেই হয়, ঢুকে চলতেই হয়।

পুলিস-কেস হাসপাতালে ও ডাক্তারকে প্রথম দেখতেই পায় না। ময়লা, ধুলো-ওড়া বারান্দায় কজন তাস পেটে। চারদিকে আবর্জনা। কিন্তু সমানে কেস আসতে থাকে, মাথা ফাটা, হাত ভাঙা, পাঁজরে চোট। এত কেস কিসের, বলতে গিয়ে ও ধমক খায়। থামে ঠেস দিয়ে চেয়ে থাকে, এবং গোপাল আলুওয়ালার মৃত্যুজনিত ব্যাপারে সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে ডাক্তারের চেহারা চেনা আছে এই ভরসায় ঘন-ঘন চারিদিকে চাইতে থাকে। ডাক্তারকে দেখেই ও গিয়ে সামনে বসে পড়ে ও কাতরে বলতে থাকে, বাবু! ডাক্তারবাবু!

ময়না-পার্টির লোকজন দেখে দেখে ডাক্তারবাবু মানুষের কাছে আর মানুষী ব্যবহার আশা করেন না। ছেলেটিকে তিনি কাঁদতে দেন।

তারপর ওর প্রার্থনা শুনতে থাকেন। সব শুনে এখন ধীরে, শিস্ত ভুলিয়ে বলেন, এখন ময়না করতে হলে, ডোমদের ত ছুটি! বুঝলে কি না, ডোমদের খবর দিতে হবে, মদ খেতে পঞ্চাশ টাকা!

গোপালের বেলা ডমদেরকে পনেরো টাকা দিছলাম আমরা।

সে কবে?

বচর ঘুরে গেছে।

এখন কি আর তাতে ওরা মানবে? গরিবকে টাকা ধসাব মিছেমিছি, সে আমার পছন্দ নয়। এখন দাহ আছে, শ্রাদ্ধশান্তি আছে। দেখ! থানায় বল গে! লাশ যেন পৌঁছে যায়। মঙ্গলবার দিনকে আমি আদালত থেকে আসতে বেলা একটা বাজবে। সে সময়ে তুমি এখানে থেক। তখন আমি যাব। বরঞ্চ, দুটোর মধ্যে, সবচে আগে তোমাদের লাশ ময়না করে দেব। যাতে করে সাঁঝের মধ্যে সব সেরে আসতে পার।

অপঘাত মিত্যু কি না!

এর আগে হয় না।

ডোম যদি রাজি হয়?

দেখ! টাকা যদি জোগাড় হয়, সন্ধের আগে আমার কাঁটাপুকুরে যেয়ে জানিও। ডোমদের বলতে ত হবে।

ছেলেটি এখন থানায় ফেরে। ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজে। ওর কথা শুনে থানাবাবু বলেন, কাল ন-টার মধ্যে লাশ পেলে ডাক্তার ময়না করবে? বেশ! ও জিতেন! জিতেন!

একটি শক্ত-সমর্থ, আস্থাবান চেহারার যুবক এসে দাঁড়ায়। গায়ে ঘন নীল জামা গায়ে সেঁটে আছে, চোখ রক্তাভ, দৃষ্টি উদ্ধত।

কি বলছেন?

কাল সকালে দুটো, না, তিনটে লাশ আনতে হবে।

হবে না।

কেন?

ডাক্তার ময়না করবে না।

করবেন বাবু, বলেছেন করবেন।

আজ এতক্ষণ অব্দি লাশ-বওয়া ভ্যান ওদিকে আটকা ছিল। আমারও কাল ডিউটি নেই।

থানাবাবু কী যেন ওকে বলতে থাকেন, জিতেনকে। ছেলেটির

আচ্ছন্ন চেতনা ও শ্রবণে রেলবস্তি·····"— "র এলাকা·····"—"মিত্তির আজ নয় মিছিলে যাত আছে, কা...সেবার সেপ্টেম্বরে···শঙ্খগুলি লুকোচুরি খেলতে থাকে। হঠাৎ জিতেন বলে, ঠিক আছে যাব, কাল কাঁটাপুকুরে লাশ চলে যাবে। কিন্তু তিনটে কিসের ?

এদের কেসটা রেলপুলিশের, একটা জলে-ডোবা, সেই পচা-চোলাইয়ের লাশটা, তিনটেই ত হল।

জিতেন বলে, লাশ যাবে, তা হাসপাতালে ঠাণ্ডাঘরে ছিল, ভাল থাকত। যদি কাল না হয়, মড়ার গাদার মধ্যে কাঁটাপুকুরে, ইঁদুরে চোখ খুবলে খেয়ে নেবে তা জান ?

না বাবু ! তা যদি হয়

পরে মড়া গেলেই ভাল ছিল, এই ত ? না, জিতেন দোলুইয়ের এক জবান ? কালই যাবে লাশ।

ছেলেটি থানা থেকে বেরোয় ছ-টার পর। এখন ও সাদার্ন অ্যাভিনুর সুখবিলসিত, আলুলায়িত, সুখী ও সুন্দর জনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত বুক ধরে চলতে থাকে। এখন গিয়ে ভাঁটিখানার পাড়ার হর্তা-কর্তা-পাতা ও ত্রাতার কাছে ধর্না দিয়ে এইচ. এফ. ৩৭ যাতে নিঃসঙ্কুলে ভিখিরির মত নিখরচায় বাহ হতে পারে, ঘাটবাবুর নামে একখানা সুপারিশ চিঠি নেবে।

বাড়ি ফিরবার আগে অবধি ওর ধরণা থাকে ও চক্রব্যূহের ভেতর আছে, এবং একটি ট্রেন— হাসপাতালের সারি-সারি ডাক্তার—থানাবাবুরা—রেলপুলিশ—ময়না ডাক্তার—জিতেন দোলুই, এরাই কৌরব।

বাড়ি ফিরে বোঝে কৌরবদের দলবদ্ধতা অতি পাকা বনেদে বাঁধা। কেন না ও যখন বলে, মঙ্গলবারের আগে হচ্ছে না—তখনি সবাই হাউমাউ করে ওঠে।

তারামাসির প্রতিবেশিনী বলে, তর না তর এত চিনা, এত জানা ? মরছে রবিবারে, সৎকার হইতে মঙ্গলবার ?

ছেলেটির মা, মেসো, মেসোর ভাই, সবাই ওকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় আক্রমণ করে। ছেলেটি অবসন্ন ক্লান্তিতে রাগবার শক্তিও খুঁজে পায় না। আজ মিছিল ছিল বলে ভ্যান ছিল আটকা। রেলপুলিশের কাছেও দেরি হল। এ-সব কথা বলতে তার রুচি হয় না। এইচ. এফ. ৩৭ তাকে যে ভীষণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করেছে, ছেলেটি বোঝে, এরা ভাবছে ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব পালনে ফেল করেছে। ছেলেটিও সারাদিনে ভেবেছে ও ফেল

করেছে। কিন্তু এখন ও, এই শোকাহত, মূঢ়, নির্বোধ, প্রেতভীত মানুষগুলির দিকে চেয়ে বোঝে, না, ও সে-ভূমিকার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। ও যা করেছে, তা কর্মবীরের যোগ্য কাজ। যত পথ হেঁটেছে, যত দরকার করেছে, যত দরজায় ঘা মেরেছে, তা সামান্য মানুষ পারে না। এখন ওর ক্ষুধার্ত, আচ্ছন্ন, অবসন্ন চেতনায় মনে হয়, এইচ. এফ. ৩৭ বুঝি বা সর্বশক্তিমান। ওকে দিয়ে এত সব কাজ করিয়ে নিল। ওর খুব মনে হয়, মা অন্তত, কিছু খা, হাতে-মুখে জল দে, বলতে পারত। কিন্তু মা কিছু বলে না। মনে হয়, চিরকাল মা, ও যা-যা পারেনি তা নিয়ে অন্ধ আক্রোশে ওকে বেঁধে। ও কিন্তু তারপরও মা ব'লে, বোন ব'লে, টাকাকড়ি সর্বস্ব এনে-এনে দেয়। এ জন্যে ওর এই একতরফা ভূমিকা। কিছু না বলে ও উঠে পড়ে। 'সী দ্যাট এইচ. এফ. ৩৭ হ্যাজ এ পপার'স ফিউচেরাল' লেখা কাগজটি বের করতেই হবে। কাল দাহ সেরে ঘুমনো যাবে

কোতা যাস, টাকা দে বা!

তারামণি চেঁচিয়ে বলে। ছেলেটির সহসা মনে পড়ে, এত হেঁটে বেড়াল, কই, মেসোর দেওয়া তিরিশ টাকা ওর শার্টের ভেতরে পকেটে পলিথিনের ঠোঙায় মুড়ে সেপটিপিনে যেমন আঁটা রয়ে গেল, মনে পড়েনি ত?

ও বলে, টাকা বাক মঙ্গলবার খাটিয়া কেনা আছে।

দে বা!

ও নীরবে টাকা বের করে দেয় ও এক গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে বেরিয়ে যায়। বোন চেঁচিয়ে বলে, মিত্তিরি নোক পাটোছিল দাদা! কেন আসনি শুধোচ্ছিল।

ছেলেটি কোন উত্তর করে না।

৬। সোমবার বই জুনের মধ্যে পদ্মমণি, তারামণির গাঁ-জেয়াতি আরো পাঁচজনা এসে পড়ে। বহু জনের কথায়, আলোচনায় বাদ-প্রতিবাদে ক্রমে ছেলেটির বিষয়ে গভীর অবিশ্বাস রচিত হয়। মেসোর তাই বলে, বা করছে সকল একা। মোনের কিছু বলে নে কেন?

তারামণি বলে, চেরকাল একোরকম অইল।

মেসো বলে, ডাক্তার বলেছে বেলা এট্টায় যাবে, তা কি হয়? এট্টায় যাবে? তকন গেলে অতগুলোন লাশের চেরাই ফাড়াই হয়।

তারামণির প্রতিবেশিনী বলে, তা কি অয়? বাবা, লাশ ঘরের নিয়ম,

বাতি জ্বললে লাশ কাটব না। সূর্য থাকতে থাকতে হকল সারা চাই। অহন একটা কইছে, না আটটা, কে কইব? আমি কই, তোমরা বিয়ান অইতে গিয়া বইয়া আছ। ছেমরার কথায় বিশ্বাস কি?

সোমবার ৭ই জুন, ছেলেটি নিখরচায় দাহ করবার সুপারিশ চিঠি জোগাড়ে আরো বহু পথ হাঁটে ও শেষে জোগাড় করে।

৭। মঙ্গলবার ৮ই জুন, ভোর না হতে পদ্মর বর, দেওর, বড়-মেজ দুই ছেলে, জ্ঞাতিগুষ্ঠী, তারামণি, তার প্রতিবেশিনী, সবাই গিয়ে কাঁটাপুকুরে বসে থাকে। ছেলেটি ওদের নিরস্ত করতে পারে না, ও একসময়ে রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে লেকের ধারে গাছের নিচে পড়ে ঘুমোয়। ওর ওপর পুষ্পিত বকুল পুষ্পবর্ষণ করে, ও গগনবিহারী চিল সপ্রেমে চাইতে থাকে, জলগন্ধী বাতাস ওর কপাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

বারোটায় উঠে পড়ে, লেকের জলে চোখমুখ ধুয়ে, প্যান্টের ওপর গামছা বেঁধে ও হাসপাতাল যায়। ডাক্তার একটার বদলে সাড়ে তিনটেয় আসেন। তারপর কাঁটাপুকুর। এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশই প্রথমে বেরোয়। 'উইদিন সামসেট!' ডাক্তার বাক্তিনিরপেক্ষে নিরুদ্দেশকে ঘোষণা করেন! তারপর ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। দরজার ফোকর দিয়ে না দেখে ছেলেটির বিফল-যুধ্যমান কর্ণের মত অস্তমান সূর্যকে লক্ষ করা উচিত, তবু ও দেখতে থাকে। এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশের চেহারা বড় সুন্দর মনে হয়। সুন্দর মনে হয়। শুধু পায়ের নিচে যেন সাদা চুনের ডোরা-কাটা।

লাশ হাতে পেলে বোঝা যায় পিঁপড়ে চোখ খায়নি, কিন্তু লাশঘরের ইঁদুর যাধিকারবলে পায়ের নিচের মাংস সযত্নে কুরে খেয়ে অস্থিকাল উদলা করে রেখে গেছে। লাশ খাটিয়ায় তোলা হয়।

এইচ. এফ. ৩৭-এর লাশ অবশেষে নিখরচায় বিদ্যুৎচুল্লিতে ঢুকে যায়। ছেলেটি এখন উত্তরে হাঁটে। কার্তিকঘাটের কোনো পুরুত, দাহ হতেই অপঘাত মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত-শ্রাদ্ধ সেরে দেবে। দর কষতে হবে।

সব সেরে ফিরতে রাত দশটা বাজে।

বুধবার, ৯ই জুন স্বর্গাত প্রত্যুষে পদ্মর বর, দেওর, সবাই দেশমুখো ট্রেনে চাপে। একটু বেলায় কাজে গিয়ে ছেলেটি জানে বিনানোটিশে কামাই করার জন্যে ও বরখাস্ত হয়েছে।

সমতট ১৯৭৭

সমাজবাদ ববুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

শীতের সময় নয়, বর্ষা কাটে, কাটে ক্যালেণ্ডারে। এমন সময়ে উলটোপালটা ঝড়জল শিলাবৃষ্টিতে চাষীর ঘরে মাথায় হাত, আর বাতাসে দাঁত গজিয়ে গেল।

রাত এগারটায় নির্জন হাইরোডের ধারে লোকটা তার ছই দেয়া টাট্টু-টানা অদ্ভুত বেতো গাড়িতে বসে কাঁপছিল। তার গলা থেকে কোনো অদ্ভুত শব্দ একটানা বেরোচ্ছিল। ওর ধারণা, ওটি গান হচ্ছে। বস্তুত, মূল গানটির শব্দ অন্যরকম, সুরও একটা ছিল। লোকটি সবই নিজের মত করে নিয়েছে।

ও গাইছিল, সমাজবাদ ববুয়া, ধীরে ধীরে আই
আওসে আই
পানিসে আই
চাষীকো কাঁদাইসে ঝামেলা পাকাই
সমাজবাদ ববুয়া···

শব্দগুলো না বাংলা না ভোজপুরী, লোকটার মতই খিচুরি পাকানো। সুরটাও সাঁওতালী করমগীতের মত। আওয়াজটা গলা থেকেই বেরোচ্ছে। তবু শুনলে মনে হয় যে দাঁতের ফাঁক দিয়ে কেউ চাপা শিস দিচ্ছে।

এমন গান শুনেও যেন টাট্টুটি আবেশে ঝিমোয়। হাইওয়েতে থাকে একটি ট্রাক। তিনটি পুলিশ নামে। ডিউটিতে গিয়েছিল খালিবাড়ি, থানায় ফিরছে। খালিবাড়িতে কিছু নাই হে। যারা তার কাটে, তারা কি বসে থাকবে ধরা দেবার জন্য? কাজও ঝাঁজাগোকুলা। ছোট দারোগা কাজ দেখাবে, বড় দারোগা হবে, তাই কাজ দেখাতে যাওয়া। বদমাশরা তার কাটছে, পুলিশ ধরতে গেল। তেমন কাজে কোথাও বসলাম। মাংস ভাত খেলাম, নোট নিলাম, সে সুখও নাই। ঝাঁজাগোকুলা কাজ। যাহোক বাপের ভাগ্যি যে স্বয়ং বড়মদন ছিল না। গুরু থাকলে দু'একটা পুলিশকে কেলিয়ে ছাড়ত। এ সব কথা বলতে বলতে ওরা কাছে আসে।

—কে ও? জংলী?

—হঁ বাবু।

— গান শুনেই বুঝেছি!

—জাড় লেগে গেল।

—এত রাতে হেথা?

—সাইট হতে পাঠাল। বাবু আসবে।

—বাবু?

—ওই সাউ, সামন্ত দুজনে বলল, দফাদার আসবে। তা টাকা থাকে কি বা সঙ্গে, যা তুই।

—ভাল রে ভাল! তা তুমি গর্দভ, দফাদার নিয়ে সাইটে যাবে? কালিবাড়ি ধু ধু করছে, কুলিকামিন ভেগে গেছে, আজ রাতে কেউ যায় সেথা? বালিবাড়িতে বড় মদন নাচছে, কালিবাড়িতে সাউ সামন্তের খেলা।

—বলল আমাকে!

—টাকা দিল?

—পাঁচ টাকা।

—পাঁচ টাকার জন্যে তিন মাইল যাবি? যা বাবা! তোর নাম জংলী, বুদ্ধিও জংলী।

—হঁ বাবু।

—দফাদারকে ডাং মেরে কেউ টাকা নিয়ে নেয় যদি? তোর চেহারা তো ছাপ মারা। ধরা পড়বি।

জংলী হ হ করে হাসে এবং মাথা নাড়ে। বলে, অনেক আগে মার্কা ছিল কপালে কাটা। তা দেখে চিনবে জংলী বেসরা। তা আসানসোলে তোমরা পিটালে খুব। তখন মার্কা হল, কপালে কাটা, পায়ের আঙুল ভাঙা, পিঠে সেলাই। তা বাদে ধানবাদে বাবুরা পিটাল। এখন তাই মার্কা অনেক, আর কাঁধের ডানা দেখ, যেমন গরুড় পাখি বসে আছে। হঁ বাবু জংলীকে তো আগেই ধরবে।

—খুব বেটা! তুই তিন বছর আছিস। পংখীরাজের গাড়ি চালাস বালিবাড়ি,—কালিবাড়ি,—তবু জায়গা তো ভাল নয়।

—বাবু এলে থানায় নিব?

—সে গেলে যাবে!

—বাস আসবে?

—ঝড়ে গাছটাছ পড়েছে বোধহয়। দেখ্! তোর আর ভাবনা কি

ঘরও তো নাই।

—গাড়িতেই ঘর

—এবার ঘর তুলে নে একটা, বিয়ে সাদী কর। আর···আর একটা গানটান ধর বাপু। ওই এক গান···

—হঁ বাবু।

সেপাইরা চলে যায়। বেলা একটা থেকে এখন অবধি বিফল অভিযান, বিফল হবে বলেই যাওয়া। বড় মদনকে ধরলে দুটো ফাঁড়ির বাট্টা কেটে যাবে। তাই তাকে সাবধান করে দেয়া। এবং "আজ বরো মদনরে লইয়া ফিরুম" সদম্ভ ঘোষণা করে অভিযান চালানো। এ সব আগেও হয়েছে, আবারও হবে। কিন্তু ধকল যায় সেপাইয়ের ওপর দিয়ে। ক্লান্ত, ক্লান্ত তারা। অপরাধী ধরে মরে গিয়ে তারপর মেডেল পেয়ে লাভ কি। দশানা-ছ'আনা করে বেঁচে থাকা ভালো। নিজের দাড়ি নিজে কামানো যায় কোলে আয়না রেখে। এক ক্লান্ত দিনের শেষে রাত যখন কয়েক ঘণ্টা বাকি, তখন শেষ মুলাকাতে জংলী বেসরা। শালা, যখনি এসি এলাকায়, থানায় তোর নামধাম লিখা হল। বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাইট বলে কথা। বর্ষায় উজ্জ্বল বাতি এ সব প্রকল্প। মস্তান, ঠেকেদার, দালাল, টাউট, কত রকম বাহুলে পোকা এ আগুনে ঝাঁপ দেবে এখন। তা তুমি তো কোনো শয়তানি নকশায় নেই। চেহারায় সনাক্তকরণ মার্কা অনেক। নানা ঘোরিখানার মার্কা পড়া হাসপাতালের চাদর যেন। বিয়ে করো, ঘর বাঁধো, তোমার উপর থানার কোনো খার নেই।

—কি তোর সমাজবাদের গান···

জংলী বেসরা বসে থাকে। মনটা ঝিমাচ্ছে বটে। গানটা রক্তে ঢুকে আছে, বসে আছে, ভুলতে চাইলে ভোলা যায় না। কিন্তু শেখাও তো হয়নি। জংলীর দেশ হাতিবান্ধা-চামরকাশীর সুরেন সিং এক কালে খুব মারেগা-কাটেগা করেছিল বটে ডেবরা যেয়ে। সেখান হতে ফেলে যায়।

জেল জীবনে এ গান শেখেনি সুরেন। জেল হতে বেরিয়ে ইটভাটার কাজে যায় বিলাসপুর। সেখানেও মালিকের মুনশিকে পিটায়। দেশে ফেরার কালে ধরা পড়ে গেল। সনাক্তকরণের অনেক মার্কা সুরেন শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল বটে। একটা বান থেকে পাহানের দেয়া জন্মদাগ, বড়াম মায়ের থানের মাকড়ি, বাঘুত ঠাকুরের প্রসাদী মাকড়ি, তিনটে ছিঁড়ে নিতে সুরেন সিং! তুমি মার্কামারা। আর ছোটবেলা গরম

মুড়িভাজা কড়াই উলটে গায়ে পড়েছিল, তাতে তোমার পেট বুক চিহ্নিত।

ধরা পড়ে বনবনিয়ে জেলে জেলে ঘুরলে। বাঁচি জেল হতে ফিরলে ওই গানের দুই কলি কণ্ঠে নিয়ে। ওঃ! গান কেমন দেশে দেশে ঘুরে তা বুঝে দেখ মন! বাতাসে যেমন বীজ ছিটায়, তেমনি। সে গানের কিছুই শেখা হয়নি জংলীর। কিন্তু সুরেন সিং ভূমিজকে জংলী তো অনেক দেশ দেখা জ্ঞানী বলে মানত। সুরেনকে জংলী জিগোস করল, দাদা! দেশঘরে তো হচ্ছে না কিছু। দফাদার একটা! তাকে চক্ষে দেখি নাই। খাতাদার হয়ন্ত ছাতনাপাড়ার। প্রহরাজ মহাপ্তি! আসানসোল দেশে কয়লাখাদানের কাজ! যাব কি বা!

সুরেন সিং ভূমিজ সে সময়ে মৌচা মজেছে কিনা তা চেখে দেখছে কয়েক ঘন্টা ধরে। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, ভাব হয়েছে। রোহিণীর হাট থেকে মাছ এসেছে, বৈতাল। রান্না চেপেছে। শুকনো মাছে বৈতালে পেঁয়াজে লঙ্কায় বেসন কি বা! খেয়ে যাবি না কি জংলী?—না দাদা! দুপুরে ঢেমনা সাপ মারলাম একটা। রেঁধে রেখে এসেছি।—তা তাই খা!

—যাব সেবা?

—নিশ্চয় যাবি। এই গান গাইতে গাইতে চলে যাবি। কোনো চিন্তা নাই। আমি বলছি!

—সে অনেক দূর কি বা!

—কিসের দূর? রেল চেপে যাবনা সনা কয়লাখাদান দেশে গো! কিনিব না পলাকাটি চাঁদমালা গো! রেল চেপে চলে যা। দেশে বা কি তোর আছে। ঘরও কাবার। নিজের নাই কেউ। আর বিয়ে তো হতে হতে হল না। বন্যা ভেঙে গেল কেওঝোর। যা চলে যা। দেশে খুঁটা পুঁতে পড়ে থাকলে ভাত নাই। আমিও এদেরে রেখে চিত্তরঞ্জন যাব।

সেই ঘর ছেড়ে বেরোনো, আর তো ফেরা হল না। প্রহরাজ খাতাদার, মুকুটলাল চাচা দফাদার। ঠেকেদারকে চোখে দেখা যায় না। ঠেকেদার ঠাকুরদেবতা, পুতুলনাচের বাজিকর। পিছন থেকে সুতা ঘুরায়। যেমন নাচাও তেমনি নাচি, অধিকারী হে!

ঠেকেদার জাগায় দফাদারকে। দফাদার খুঁজে খাতাদার। খাতাদার হয় গ্রামবসাৎ লোক। চিনাজানা মানুষ না হলে সেবার আনিবে কে বা। প্রহরাজ বাবু পেরিপাজাবি আর আশি সুতার ধুতি পরে মশমশিয়ে মাঝিপাড়া, ডমপাড়ায় ঘুরে। খেতে পাবি, পয়সা পাবি, রেল চেপে যাবি

সনা কয়লাখাদান দেখে গো ! জংলী রে ! তুই ওদের বুঝা। —বুঝাব, বুঝাব বাবু। নির্বাচিত বিয়ার মেয়ে মেঘরাই হেমব্রমের সঙ্গে কেঁওঝোর চলে গেল ! সবাই করুণার চোখে চায়। দেহটা তোর মস্ত বড় জংলী ! কিন্তু খেতে পরতে বা দিতিস কি কোসোমবালাকে ? মনটা উঠে গিছে আমার। চল বাবু ! আমি বুঝাব। গান গেয়ে গেয়ে যাব।

রেল গাড়ি ঝমাঝম ! রেল গাড়ি ঝমাঝম ! সমাজবাদ বন্ধুরা ! ধীরে ধীরে আই ! মেঘরাইসে আই ! কোসোম সে আই ! কয়লাখাদানের খবর সে আই, সমাজবাদ ! —এই বেটা ! দাঁতের ফাঁকে পিস মারিস কি না ! না বাবু গান করি খানিক। কয়লাখাদান কত দূর হে ?

কয়লাখাদানে খাতাদার চাল দেয় শুধু। খাতায় কি লিখে। তা এখন তো আমাদের বাঁধনা পরব বাবু। টাকা চাই। মদ কিনব, মাংস খাব, "বলে বলে বলে বলে" গান গাব। পয়সা কোথা এখন ? ছয়মাস কাজ কর্। দফাদার না দিলে আমি দিতে পারি ? হেই দফাদার ! মুকুটলাল বাবু ! আরে আমি তো খাতাদারকে সবই দিয়েছি। টাকা না দিলে বাবু কাজ করব না। কাজ করবি না ? তবে ঠেঙিয়ে তাড়াব, আবার লেবার আনব। এমন কথা ? তবে তোদের দুজনাকে বাঁধব, বাঁধনায় গরু খেলাব তোদের দিয়ে।

খুব মারপিট, খুব ঝামেলা। পালের গোদা জংলীকে ধরো। বেটা রাতদিন সমাজবাদ বন্ধুরা গান গায়। বটে ! বেটা গান গায় ?

গ্রামের লোকজন নিয়ে জংলী তখন স্টেশনে। ওই তো জংলী। কপালে কাটা দাগ আছে। ধরো ওকে, চলো থানায়। বেটা তুমি লেবার খেপাও ? মার্ মার্ বেটাকে। থানায় শুওরপারা বেঁধেছেঁদে হাতের সুখে পিটা। না মুকুটলাল বাবু ! অন্যদের নিয়ে যেয়ে কাজ করান আপনি চেনা দফাদার। কদ্দিন লেবার আনছেন ! এবারেও কি মেয়ে হল ? এ হে হে হে ! দুটো বিয়ে, দুঘরেই মেয়ে ? আপনাকে আর খাতাদারকে বড়ই মেরেছে বেটা ! যান, ওকে বেকল করে দিলাম। চিনতে পারবেন না।

হাসপাতালে কতদিন। তারপর জেল। নাম জংলী বেসরা, সাঁওতাল আদিবাসী হিন্দু ; পিং মৃত নন্দ বেসরা ; সাকিন হাতিবান্ধা—চামরকাশী ; থানা সাঁকরাইল···। সনাক্ত করিবার চিহ্ন কপালে এক ইঞ্চি ক্ষত চিহ্ন, হাঁ পায়ের আঙুল ভাঙা, পিঠে ক্ষত সেলাইয়ের দরুণে ইংরাজি ডবলিউ আকারের দাগ···

জেল থেকে বেরোতে চ হ হাসি। এখন কোথা যাব বটে? পায়ের আঙুল ভাঙা, হাঁটা বদলে গেল, চেহারা পালটে যাচ্ছে। চা দোকানে কাজ করছিল জংলী। তারপর গেনুয়ার হাটে তরকারি কিনে টাউনে আনছিল শিবুবাবুর হয়ে। সমাজবাদ বহুয়া! ···লাঠিসে আই···মামাসে আই··· জেলে জেলে ঘুরি ঘানি ঘুরাই, সমাজবাদ হে! শিবুবাবু খেতে দেয়, দোকানে থাকতে দেয়। বাবুর শালা চলে আসে। এ শালা যে ভাতের পাহাড় নামাইছে রে দিদি! আরে সমাজবাদ! কাজে যাবি, কাজে?

মাটি কাটা কাজ। অনে—ক টাকার কাজ। দিদি রে! খাতাদার হয়ে বেঁচে গেলাম। কোম্পানি দেবে ফুট হিসাবে, আমি লেবার খাটাই পেটভাতায়। মাটির টাকায় সোনা। কি রে, জংলী, যাবি?—সেথা গ্রামের লোক আসবে?—বেটা! সাঁওতাল পরগণারই তো সব।

—সাঁওতাল পরগণা!

মনের অতলে কেমন সব নাম নড়ে চড়ে। গোড্ডা, হাঁসাডিহা, তিলাডিটা, বারহারোয়া নামগুলি নতুন জলে মাছের পোনার মত ফুট কেটে ডুবে যায় আবার। সুরেনদাদা ভগনাডিহি গিয়েছিল। সাঁওতাল পরগণাতে তারা কেউ যায়নি। তাদের চলাফেরা সাঁকরাইল, নারায়ণগড়, ঝাড়গ্রাম, এসব থানায়। কিন্তু সাঁওতাল ওরা। আপন ভাষায় কথা বলবে।

—কোথা যাব বাবু?

—ধানবাদ ছেড়ে দূরে।

এখন সমাজবাদ জংলী বেসরার কাছে বাবুর শালা হয়ে আসে, ধানবাদ হয়ে আসে।—পারবি তো?

—খুব পারব বাবু। পা চেপে নিব মাটিতে। আর কোদাল চালাতে পারব। পয়সা পাব তো? পয়সা পেলে বাবু, দেশে চলে যেতাম।

ধানবাদ ছেড়ে আরো দূরে। বাপ রে, মস্তবড় জায়গা জুড়ে কাজ। কাজের মূল ঠেকেদার ইংরিজি নামের কোম্পানি। অধিকারী হে! সামনে থাক না, চোখে দেখি না। তা দফাদারের চাষ, খাতাদারের চাষ। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, ধানবাদ, নানা জেলার লেবার এনে মস্ত মেলা।

জংলী বেসরার গ্যাঙে তো বজাতি নাই। অন্য অন্য গ্যাঙে আছে

বটে। কিন্তু এর সাথে ওর, কার সাথে তার, দেখাশোনা কথাবার্তা একেবারে বারণ। বাঁশের খুঁটায় চটের ছাউনি। সেখানে থাকো। আর পাঁচশ কিলোমিটার লম্বা খাল কাটো। মাটি তুলে পাড়ে পাহাড় করো। এ মাটিতে পরে নাবাল জমি সমান করবে লরি। কেউ কারো সঙ্গে মিশবে না। এখানে প্রতি দফাদার মস্তান নিয়ে তাঁবুতে বসে আছে। মস্তানরা ঠেকেদারের লোক।

ঠেকেদারের কি? বলো ঠেকেদারের কি? কোম্পানি পয়সা দিচ্ছে ফুট হিসাবে। এত কিউবিক ফুট কাটলে এত টাকা। সে হিসাবে কোম্পানির খাতায় তুমি রোজ বিশ-বাইশ টাকা পেলে। ঠেকেদার, দফাদার, খাতাদার, মস্তান, সবাই ওই টাকা থেকে খাবে।

তবে তুমি পেটভাতায় খাটো, তুমি পেটভাতায় খাটো। তোমার জন্যে দিন ধরো চার বা পাঁচ টাকা। বাকিটা নাকি জমছে। কাজ করছ হাজার মানুষ, দিন পিছু কোম্পানি দিচ্ছে বাইশ হাজার। চার-পাঁচ হাজার খরচ, বাকিটা বুঝে দেখ মন!

কয়েকদিনেই জংলীকে তার মন বলে দিল, সমাজবাদ বুঝবা, মাটিসে আই! যত খরা আকাশ, যত পেটের জ্বালা, তত মাটি কাটা, তত সমাজবাদ!

সন্ধ্যায় জংলী ঝোপড়ির দাবে ঘুরত আর গান গাইত। ওই গান শুনেই একদিন মুকুটলাল চাচা ঘুরে দাঁড়ায়। তুই! জংলী বেসরা!

—হঁ বাবু।

—এখানেও এসেছিস?

—কি করব বাবু?

—দেখিস, আর কোনো বদমায়েসি করিস না। এ সেই আসানসোল নয়। মাটিতে পুঁতে দেবে। জংলী মদের ঢেকুর তুলে বলেছিল। কেন? এরা তো বারে মদ দিচ্ছে, খোরাকিও দিচ্ছে। যাহা পরব মনাতে দিবে, তখন ছুটির দিবে, মদ দিবে। এদের তুই মন্দ বলছিস কেন?

—মরণা বেটা! আমার গ্যাঙের কাছে এলে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলব, মনে রাখিস।

—হঁ হঁ, মনে রাখলাম। এমন তিতাকিচা মন তোর, তাতেই ছেলে হয় না।

মুকুটলালবাবু রেগেমেগে চলে গিয়াছিল। কিন্তু মনটা ওর বড়ই

পেচালো। কথাটা তুমি খুব ছড়িয়ে দিলে বাবু! তারপর হতে মস্তানরা যখন তখন শাসায়। খাতাদার বলে, তুই লেবার খেপাবি না। অন্য গাঙে তো যাই না। সেখানে স্বজাতির মানুষ সন্ধ্যেবেলায় কেমন গান গায়, মাদল বাজায়, মনটা পোড়ে আমার। আপন গাঙেও কথা বলে না কেউ। শেষে বর্ধমানের ভরত বলে, কি বা বলব বল্? তোর সঙ্গে মাথামাখি করলে তাড়িয়ে দিবে।

সে সময়ে জংলীর কাছে ওই গান ছাড়া কি আর ছিল? একলা মানুষ, এই ভীমকায় শরীর। মন চায় দুটো কথা, গান, হাসি। সেখানে তো বেড়া পড়ে গেল। ও সুরেন দাদার শিখানো গান! ও সমাজবাদ! কত কিছুর মধ্যে দিয়ে কত ধীরে ধীরে আসছ তুমি? বারপসে আই! শাসনসে আই! মস্তানদের লাঠি আর লাল চোখে আই, সমাজবাদ হে!—ধুর বেটা, ওটা কি গান হচ্ছে? আমি কি গানের কথাটবা জানি? মনোকষ্টে গান করি হে, মনোকষ্টে। আর মদ খাই।—ও জংলী! এত মদ খেলে ঘর যাবার কালে পয়সা থাকবে না।—যাও যাও ভরত! আমার সঙ্গে কথা বললে তোমাদের কাজ চলে যাবে। আমি মন্দ। আমি লেবার খেপাই।

কিন্তু সেই জংলীকেই তো নামতে হয়েছিল আসরে। অধিকারী হে! তুমি সুতা টানো। আর জংলী বেসরার মুখের ও শরীরের ম্যাপ পাল্টায়। সনাক্তকরণের চিহ্ন যোগ হয়। ঠেকেদার কোম্পানি অধিকারী হও। তোমাকে সনাক্ত করতে পারে না কেউ। তুমি শুধু নাম। তোমার শরীরও নাই, চিহ্নও নাই। সমাজবাদ ববুয়া! ঠেকেদারসে আই! কোম্পানি গাড়ি চেপে এসেছিল।

গ্যাট ম্যাট ফ্যাট! হাতে চুরুট, মুখে ইংরিজি। দফাদাররা দৌড়াচ্ছে, মিটিং চলছে রোদে দাঁড়িয়ে, ঝপাঝপ কাজ সারো। ঝপাঝপ মাটি কাটাও। লেবারকে আরো চটজল্‌দি কাজ করাও। টাইমে কাজ শেষ না হলে সব ফুটিয়ে দেব। টাকা মাটি, মাটি টাকা। মাটির পাহাড় উঁচু করো আরো। গ্যাট ম্যাট ফ্যাট। তারপর গাড়ি চেপে কোম্পানি ভোঁ কাট্টা। এই ছিল এই নেই। বাপরে লাল মুখ! যেন লধাপাড়া থেকে বাঘুত দেবতা এসেছিল।

হেই মাটি কাট্! ঝপাঝপ মাটি কাট্, ঝনাঝন পয়সা নে, কাজ সেরে দেশে চলে যা।

মুকুটলাল বাবু মাটির পাহাড়ে বাঁশ পুঁতেছিল। তার মাথায় ছিল

রুমালে বাঁধা একশো টাকা। ওই বাঁশ সমান উঁচু করো মাটির পাহাড়। গ্যাঙের তিরিশ জনকেই একশো টাকা করে দিব। টাকার জন্যেই তো খাটতে এসেছিস?

সাঁওতাল পরগণার মানুষগুলির উৎসাহ কি! সারোয়া, জারমুণ্ডি, বাবুহাইডের লোকগুলি ঝপাঝপ কোদাল মারে। পাড়ে পাহাড় ভোলে। খাতাদার ভয়ে কাঁপে। দূরে ফেল্ মাটি, এ যে ধস্ নামলে আঠারো ফুট মাটির নিচে চাপা পড়বি। —বাবু টাকা দিবে! —আরে। জানে বাঁচলে তবে তো টাকা। —দফাদার কোথায়? আর কেউ টাকা দেখায় না, সে বা টাকা কেন দেখাতে গেল? —দফাদার তাঁবুতে মেয়ে তাস খেলছে।

দূর থেকে জংলী বাঁশের মাথায় রুমাল দেখেছিল। দেখছিল যে সমাজবাদ আসছে ওই নোট ছোঁবার দুর্মর অবোধ জেদে। দেখতে দেখতে বাঁশ টলে গেল। দেখতে দেখতে মাটির ধসের হাত ধরে ভয়ংকর আর্ত চীৎকার হঠাৎ থেমে যাবার মধ্য দিয়ে সমাজবাদ এল

জংলী ছুটে গিয়েছিল। লণ্ঠন, টর্চ, ছোটাছুটি। সবাই কাজ ফেলে চলে আসে। মস্তানরা দড়ি দিয়ে জায়গা ঘেরে। কোদাল মেরো না, সাবধানে মাটি সরাও। পুলিশকে খবর দাও, পুলিশকে। কোম্পানীকে ডাকো।

জংলী বাঘের মতো ছুটে গিয়েছিল, মুকুটলালকে পিটাতে লেগেছিল। মস্তানরা ঘেরে আসে। জংলী বনবন কোদাল ঘোরায়। না, ছেড়ে দাও পব! দফাদারকে মাটিতে দেই। ছেড়ে দাও। —মুকুটলাল অচেতন, মাটিতে লোটায়।

ওরা জংলীর মাথায় তাঁবু ফেলে দিয়েছিল দড়ি কেটে। তারপর বহুজন ধরে তাকে,—মটাস মটাস হাড় ভাঙছে কাঁধের, পিঠের,—পুলিশ এসেছিল।

আবার থানা, আবার হাসপাতাল। আঠারো জন লেবার নিহত। মুকুটলালও ওই যা মার খেল, দফাদারি গেল। আর হাসপাতাল থেকে বেরোতে বেরোতে সে খাল কাটা হয়ে যায়। সে মাটি সমতল করে অসমতল জমি। শুকনো খাল পড়ে থাকে চমৎকার। বাঁধ না হতে খাল হলে জল কোথা হতে মিলবে? বাঁধ হবে নদীর ওপর। তার অনেক দেরি।

এবারে জংলীর নামে কোনো কেস টেস নেই। খাতাদারের কলার চেপে ধরে জংলী তিনশো টাকা খিঁচে নেয়। নাম জংলী বেসরা; সাঁওতাল

আদিবাসী হিন্দু বটে। কিন্তু ওর শরীরে সমাজবাবু এঁকে যান কপালের ক্ষতে, পায়ের ভাঙা আঙুলের, পিঠের ক্ষত চিহ্নে, কাঁধের ডানার অস্বাভাবিক উত্থানে, নাকের ভাঙা হাড়ে। কোঁকড়া চুল পেকে যায় খানিক, শরীর দুমড়ে যায়। খাতাদার বলে, চার পাঁচ মাস কাজ করে এত টাকা খেঁচে নিলি, তা নে! দফাদারকে তো শেষ করে দিয়েছিস। সে লোক পেটে পিঠে এক হয়ে সামনে ঝুঁকে গেছে।

জংলী অন্যমনস্ক ভাবে বলে, হঁ বাবু!

তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে। এই ঘোড়া, এই গাড়ি, বারো কেনা। তিন বছরে খানিক শোধ হয়েছে। ভবানীবাবু লোক খারাপ নয়। তার আরো আছে! বুড়ো ঘোড়া, বেতো গাড়ি জংলীকে দিল। যদি করে কর্মে খেতে পারিস তো খা কেন। তা জংলীর চলে যাচ্ছে। কালিবাড়িতে বিদ্যুৎ প্রকল্প চলছে, এখন মাটি কাটা। খাতাদার সাউ ও সামন্ত। লেবার আসে, লেবার যায়। সাউ বাবুরা জংলীর গাড়ি ভাড়া করে।

কালিবাড়ি থেকে বালিবাড়ি জুড়ে প্রকল্প। ধু ধু মাঠে ঝোপড়ির পর ঝোপড়ি। তমলুকের সাউ আর কাঁথির সামন্ত ওদের মতই ঝোপড়িতে থাকে। ওদের সঙ্গেই রান্না করায় নিজেদের, সাইকেল চেপে নিজেদের জন্যে মাছ কিনে নিয়ে যায়। দফাদারের কাছ থেকে আনা টাকা ফুরিয়ে গেছে বলে রান্না বন্ধ ২ দিন। সাউ ও সামন্ত বার করে মুড়ি নিয়ে গেল, কিন্তু লেবার ফুটে গেছে। ওদেরকে শুকনো মুখে চলে যেতে দেখেছে জংলী।

এখন জংলী ইচ্ছে করলে ঘরে যেতে পারে, যায় না। এখানে গ্রাম ঘুরে ঘুরে। জংলীর গাড়িতে চাপে ঝি-বউড়ি। বুড়ো মানুষ আসে বাস পথে। এই গাড়িতেই ও রাখে কড়াই ও ঘটি, একটি লণ্ঠন। যখন যেখানে থাকে, রাতে বানার সামনে চলে যায়। বটগাছের নিচে কড়াইয়ে ভাত চাঁপে, কড়াই থেকেই খায়। ঘোড়াটি ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে ঘুমোয়। দুনিয়াতে কারো সঙ্গে তার ভালবাসাও নেই, বিবাদও নেই। বানার রেডিওতে গান বাজে। জংলী নিজের গান গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। গাড়ির জো' বট গাছের নিচের বেদীতে ঠেকো দাও, পালঙ্ক হল। ছই আছে, হিম আটকায়। পয়সা রাখে ভবানীবাবুর কাছে। ঘর একটা তোল্ জংলী। —না বাবু। কত ঘুরে ঘুরে মরলাম। চাইতে গেলে শরীরে চিহ্ন বাড়ে বই তো নয়। জংলীর জন্যে কিছু মাপা নেই বলে মনে হয়। থাকলে কোসোমধালা কেন···

সেও কোন অতীতের কথা বলে মনে হয়।

ঝড়জলে আটকে থাকা কৈওকোর টু হাওড়া বাসটি এতক্ষণে আসে। এক পলক থেমে একটি যাত্রী উগরে দিয়ে চলে যায়। আপাদমস্তক র‍্যাপারে মোড়া যাত্রীটি নির্জন পথে নেমে একা হয়ে যায়।

—বাবু!

—কে, কে?

—সাউ বাবু, সামন্ত বাবু পাঠিয়েছে আমাকে। সাইটে যাবেন তো?

লোকটির গলা চাপা, কণ্ঠ ঘসা। সে বলে, কতদূর হবে? যাওয়া যাবে?

—তিন মাইল।

—তি—ন মাইল!

—থানায় যাবেন বাবু?

—কেন, কেন?

—রাত তো অনেক হল।

—থানা কদ্দূর?

—দুই মাইল।

—না, সাইটেই চল। পথ কি ফাঁকা? ডাকাত কেমন?

—ডাকাত অনেক। তবে পথে ফাঁড়ি আছে। পুলিশ থাকে।

লোকটি শরীর সামনে ঝুঁকিয়ে উঠে বসে। মাথা মুখ ঢাকা। মাথায় কালো টুপি। খসখসে গলায় বলে, সাইটেই চলো। কাল কলকাতা যেতে হবে। রাতে থানায় থাকব, সকালে সাইটে যাব, সে করতে গেলে চলবে না।

—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।

—রাতে তুমি যাও তো এ পথে!

—তা যেতে হয় কখনো। চল্ চল্ পংখীরাজ।

—পংখীরাজই বটে!

এর জবাবে জংলী কৃষ্ণ বাক্যে বলে না, মটর চেপে চলে যান। —সে সরল ভাবে বলে, ফিকসা তো নাই বাবু! সাইটে কাজ হয়ে গেলে প্যাডলার আসবে।

—হুঁ।

—এখন তো ভালো দেখছেন। আগে···

—শোনো, আমার ধকল গেছে খুব। একটু দু চোখের পাতা বুজাই, সাইট এলে ডেকে দিও।

—হঁ বাবু, ঘুমান।

ওরা মেঠো পথে নামে। পথ মেঠোই তাকে। লরি খানিক চওড়া হয়েছে মাত্তর। পক্ষীরাজ তার নিজস্ব গতিতে চলে। মাঠ ঘাট, ভাদ্র শেষের জ্যোৎস্না ও শিশির, ঘুমন্ত গ্রাম, বুড়ো ঘোড়া ছই দেয়া গাড়ি। হিমেল বাতাস। মেঘ কেটে গেছে কখন, জ্যোৎস্নাও হেসেছে, শিশিরে ঠাণ্ডা, সদ্য হয়ে যাওয়া বর্ষণের ঠাণ্ডা, জংলী বুঝতে পারে যে তার আরোহী ঘুমিয়ে পড়েছে!

চলে, চলে. গাড়ি চলে। ক্রমে গ্রাম পড়ে পেছনে। মাঠ চওড়া হতে থাকে, মাঠের সমুদ্র যেন। সামনে সাইট। অস্পষ্ট হিমেল জ্যোৎস্নায় ঝোপড়িগুলো দেখা যায় না যেন। বাবুটাকে বললে হত কি, যে লেবার চলে গেছে, রাতভিতে না গিয়ে থানায় গেলে ভাল হত? কিন্তু বাবু কথা বলতে বিরক্ত হচ্ছিল। কি করবে জংলী? সে গান গাইতে শুরু করে, সমাজবাদ বহুরা···সমাজবাদ আরো কত কিছুর মধ্য দিয়ে আসছে তো আসছেই। সে যেমন সাইটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। বুড়ো ঘোড়া আর বেতো গাড়ি নিয়ে সে যদি দেশের সবগুলো সাইটে পৌঁছে যায়, তাতে তো অনন্ত সময় লাগবে। অনন্ত সময় হাতে পেলে সমাজবাদ কি কোনো একদিন জংলীর কাছে আসবে? কত ধীরে ধীরে সে আসে গো? মাটিসে আই লেবারসে আই সমাজবাদ বহুরা! গাড়িটি ধীরে ধীরে যেতে থাকে।

—ন্ না!

জ্যোৎস্না, মাঠ, হিম ও নীরবতা ভেঙে আরোহী বিকট ও বিকৃত চেঁচিয়ে ওঠে। গাড়িতে ভীষণ ঝাঁকানি। পক্ষীরাজ ঝাঁকি খেয়ে ডেকে ওঠে। আরোহী লাফিয়ে নামে।

—কি হল বাবু?

—না! যাব না আমি। তুই সেই জংলী।

র‍্যাপার ফেলে দেয় মুকুটলাল, ছুটতে থাকে। জংলীর মাথায় ঘন ঘন বিদ্যুতের চাবুক পড়ে। এ সেই মুকুটলাল, আর ও সেই জংলী! চেহারায় জংলীও অনেক বদলেছে, বদলেছে বাবুও। কিন্তু এ কি অদ্ভুত আশ্চর্য কাণ্ড। আজ রাতে, এইখানে, বুড়ো ঘোড়া বেতো গাড়ি, গাড়িতে কড়াই

থাকে, লণ্ঠন দোলে। জংলীর জগৎ তো এতটুকুর মধ্যে। জংলীর মন বিচারবুদ্ধিহীন এখন, সেখানে শুধু অন্ধ আবেগের তাড়না। মুকুটলাল বাবু আগে দুবার জংলীকে জীবন থেকে উৎখাত করেছে, আজও তাকে আবারও উৎখাত করতে এসেছে। শালা! তোমাকে আমি বইছিলাম, কিন্তু টের পাইনি একবারও?

—মুকুটলাল বা—বু। —জংলী ছুটতে থাকে। ধীরে ধীরে আই? ধীরেই তো আসছিলে, ছুটতে লেগেছ কেন?

জংলী দৌড়তে থাকে। ভীষণ বেগে দৌড়তে থাকে। চিনতে পারেনি, সে একরকম। চেনার পর জংলী ওকে ছেড়ে দেয় কেমন করে?

সামনে ও চারদিকে মাঠ। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দুটি মানুষ। ওদের মাঝখানের দূরত্ব কমে আসতে থাকে।

(প্রথম ১৯৮৩)

চড়ক

মহাশ্বেতা দেবী

চড়কের বোলবোলা এক মাস ধরে চলে। রঙ্কেশ্বরী নদীর মৃতপ্রায় সোঁতার ধারে কোন গ্রাম আছে বলে চট করে বোঝা যায়। রঙ্কেশ্বরীর দুই পাশের একত্রিশটি গ্রাম বা সেই ধরেই নির্বাসনে আছে। ঝকপুর স্টেশনে নামো, কাশাহাটা—মণ্ডলগঞ্জ বাসে চাপো, কোমারডিতে নামো, তারপর পশ্চিমে চার মাইল হাঁটো ধানক্ষেতের আল ধরে। তারপরে রঙ্কেশ্বরীর সোঁতা পেলে, রঙ্কেশ্বরীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয় তা সবাই জানে। কিন্তু স্নান করার জল রঙ্কেশ্বরী দেয় না। আষাঢ়ে-শ্রাবণে তার বুকে ডুবজল হয় না। এখন রঙ্কেশ্বরীর বুক ধরে উত্তরপানে হাঁটো দেখবে, ক্রমেই নদীর বুক খালি হেলে উঁচু হচ্ছে, দুপাশে শুকনো কাশঝোপ, বিরল-বসতি দগ্ধ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম। মাইল কুড়ি এমন এক শ্মশানসদৃশ অঞ্চল। অথচ দক্ষিণে ও পুবে আছে সেচখাল। সেখানে সব সবুজ।

রঙ্কেশ্বরীর বুক ধরে মাইল তিনেক হাঁটলে, তারপর পৌঁছবে শাঁকাটা গ্রামে। শাঁকাটা গ্রাম দেখলে প্রথমেই চোখে পড়বে শ্মশানদহ। অধিকন্তু মাঝে-চেরা ঘোড়ার খুরের মতো আকৃতির এই জলাশয়টি খুবই চোখে লাগবে। এত খালি। এত রুক্ষতার মাঝখানে এমন জল কে কবে দেখেছে? দীঘির পাড়ে ওঠ, আরেকটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখবে। চারপাশে সুউচ্চ মাটির আড়া। তার মাঝে এক অত্যন্ত নিচু মন্দির। মন্দিরের কিছু দূরে একটি বটগাছ। ঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা ছায়া করে রেখেছে।

ওই মন্দিরের কারণে এখানে সংক্রান্তির মেলা জমে ওঠে। এক মাস ধরে মেলা চলে। তারপর চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় মেলাতলায় মানুষ ভেঙে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে। কোন বছর বেশি লোক আসে, কোন বছর কম।

নাচ না হলে আসবে কেন বল?

নাচ বলে নাচ? মানুষের হাত পা, কাটা মাথা নিয়ে নাচ। না না, জ্যান্ত মানুষকে খুন করে তার মাথা বা হাত নিয়ে নাচ নয়। এ সময়ে

টাকুরের লাশঘরের ডোম পয়সা পায় বিস্তর। ভাই! এখানে তো লাশ পড়ে থাকে, পচে, কাটাছেঁড়াও তোমার হাতে। এটা ধর্মকাজ হয়। শাঁকাটার গাজননাচ।

হ্যাঁ হ্যাঁ। পুণ্যকাজে পাপ নাই। ওই মদের টাকাটা দিয়ে যাবে।

লাশঘরের ডোম এমন কাজে তার হেফাজতি তাজা বা বিবর্ণ শবগুলি সানন্দে দেয়। দেবে না, এমন সাহস নেই তার। এ কাজে সহযোগিতা না করলে তার সমাজ তাকে ধিক্কার দেবে। বুড়োরা মাথা নেড়ে বলবে, এক সময়ে আমরা শূরবীর ছিলাম রে! যুদ্ধকালে আগে ডোম পাশে ডোম পিছে ডোম সেনা চলত। কত ধাদরমেগর বাদ্য বাজত। তা বাদ্যকর আমরা আছি, যুদ্ধ আর করি না। আর, ডোম রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে না মোগলরাজার সেনাপতি শাঁকাটি—রঙ্কেশ্বরী পরগণা নিল। যুদ্ধে আমরা প্রথমে জিতি আর সংক্রান্তি ৩৪ দিন পড়েছিল। যুদ্ধ জিতে মহানন্দে আমরা মেয়ে ভক্ত্যা হলাম। শত্রুরের মাথা-হাত-কবন্ধ নিয়ে নাচলাম কত। সেকালে আমাদের রাজা রাবণেশ্বর ডোমের ঘোড়াও নেচেছিল। তা থেকে ঘোড়ার ক্ষুর মাটিতে গেঁথে ওই দহ হল। তা বাদে আমরা হারলাম। মোগলরাজার সেনাপতি আমাদের রাজাকে দাহ করল বলে ওটি শ্মশানদহ হয়। তা বাপ! সেদিনের কিছুই তো বাকি নাই যে তোরাদের দেখাব, ওই নাচখানা আছে। তাতে লাশ দিতে কাতর কেন? ওই নাচ নাচলে যার লাশ তারও গতি হয়ে যায়। শিবের ভক্ত্যা তাণ্ডব নাচে, শিব জাগ্রত হয়ে দেখে।

প্রতি বছর ঠিক দিন বুঝে লাশ মেলে না হয়তো। তখন খড়ের মাথা, খড়ের কবন্ধ নিয়ে নাচ হয়। আবার হয়তো সাপে কাটা কোন লাশকে কেউ জ্বালায়নি, এমন হল। রঙ্কেশ্বরীর জল হতে তুলে আনো। রঙ্কেশ্বরী অভিশপ্ত নদী, জলহীন মরুভূমি। তারই বোন বঙ্কেশ্বরী দেখ, চৈত্র অবধি খানিক জল দেয়।

এই নাচটি অঞ্চলের ডোমদের কাছে বড়ই নিজের জিনিস। বিশমাইল শ্মশানপারা রুক্ষ, জ্বলে যাওয়া অঞ্চলটি ডোম অধ্যুষিত। কারো জমি আছে, অধিকাংশের নেই। জলাভাবে সব মাঠই ফুটিফাটা। এদের জীবিকা বাঁশ কিনে এনে ঝুড়ি, কুলো বোনা এবং পাইকারকে বেচা। ফুট-ফারাকের দিনগুলি স্বপ্নের মত ফাঁকি দেখা দিয়ে পালিয়েছে। পকাল্লেও কাজ দিলে কাজ করে। পুরনো সেটেলমেন্টারে এদেরকে অপরাধপ্রবণ বলা

হত, এখন বলা হয় না। চোলাই মদ তৈরি এখন স্বীকৃত কুটশিল্প। ব্যবসায়ীরা এদের কাছে কেনে। স্বাধীনতার ফলে যারা উন্নতি করেছে, এই গরীব, পশ্চাৎপদ, হতভাগ্য মানুষগুলি তাদের ঘোর সন্দেহের চোখে দেখে। চড়কের তাণ্ডবনাচে গ্রামের সচ্ছল, অসংবর্দের মানুষদের কাছে এক ভয়াবহ জিনিস। তারা আসে না। সেদিন চড়কতলা এদের থাকে। নাচের প্রতি আকর্ষণের সেও একটা কারণ।

কয়েক বছর ধরে হরিপদ ডোম (বর্তমানে সে 'দাশ' লেখে) এ উৎসব তুলে দিতে চাইছে। শাঁকাটি এবং দশখানা গ্রামের সব চেয়ে সম্পন্ন লোক হরিপদ। তার ক্ষেত সবুজ, কেননা নিজস্ব জোড়া পুকুর আছে। অঞ্চল থেকে তালপাটালি ও খেজুরে গুড় চালান দিয়ে তার উন্নতির শুরু।

কথায় বলে, জলে জল বাধে, টাকায় বাধে টাকা। হরিপদর গুড়ে কেরোসিনের ডিপো বাধল। কেরোসিনের ডিপোয় বাধল চাপা কল বসাবার ঠিকাদারি। চাপাকল ব্যাপারটি ছিল শাঁকাটার জাগ্রত শিবের আশীর্বাদ। জলহীন জায়গায় চাপাকল বসাও, জল উঠল না বলে সরিয়ে বসাও, ভেঙে গেল বলে মেরামত কর বা নতুন কল বসাও। প্রতি দফায় নতুন বিল, বিল পাস। বাবুরাও খুশি, কেননা হরিপদ ঘিরে ঘুরে যায়। তাছাড়া হরিপদ যদিও আদালতে গিয়ে দাত টাকা খরচ করে শপথপত্রে সই করে 'ডোম' থেকে 'দাশ' হয়েছে, তবুও সে তপশীলী জাতির লোক। তাকে সাহায্য করাই উচিত।

চাপাকলে জল ওঠে না, পানীয় জলের কুয়ো চাই বলে বুধিরাম যে পাঁচজনাকে নিয়ে দরখাস্ত করাবে, সে দরখাস্ত অঞ্চলে ভ্রমণরত মহকুমা-হাকিমকে দেবে। তা হরিপদ জানত না। সে একথাও জানত না যে মহকুমাহাকিমের মাথায় পোকা আছে। তিনি হরিপদর ধনী হবার পথ বন্ধ করে দেন এবং অঞ্চলে দশটি কুয়ো কাটান। কুয়োর ঠিকাদারি হরিপদ পায় না। কুয়োতে জল ওঠে। মানুষজন পিপাসা মেটায়।

হরিপদ এ কথায় গ্রামসমাজে বলে, ডোম জাতে একতা নাই। একের ভালাই অপরে দেখে না। বুধিরাম আমার স্বজাতি হয়ে এমন করল?

বুধিরাম ও অন্যরা এ কথায় রুখে ওঠে। কিসের একজাত? ডোম নামটি মুছে ফেলেছ, টেরিকটের পাঞ্জাবি, হাতঘড়ি, সাইকেল আর দোতলা বাড়ি হাকিয়েছ। জোড়া পুষকণীর জলে চাষ, মাছ তুলে বেচ। তোমার পুষকণীতে স্বজাতিকে নামতে দাও না। বল, নোংরা জানোয়ার! জল

নষ্ট করে ফেলবি। শহরে যেয়ে নেওা হয়েছ, গ্রামে ইস্কুল নাই। তার চেষ্টা কর না। ছেলেদের শহরে রেখেছ বাসা করে। পথ নাই। জল নাই। তোমার তো সব হচ্ছে। গ্রামসমাজ যে মরে গেল, তা দেখ? তুমি বাবুসমাজের, আমাদের সমাজের নও।

হরিপদ এতদিন ধরে এ কথাই বলে এসেছে বাবুদের কাছে। শাঁকাটার ডোমসমাজ দিয়ে আমাকে বিচার করো না। আমি ওদের পরিচয়ে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই। আমি তোমাদের লোক।

কিন্তু সে ভেবেছিল, সে ওদের ত্যাগ করার অধিকারী। ওরাও যে তাকে ত্যাগ করেছে এবং আপনজন মনে করছে না। এ কথা জেনে সে কোথায় থাকা যায়।

—আমি তোমাদের কেউ নই?

—না না, কেউ নও। তোমার বাড়ি থেকে শীতলা পূজায়, কালীগানে চাঁদা দাও না। নিজে বিজলি ফেলে ডাইনামো এনে আলাদা পূজা-পরব কর। তাতে হাকিম হুকুম ডাকো।

বুধিরাম বলেছিল, আমার বাপের কোলে চড়েছ কত। বাবা তোমাকে কাঁধে চাপিয়ে ইস্কুলে নিত। তা বাবা আর আমি তোমার ক্ষেতে কাজ করি। তুমি দাদন ধরে সুদ ধরো।

কেদার ফোড়ন কেটেছিল, সে জন তোমার ছোটা লাগে সম্পর্কে। তা সে সব কথা যাক। তোমার উপর ভরসা রেখে আমরা পিপাসার জল পাই নাই। এখন পেলাম। মানুষ পোকপতংগের পিপাসার জল নিয়ে ব্যবসা করে না, তুমি করে দেখালে। আমাদের তবু শ্মশানদহটা আছে, জল পাই। বড়মুক্তাপুর, কাঁকরা, বানীচকের মানুষ কি করে বেঁচে আছে হরিপদ বাবু?

হরিপদর গায়ে 'বাবু' কথাটা জ্বালা ধরিয়েছিল। অথচ সেই বলেছে আগে আগে, হাটে বা শহরে দেখা হলে 'বাবু' বলতে পার না তোমরা?

এতেই হরিপদ বুঝেছিল যে স্বসমাজের সঙ্গে তার ফারাক হয়ে গেছে। বড় এবং দোতলা মেটেবাড়ির বাসিন্দা হয়েও তার মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। নিজেকে খুবই একা একা মনে হয়েছিল। তারপরই যুক্তিবিচারহীন ক্রোধ হয়েছিল। বুধিরাম এবং আর সকলকে সে দেখে নেবে।

এরপর হরিপদ সবচেয়ে লাভজনক কারবারে মন দেয়। কাঁধে বাঁক নিয়ে তারকেশ্বরে যায় সে এবং ফিরে এসে সে হয় সুদী মহাজন। সত্তর আর একাত্তর সালে সে গ্রামে থাকে নি। শহরে থাকত। বাহাত্তর থেকে

আবার সে গ্রামে মোতায়েন হয়। এ সময়েই সে বক্রেশ্বরীর বাঁকের খাস-জমিতে বহুদিন ধরে বেড়ে ওঠা ঘন ঝুনোট বাঁশবনটির ইজারা নেয়। দীর্ঘকাল বাঁশবনটি অঞ্চলের ডোমদের প্রাণদান হয়ে আছে। বনটি ডাক হয়, ডাকে জমা নেয় বাঁকরার পতিত ডোম। পতিত থাকতে বাঁশ কেনায় ডোমদের কোন অসুবিধা হয়নি। হরিপদর হাতে যেতে বাঁশের দাম বেড়ে যায়, কেন না হরিপদ শহরে সভাসমিতি বিয়ে শ্রাদ্ধর প্যানডেল বাঁধার ডেকোরেটরদের বাঁশ চালান দেয়।

বুধিরামরা এ নিয়ে হরিপদর সঙ্গে বহু কথাই বলে। হরিপদ বলে, আমি বাবু লারছি কথাটি মানতে। তারা বাঁশ পিছু চার টাকা দেয়, তোমরা দিবে? বল না গো।

—তাই দিতে পারলে তোমাকে বলতে হত?

—আমি জানি না। সকল সমাজে উন্নতি আছে, তোমাদের ভিখমাঙা হাল ঘুচে না।

বুধিরামের ধাবা ঘোলাটে চোখে কাতর গলায় বলে, অ বাপ হরিপদ! বাঁশজঙ্গল জন্ম থেকে মরণ অব্দি সঙ্গের সাথী। ছই থেকে মই, মাচা থেকে খাঁচা, ঝুড়ি-খাঁচা-কুলো, বাঁশ নইলে বাঁচব না বাপ!

—তবে যে যার জমিতে বাঁশ লাগাওগা।

বুধিরাম বলেছিল, জমি থাকলে সে কথা বলতে হত না। কার জমি আছে শাঁকাটায়? সব জেনেশুনে তুমি এতবড় কথাটা বললে? আমরা যা দিচ্ছি তাই দেব। আর ঘরে ঘরে ভাদ্দরে বাদন নেয়া আছে, মহাজনকে মাল দিতে হবে না?

—সে আমি জানি? আমি বাঁশের কাজ করি?

—তুমি কর না, তোমার বাপ-মা করত। সে কথা মনে করেও বিবেচনা কর।

—তুই আমার বাপ তুললি?

—একে বাপ তোলা বলে?

এ থেকে খুব বিষাদবচসা হয়। হরিপদ বলে, দাম বাড়াতে হবে। নইলে হোবা ঢুকতে হচ্ছে না আর। আমি একমুঠো টাকা দিয়ে জন্ম নিয়েছি।

বুধিরাম ঘরে ফিরে তার বউ বিলাসিনীকে বলেছিল, সেই চাপাকলের বাগ ও ভোলেনি।

বুধিরামের বয়স বছর সাতাশ, শরীর ঘড়ির মত পাকানো, চোখ দুটি তার কটাশে। ফলে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলে চোখ দুটি হিংস্র দেখায়। বিলাসিনীকে সবাই বলে 'বিলোসিনী'। তার চেহারা অনাবশ্যক রকম চলচলে। বিলাসিনী যখন হাটে যায়, ভালো কুলো সে বেশি দামে বেচে। মহাজনকে সবটা মাল দিলে ওদের চলে না।

বিলাসিনী মুখ মচকেছিল।

—মুখ মচকাস কেন ?

বিলাসিনী হঠাৎ গা নাচিয়ে হেসে বলেছিল, বাবুকে বল বউকে আনতে। শহরে বউ রেখে বাবু এখানে শুকাচ্ছে। আমাকে আজ মুড়ি খেতে ডাকছিল। আমি শুনি নাই।

—না, শুনিস না।

রাগটা বুধিরামের মনে ভালই জমেছিল। তাই সে ঘরে ঘরে ঘুরে বলেছিল, বুদ্ধি তো একটা করতে হবে। নয়তো খাব কি ?

—কি বুদ্ধি করব ?

বুধিরাম রাগে জ্বলে উঠে ভেংচিয়ে বলেছিল, শুরবীরের জাত ! রাজার সঙ্গে লড়েছিল ! সত্তুরের মাথা নিয়ে নেচেছিল ! এখন বলে 'কি বুদ্ধি করব ?' বুদ্ধি তো একটাই হয়, বাঁচার বুদ্ধি। বাঁশ নাই তো ডোম নাই। তামাম এলাকায় ডোমগুলা মরে যাবে। জল নাই, জমি নাই, কাজ দিবার মালিক তিন চারজন। তা বাঁশ আমরা আনব আর আমাদের রেটে দাম দিব। বলে আসব যে পারলে আর এক সিকা দিব।

কেদার হতাশ্বাসে বলেছিল, যা পারিস, জোয়ানরা করগা যা। আমার মত বুড়াদের উপর আর ভরসা নাই। সেথা বঙ্কেশ্বরীর বাইরে ডোমরা দেখ ভাল বি. ডি. বাবু পেয়েছে। সমবায় করেছে, মহাজনের হাতে মার নাই। আমাদের যে মহাজনের কাছে হাত-পা আর হরিপদর কাছে মাথাটা বাঁধা রাখা আছে। তুই বল বুধিরাম ! মনে ভরসা আসে ?

—তবে মর গা !

জোয়ানরাও সবাই বুধিরামের সঙ্গে প্রথমে আসেনি। পাঁচজন গিয়ে বাঁশ কেটে আনে, তারপর অন্যরা যায়।

হরিপদকে ওরা পুরণো রেটেই দাম দেয়। হরিপদ রাগে গুম হয়ে থাকে। পরদিন রুকপুরে গিয়ে ও বুধিরামের নামে থানায় কি সব লিখিয়ে এসেছিল।

অতীব কাকতালীয়বং হরিপদ কোমারডির চায়ের দোকান থেকে তার সাইকেল নিয়ে যখন গ্রামে ফিরছে, কে বা কাহারা তাকে মেরেধরে সাইকেল ও হাতঘড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। নদীর সোঁতার অদূরে তাকে পড়ে থাকতে দেখে বুধিরাম ও রামেন্দ্র। ওরা হাট থেকে ফিরছিল। হরিপদকে ওরাই তোলে ও বয়ে নিয়ে যায় কোমারডি, সেখান থেকে ঝকপুর। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তবে বুধিরামরা ওর বউকে খবর দেয়। হরিপদর শালা 'চা খাও, ফিরোও', এসব বলে ওদের বসিয়ে রাখে ও থানায় খবর দেয়। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরতে হরিপদই 'বুধিরাম আততায়ী' এ কথা বলে। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে কোন অসুবিধায় পড়ে না। 'কয়েকটা কথা শুধাবে বলে ডাকছে' বলে থানায় নিয়ে একবার মার, একবার ধমকানি, এরকম কয়েক ঘন্টা চলতে থাকে। এরপর বুধিরামকেও হাসপাতালে নেওয়া হয়। একই হাসপাতালে। তবে সেরে উঠে হরিপদ বাড়ি ফেরে। বুধিরাম ফেরে না। ৩৯৩ ও ৩৯৭ এমন নানা ধারার আসামী হয়ে যাবার সম্ভাবনায় সে জেলে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু বিচারাধীন অবস্থাতেই সে একদিন আরেকজন কয়েদীর গলা কাটবার চেষ্টা করে। হাতে অস্ত্র স্বভাবতই ছিল না। আক্রান্ত লোকটির বিপন্ন চীৎকারে সবাই ছুটে এলে বুধিরাম বলে, ওর মাথা কাটতে দিবে না তো আমি লাচব কি দিয়ে? এখানে লাশঘর কোথায়?

এ সব কথার কোন মানে কারো মাথায় ঢোকে না। বুধিরামকে হাত-পা বেঁধে রেখেও কিছু করা যায় না। চোখ ঘোরাতে থাকে সে, দাঁত কড়মড় করে এবং একটি মুণ্ড চায় বারবার।

পাগল হয়ে যায় সে। সে যে পাগল এবং বিপজ্জনক জাতের পাগল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না কর্তৃপক্ষের। তৎক্ষণাৎ তাকে পাগলা হাজতে সরানো হয়।

এ অবধি শাঁকাটায় বসে বুধিরামের বাবা ও বিলাসিনী জানতে পারে। তারপর তারা আর জানতে পারে না। বুধিরামের বাবা একদিন মরে যায়। বিলাসিনী কিছুদিন দাঁতে দাঁত চেপে ঘর আগিয়ে বসে থাকে। তারপর সে একদিন হাট থেকে উধাও হয়। জানা যায়, হাটে তার যে আত্মীয় যুবকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল ঘন ঘন, যে শহরে রিকশা চালায় এবং 'জাত খুনের' কুশল জানবার জন্যেই যে বারবার 'রেকশা' চালানো বন্ধ রেখে এই সুদূর গ্রামে আসছিল, বিলাসিনীকে, সেই নিয়ে গেছে। শহরে কি

খেটে খাবে। ঘরে পড়ে শুকোবে কেন?

রামেন্দ্রদের ডেকে কেদার বলল, সে ছেলেটা বিনা দোষে জেলে গেল, অবিচারে পাগল হল, তার বউটাই চলে গেল, এটাতে আমাদের দোষ হয়ে গেল।

রামেন্দ্ররা বলল, আমরা তো তাকে বলেছিলাম যে তুমি থাক। তোমার কোন ভয় নাই। আমরা যেমন খাব, তুমিও তেমন খাবে। আমার মা তার ঘরে শুচ্ছিল পর্যন্ত। কেমন ভাই তাও জানি না। গ্রামে কোনদিন আসে নাই।

কেদার ও রামেন্দ্ররাও ক্রমে বুধিরামের কথা ভুলে গেল। বুধিরামের বিষয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভুলে গেল বলাই ভাল। শহরে গিয়ে তারা দু-একবার বুধিরামের সঙ্গে দেখা করেছে। বুধিরাম এখন শান্ত, খুব শান্ত। এখন শান্ত ও কোনদিন ছিল না। শান্ত হয়ে ও তাকিয়েই ছিল। কোন কথাই বলেনি। ফলে রামেন্দ্রদের মনে হয়, ও তো চিনতেই পারছে না আমাদের। —যে চিনতে পারছে না, তার খোঁজখবর না নিলে বিবেক পীড়িত হয় না। আর বারবার যাবে আসবে, একজনের ষোলটি টাকা খরচ হয়। সোজা কথা নয়।

ক্রমে বুধিরামের ভিটা পোড়ো হয়ে যায়। এক বর্ষার জলে আগাছা জন্মায়। ঘরের কাঁধে উঠে ছাগল ঘাস খায়। ব্যস্ত পাখিদের মুখে এনে ফেলা নিমের বিচি থেকে গাছ ওঠে। কয়েক বর্ষায় দেখা যায় নিম ও সাঁইবাবলার গাছ। ধান সিদ্ধ করবার মেটে হাঁড়িটা গলে যায়। কালকাসুন্দে ও কটিকারিতে উঠোন ঢেকে যায়।

অঞ্চলে অভাব বাড়ে, চুরি-ছিনতাই-ডাকাতি বাড়ে। এখনকার নতুন লক্ষণ হয়ে চোরডাকাত সন্দেহে গণধোলাই ও মৃত্যু। খুনজখমের বিনারা আগেও হত না, এখন আরো হয় না। হরিপদ কাহাকাছি পুলিশ চৌকি বসাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে। তরুণ এম. এল. এ. তার সব কথাই শোনে এবং গ্রামগুলি ভুলে গিয়ে কোমারডিতে আরেকটি চৌকি বসায়। চোলাই মদের কারবার হুহু করে কচুরিপানার মত সতেজ স্পর্ধায় ছড়িয়ে পড়ে। কোমারডি থেকে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটি পথ হয়। শাঁকটা কাছে আসে। হরিপদ বলে, রক্তেশ্বরীর পাড় দিয়ে রাস্তাটা করুন এবার। আমরা যে নির্বাসনে, সেই নির্বাসনেই রইলাম যে।

এম. এল. এ. সব কথাতেই 'হ্যাঁ' বলেন এবং একই সঙ্গে বলেন,

পঞ্চায়েতের কাছ থেকেও প্রস্তাবগুলো আসা দরকার।

এরপর তিনি, এ অঞ্চলের বহুজনী হরিবলের পাগলপারা বর্ষাধারার মতো নানা-মুখে ছোটাছুটি সংযত করে বড়বুজাপুর দু নং পঞ্চায়েতের দিকে বহাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। অতি সত্বর তাঁর শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ওরশদের জন্যে পাকা শৌচঘর এবং কোমারডিতে বাসযাত্রীদের জন্যে সিমেন্টের ছাউনিযুক্ত প্রতীক্ষাঘর এবং চৌরাস্তার মোড়ে নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়। তিনটিই তিনি একদিনে উদ্বোধন করে আবার উধাও হন। ঝকপুরে হয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। হরিপদ কোনো ভালো ঠিকাদারি বাগাতে পারে না বটে, কিন্তু দুটি মিনিবাস কোনমতে বাগিয়ে নেয়। বউকে বলে, আর কিছু হবার নয়। এদের, বুঝলে? তপশীলি জাতি বলে কোনো দরদ নেই। রাস্তাটার ব্যাপারে আমার টেণ্ডার নিলই না।

বউ বলে, রাস্তা না হলে আমি দেশে যাচ্ছি না বাপু। শহরে থাকার পর দেশে কেউ থাকতে পারে? সব বেচেবুচে চলে এস।

—কিনবে কে? আর শাঁকাটার মধু কোথায় তা তো বুঝলে না।

—তোমার মধু সুদের টাকায়!

এমনি করেই সময় বর্তমানের দিকে এগোয়। আর, চৈত্রের শেষদিকে চারদিকে যখন চড়কের মাতন, শাঁকাটার মানুষগুলি যখন শুকনো মুখে, চামসে পড়া পেটে তবু চড়কের আয়োজনে মাতছে, তখন চোলাই-মদের ব্যবসায়ী বলে, শুনেছ তোমরা খবর?

—কি খবর?

—বুধিরামকে ছেড়ে দিচ্ছে। আজকালের মধ্যেই খালাস হবে। বিনা বিচারে বন্দী রেখেছিল যাদের, তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছে তো! বুধিরামকেও ছাড়ছে।

—বল কি? সে না পাগল?

—কবে সেরে গেছে। কেউ খোঁজ নেয় নাকি জেলখানায়। এবারে কি জন্যে যেন জেলহাজত খালি করছে।

—বুধিরাম ছাড়া পাচ্ছে। জান?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। জেলের ডাক্তার বলল।

শাঁকাটা গ্রামে দীর্ঘকাল বাদে 'বুধিরাম' নামটি নিয়ে আলোড়ন ওঠে আরেকবার। বুধিরামের সমসাময়িক কয়েকজন এবং যুবকদের বেশ

কিছুজন এখন মদ তৈরি ও চালানে পয়সা পায়। চড়কের সময়টা তারা সংযমে থাকে। সংক্রান্তির রাত ভিন্ন নেশা করে না। এই রকমই নিয়ম এখানে। পরিষ্কার মাথায় ভাল চিন্তা আসে। চল হে আমরা তাকে নিয়ে আসি। এনে আমাদের ঘরেই রাখব। মন হয় তো আবার বিয়ে করবে। ঘর একটা তুলে দিব। সে থাকত তবু পাঁচজনার কথা ভেবেছে। আর জেল খাটল তো নিদোষে।

রামেন্দ্রর মনে পড়ে ও বলে, বিলোসিনীকে বড় ভালবাসত হে। নিজের না জুটলেও তাকে খাওয়াত।

—রাখো রাখো। অমন কত বিলোসিনী জুটবে। তার বয়সটা বা কি এমন ?

– বউ জুটবে। বিলোসিনী জুটবে না। কে বলবে ডোমের মেয়ে। যেন দুধভরা পেতলের কলসি !

রামেন্দ্ররা শহরে চলে যায়। বুধিরামকে দেখে ওরা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। চুলগুলো সাদা। শীর্ণ চেহারা, শুধু কপিশ চোখ দুটি ছাড়া আগেকার বুধিরামের কোন চিহ্নই নেই। কী শান্ত, কী ধীর। তাকে দেখে রামেন্দ্রর বুক ফেটে যেতে থাকে। সেদিন বুধিরামই বলেছিল, হরিপদ যেমন মানুষ হোক না কেন, চেনা মানুষ, গ্রামের লোক, ফেলে চলে যাব ? যার ভাল করতে গেল সেই ওর জীবনে ছাই ঢেলে দিল।

চায়ের দোকানে বসে ওরা, চা ও বিস্কুট দেয় বুধিরামকে। তারপর রামেন্দ্র বলে, ঘরে চল্।

—বাবা কবে মরে গেল ?

—তুই জানলি কি করে ?

—ডাক্তারবাবু বলেছে। ডাক্তারবাবুকে বলেছে···

—বুঝেছি। মণি সাহা বলেছে।

—বিলোসিনীও নাই ?

—চলে গেল। তুই আমার ঘরে থাকবি বুধিরাম। ভোকে আমরা আবার ঘর করাব।

—চল্. যাই

সারা রাস্তা বুধিরাম কথা বলে না। মাঝে মাঝে কথার জবাবে একটু হাসে শুধু। তবে চড়কের কথা জিগ্যেস করে। এবার মাতন কেমন ? সে কি, কেদার কাকা অসুখে পড়ে ? তবে ঢোল বাজাবে কে ? কাঁটাঝাঁপ,

আগুনঝাঁপ, হবে তো ? এবার কোন্ গ্রামের পালা পড়েছিল ? গাজনতলা সাফ করল কোন্ গ্রাম ? নাচ হবে না ? নাচ ?

-নাচ হবে, তবে খড়ের মুণ্ড নিয়ে। লাশঘরে লাশ আর মিলে না। এখন সব খুনজখম, কামেলার লাশ। তাতেই মিলে না।

—তাই ?

বুধিরাম আর কিছুই বলে না। গ্রামে পৌঁছে ও রামেন্দ্রর বাড়িতেই ওঠে। রামেন্দ্রর বউ বিলোসিনীর বন্ধু ছিল। সে বুধিরামকে দেখে বড় দুঃখ পায়। জলের ঘটি ও গামছা দিয়ে বলে, তার কথা ভেব না দেওর। ভাল মেয়ে অনেক মিলবে।

বুধিরাম খুব আস্তে বলে, হ্যাঁ বউদিদি।

সকালে বুধিরাম বলে, ঘরটা দেখে আসি।

পোড়ো ভিটে, গাদেঝোপে ভুতুড়ে। বুধিরাম একটি তরুণ নিমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ হয়ে। তার শরীর নিশ্চল হয়ে যায় এবং এক সময়ে তার গা বেয়ে একটি কাঠবিড়ালি নেমে যায়। ঘরের কাঁধ গলে নামতে নামতে চৈত্রের পোড়া রোদে পাথর হয়ে গেছে। চাল ধ্বসে গেছে। কালকাসুন্দে, কন্টিকারি, কাঁটানটের ঝোপ। বাবার মাথালটি ঝোপের মধ্যে দেখা যায়। বুধিরামরা বলে 'পেকে'। পেকেটা আছে, মানুষটা নেই। বাবা পেকেটা রেখে গেল। বিলোসিনী কিছু রেখে যায়নি ? বুধিরাম ফিরে আসে ও রামেন্দ্রকে বলে, কোদাল, হেঁসো দে দেখি। ভিটাটা সাফ করি।

—আমিও যাই ?

—দা নিয়ে আয় একটা। গাছগুলান কাটতে হবে। জোড় হয়ে গিয়েছে।

—চল্।

—তুই থাক। আমার আর কাজ কি বা আছে। আমিই করি।

বুধিরাম চৈত্রের উদাস করুণ দিনে ভিটে সাফ করে। নিমগাছগুলি রেখে দেয়। ঝোপঝাড় কেটে পাঁজা করে। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একটি ত্রস্ত সাপকে সে মারে। বাসা ছেড়ে লটা পাখি উড়ে যায়। ওরা ঝোপে বাসা করে। এখন, কাঁথের কুলুঙ্গিতে কী যেন দেখা যায়। বড় দুমূল্য জিনিস। বিলোসিনীর মাথার লাল চিরুনিটা। লোহার কড়াই, খুন্তি, পচা চালে পিটাতে মাটিতে পড়ে চালে গোঁজা দা-হেঁসো। সব মরচে ধরে

গিয়েছে। উঠানে পর পর রাখে সব বুধিরাম। বাবার পেকে, বিলোসিনীর চিরুনি, তার দা-হেঁসো, লোহার কড়াইটা। আছে, সবই আছে। পতিত ভিটে হলে অন্য কথা। সেখানে কেউ ঘর তোলে। ঘরের মানুষ জীবিত থাকলে সে ভিটেতে কেউ চট করে ঘর তোলে না। এই কড়াই-খুন্তি-দা-হেঁসো জানিয়ে দিচ্ছে যে গ্রামবাসীরা বুধিরামকে কত ভালবাসে। কেউ কিন্তু নেয়নি। একদিনে হবার নয়। আবার আসব। ভিটাতে বাবার কাজ একটু বাড়িয়ে হয়। শুনলাম দীননাথ করেছে। তবু ছেলের হাতে জল বলে কথা। বাবা! আমার কোন দোষ ছিল না। নির্দোষে মরাল।

কয়েকদিনে ভিটা পরিষ্কার হয়। সবাই বলে, না! বুধিরাম পাগল হয় নাই। ভিটায় ভিটা বাঁধবে। চড়কটা যাক। পাঁচকনা খেটে ঘর তুলে দিব। বাঁশ, খড়, দড়ি, চাঁদা করে উঠাব। বুধিরাম সকলের কথা নম্র বিনয়ে শোনে ও অল্প অল্প হাসে। কেদার সদুঃখে বলে, সে বুধিরাম আর নাই রে! হরিপদ এ সময়ে গ্রামে। সে জানে যে বুধিরাম এসেছে। এদিক পানে সে আসে না বা হাঁটে না। তবে তার মান্দেরকে দিয়ে পরোক্ষ প্রস্তাব পাঠায় যে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। পিছনে ফিরে গিয়ে কি বা লাভ? সে দুইশত টাকা দিতে রাজী আছে। বুধিরাম নতুন করে জীবন শুরু করুক। বুধিরাম অল্প হাসে। সব হবে। চড়কটা যাক। ভিটার ঝোপজঙ্গল শুকাইয়া তাতে আগুন দিব। তারপর নতুন ঘর উঠাই। আটটা বছর কোথায় চলে গেল তার তালাসহিসি করি। সব হবে। হবে না কেন? সে বুধিরাম আর নাই গো মান্দের দাদা। যে বুধিরাম সহজে চেতে উঠত, ঝগড়াকেজে করত। এ বুধিরাম অন্য মানুষ। যাও, বাবুকে সব যথাযথা বলগা।

চড়কের দিন এভাবেই আসে। বড়-সুজাপুর-বানীচক-কাঁকরা-মৌলা সব গ্রাম থেকে ভক্তরা আসতে থাকে। তাদের হাতে খড়ের নরমুণ্ড, খড়ের কবন্ধ। সেই কবে লড়াই হয়েছিল এখানে ডোমরাজাতে আর মোগলরাজার সেনাপতিতে। তখন রক্তেশ্বরী দু'কূল ভাসিয়ে বহে চলত দশ মাস, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া। আগে ডোম বাগে ডোম পিছে ডোম সেজেছিল। রাজা চেপেছিল পাহাড় প্রমাণ কালো ঘোড়ায়। সে ঘোড়ার পিঠে রণসাজ, ক্ষুরাঘাতে বিজলীঝলক। চাঁইমেগর-ঘাঘর রণবাদ্য বেজেছিল। ডোম সেনাদের হাতে তীরধনুক-বল্লম-বর্শা-টাঙ্গি। শুরবীর জাত। ভীষণ লড়াই হয়েছিল আর প্রথম যুদ্ধে মোগলরাজার সেনাদল হেরে যায়। অযোধ্যও

ডোমরা সে সংক্রান্তির দিনে শত্রু সৈন্যের মাথা-হাত-পা নিয়ে নেচেছিল রাজার ঘোড়ার নাচ কি ! তার ক্ষুরাঘাতে শ্মশানদহ তৈরি হল। ডোমদের আর সেদিন নাই হে ! এখনও এই একদিন আমরা সে কথা মনে করি, তাণ্ডব নাচি। লাশ পাইনা তো খ্যাড়ের নরমুণ্ড নিয়ে নাচব। রাত হবে, হ্যাচাক জ্বলবে, দিকদিক হতে শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীরা আসবে। তারাও নাচবে। যত নাচি, তত পাগলপারা হই, মনে থাকে না আমরা উপাসী কাঙালী। নাচে নাচে আমরা পিতৃপুরুষের কাছে যাই। পিতৃপুরুষের কাছে।

রাত আটটা নাগাদ বুধিরাম ভিড় থেকে সরে পড়েছিল। এখন সকল ডোম শ্মশানদহে স্নান করবে, হরিপদও করবে। রক্তের বিশ্বাস। তারপর ডোমরা নাচবে, সে নাচবে না। বুধিরাম ছায়া হয়ে তার পিছু নেয়। হরিপদর বয়সও বেড়েছে। সে ধীরে ধীরে চলে। বুধিরাম ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার ওপর। এক হাতে তার মুখ পেছন থেকে চেপে ধরে। তারপর তাকে নিজের ভিটার দিকে টানতে থাকে, কেবলই টানতে থাকে। আততায়ী যে বুধিরাম, তা হরিপদ ভালই বোঝে ও ভীষণ আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে যায়। আটটা বছর হরিপদবাবু, আটটা বছর ! আমার বাবা, বিলোসিনী, আমি ! বুধিরাম আর সে মানুষ নাই। সে নিজেকে লুকাতে শিখেছে। বুধিরাম তাকে টেনে ও পাছড়ে নিয়ে যায়। মাদেরটি হরিপদর গামছা কাপড় নিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখেছে ? দেখুক ? বুধিরাম তো দেখাতেই চায়।

চড়কতলায় তাণ্ডব নাচে ভীষণ গতি তখন। ঘন ঘন নেশায় সবাই রক্তচোখ। ডোমরাজার সেনানী ওরা সব। শত্রুকে মেরে তাদের হাত-পা-কবন্ধ নিয়ে সবাই নেচেছিল। খড়ের মুণ্ড-কবন্ধ-হাত নিয়ে সবাই নাচে। বুধিরাম সেখানে নরমুণ্ড ধরে নাচতে নাচতে ঢোকে। উন্মত্ত নাচ। ওরে শালোরা, খ্যাড়ের মাথা লিয়ে নাচ করিস ? বুধিরাম খ্যাড়ের মাথা লিবে নাই। আমার হাতে শত্তুরের মাথা রে, শত্তুরের মাথা ! নৃত্যরত মানুষগুলি চীৎকার করে ওঠে, বুধিরাম কেঁদিয়ে নাচতে থাকে। কোথায় কি বাঁধ ভাঙে, যাদের হাতে কিছু নেই সে-সব ভক্তারাও নেমে পড়ে নাচতে। বুধিরামের মুখে হাসি লেগে থাকে, চোখ আধবোজা। ও শুনতে পাচ্ছে অন্য কোন নাচের মন্ত্র, ঘোড়ার খুরে খটাখট, নাচের তালে ঘোড়ার দেহে রণসাজ বাজে ঝনাঝন। নাচে নাচে ওরা পিতৃপুরুষের কাছে চলে যায়।

পুলিশ আসতে আসতে সকাল হয়ে যায়। বুধিরাম তখনো নাচছে। থামো, থামো, থামাও নাচ! —কেউ শোনে না। সকলে চালান হয়ে যাবে! —শত শত লোক সে কথাও শোনে না। পুলিশের কথামত কেউ বুধিরামকে ধরতে এগোয় না। যে জন্ত পিতৃপুরুষের সঙ্গে এক হয়ে আছে তাকে ধরা বড় দুষ্কর।

(শিলাদিত্য / পূজা / ১৩৮৯)

ভীষণ যুদ্ধের পর

মহাশ্বেতা দেবী

বছর দশেকের ছেলেটা, মাথায় রুক্ষ, লালচে চুল। কোমরে থাকে একটা হাফপ্যান্ট আর মাথাটি ঝেঁকে ঝেঁকে ও যখন চলে তখন চার দিকে চেয়ে চেয়ে যায়।

শুকনো কাঠকুটো দেখলেই কুড়িয়ে নেয় খপ করে। অনেকদিন ঘোরাঘুরি করে ও রোহিনী বাজারের দোকানীদের কাছ থেকে একটা নুনের বস্তা পেয়েছে।

বস্তাটা ওর সঙ্গের সাথী। এখন ও কাঠকুটো যা পাবে তাই ওতে ভরবে। বাবুদের বাগানও। গাই বাগালি করতে গিয়ে ওর গরু খোঁজে ঘাস, আর ও খোঁজে ঝোড়ো হাওয়ার পোড়ো আম, শুশনি-কলমি শাক, মেটে আলু। সব ও তুলে তুলে বস্তাটায় ফেলে। বাজপাখির মত ধারালো চোখ ওর।

বাবুদের গরু নিয়ে ও ডুলং-এর একটুখানি জল পেরিয়ে চরে ওঠে। চরের ঘাসে গরু চরে আর খায়। ও এই চর পেরিয়ে দৌড়ে যায় সুবর্ণ-রেখার জঙ্গলে। এখানে ডুলং নদীর এক ধারা। সুবর্ণরেখার দুই ধারা। তিনটি স্রোত, দুটি চর। আরো উজিয়ে গেলে সুবর্ণরেখা আর ডুলং হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছে।

ছেলেটা সুবর্ণরেখার জলে ধোচনা পেতে রেখে যায়। ধোচনা হল বাঁশে বোনা খাঁচা জাল। ধোচনার ফাঁদে মাছ পড়ে কাঁদে। ছেলেটা যদি মাছ পায় শুঁড়ো কুচো তাহলে মহা নিশ্চিন্ত। তখন ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে আহ্লাদে গোনে,—শাক তুলেছি, শাক খাব। কুচো মাছের টক খাব। মেটে আলুটা দোকানে দেব, নুন নেব, তেল নেব।

তারপর, একা একা তিনটে নদী, দুটো চর, গাইগরু আর ঘাস কাশকে শুনিয়ে ও গল্প বলে মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে,—তারপরে না, যুদ্ধ হল! সে কি ভীষণ যুদ্ধ, কি যুদ্ধ! তীর চলেছে শন্ শন্। কামান হাঁকছে দম দম। ঘোড়া ছুটছে খট খট সে কি যুদ্ধ!

যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কিসের যুদ্ধ কাদের যুদ্ধ, কেন যুদ্ধ কিছু জানে না

ছেলেটা। শুধু জানে যে ভীষণ যুদ্ধ হল।

কেন যে ছেলেটা শুধু যুদ্ধেরই গল্প বলে, আকাশ-বাতাস কাশ-তিনটে-গাইবাছুর আর কালো-সবুজে ছেত্রা ফড়িংদের, তা কেউ জানে না, কেননা কেউ গরু-বাগাল ছোট ছেলেদের কথা ভাবতে সময় পায় না।

ছেলেটা কেন যুদ্ধের কথা বলে তা জানতে হলে ছেলেটার সকাল থেকে কিছুক্ষণের রুটিনটা জানতে হবে।

কাক ভোরে ও ওঠে আর ওদের অসম্ভব নীচু ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। খুব অধৈর্য হয়ে পুব আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যকে যেন ও বলতে চায়, উঠে পড়ো বন্ধু, তুমি আর আমি, আমাদের তো ছুটিছাটা নেই। দেরি করছ কেন?

এই সময়ে ও ছুটে যায় ডুলং নদীর ধারে। সেখানে যায় কেন বল তো? নদীর জল আর নদীর পাড় ওর বাথরুম। ওর মত অনেক মানুষের।

ঘুম চোখ মুখে একছুটে ফিরে এসে ও ঘর থেকে ছাগল দুটোকে বের করে উঠোনে কাঁঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে দেয়। অনেক কাঁঠালপাতা আর জল রাখে। বেলা হলে ওর বন্ধু যখন ছাগল চরাতে যাবে, এ দুটোকে নিয়ে যাবে।

তারপর ওর মস্ত ঘরে আবার ঢোকে। খুব বড় ঘর। কেন না দু দিকে দেয়াল ভেঙে আকাশ ও মাঠ দেখা যাচ্ছে। তাতেই ছোট ঘরটা খু—ব বড় হয়ে গেছে। ওর ঘরে রাতে চাঁদ আর দিনে সূর্য বাঁধা আছে। কেন না ঘরের চাল ভাঙা। সে ফোকর দিয়ে জ্যোৎস্না আর রোদ যে যার সময়ে খেলা করে ডিউটি দিয়ে চলে যায়। এই ঘরে ওর রাজপালঙ্ক হল এক বাঁশের মাচা। সে মাচাতে চাটাইয়ের ওপর কাঁথার ডানলিপিলো। মাচার নীচে ঢুকে ও এক থোরা পান্তা ভাত বের করে। খানিক ঢেলে নিয়ে হুশহাশ করে খেয়ে চলে যায় কাজে।

কত যে কাজ ওর থাকে। বাবুদের বাড়ি কত বড়। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠোন। বাবুদের পূর্বপুরুষ তৈরী করেছিল বাড়ি। বড় বড় চৌকো পাথর কোথা থেকে কারা এনেছিল? বাবুদের হাতি রাখার জন্যে পাথরের এক খুব উঁচু থাম দেয়া ঘর ছিল। বর্ষায় বা শীতে হাতি থাকবে কোথায়?

সে-ই হাতিঘরের চারিদিকে দেয়াল গেঁথে তুলে বাবু ধান রাখে। পূর্বপুরুষের তৈরী পাথরের একতলা বাড়ির ঘরে ঘরে ধান-চাল-কলাই।

বাবু নতুন বাড়ি তুলে নিয়েছে।

এই মস্ত উঠানটা ঝাঁট দেয় ছেলেটা ছুটে ছুটে। দেউড়ি ঝাঁট দেয়। টিউবওয়েলের জল নিয়ে দেউড়ি ফটকের সামনে ছিটোয়। বাগানে জল দেয়।

এত কাজ সারা হলে তারপর ও গরুবাছুর নিয়ে বেরোয়। গরুবাছুর নিয়ে যাবার পথ ওর গ্রামের বেসিক প্রাইমারি স্কুলের পাশ দিয়ে। স্কুলের নতুন মাস্টার ছেলেদের রোজ গল্প বলে। গল্প বলে খানিকক্ষণ, তারপর পড়াতে থাকে।

গল্পটা যে মহাভারত, তা ছেলেটা জানে না। ও শুধু একটু শোনে, তখন ভীষণ যুদ্ধ হল। খুব তীর চলল, খুব যুদ্ধ।

একদিন মাস্টার বলল, সিপাহী যুদ্ধের কথা। কি বলছে তা তো ছেলেটা জানে না। ও শুধু শুনল, তখন ভীষণ যুদ্ধ হল। খুব কামান ছোঁড়া হল।

মাস্টার ওর ঝকঝকে চোখ আর জিজ্ঞাসা ভরা চোখ পড়তেই ও মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায়। কাঁধে বস্তাটাই থাকে।

বস্তাটা নিয়ে ও ভীষণ যুদ্ধই করে। রোজ শাকটা, মাছটা কাঠকুটোটা নিয়ে ও বস্তায় ভরে, গরুর পিঠে চাপায় আর ঘরে নিয়ে আসে।

কি যত্ন যে করে বস্তাটাকে, তা যদি দেখতে। ডুলংয়ের জলে বস্তা কাচে আর গাছের ডালে ডালে শুকোয়। বর্ষার জলে বস্তাটা ওর জল আটকাবার বর্ষাতি। শীতকালে বস্তাটা ওর লেপ।

বিকেল হলে ও বাবুর বাড়িতে বসে চারটি মুড়ি খায়। তারপর গরু-বাছুরকে খেতে দিয়ে গোয়ালে তুলে দিয়ে, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে তবে ওর ছুটি।

তখন ও বস্তাটা নিয়ে ঘরের দিকে ছোটে। বাপ রে বাপ এখনি তো ওর আসল কাজ। ঘরে বসে থাকে ওর দাদু।

দেখ কি কাণ্ড। না বলেছি ছেলেটার নাম, না বলেছি ও দাদুর নাম।

ওর দাদুর নাম মতিরাম। ওর নাম পতিত। ওরা জাতে মুণ্ডা। মুণ্ডা মানে আদিবাসী। তবে পতিত নিজের ভাষা, যার নাম মুণ্ডারী ভাষা তা জানে না।

মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। আদিবাসীরা যত বুড়ো হোক, বসে থাকে না। মতিরাম বসে থাকার মানুষ নয়। কিন্তু পতিত যখন এতটুকু

ছেলে, কলেরায় ওর বাবা আর মা মরে গেল। সে ভারি এক অবাক কাণ্ড!

ওরা ছত্রিশজন লোক জেলে গিয়েছিল। বছরের পর বছর যে বাবুর জমিতে বর্গা করে, সেই বাবুর জমির ধান লাগাতে গিয়েছিল। বাবু যে ওদের কিছু জানায় নি আর শহরে বসে আরেক বাবুকে জমিজমা বেচে দিয়েছে, তা তো কেউ জানে না।

নতুনবাবু বলল, আরে! এরা কে এসে আমার ক্ষেতে ধান চারা রুইতে লেগেছে বাবু? আমি তো জানি না।

এ হল গে, আট নয় বছর আগেকার কথা। নতুন বাবুর কথায় পুলিশ সকলকে জেলে নিয়ে গেল। ঘরে ফেরার সময় কোন মেলায় পচা খাবার খেয়ে কলেরা হয়ে পতিতের বাপ মা মরে গেল।

মতিরাম বলল,—ঠিক আছে। আমি কাজ করে নাতিকে মানুষ করব।

মতিরামই এখানে চলে আসে আর বাবুদের বাড়ী কাজ নেয়। বাবু অবশ্য বলত,—মতিরাম! তোর নাতিটাকে দে। বাগানের কাজ করবে।

—না বাবু। তা হবে না।

কেন রে?

—আমার জনম গেল বাগালি কাজ করে আর পরের জমিতে খেটে। ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাবার বড় ইচ্ছে ছিল। তা ছেলের মা মরে গেল। বাবু তো একা আমাকে খেতে দিত। বাড়িতে ভাতটা আনতে দিত না। ছেলেটা কি খায়? সে লাগল বাগালি কাজে। তাতেই তার লেখা-পড়া শেখা হল না।

—সে তো ভালই করেছিলি।

— কি ভাল করলাম বাবু?

—ছেলেকে যে বাগালি কাজে দিলি!

—কেন? খেতে পায় নি, তাতেই তো সে গিয়ে বাগাল হল, না কি বল?

—খেতে তো পেত!

—মুড়ি···পান্তা···

—নাতিটাকে দে।

—না বাবু। নাতিকে আমি লেখাপড়া শেখাব। আমি জানতাম না লেখাপড়া, তাতেই না জমি চলে গেল। কত কষ্ট করলাম সারা জীবন।

—লেখাপড়া শিখাবি ? তোদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের কাজগুলো কে করবে ?

—না বাবু, ওকে কাজে দেব না।

খুব জেদ ছিল মতিরামের। ওর যখন ভারি অসুখ হল, হাসপাতাল যেতে হল। সে সময়েই পতিত হল বাবুর বাগাল।

ফিরে এসে মতিরাম পতিতকে খুব মেরেছিল। বলেছিল তোর বাবা যখন তোর মত ছোটো, তখন এত ইস্কুল ছিল না ? এখন গ্রামে গ্রামে ইস্কুল হয়েছে, তুই পড়বি না ?

সুবল সিং, এক বুড়ো মুণ্ডা, সে মতিরামকে খুব বকেছিল। বলেছিল, —মতিরাম ! এখন তোর শরীর খারাপ। পরিশ্রমের কাজ তুই পারবি না। ছেলেটা পড়বে যে, খাবে কি ?

এ সব কথার কি জবাব হয় ? মতিরাম আর কিছু বলে নি। রাগের চোটে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। ও বলল,—বেশ ! বাবু যা বলেছিল তাই হল তো ? আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে বাবুদের কাজ চলে না। তাই হোক, তাই হোক।

যেন কেমন হয়ে গেল মতিরাম। এখন কাজের মধ্যে ঘরে বসে খেজুর পাতার চাটাই বোনে আর হাটে বেচে। ও কেনে চাল। পতিত আনে তেল নুন।

আজ, পতিত ঘরে ফিরতে মতিরাম বলল,—মাস্টারটা এসেছিল। তোকে ইস্কুলে পাঠাতে বলে।

—তুই কি বললি ?

—আমি বললাম, ইস্কুলে যাবে তো খাবে কি ? বাতাস খেয়ে থাকবে ?

—কি বলল ?

—আর কি বলবে ?

—আমি তো পড়তে চাই।

আর কথা বলল না পতিত। কাজ তো ফুরায় না ওর। এখন টিউব-ওয়েল থেকে জল আনবে, রান্না করবে। রান্না তো হয় রাতে। সকালে পান্তা খাও, সারাদিন চুপ করে থাকো।

রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, ভীষণ একটা যুদ্ধ হচ্ছে আর পতিত নিজেও খুব লড়ছে।

পরদিন মাস্টার ওকে ধরে ফেলল।

—এই, শোনো, শোনো।

—কি বাবু ?

—তুমি ইস্কুলে আসনা কেন ?

—কেমন করে আসব ?

—তুমি আস না, তোমার মত আরো কয়েকটা ছেলে আসে না।

—আমরা যে বাগাল গো !

—পড়লে পরে টাকা পাবে, মাইনে লাগবে না।

পতিত এ কথার জবাবে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ল খানিকটা। তারপর বলল,—যুদ্ধ যুদ্ধ বল তুমি, যুদ্ধটা কোথায় হয়, না কি হয়ে গেছে ?

মাস্টার ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখে। চোখ নয়তো হীরের ছুরি।

—যুদ্ধ তো অনেকই হয়েছে রে।

—এখন আর হয় না ?

—হলে কি করবি ?

পতিত হাসল। তারপর বলল,—তুমি তো রেঁধে খাও। মেটে আলু খাবে ? বেশ খেতে।

—তুই স্কুলে আয়, তখন নেব। ছাত্র দিলে নিতে পারি, নইলে নেব কেন ?

পতিতের চোখ দিয়ে মেঘ ভেসে চলে যায়। সে বলে, —দাদু তো পড়তে বলত।

—তাহলে ?

—আমি গিয়ে বাগাল হলাম।

—কেন ?

—দাদুর অসুখ হইছিল। খুব অসুখ।

এতেই ওর সব কথা বলা হয়ে যায় যেন। মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে চলে যায় ও। ওর দিকে চেয়ে খুব কমবয়েসী মাস্টারটি বোঝে যে পতিতও মস্ত একটা যুদ্ধ করছে, শুধু ও তা জানে না।

মুণ্ডাপাড়ার প্রৌঢ়া আলোমণি সারাদিন অন্যের ক্ষেতে খাটে। বিকেলে ও মাস্টারকে খাওয়ার জল এনে দেয়। স্কুলের আঙিনায় মাস্টারের একখানা ছোট ঘর। মাস্টার তাকে "মাসি" বলে। আলোমণি খুব শক্তপোক্ত মানুষ।

—মাসি, পতিত পড়ে না কেন ?

—পড়লে তাকে কে খাওয়াবে ?

—তোদের ছেলেমেয়েরা পড়বে না, সরকারের ব্যবস্থা যে বিফলে যায়।

—তুই কি বুঝবি ?

—পড়লে পরে ভালো কত।

—সে তো জানি। আমাদের ছেলেগুলো আজ বাগাল, কাল ক্ষেতমজুর, বাস! জনম শেষ। পড়লে তো ভালো। কিন্তু খেত দিব কি ? বাগালি করে, দুটো ভাত মুড়ি পেল, মাসে পাঁচটা টাকা আনল। তাতে সংসার বাঁচে। আমরা সংসার বাঁচাই আর ছেলেদের চোখ রইতে কানা করে রাখি, এ কি সাধ করে করি ?

পরদিন পতিতকে ডেকে মাস্টার বলে,—দেখ্, যুদ্ধের কথা ভালবাসিস, এই ছবিটা দেখ।

—কার ছবি ?

—বীরসা ভগবানের। নাম জানিস ?

—না তো।

—তোর জাতের লোক। মুণ্ডা। খুব যুদ্ধ জানত আর যুদ্ধ করেই মরে যায়। পড়তে এলে পতিত সব জানতে পারতিস নিজেই পড়তিস।

আজ আর পতিত নদীর চরে গিয়ে অন্য কথা বলে না। দুই হাত ছাড়িয়ে চরের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। ঝিনঝিনে গলায় আকাশ—নদী—ঘাস কাশকে বলে যায়। জাতের লোক বীরসা ভগবান। ভীষণ যুদ্ধ করেছিল, ভীষণ যুদ্ধ।

পতিতের আনন্দ দেখে ডুলাংয়ের ঘোলা জল সুবর্ণরেখাকে বলতে চায় গল্পটা। ছুটে চলে যায় কলকল শব্দে। নদীর ওপার থেকে রামেশ্বরের মন্দিরটা ঝুঁকে পড়ে সে কথা শোনে। ডোরা কাটা ফড়িংরা পাখনা কাঁপিয়ে উড়ে যায়!

সন্ধ্যেবেলা পতিত মতিরামকে বলে,—দাদু! বীরসা ভগবানের নাম জান ?

—সকল মুণ্ডা জানে।

—কি করেছিল সে ?

—তা তো জানি না! নামটা জানি।

পতিত ভাত নিয়ে নাড়েচাড়ে। তারপর বলে,—আমি পড়তে যাব।

—কেন ?

—এখন তোমার অসুখ নেই। ইস্কুল হয়ে গেলে উঠানে লঙ্কার গাছ করব। রোহিনীর হাট কত বা দূরে, বেচে আসব তরকারি। পড়ব আমি।

মতিরাম ওর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর শুকনো গলায় বলে,—দেখব।

—বল পড়তে দিবে ?

পতিত! তুই জানিস না, দেখিস নাই কখনো। আমাদের সমাজের সভা হবে। সেবা কথাটা উঠাই। পাঁচবলা কি বলে তা দেখি ?

—সভা হবে ? আমি দেখব ?

—যাবি ? নিয়ে যাব।

পতিত সমাজের সভায় যাবে সেদিন বাগালি করবে না শুনে বাবু বেজায় রেগে যায়। রাগটি সে মনের মধ্যে চেপে রাখে ও বলে,—এ আবার কি কথা রে তোদের ? শুনে যে হেসে বাঁচি না। জংলী ভূত তোরা, তোদের আবার সমাজ! তোদের আবার সভা।

পতিত বাবুকে কিছু বলতে পারে না। কোনোদিন বলে নি, চট করে বলতে পারে না। কিন্তু বাড়ি এসে গোঙ্গ হয়ে থাকে। সবসময়ে যে পতিত বড়দের মত কাজকর্ম করে, সে হঠাৎ ছোট ছেলে হয়ে যায়। দাদুকে বলে,—আমরা জংলী ভূত ?

—কে বলেছে ?

—বাবু।

—না পতিত। আমরা কেন জংলী ভূত হব ?

—লেখাপড়া শিখি না, ভাঙা ঘরে থাকি, তাতে বলল ? রং কালো, তাতে বলল ?

— ভূত হলে ভূত আছি। ভূত ছাড়া তো তাদের গরু চরানো, মাঠে ধান চাষ, কোনো কাজ হয় না।

—আমি যাব না বাবুর বাড়ি আর।

—বুঝেছি। চল্, গিয়ে সাবান কিনি, সোডা আনি। কাপড়টা তো কাচতে হবে। সমাজে যাব বলে কথা।

সবাই ওরা সমাজের সভায় চলে। যে যা খাবে মুড়ি ছাতু ভাত, বেঁধে নিয়ে নিলো। গরিবের সমাজসভা। যে যার খাবার খাবে। আলো-মণিরাও এসে পড়ে।

কত বড় সভা, কত লোক। পতিত অবাক হয়ে দেখে। তার দাদু গরিব বলে কেউ হেলা করছে না। কতজন কথা বলছে। কেউ বলল,—নাতি বুঝি? মুখ দেখলে বলে দিতে হয় না যে কার ছেলে। এ যেন মাণিকচাঁদকেই দেখছি।

তারপর পতিতের অবাক চোখের সামনে একটা মস্ত ছবি তুলে ধরা হয়। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর কাগজ এঁটে তাতে মোটা তুলিতে আঁকা। কি সুন্দর চেহারা, কি রকম পাগড়ি বাঁধা মাথায়, চোখ যেন জ্বলছে আলোর মত।

বীরসা ভগবান! বীরসা ভগবান! ভীষণ যুদ্ধ করেছিল!!—পতিত চেঁচিয়ে ওঠে।

তার গলা ছাপিয়ে কয়েক হাজার গলা বলে ওঠে,—জয়ার বীরসা ভগবান!

পতিতের বুক ভরে ভরে ওঠে। জংলী ভূত! জংলী! জংলী ভূতদের এমন বীরসা ভগবান থাকে না কি? দাদুর হাত ধরে ও দেখতে থাকে আর মাথাটা ওর খুব উঁচু হয়ে যায়। কক্ষনো ওরা জংলী নয়, আর বাগাল হয়ে থাকাই ওদের কাজ নয় কেন ওরা ভাঙা ঘরে থাকে, কেন দাদুর ধুতিটা এমন ফুটিফাটা, সব পতিত একদিন জেনে ফেলবে। সব জেনে ফেলবে ও। বুকের মধ্যে কি যেন তোলপাড় করে। যেন ভুলং আর সুবর্ণ-রেখা এ-ওর বুকে ঝাঁপাচ্ছে। গেরুয়া জলে বান ডেকেছে। সেই যে সমাজ—সভায় যায় পতিত, আর সে বাবুর বাড়ি যায় না। বাবু তো বেজায় লাফঝাঁপ জুড়ল। বেটা বাগাল এমন কামাই করছে? দেখাব মজা।

কাকে মজা দেখাবে, কে দেখাবে? গণ্ডগ্রাম, গণ্ডগ্রাম। খড়্গপুর থেকে গুপ্তমণি বাসে এসো। আবার বাসে চড়ো। নামো গিমড়াতলা। তারপর পায়ে হাঁটে ধানক্ষেতের আল ধরে চার মাইল। তবে পৌঁছবে গ্রামে।

বাবুরা হয় ঘর বাকি সব তো ওরাই। ঘরে ঘরে বাগাল ছেলে-গুলো গরহাজির। পতিতের বাবু শেষে মতিরামের কাছে গেল।

—ব্যাপার কি মতিরাম?

—কিসের ব্যাপার?

—পতিত যে গেল না?

—পতিত আর যাবে না। সে ইস্কুলে গেছে। ইস্কুলে গেলে টাকা

পাবে, খেতে পাবে। বইখাতা পাবে। ও পড়বে।

—ঘটে!

বাবু রেগে উঠল, ইস্কুলে গেলে কি রাজা হবে?

—তা কেন? মানুষ হবে।

— এ তোদের ষড়যন্ত্র। ঠিক আছে। ক্ষেতখামারের কাজও তোদের দেব না আর।

মতিরাম হেসে বলল,— বাইরে থেকে লোক আনবে? স—ব আমাদের সমাজের লোক। কেউ কাজ করতে আসবে না। আমাদেরি নিতে হবে। জংলী ভূত তো আমরা। আমাদের মধ্যে মিলমিশ খুব বেশি।

বাবুর মুখ চুন হয়ে গেল।

আজ পতিতের আনা ঘেটে আলুটা মাষ্টার নিল। নেবে না কেন বলো? পতিত তো ওর ছাত্র। ছাত্র কোনো জিনিস দিলে মাষ্টার নেবে না?

ইস্কুল ছুটি হলে পতিত একাই ছুটে চলে গেল নদীর চরে। ঘোলা জলে চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে ও নীল আকাশকে হেঁকে বলল,—তারপরে না? ভীষণ যুদ্ধ হল।

ডুলং নদীর জল। ঝুঁকে পড়া ঘাসবন সবাই যুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে রোদ মেখে হেসে কুটিপাটি হল। পতিতটা কি বোকা, কি বোকা! ইস্কুলে গিয়ে ও যে নিজেই একটা ভীষণ যুদ্ধে কিতে গেছে তা ও নিজেই জানে না।

(কিশোর ভারতী, পূজা, ১৩৮৯)

জাতুধান

মহাশ্বেতা দেবী

জাতুধান মানে যে রাক্ষস, তা সাজুয়া তিওর কোনদিন জানতে পেত না। রাম সিংগির মাতৃশ্রাদ্ধে সে উপাধিটি অর্জন করে। ভাগীরথীর কূলাশ্রি বেলেটি নামক সেমি-শহর ও সেমি-গ্রামের তিওর পাড়ার অশেষ সৌভাগ্য, রাম-জননী অঘ্রানের ধান গোলায় তুলে, নবান্নের উৎসব সেরে তবে মারা যান। শ্রাদ্ধ হল অসাগর ধানচালের দিনে। রাম সিংগি একদা জমিদার ছিল, তিওররা ছিল তার প্রজা। বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তারা বর্গাদার। ফলে উপসী কেননা উক্ত জমিটি চর-জমি। ভাগীরথী, চরটি এ-সনে ভাসান, ও-সনে ডোবান। তবু মাতৃশ্রাদ্ধে রাম সিংগি সকলকেই ডাকে। বাইন কেটে ভাত র'াধা হয়। সায়েব বাড়ির বাথরুমের বড় বড় টব, নিলেমে কেনা, তাতে ডাল চালা হয়। তিওররা কাঠ আনে, কলাপাতা, উঠোন চাঁছে এবং ভরা শীতে, বর্ণোচ্ছেদের জাত বাঁচাতে বাইরে বসে থাকে। সেখানেই ওদের পাত পড়ে।

সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, 'এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।'

সাজুয়া কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ'্যাট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও, কথা না কয়ে। ওর রাক্ষুসে খাওয়া লোকে দেখে, ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।

পুরুত দাওয়ায় বসে দেখছিলেন। তিনি বললেন, মিষ্টি মেঠাই তাহলে ওই ওড়াবে?'

সাজুয়া মাথা ঝাঁকাল। রাম সিংগি বলল, 'না ঠাকুর মশাই। ভাত খাবে পাহাড় প্রমাণ, সাজুয়াকে জব্দ করতে হলে মিষ্টি দেন পাতে। আট-দশটা খেলেই মুখ মরে যাবে।'

পরিবেশকরা সাজুয়াকে আবার ভাত দিল, ডাল। বলল, 'মাছ খাবি না?'

'খাব।'

'ডাল দিয়ে বেটা পাহাড় সাফ করছে।'

'তুমি দিবার, দিয়ে যাওনা মশাই।'

'লয় লিয়ে যাস?'

'মশাই, যত খেলাম, তত খাব। লিয়ে যাব কাল। এঁটো বাসি লিব। আজ খাব।'

'হেই সাজুয়া, মরবি বাপু।'

'তা দেখ, মা জননী লিত্য মরবে?'

দেখতে দেখতে পুরুত বললেন, 'এ বেটা জাতুধান। মানে রাক্ষস।'

সাজুয়া খেয়ে এসে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, কি বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রাক্ষস মোরে বলে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কি হয়? পেটে খেলে লামের লাথ সয়।'

সাজুয়ার বউটি ছোট খাট, গোল-গোল গড়নের শ্রীময়ী মেয়ে। সে ফিক করে হাসল।

পুরুত বললেন, 'রাক্ষস কি হে! তুমি বাবা জাতুধান! নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বললে বেশ মানাচ্ছে।' 'ত তা

'তা বাবা, পেটটি করেছ বড়। পেটের অন্ন জুটাতে ত মুশকিল

'জুটে কই? জুটে না ত? যেদিন জুটবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।'

সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে, উচ্চারণ করতে জিভেও এড়ে না। কাজ, মানে চাষ-কাজ যখন থাকে, তখনি ওর পেট ভরা মুশকিল। যে বছর চর নেই, চাষ নেই, সে বছর ও বেরিয়ে পড়ে। যতদিন পারে, রাম সিংগির কাছে ধার নেয়। তারপর বউ ও লুংগি, গেঞ্জি, গামছা বেচে দেয়। পোঁটলা বেঁধে ও রওনা দেয়।

বউ বলে, যেও না।'

সাজুয়া বউকে আদর করে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, 'যেতে মন উঠে না। কিন্তুক, ওই দশ দিন কিলো চালে তোর আর মায়ের অনেক দিন যাবে। আমি রইলে সব খেয়ে ফেলব। 'পেট মেরে খাও, ঘরে থাক।'

সাজুয়া গভীর, অপ্রতিরোধ্য দুঃখে মাথা নাড়ে। বলে, 'তাই যদিক পারতম! ঘরে চাল আছে, ভাত খাব নাই, এ ভাবলে মোর মাথায় বাজুকি

নাড়ে। আমি রইতে তোদের আসান নাই। তাবে তুই কাজও করতে পারবি।'

'কোথা যাবে?'

'দেখি, মাতং যেথা লয়ে যায়।'

মাতং ওদের নেতা এবং বছর বছর মাতং ওদের নিয়ে রাঢ় দেশে চলে যায় ধান চষতে। সাজুয়ার বিশেষ ব্যবস্থা। পেট ভাতায় ধান চষে, কাটে, মজুরী ও ধান নেয়। শীতের মুখে নৌকোয় ধান চাপিয়ে এসে পড়ে।

নিজেই বোরা বয়ে আনে। মাতং-এর ওপর ওর এবং ওদের অগাধ বিশ্বাস। অবিশ্বাস্য কম মজুরী ও পেট ভাতায় কন্ট্রাক্টরদের পথ মেরামতি, জোগালি কাজ, চাষের দেওয়ালী কাজ ইত্যাদির এক বিস্তীর্ণ গুডউইল-মার্কেট তৈরি করেছে ও। কোন-না-কোন ভাবে ও লোকগুলিকে বাঁচায়।

সাজুয়াকে মাতংও বলে, 'রাক্ষস বলতাম, জাতুধান হলি। তা ভাল! কিন্তুক আমি ক দিন? এই বুড়া মরলে তোদের হবে কি? কাজের সুতারশি ধরে নিবি, তা এমন খাওয়া খাস, যে দেখে মানুষ ডরায়।'

'সে বার? কাটোয়ার?'

মাতং হ হ করে হাসে ও বলে, সেবার কি হল শোন্ সাজুয়ার মা! কাটোয়াতে চাষ করে আমরা চলে আসব। কুণ্ডুবাবু ত বাড়িতে সত্যনারাণ দিছে। তার কাকা শোঁসাচ্ছিল, তা বুড়া সেদিনই মোল। অশুচ লেগে গেল। যত ভাত তরকারি ফেলা যাবে, ফল-মিস্তি। তা এই হতভাগা বলে, দাও দেখি, খেয়ে লই।

—খেল বটে! সেদিন খেল, জাড়ের কাল, পরদিন খেল, আমরাও খেলাম, কিন্তুক ও খেল আমাদের দশজনার সমান।'

সাজুয়ার মা ক্ষিপ্র হাতে বাঁশের চেঁচারি চিরতে থাকে ও বলে, 'ও পেটে, মোরা কানিং টাউনে, পঞ্চাশের আকাল হল। তা আকালের যত মানুষের যত খিদা ওর পেটে।'

মাতং বলল, ওই ভাতের খিদ। কোথা যাব, খেতে এসে ধান পুজবে, তা পুজার ফল-মিস্টি-বাতসা ওর রুচে না।

সাজুয়া বলল, 'ভাত হতে মিস্টি কি, মোরে বল দেখি? উ শালোর বাতসা—মুড়কিতে মুখ মেরে ল্যায়। থুঃ!

এই রকমই সাজুয়া। আমাদের জাতুধান। কালো, বিশাল দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল; কঠোর পরিশ্রমী বলে যা খায়, তা গায়ে লাগে।

বউ এখন হাসে ও মাতংকে বলে, 'রঙ্গ দেখ যদি! সেদিন ঘরে চাল নেই। আমি আনতে গেলাম। খুব ঝড়। মা বলে, ছাগল দুটা ঘরে উঠা। তা হোথা শুয়ে র'ল খোসলা গায়ে? বলে কি! বাতাসে ছাগল উড়াক, কান্দীতে নিক, ফরকায় নিক, আমি লড়ব না। অঙ্গ নাড়লে খিদা চেগাবে। তোর বউ আসুক, কতখানিক চাল আনে দেখি, তখন যদি বা বা—বাতাস থাকে, তাইলে তোর ছাগল, সবার ছাগল তাড়য়ো লয়ে ঘরে উঠাব।'

মাতং বলে, 'সেদিন তুমু শালো, মনিবের পাঁঠা ঘরে উঠালছ। ঝড়ের দিনে। মনিব জানে না, অাঁ? তুমু?' 'আরে মোর শাকা ভীম! সেদিনই তুম, গোকুল, ফাগুনাল, মাঁস খেয়, দিই নাই?'

'যাঃ, খাছিস তো খাছিস!'

'খুড়া, সমসারে ভাত চাল, ভাত খাসি, ভাত সামিগাগি। মনির বৈটার পেটে নানা রোগ। খেতে পারে না। আমি পারি।

জুটে না। তাতেই জুটাতে হয়। মাঝ মধ্যে।'

এবার বর্ধমানে নিব।'

'খুব খাব। ডিংলা সিজাব, বেগুন পুড়াব, নুন মরিচ মেরে দিব। আঃ! বর্ধমানে কত ধান রে! কানাল ছুটে যেমন নষ্ট মাগী, ধান হয় যেমন মাটির অঙ্গে মায়ের দয়া! খুব খাব।'

কথাবার্তা হয়ে যায়। সাজুরা ঘর ছাড়ে। গভীর, গভীর পত্নী প্রেমে, জননীর প্রতি ভালবাসায়। ও থাকলে, এই টানের দিনের সব চাল খেয়ে ফেলবে। ওরা বউ-শাশুড়িতে, আজ আমানি, কাল পান্তি, পেট মেরে মেরে খাবে ক দিন ধরে। চলে যাবার কালে কোলের ছেলেটা, একমাত্র সন্তান ওদের, গোঁদা নুনা শিশু জগন্নাথের জন্যে সাজুয়ার কষ্ট হয় এবং ভাবে, ফরকায় টাকার খেলা, চারিদিকে কত রাস্তা, ব্যাবসা, বাণিজ্য, ওকে কেন পেটের ভাতের জন্য চলে যেতে হয়?

মা বলে, 'তার আনিস।'

বউ বলে, 'লাল নীল নাইলং সুতা।'

ও বলে, 'আনব।'

তারা এবং বেত এবং নাইলন সুতোয় বেঁধে নানা রকম ডালা, কাঁপি, সাজি তৈরি করে এরা বাঁশ চিরে-চিরে। মহাজন নিয়ে যায়।

এ ভাবেই চলে, চলতে থাকে, যতদিন না নতুন চক্রে বান আসে।

রঙের বান, চঙের বান। আকাশে মেঘ ঘুরে-ঘুরে ফেরে। চেপে বৃষ্টি হয় না। যেন শরতের বৃষ্টি। আসে যায়, আসে যায়। সাজুয়ার মা বলে, 'যত জল সব শওরে ? চাষী-বাসী দেশে জল নেই ?'

'থাক না থাক, এবার অঘাগর ধান, মা !'

ধান এবার হবেই হবে। গাছের গত্ কি, এই মোটা। পাতাগুলি ঘন সবুজ, তেজাল। চরাল জমি, সরকারী সার, খুব জেঁকেধে চাষ।

সাজুয়া জগন্নাথকে কোলে নিয়ে লুফল। বলল, 'বউ ! চল তোরে চর দেখাই।'

'তুমি দেখ।'

'চল !'

'মহাজনের দাদন্।'

ধান-কাটার সময় অবধি এদের পেট চলে মহাজনের দাদনে। সাজি-ডালা-কুলো তৈরি করে। সাজুয়া বলল, 'র, আমি চিরে দেই ?'

'দিলে খেতে চাইবে।'

'হ হ ! বলতে দিব না কিছু। ধান-চাল বাড়ি লিয়ে আসছি।'

মা বলল, 'ত্যাড বুদ্ধি। তাতেই রাম সিংগি পাওনা কাটে তোর ?'

'এবার একটা ডাবা আনব।'

'গরু কোথা ?'

গরু কেন ? বড় হাঁড়িতে ভাত রান্‌বি, ফ্যানে ভাতে ডাবায় ঢালবি, 'আমি নুন-মরিচ ফেলব আর খাব। এক ডাবা !'

বউ বলল, 'তবে আর কি ! খুব গজাবে, লেজ গজাবে, শিং বেরাবে।

সাজুয়া রাগ করল না। ওদের সমাজে সাম্যবাদ। মা বুড়িও বয়ে খায় না, বউও বসে খায় না। ওর সচ্ছল খেটে খায়। সমানে—সমানে কথা ওদের মধ্যে চলে। মা ওদের হাসি শুনল, বলল, 'ঘরে বসে রঙ্গ ! যা না, গিন্নি মা বাগাল চাঁছাবে ?'

রাম সিংগির নারকোল গাছগুলির পাতা চেঁছে কাঠি বের করার কাজটি সাজুয়া নিজেই নিজেকে দিয়েছে। তখনি ও মনিব বাড়ি গেল। কপাল ওর খুবই প্রসন্ন। মনিব্যান বলল, 'বাইরে শুনে যাস্।'

'কেন, মনিব্যান ?'

'শোন্ গা।'

রাম সিংগির বলল, 'কাজ আছে, বুঝলি ? নারকেল বাগানে চালা বাঁধ ক'টা।'

'কেন ?'

'বেটা জাতুধান ! খেতে জানে, ভাবতে জানে না। গরু-মোষ রাখতে হবে না ?'

রাম সিংগির গাই-মোষ অনেকগুলি। দুধের টাকা মনিব্যানের নিজের টাকা। বছর তিরিশ আগে, বাঁজা মনিব্যানের সম্মতি নিয়ে রাম সিংগি শালীকে বিয়ে করে। সম্মতি দিয়ে মনিব্যান ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসেছিল। তখন রাম সিংগি এক আঁজলা টাকা দিয়ে বউকে বলে, 'মোষ কেন, মাদী মোষ। দুধ বেচ। এ তোমার স্ত্রীধন হল।'

রাম সিংগির দ্বিতীয় পক্ষ পুত্র ধন বাড়িয়েছে বছর বছর। ছেলের মা। মনিব্যান বাড়িয়েছে স্ত্রীধন। দুশাল গাই-মোষ নিয়ে তিনজন চাকর ভাগীরথীর পাড় ঘেঁষে থাকে। পর পর চালা ঘরে সমৃদ্ধ বাথান।

সাজুয়া রাম সিংগির কথা শুনে, কেন গোয়াল তুলতে হবে তা জিগ্যেস করল না। সে কথা মনেই এল না ওর। ও বলল, সে ঘরেন যেয়ে গরু-মোষ অ্যানেক। তা, টান চালা বেঁধে দিব। মাতংরে বলি ? ওরা যা লিবে তা লিবে। আমার শুধু পেট খোরাক আর বিড়ির পয়সা।'

'পেট খোরাক ?'

'দু বেলা।'

'অ্যাঁ ?'

'হাঁ বাবু। তাতে ঘরে চাল বাঁচবে। মা বউ খেয়ে বাঁচবে।' রাম সিংগির কথাটা খুব পছন্দ হয়নি। তবে মনিব্যান বলে পাঠাল, 'সাজুয়া দু বেলা কেন, চার বেলা খাবে। কোন কথা আনি না হয়। আমার গরু-মোষ আমার সন্তান।'

ভরপেট ভাত খাবে, সেই আনন্দে সাজুয়া সব ভুলে গেল। মাতংকে ডাকতে গেল। মাতং সব শুনে বলল, 'অ্যাঁ ? বাথান উঠাবে ? কে ?'

'তা শুধাই নাই।'

বেটা জাতুধান লিচ্চয় বান ডাকবে।

'হাঃ, নদী দেখে বুঝ না ?'

'বুঝ না ? বেটা পেট চিনে। ভাত খাবে, তাতেই নাচ কত। শালা, এখন নদী দেখে বান বুঝা যায় ? ফরক্কার জল ছাড়বে লিচ্চয়।'

'আঁ ? জল ছেড়ে সব ভাসাবে ?'

'আমি জানি।'

ওরা দুজন রাম সিংগির কাছে এল। রাম সিংগি কথাটাকে গুরুত্ব দিল না। বলল, 'যারা নাবালে আছে, তাদের ভয়। বাথান নাবালে। তাতেই সরাই। তোদের ঘর ভাঙার, লয় ? তোদের ভয় কি ?'

'যদি বান ডাকে ?'

'বান ডাকলে শালারা আমার কাছে চাপ না ? আমার চালের ছাদ লয় না ?'

মাতং বলল, 'তোমার সরকার দেয়, তাতেই খাও। লইলে কি দিতে ?'

'ওই করেই ত চলছে বাপু। তোরাও পেলি, আমিও দিলাম, সরকারও দেখল। যা বাপ, চালা খুঁটি আন্ গা। নতুন খ্যাড় দিলাম।'

চালা কেটে, খুঁটি উপড়ে, নারকোল বাগানে নতুন বাথান বাঁধতে-বাঁধতে দু দিন গেল। মনিব্যান সতীনকে নিয়ে ভাত, কলাই ডাল, আমরা পোস্তর টক রাঁধল। অনেক খাওয়া। কিন্তু সাজুয়ার মনে কোথায় খোঁচ ঢুকে গেল, মাতঙের।

কাজ সারা হলে মাতং বলল, 'বাস চেপে বহরমপুর যাব ? সেথা সকল খবর পাব।'

'কে দিবে খবর ? মাজিস্টর ?'

'শালা নদী-আপিসে নাই ?'

'তাই যাও।'

'আগে মা বইত, খাল পাড় উঁচু রইত। কবজা হয়ে হতে কানে-কানে জল। এতটুক্ বাড়লে পাড় ভাসবে।'

'ভাঙার ঘর !'

'শালা শুধা পেট চিনে। ঘর ত ভাঙার, চর কি ভাঙার ?'

'না না, চর কখনো ডুবে ? মা যখন ডুবায়, তখন ডুবায়। ভাসায় যখন, তখন ডুবায় না। এবার নিজে ভাসাল, বান দিল, ডুবাবে ?'

'জানি না।'

পাড়ে যেয়ে হামু টেনে দেখলাম, পিপড়াত ঠাঁই ছেড়ে যায় না ?

'রাম সিংগি নিশ্চয় কিছু জানে।'

'চল, চরে যাই !'

'দেখে লই দু-চার দিন।'

দু-চার দিন সময় দিল না ভাগীরথী। বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, শুক্ল-পক্ষের নির্মল আকাশ, পাড় ছেড়ে নদী নিঃশব্দে ডিমপাড়ায় ঢুকল।

ডোমদের চেঁচামেচি শুনে প্রথমে সাজুয়ারা ভাবে, ওদের শুওর পালিয়েছে। শুওর ওদের মাঝে মাঝেই পালায়। তখন হই হই পড়ে যায়।

তারপর ওরা বুঝল, এ অন্য কোন বিপর্যয়। আলো এবং লাঠি নিয়ে ওরা বেরুল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। জল, সর্বত্র জল। বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে জল। একটা কুকুর ছুটছে।

মাতং চেঁচাল, 'হা পতিত! সদন হে! উঠে এস তোমরা!'

'আলো ধর হে—এ-এ-এ!'

'ধরলাম!'

সাজুয়া বলল, এখনো হাঁটু পরিমাণ। নেমে উদের টেনে আনি। ইঃ! এ যে বেপজ্জর জল হে! ত্যাত জল?

ওদের টেনে টেনে পাড়ে তুলতে সকাল হল। নির্মেঘ আকাশ। নির্মম সূর্য। ভাগীরথী ফুলে ফুলে উঠছে, জল দুপাড়ে ছড়াচ্ছে।

রাম সিংগির বাগানে ওরা চলে এল। রামের ছেলে বহরমপুরের বন্যা-কন্ট্রোল আপিস থেকে খবর আনল। জল না ছাড়লে ফরক্কা বাঁধ ভেঙ্গে যেত। পদ্মা চ্যানেলে জল বহানো সম্ভব নয়। বড় বড় বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে গিয়ে এই বন্যা।

রামের ছেলে মহোল্লাসে বলল, 'মেলেটারি নেমেছে। হাইওয়ের উপর নৌকো চলছে নৌকো বোঝাই মানুষ আনছে। ক্যাম্প হবে, চাল-আটা-ওষুধ-কাপড়, খুব বেবস্থা।'

'হেথাকার কি ব্যাবস্থা?'

'আমাদেরই করতে হবে।'

'তুই আবার যা। গম আন্। ভেজে সিজ্যে থাক। তত শ মানুষকে চাল দেওয়া যায়?'

মনিব্যান রাম সিংগিকে ভেতরে ডাকল। ছেলেপিলে হয়নি, বাঁজা মানুষ, পঞ্চাশে পৌঁছেও শক্ত শরীর। মনিব্যান বলল, 'চাল দাও, লিখে দিও। কাটবো।'

'তা ত লিখবই। চাল দেব?'

'দাও। বেপজ্জর দুর্গতি যা।'

'দেখি।'

বিকেলের মধ্যে ডোমপাড়া রইল না। জলের চাদর বিছিয়ে গেল সর্বত্র। বাবলা গাছের মাথা জেগে থাকল। রাম সিংগি সাজুয়াদের বলল, বাইরে চালা বাঁধ্। এবার বাবুদের টনক নড়বে। আসবে সব। জল যদি বেলাটির খালে ঢুকে, আবাদ ভাসবে। শালারা বছর বছর দেখে যায় আর 'তবে হবে' বলে। সাজাখালির বাঁধটা সারালে জল ঢুকত?

সাজুয়ারা বলল, 'ওরা করুক।'

'তোরা?'

'মোরা চরে যাব

'কেন?'

'মোদের জান সেথা।'

'চর! চর আছে?

মাতং অভিজ্ঞ লোক। সে বলল, 'না থাকবে বা কেন?'

'চর ডুবলে সাজাখালি ডুবে। সাজাখালিতে পুলিশের ঘাট-চৌকি। ঘাট চৌকি ডুবলে জানতাম না? তুমি খবর পেতে না?

রাম সিংগিও খুব চিন্তিত। বলল, অসাগর ধান রে! গেলে আমারও গেল। তোরা যাবি বলছিস, তা বোট মারা পড়বে না তো?

মাতং গভীর হতাশায় বলল, 'বাবু! বাখান সরালে সদর হতে খবর পেয়ে। একবার বললে না, তাতে ডোম পাড়া ডুবল।'

'বুঝি নাই রে বাপ!'

'বোট মারা পড়বে বলে মনে লেয় না। জল যেমন হেলা-দোলা নাই। নিচ হতে ঠেলে কে উচা করে। কোন দেশ বাঁচাতে মোদের ভাসায়?

প্রশ্নটি বেলাটির মাতং তিওর করে, উত্তরটির সঙ্গে বহু দপ্তর, ব্যক্তি, একাধিক রাজ্য ও রাষ্ট্র জড়িত। রাম সিংগির ও সব জানে না। নানা কথা মনে হয় ওর। সদরের খবর, জল ছাড়া হবে। রাম সিংগি জানত, বাখান সরাল। সরকার খবর ঘোষণা করে মানুষজনকে ভাঙা জায়গায় আসতে বলতে পারত, বলে নি। সরকারের কাছে "বন্যাগ্রস্ত" ঘোষিত না হওয়া অবধি বেলাটি কোন অস্তিত্ব নয় রাম সিংগি তা বলতে পারে না। সেই বেলাটি। দুর্গত ডোমরা সামনে বসে আছে। সরকার যদি ত্রাণে সাহায্য না দেয়, তাহলে সে গেল। এরাই খেপবে, এবং যে সাজুয়া জাতুধান, আহার বিনা কিছুই বোঝে না, সেই সকলকে নিয়ে বলবে, 'গোলার চাবি দেন।' এ রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা অতীতে রাম সিংগির হবার হয়েছে।

ভিক্ত। "গোলার চাবি দেন" যদি বলে অত্যন্ত চেনা মানুষ, তাহলে সম্পর্কে ফাটল ধরে। কিন্তু তারপরেই সাজুয়া প্রত্যহের মত অতীব নর্মাল ব্যবহার করেছে। বলেছে, 'বাগান সাফ করলে বাগাল নিব। ঘরে শলা নাই।' নানা মিশ্রিত চিন্তা ধাক্কা দেয় রাম সিংগির মনে এবং সে বোঝে, চরের সতেজ, সুপুষ্ট ধানগুলির জন্য সে উদ্বিগ্ন। বলে 'নৌকায় যা। চিড়া-গুড় লয়ে যা। জলের গতিক কে জানে? যদি আজ না ফিরা হয়?'

ভাগীরথী উঁচু হচ্ছে, উঁচু হচ্ছে। জলে কচুরিপানা, ঘরের চাল ও খুঁটি, মরা গরু। সাজুয়া বলে, 'কুনো গেরাম খেয়ে আসতেছে বুঝি? হঃ! লতুন খ্যাড় গো চালে, লতুন খুঁটি। কার সাধের ঘর গো!'

মাতং জল দেখে। বলে, 'ই লতুন বান! জল ছাড়ে। ভাসায়।'

সাজুয়া বলে, 'হুই পদ্মা, হেই ভাগীরথী। মাঝে এতটুনি ফারাক, তিরতির করে। যদি উ ফারাক ভাসে, তবে?'

'বাপ-ঠাকুরের কাছে যাবি শালা। ফারাক ভাসলে, পদ্মা-ভাগীরথী হাত মিলালে জেলা থাকবে? শালা জানে পেটে খেতে, আর ফাল কথা বলতে।'

সাজুয়া চুপ করে যায়। গেরুয়া জলরাশির ওপর দিয়ে কালো নৌকাটি যায়। ভাগীরথীকে দেখে মাতং বা সাজুয়া বা গগন বা ঈশানের এখন "মা" মনে হয় না। দরকার জল পাবার পর এ এক নতুন ভাগীরথী।

নদীর চেহারা নেই তার, চেনা চেহারা। নদীর পুরনো চেহারায় গ্রীষ্মে চড়া পড়ত, তিন-চার ধারে জল বইত, তাতে ডুব জল—সাঁতার জল থাকত। পাড়ে ধরে নামলে জল। বর্ষায় টাবু—টুবু। এক সময়ে বর্ষায় বড় নৌকো চলত, কলকাতা থেকে ষ্টীমার আসত।

এখানকার ভাগীরথীর চেহারা কানালের মত! সমচ্ছর জল। দু পাড় ছুঁয়ে। জল ভাল, খুব ভাল, শুধু এ জলের নদীর চেহারা বা স্বভাব নেই। আকাশে জল নেই, নদীতে বান, কে কবে শুনেছে?

দূর থেকে চর চোখে পড়ে। গেরুয়া জলের বুকে এক খণ্ড পান্না ভাসছে। সাজুয়া বলে, 'জয় মা! গঙ্গা পূজায় ডালী দেব।'

চরটি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে ওর আর মাতংদের চোখ দিয়ে অপ্রতিরোধ্য আবেগে জল ভরে আসে। মাতং এক আঁজলা জল নিজের ও অন্যদের মাথায় ছেটায়। বলে 'দোষ নিয়ো না মা! কটু কথা বললাম কত!' বলে

পুজায় সবে ভালী দিব।'

চরটি কাছে আসে, ক্রমশ। ধান বোনার সময়ে রাতে থাকতে হত বলে মাচাঙে চালা। ধান পাকলে পাহারা দিতে পাখির হাত থেকে—চালাটি কাজে লাগবে। ওর মাচাঙের নিচে যায় ও দাঁড় দিয়ে পেটায়। সাপ নেই। মাতং বলে, 'জলের টানে সাঁপ অন্তত্তর যেছে।'

ওরা মাচাঙের নিচে বসে। চিড়ে ও গুড় খায়। তারপর সাজুয়া মাচাঙে ওঠে। চেয়ে দেখে। মাতং বলে, 'কি দেখিস?'

'জল।'

'কতদুর দেখা যায়?'

'সাদা খালি।'

'তবে ভয় নাই।'

'কত ঘরের চাল, পানা কত রে!'

'খেতে খেতে আসছে।'

'উনি ও জাতুয়ান হল?'

'হয়। নদী রাক্ষসী হয়।'

নেমে এসে ওরা খেতের আগাছা খানিক উপড়োয়। তারপর সাজুয়া বলে, 'আমি থাকি। খেয়েছি, এখন কষ্ট নাই আর। তোমরা খেয়ে, সকলারে লয়ে এস। ঘাস না উঠালে ধান যাবে।'

'নৌকা আছে তত? চর ফেলাল, হেঁটে আসব, তা ফরজা হতে সকল বিস্মরণ।'

'মেয়ে ছেলা লয়?'

ওরা সাজুয়াকে রেখে চলে আসে। বিড়ি চেয়ে নেয় সাজুয়া। হেঁকে বলে, 'ফিরা নৌকায় চলে এস হে! এই ধানে মদনরা নৌকা নিবে না।'

'আসব।'

ওরা চলে আসতেই সাজুয়া মাচাঙে শুয়ে পড়ে। খুব নিশ্চিন্ত লাগে যান হোক, গ্রাম ভাসুক, চর তো ডোবে নি? ঘুমিয়ে পড়ে ও।

ওদের যেতে বেলা গড়ায়। ফলে বিকেলে ওদের না দেখে ওর তেমন উদ্বিগ্ন লাগে না। আজ পারে নি। কাল আসবে। ধান ওদেরও। এখন আগাছা ও ঘাস না কুঁদরালে ওদেরও ক্ষতি। সাজুয়া কল্পনা প্রবণ নয়। ফলে আদিগন্ত ভাগীরথীর বুকে একা ও চরের মাচাঙে বসে আছে, এ উপলব্ধিতে ওর মনে কোন ভয়ের অনুভূতি জাগে না, দৃশ্যটির অমানুষী

ও আদিম সৌন্দর্য ওকে স্পর্শ করে না। বিড়ি টেনে ও সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। শুক্ল পক্ষে চাঁদ ওঠে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। মৃদু জ্যোৎস্নায় ভাগীরথী আকাশ পানে ঠেলে উঠতে থাকেন সোজা।

সাজুয়া ঘুমের মধ্যে ধাক্কা খায়। প্রথমে মৃদু তারপর জোর ধাক্কা। না, গায়ে ধাক্কা নয়, মাচাঙ নড়ছে। ওরা এল নাকি? ওঠে বসে ও, এখন চোখ কচলে চেয়ে দেখে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী ওর চারিদিকে। বিমূঢ় আতঙ্ক বিহ্বল সাজুয়া আবার চেয়ে দেখে। ধান নেই, চর নেই, জল ওর মাচাঙের খুঁটিতে ধাক্কা মারছে। চালে উঠবে? চাল তো তেমন পোক্ত করে বাঁধা হয়নি? মাচাঙের খাঁচাটি আঁকড়ে ধরে ও চোখ বোজে। বউ নয়, মা নয়, ছেলে নয়, নিজের জন্যে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। কিছুই পাওয়া হল না জীবনে। সব সাধ অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হল। জলে পড়ে তবে সাজুয়া বুঝতে পারল, ভাগীরথীর বুকের নিচে ভীষণ তোলপাড়। গুম গুম শব্দ হচ্ছে অতলে। ওপর পানে চাইলও। নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত চন্দ্রমা। মাচাঙের খাঁচা জড়িয়ে সাজুয়া চাইতে থাকল। একটা গাছ ভেসে আসবে না? একটা শক্ত পোক্ত চালাঘর? তারপর ওর আতঙ্ক বিহ্বল চোখের সামনে একটা জলের দেওয়াল ছুটে এল। আসতে আসতে, জ্যোৎস্নার আলোর লোনা জল যেন দাঁত বের করে হাসল।

চর ভেসে গেছে, এ কথা জানা যায় ভোরে। সাজখালিতে ত্রাণ বোট যেতে থাকে যখন। পুলিশের ঘাট-চৌকিতে জল ঢুকে পড়ার কারণে বেলেটি এখন ত্রাণকেন্দ্র হয়। রাম সিংগিকে অশেষ ব্যথা দিয়ে সরকার, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্যে আলাদা শিবির ফেলে। জওয়ানরা উদ্ধার ও ত্রাণ-দান চালাতে থাকে। রাম সিংগি চর ডুবতে পয়লা ব্যথা পায়। দ্বিতীয় ব্যথা পায় রিলিফের গম-চিড়ে-গুড়-কাপড় ইত্যাদির হেফাজতী না-পেয়ে। তারপর ভয় খায়, বি ডি ও যখন খিঁচিয়ে বলেন, 'নিজের গাই-বলদ সরালেন খবর পেয়ে। খবরটা দিতে পারেন নি? সে খবরও সরকার দেবে? সরকার মানে সরকারী আমলা শুধু? আমি জানলে নিশ্চয় জানাতাম। যান-বক্সা বলে কথা! জেনে চেপে গেলেন?'

রাম সিংগি সকাতরে বলে, 'সে ত হয়েই গেছে। চেল্লাচিল্লি করিয়েন না সার। এ ডোমগুলো শুনলে ছিঁড়ে খাবে। তাতে আমাদের সাজুয়া চর মুনতে গিয়ে ভেসে গেছে, তিওররা কান্‌তে লেগেছে?

'আপনার চর-জমি ত?'

'আজ্ঞা !'

রাম সিংগি আরো কাতর হয় ও বলে, 'মোটর বোট নিয়ে ঘুরতে ওকে জানি তোলে ?'

তার ওপর তো কারো রিষ নেই যে দেখলেও তুলবে না। এই জলের তোড়, সে কি আছে ?

নৌকো ঘুরতে থাকে জলে। এখন পরের পর গ্রাম ভাসছে। বেলেটি ব্লক ডিকলেআর্ড বন্যা প্লাবিত ব্লক। ত্রাণ করে আনা হয় যাদের, তাদের মধ্যে মাতংরা, সাজুয়ার বউ ও মা বৃথাই খুঁজে খুঁজে ফেরে সাজুয়াকে। অবশেষে জানা যায়, নদীর মাইল তিনেক আগে, একটি গলিত শবদেহ দেখা গেছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। প্রসারিত ও স্ফীত হাতে লোহার বালা।

এখন আর সন্দেহ থাকে না কোন। সাজুয়ার বউ দাপাদাপি করে কাঁদে। মা ঘন ঘন মূর্ছা যায়। মাতংরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তারপর মাতং নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সকলি জান। গেল যখন, সে যখন নাই, তখন রীতকরম কত্তে হবে। সাজুয়ার মা ! মাতং রইতে তোমরা মরব না। এখন ওঠ।'

'কি কত্তে উঠব, অ দেওর !'

বউরে বলা যায় এমন কথা ? উঠ, তার খাড়ের ঠাকুর দাহ কত্তে হবে। হরাদ আছে। আহা হা রে, আমরা বলছি রাক্ষস ! বামুন নাম দিল জাতুধান ! আহা হা রে, দলমলা ছেলে, কুন রিষ জানে না গো ! ডোমপাড়ায় জল, তাতে কাঁধে বয়ে বাছুর উঠাল ডাঙায় ! এখন আমি মরব, বুড়াটা না জোয়ানটা গেল !'

'কেনে রেখে এল তারে, অ দেওর ! সে ত গোঁয়ার হাবাটা ছিল ! কেনে বা তার কথা শুনলে ?'

'সাজুয়ার মা ! সে দুক্তে মোর বুক ফাটে। কে জানে বল, এমন হবে ? উঠ উঠ, দাহ আছে, হরাদ আছে, জাতভোজন আছে, তার গেঁদাটার অমঙ্গল হবে কালো।'

'কোথা হতে হবে ?'

মাতং ভীষণ ক্রোধে বলল, 'রাম সিংগি বাবু দিবে ? জল আসবে জেনেছিল, কারেও বলে নাই ? মোষের কথা ভাবল, মানুষের কথা ভাবে নাই !'

চার দিকে বন্যাতাড়িত মানুষ। বেলাটি এখন মানুষে থই থই।

তিওররা খড়ের পুতুল দাহ করল। তারপর রাম সিংগির কাছে গেল। মাতং বলল, এই বান-বন্যা তোমারে ছুঁল না বাবু! সরকার সকল দিতেছে।

'মোদের সাজুয়ার লোগে তুমি দাও। লয় ত খারাপ হয়ে যাবে।'

রাম সিংগি তার গ্রামীণ ও অন্ধ মানসিকতায় মাতংয়ের ক্রোধকে যথার্থ মনে করল ও বলল দিব। দিব না কেন? সরকার তাসাতেছে, তোরাও তাসাতিছ, ধান ত আমি ডাকা করেছি, লেঃ, কি লিবি, লে। তোদের পিছনে বড় গিন্নি। তার দুবের টাকা সুদে খাটায়।'

মনিব্যান বলল, 'ই চাল তুমি লিখবা না। ওরা রুখলে ধান কাটতে পুলিস আসবে। আর হাংনামা কর না।'

'আর করি?.. মন্দ করলে বি. ডি. দেখে। ভাল করলে দেখবে? ভালর দিন নাই। সে আমলে বাপ আকালে গোলা খুলে রায়সাহেব খেতাব পায়।'

'সাজুয়ার ঘরাদে চাল দিবে, তাতে তুমি খেতাব পাবা না?'

'খেতাব এখন নাই। ই বেটারা সামনে "শালা" না বললে সেই জানবে বাপের ভাগ্য। বানে জগৎ ডুবায়, ঘরাদ!

চালের বস্তা এনে মাতংরা সাজুয়ার মাকে দিল। বলল, আর তিন দিন। তা বাদে আমরা তেল-তৈজস আনব। আমি রীতকর্ম করা দিব। লাও, লোহা রাখ। বউয়ের চুলে বেঁধে দিবে।'

চালের বস্তার গায়ে হাত বুলিয়ে, যেন ক্ষুধাকাতর, সদাই অন্নলোভী সাজুয়ার স্পর্শ পেয়ে মা ও বউ ঘুমোল। দুঃখের দিনেও ঘুম আসে, ঘুম এল। মা বলল, 'মাতং দেওর ছিল বলে ত্যাত চাল! নইলে উ হারামি দিত?'

বউ বলল, 'ঘরাদ হলে চলে যাব ধামনাই। তুমি ঘর দেখবা, আমি ভাজদের সঙ্গে মাঠে যাব। সেথা বিটিছেলা মাঠে খাটে।'

'তাই যাব। বান না হতে আকাল আসবে। বাবু আর কারে সাজুয়ার ভাগ দিবে লিখ্যদ। মানুষ এখন গোরু পড়ং, অসাগর মানুষ! বাবাঃ, ত্যাত মানুষ কোথায় ছিল? এত ছাচাক জলতে দেখি নাই, ত্যাত মানুষ দেখি নাই।'

চরের দাংগায় তুমি বাড় হলে, চর ভেদে আমি! আর রব না হেথা।'

'নে ঘুমা।'

দুজনে জড়াজড়ি করে ঘুমোল।

ঘুমের মধ্যে মা আগে শোনে, দরজার ওপারে কে বিপন্ন গলায় ডাকছে, 'দরজা খোল !'

ধরমড়িয়ে উঠল মা। কে ডাকে ? সাজুয়া ? মৃত্যুর পর তার প্রেত ?

'কে ?'

'আমি মাতং হে, দরজা খোল।

বউকে ডেকে তোলে মা, তারপর দরজা খোলে।

বউ ডিবরি জ্বালে।

মাতং সঙ্গে সাজুয়া।

'ই কি দেওর ?'

'মা, আমি !'

'তুই !'

'আমি !'

'মরিস নাই ?'

বউ ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে ও ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাতং ধমক দিয়ে বলে, 'কেন্দো পরে। আগে ওরে চাল দাও, চিবায়ে জল খাক। মরে এসেছে।'

'মরে নাই ত ! মরে নাই !' মা হেসে কেঁদে সাজুয়ার গায়ে হাত বোলায়। বলে, 'তুই ?'

'হুই ভেসে এটা গাছ পাই। তাতে সাঁপ কি ! লরে-লাগে ভেসে ভেসে সেই জিয়াগঞ্জ ! সেথায় মড়া হয়ে পড়েছিলাম। উঠাল সেপাইরা। তা বাদে ঘুম জ্বর ! ইস্কিশান, অষুদ, দে, চাল দে !'

বউ চাল ও জল দেয়। সাজুয়া খায়। জল খেয়ে বলে, 'হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে হাঁটতে—মাতঙের ঘরে আগে ডাকতে বুড়া ভূত দেখল।'

মাতং গলা সাফ করে বলল 'অনেক ছরাদ হয়ে ফেল্‌ছে রে ! সে অনেক কথা।'

'ঘরে চাল এত ?'

'শালা চাল দেখতেছে ! শোন বেটা !'

মাতং ওকে সব কথা বলে। ভয়ে ভয়ে বলে। জলে ভেসে যাবার অভিজ্ঞতা, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার অভিজ্ঞতা, সাজুয়ার মাথা না খারাপ হয়ে যায়। কম কথা নাকি ? মা ও বউ, অপরাধীর মত বসে থাকে। সাজুয়া ওদের পেটায় যদি ?

সব শুনে মেলে সাজুয়া বলে, 'দাড়াও, বুঝে লই। ঠাকুর বাহ কয়লা ?'

'সি তোরে শুদ্ধ করে লিব।'

'ছরাদে জাতভোজনের চাল আনলা ?'

কালই ফিরত দিব। লইলে বেটা বলবে, তোরা সাজস করে ই কাজ করছিস।'

'লাঃ !'

'কি বলিস ?'

'চাল ফিরত দিব না'

'তবে ?'

সাজুয়া ওদের অবাক করে হাসে। দমকে দমকে হাসে। বলে, 'উঃ, আমি সেথা আছি। তোমরা খ্যাড়ের ঠাকুর পোড়ালা, ছরাদের চাল আনলা···'

তোর মারে বলাছি, মাতং রইতে তোমরা মরধানা। আমরা তোর সমাজ লই ?'

মাতংয়ের পায়ের ধুলো খায় সাজুয়া। বলে, 'তা জানি হে বুড়া।'

'তবে ?'

'দেখ ! সবে বলে জাতুধান, আমার বুদ্ধি লাই। বুদ্ধি আমার হলছে হে এট্টা। আমি যে এসছি, জীয়তে ফিরাছি, তুমি ভিন্ন কেও জানে না ?'

'তাতে ?'

'বুঝলা না ?' আবার হাসে সাজুয়া, মাতংয়ের গালে আঙুল দিয়ে চুম কুড়ি খায়। বলে, 'চালের বস্তা লয়ে এদের লয়ে আমি ধামনাই চললাম। তুমি বলবা, ওরা কোথা গিছে, মা বউ, তা জান না। বলবা, বুঝি ধামনাই গিছে। সেথা ছরাদ করবে।'

'রাম সিংগিরে কি বলব ?'

'কিছু বলবা না। বান শুকালে আবার চলে আসব। বলব জাতুধান আমি, তাতেই ভাগীরথী ফিরায়ে দিল। বলল, এখনো অনেক দিন দানা আছে তোর ?'

'এ চাল ?'

সাজুয়া হাসে। বলে, 'আমি তো রাক্ষস, জাতুধান, আমার ছরাদের চাল আমি খাব না ? আরে এমন ছরাদ হয় নাই ! যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছে ?'

'তাই কর গা! আমি কারেও কিছু বলব না কিন্তুক কাজটা কেমন হল বল্? শুদ্ধ হল না, দাহ হল, দেও দেবতার রিষে পড়বি।'

'পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বেরুখা যায়। মা চল্, বউ, গেঁদাটা ওঠা। আঁধারে পলাতে হবে।'

নিজের শ্রাদ্ধের চালের বস্তা কাঁধে জাতুধান অন্ধকারে পালাতে থাকে। ধামনাই অনেক দূরে। পালাতে পালাতে মনে হয়, ও ভাগীরথীর চেয়েও শক্তিমান।

এই বান-বন্যা থেকেও ফাল্গুনী তুলে নিল।

(১১৭৮)

গিরিবালা

মহাশ্বেতা দেবী

গিরিবালার ঘর কান্দী মহকুমার তালসনা গ্রামে। গিরিবালার কোন নিজস্ব মনপ্রাণ আছে বলে কেউই বোঝেনি। গিরি আমাদের না-সুন্দরী না-বান্দরী, ওই এক রকমের। তবে তার চোখ দুটি বড় সজীব। চোখের জন্যে ওকে চোখে পড়ে।

ওদের জাতে এখনো মেয়েকে পণ দিতে হয়। আউলচাঁদ চার কুড়ি টাকা, বকনা বাছুর, এত সব গিরির বাবাকে ধরে দিয়েছিল। তারপর সে গিরিকে বিয়ে করে। মিছে বলব না, গিরির বাপও মেয়েকে চার ভাঁর কলো, বাসন-কোসন, মাদুর আর একগাড়ি বাঁশ দিয়েছিল। দেবে না কেন বল? গিরির বাপের কয়েকটি বাঁশঝাড় আছে। আউলচাঁদ বলেছিল, ঘরটা পুড়ে গেছে বলেই তো মেয়ে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। ঘর তুলি, বাঁশ দাও, তারপর বউ নিয়ে যাব।

সেই যে গেল আউলচাঁদ আর তো তার দেখা নেই। কয়েক দিন বাদে ই. ডি. পিওন বংশী ধামালি গিরিদের বাড়ি এলো। বংশী ধামালি নিশিন্দা সাব-পোস্টাপিসে ই. ডি. পিওন। ১৪৫ টাকায় সংসার চলে না বলে বংশী সন্ধ্যায় নিশিন্দায় ডাক্তারবাবুর রুগী দেখায় সাহায্য করে। এই ডাক্তার যেহেতু হাসপাতালে আসেন, সেহেতু রুগী ভাগিয়ে এনে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। ফলে বংশীরও সাতখানা গ্রামে যথেষ্ট দাপট। জানে যে বংশীর দ্বারাই সবাই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

বংশী এই ডাক্তারবাবুকে দেখে দেখে ইদানিং নিজেও কিছু কিছু ডাক্তারি কথাবার্তা বলে। ফলে তার মান-সম্মান যথেষ্ট বেড়েছে।

গিরির বাবাকে সে মামা বলে। কেন বলে সে কথা আজ কারো মনে নেই। বংশী ধামালি বলল, বেত্রবতীতে গিয়েছিলাম। আরো কিছু ঘুরে-ঘেরে এলাম। এ কি শুনছি? তুমি নাকি আউলচাঁদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? ছুটে গেল, দিলাম।

বটে! তা সে কত টাকা দিয়েছে?

চার কুড়ি এক টাকা, এই রকমটা।

ম্যাও সামলাতে পারবে ?

কিসের ম্যাও ?

কি বলব বল। আমি একটা সরকারী চাকুরে, তাই ডাক্তারের ডান হাত, তা আমাকে একবার শুধোবে তো ? আউলচাঁদ মানুষ খারাপ নয়। ওর সঙ্গে অনেক গাঁজা টেনিছি, তা অস্বীকার যাব না। কিন্তু ও টাকা আর রকম, ছই তো চন্দনের। চন্দনের বিয়ে ঠিক হল কলহাটে। তা আউলচাঁদ চন্দনের কাকা হয় সম্পর্কে, সে গেল কন্সেপশ দিতে।

সে কি কথা !

চন্দনের মা তো কাঁদতে বসেছিল। ধারকর্জ করে ছেলের বিয়ে দিল। কি রকম লোক বল দেখি ? জমিজমা নেই, চন্দনের বাড়ি পড়ে থাকিস—

জমিজমা নেই ?

না না।

ঘর তুলবে বলে বাঁশ নিল একগাড়ি।

সেই তো বলছি। বাঁশ চন্দনের পিসিকে একশো টাকায় বেচে দিয়ে সে তো বাণপুরের মেলায় গেছে।

এ সব কথা শুনে গিরির বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে। বংশী ধামালি আউলচাঁদের আরো বৃত্তান্ত সব বলে। শেষে বলে যায়, ছেলে খারাপ নয়। তবে ওই জমিজমা নেই, আর মেলা থেকে মেলায় ঘোরে আর গান গায়। নইলে ছেলে খারাপ নয়।

মোহন তো কিছু বলল না। সে-ই তো সম্বন্ধ এনেছিল। সে তো বলেনি কিছু।

বলে কখনো ? মোহন হল ওর ডান হাত।

গিরির মা বলে, মেয়ের আবার বিয়ে দেব। ঠগ, জোচ্চোর, আমার মেয়েকে তার ঘরে পাঠাব না।

কিন্তু আউলচাঁদ যখন এসে পড়ে বছর খানেক বাদে, তখন আর 'না' বলবার মুখ রাখে না। নিয়ে আসে একটা মস্ত মেটে আলু, বউয়ের জন্যে নতুন কাপড়, শাশুড়ির জন্যে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ে, শ্বশুরের জন্যে চারটি নতুন বস্তা। গিরির মা অবশ্য বংশীর বলে যাওয়া সব কথাই বলে। আউলচাঁদ এ কথার জবাবে উদার হেসে বলে, বংশী দাদার কথা ধরতে গেলে সংসারে থাকা চলে না মা। এখন যে আপনার মেয়ে পাকা ঘরে থাকতে যাচ্ছে

সেটা তো মিছে নয়।

গিরির মা গিরির চুল বেঁধে দেয়, সাজিয়ে দেয়। তারপর কেঁদে বলে, এ লোক হল গে ঘরের ভিটের শতমূলের গাছ রে মা! যত উপড়ে ফেল, ফের মাথা জাগাবে। যা বলছে সব মিছে কথা, কিন্তু কি কথার বাঁধুনি বল দেখি।

গিরি চুপ করে থাকে। বরকে এসে কনের বাপকে পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়। সব কথাই ঠিক। কিন্তু তবু তো মেয়ে। মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি। গিরি বোঝে যে এখন থেকে তার দুঃখের দিন শুরু হচ্ছে। সে নীরবে কাঁদে। তারপর নাক টেনে চোখ মুছে বলে, ঠাকুর উঠবে যখন তখন এনো আমাকে। আনবে তো? রাঙা গাইটাকে খেতে দিও। খড় কুচিয়ে গেলাম। জাবাগাছটায় জল দিও।

এমনি করে চোদ্দ বছরে গিরি স্বামীর ঘর করতে যায়। মা ঘর-বসতকালে বাসনকোসন গুছিয়ে দেয়। আউলচাঁদ বলে, অমনি চারটি চালডাল দিয়ে দিবেন গো মা। আমি বাবুর কাজ ধরেছি। গিয়েই ডিউটি আছে। চাল ডাল কিনতে সময় পাব না

গিরি চাল ডাল নুন নেয়। তারপর চলে যায় গ্রাম ছেড়ে। আউল-চাঁদ হনহনিয়ে হাঁটে। বলে, পা চালিয়ে চল দেখি।

তালসনা গ্রামে ঢুকে আউলচাঁদ ওকে নিয়ে তোলে পাকা ঘরে। বাবুদের আম জাম পেয়ারা নানাবিধ গাছের বাগান। বাগানের এক কোণে বাগান পাহারা দেবার জন্যে একখানা ঝুরঝুরে ঘর। আউলচাঁদ বলে, আগড় একটা ঠিকই বেঁধে নেব। কেমন ঘর দেখেছিস? ওই পাশে পুকুর রয়েছে। ঝপ করে কাঠ পাতা এনে ভাত চাপিয়ে দে দেখি।

আঁধার হয়ে আসছে যে। কুপি নেই?

কুপি? কুপি কোথা পাব?

বাবুদের ঝি এসে পড়ে গিরিকে বাঁচায়। সে আউলচাঁদকে গাল পাড়ে, কুপি আনে একটা। গিরিকে পুকুরে নিয়ে যায়। বলে, বাপ মা কি পাথরের গড়া গো? এমন কচি মেয়েকে ওই নেশাড়ে গেঁজেলের হাতে দেয়? ওর আছে কি যে তোকে খাওয়াবে? বাবুদের গরু চরায়, মুনিষ খাটে। মাসে কিছু পায় কি না পায়। এই কাজ করে, এই চলে যায় কোথা কোথা। ধানের চালের ভাত যদি খেয়ে থাকো মা, তাহলে কালই

বাপের বাড়ি গিয়ে ও রূপোর কুচিকাচা রেখে এসো।

তবু গিরি একদিন গয়না রাখতে ছোটে না। দেখা যায় সে অত্যন্ত যত্নে বাগানের কোণের পাঁজরা বের করা ইঁটের ঘরটির গায়ে মাটি লেপছে। আউলচাঁদ একখানা টিন জোগাড় করে বাবুদের কাছ থেকে। তাতে বাঁশের বাটাম দিয়ে ঘরের দরজা হয়। খুব তাড়াতাড়ি গিরি বাবুদের বাড়ি পেট-ভাতে কাজে লেগে যায়। আউলচাঁদ কয়েক মাস বাদে বলে, তুই আমাকে গেরোবাসী করে ফেললি বউ। বাপ মা ছিল না, ঘর-সংসার জানি না, ভেসে ভেসে বেড়াতাম।

বাবুদের কাছে চেয়ে মেগে নিজের ঘর তোল, জমি নাও এক টুকরো।

দেবে?

দেবে না কেন? সংসারে প্রাণী আসছে। সে কি পরঘরে জন্মাবে? ভিখিরি বোষ্টমেরও ঘর থাকে।

ঠিক বলেছিস। নিজের ঘর বলে আমারও খুব মন পোড়ে। আগে তো হত না এমন।

ঘর, নিজের ঘর বলে দুজনের বড় পিপাসা। কিন্তু প্রথম মেয়ে বেলারাণী জন্মায় এখানেই। মেয়ের এক মাস না হতে গিরি বাবুদের মশারি চাদর শতরঞ্চি পুকুরে কাচতে যায়। বাবু গিন্নি না বলে পারেন না, মেয়েটা ভারি কাজ-পাগল বটে। কাজও খুব পরিষ্কার।

অসীম মহানুভবতায় তিনি গিরির মেয়েকে ছেলেদের পুরনো জামা দেন। গিরিকে বলেন, কাজ রেখে মেয়েকে দুধ দাও বাছা। নইলে পারবে কেন? বেলারাণী, পরীবালা, রাজীব, সব দেড় বছর দু' বছরে জন্মায়। আর কোলের মেয়ে মরুনী জন্মকালে গিরি অপারেশন করিয়ে সন্তানবতী হবার পথ বন্ধ করে।

আউলচাঁদ ততদিনে বাবুদের ঠেঙে জমি পেয়েছে দুই কাঠা। যেমন তেমন ঘরও তুলেছে একখানা। আর জনমুনিষ খাটতে সে এখন দিকে দিকে যায়। গিরিকে সে এই মারে তো সে মারে, অপোরেশোন করালি, সে অধর্মের কাজ। কেন করলি, বল?

গিরি মুখ বুজে থাকে। আউলচাঁদ তাকে চুল মুঠিয়ে ধরে কিল মারে কয়েকটা। গিরি মুখ বুজে মার খায়। তারপর বলে, পঞ্চায়েতে যেতে বলেছে। রাস্তা করছে, জন চাই। গম দেবে বলেছে।

যা না, বাপের ঠেঙে বাঁশ চেয়ে আন না।

কি হবে ?

ঘর ঘর করে মরছিলি, ঘর হল তো সাতমহল। বাঁশ পেলে ঘরের মত ঘর হত।

দুজনায় খাটব, ঘর হবে।

কোথা থেকে ?

চেষ্টা কত্তে হবে।

রুপোগুলো বাঁধা দিলে বেচলে···

গিন্নিবালা চোখ তুলে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে আউলচাঁদের দিকে। সে চোখের সামনে আউলচাঁদ মাথা নামিয়ে নেয়। বাঁশের চোঙায় সেই ক'ভরি রুপো গিন্নি গিন্নিমার হেফাজতে রেখেছে। এখনো সে ও বাড়িতে কাজ করে দেয়। আট বছর বয়স থেকে বেলারাণী ও বাড়িতে পেটভাতার হাজার ফরমাশ খাটছে। বেলার বয়সও দশ হল। বাবুর বাড়ির ভাত, মেয়ে যেন বর্ষার আগাছার মত ফনফনিয়ে বড় হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে রুপোটুকু লাগবে। ওই রুপোটুকু, আর গতর জল করা বাইশটি টাকা।

গিন্নি বলে, রুপো বেচে ঘর আমি তুলব না। বাবা যথাসাধ্য দিয়েছিল। ঘর তুলতে একগাড়ি বাঁশের জোগান দিয়েছিল। সে বাঁশের তখন বাজারদর নিশিন্দাতেই হাজার টাকা। একশত বাষট্টিখানা বাঁশ ছিল।

সেই এক কথা।

মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

মেয়ের জন্ম তো পরঘরে দাসীজন্ম। হাত দেখে মোহন বলিছিল পঞ্চম গর্ভ হতে শুধু ছেলে হবে। তুই কুপথে যাবি বলে বাঁজা হয়ে এসেছিস।

গিন্নি বঁটিটা চেপে ধরেছিল। বলেছিল, কুকথা বলেছ কি ছেলেমেয়ের গলা কেটে আত্মঘাতী হব।

না, বলিনি, বলব না···আউলচাঁদ সামলে নিয়েছিল মুখ। কয়েকদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। তারপর থেকেই বোধ হয় আউলচাঁদের মাথার পোকা নড়তে থাকে। এই পোকা নড়ার মূলেও মোহন।

মোহন একদিন এসে উদয় হল। খুব কাজ চলছে গ্রামে গ্রামে। কৃষ্ণচক—নিশিন্দা বাসরাস্তা পাকা করা হচ্ছে। গিন্নি আর আউলচাঁদ দুজনেই যাচ্ছে। গমটা আসে, খাওয়া চলে যায়। মোহনও কাজ করছে। সে এখনো তেমনি বাউণ্ডুলে, বিয়ে-থা করেনি। গম বেচে ও চাল আনে, কুমড়ো, মাছ। গিন্নির দাওয়াতেই পড়ে থাকে রাতে। কখনো শহরে

কখনো গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে বোলেচালে এখন জবর বোহেমিয়ান। আউল-চাঁদকে দেখে মুখে চুক চুক শব্দ করে বলে, একেবারে কাদায় গুণ গেঁথে বসে গেলে মিতে? ছি ছি, সে জীবন একেবারে ভুলে গেলে?

গিরি বলে, ও সব নচ্ছার কথা এখানে বল না।

মিতার একটা গানের গলা ছিল।

তা ছিল। তাতে টাকাও হত। কিন্তু সে টাকা আর ঘরে আসত না, ছেলেপিলের মুখে ভাত হত না তা থেকে।

এই মোহনই একদিন বলল, বিহার দেশে মোটে মেয়ে নেই। কন্যেপণও বিস্তর। তাতে সেখানকার লোকজন এসে আমাদের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টাকা দিচ্ছে কত! সহদেব বাউরি তার মেয়ে বিয়ে দিয়ে পাঁচশো টাকা পেল।

সে কোন্ দেশ?

বললে কি আর বুঝবে মিতেন? সে অনেক দূরেও বটে। আর তারা বাংলা কথা কয় না।

আউলচাঁদ বলল, পাঁচশো টাকা দিল?

নিশ্চয়।

কথাটি এখানেই থেমে যায়, কেননা এ সময়ে পঞ্চায়েতের কালীবাবুর গোয়ালে সাঁঝাল থেকে আগুন লেগে যায়। খুব একটা হৈ হৈ ওঠে। সবাই সেদিকে ছুটে যায়।

গিরি কথাটি ভুলে যায়, আউলচাঁদ ভোলে না। গিরির যে কি হয়, সে স্বামীর কথাবার্তা থেকেও কিছু বোঝে না। কেননা একদিন আউলচাঁদ বলে, তোর গয়না কে চায়? বেলার বিয়ে দেব, ঘর পাকাপোক্ত করব। বাবুর বাড়ি খেয়ে মেখে মেয়ে আমার দেখতে কেমন হয়েছে?

গিরির মনে তখনো কোন কু ডাকেনি। সে বলল, ছেলের খোঁজ করছ?

মেয়ের বিয়ে দেখিস অমনি হয়ে যাবে।

গিরি বলে, ঘরটা যেন ঝুলে পড়ছে। এবার একটু ঠেকো দিতে হয়। নইলে হবে কেন?

এ কথা মনে করেই গিরি দু'দিনের জন্যে তার বাপের কাছে গিয়েছিল। মরুনীকে কোলে নিয়ে। পরী আর রাজীবের হাত ধরে। বেলা খুব কেঁদেছিল। গিরি মেয়েকে রেখে যাচ্ছে বলে হাতে আট আনা পয়সা

দিয়েছিল। মিষ্টি কিনে খাস মা। মামাবাড়ি যেতে সাধ, পরে যাস। এখন মন দিয়ে কাজ কর। যেতে আসতে বড় জোর চার দিন।

তখন কি গিরি জানে যে বেলাকে আর দেখতে পাবে না? জানলে তো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যায়। জানলে তো মেয়েকে বুকে ধরে রাখে। মেয়েকে সাত বছর বয়স থেকে বাবুর বাড়ি কাজে দিয়ে রেখেছে সে কি সাধ করে? খেতে দিতে পারে না, জামা দিতে পারে না। বেলার কপালে চুমু খেয়ে গিরি বাপের বাড়ি যায়।

মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি। তবু মেয়ে বলে কথা! বাঁশ বেচে বেচে বাপ তিন বিঘে জমি কিনেছে, দু-বিঘা ভাগে পেয়েছে। বাপ বলে, আনতে পারিনি পুকি, এসেছিস তো ক-দিন থাক। মা বলে, মুড়ি ভাজি, কচুটা তুলি। কি বিয়ে হল মা, এমন হত্তেলের মত রং ছিল, কালি মেড়ে গেল। চুল উঠে গেল, গলার হাড় দেখা যাচ্ছে, ক-দিন খেয়ে মেখে শরীর সারা। ভাই বলে, থাক কেন দিদি, দুই এক মাস থাকলেও ভাত দেব।

খুব খাওয়া মাখা, খুব যত্ন। বাপ বলে, তা নিবি বাঁশ। এখন তুই আছিস, নিবি। ঘরের মত ঘর না হলে ভাল কুটুম হবে কেন? দেখে তো একটা ভরসা হওয়া চাই যে ভাল ঘরে কুটুম করছি।

কেঁদেকেটে গিরি বাপের কাছে আরো আদায় করতে পারত। মা বলল, পুঁকি, অমনি একমণ চাল চেয়ে নে। কিন্তু গিরি তা বলেনি। বলবে কেন? দেবার মন থাকলে নিজে দাও। আমি কেন চাইব? গিরি পায়ে পায়ে জবাগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কত ফুল ফুটেছে দেখ। গাছটা তার লাগানো। কেমন নিকানো উঠান, ঘরের চালে নতুন খোলা। মা রাজী হলে রাজীবকে এখানে রেখে ইস্কুলে পড়াবে গিরি। ছোট ভাই পড়ছে। গিরি একটা সাবান কিনে এনেছিল আর পুকুরপাড়ে বসে খুব সাবান মাখিয়ে ছেলে মেয়েকে স্নান করিয়েছিল। নিজেও স্নান করেছিল মাথা ঘসে। তারপর পাড়ায় ঘুরতে বেরিয়েছিল। এটুকু আরামেই যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছিল সে। মা ভাইকে পাঠিয়েছিল খালে মাছ ধরতে। একটি সেচের খাল অঞ্চলটির চেহারা বদলে দিয়েছে। বছরে দুটো চাষ কর, বছরভোর মাছ ধর। গিরির মনে সুখের বাতাস বইছিল। কোন কু ডাকেনি।

বংশী ধামালি এসেছিল।—আহা রে গিরি! আউলচাঁদের হাতে পড়ে

তোর কি দুর্দশা রে। ডাক্তারবাবু বহরমপুরে বাড়ি করেছে। সেখানে ছেলেরা পড়ে, বউ সেখানে। আউলচাঁদ যদি মানুষ হত তো ছেলেমেয়েকে দেখত। তুই কোলেরটাকে নিয়ে সেখানে কাজ করতিস। ঠিকে কাজ পাড়ায় একটা, বাবুর বাড়ির কাজ দামলে করতিস। তারপর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসা করতে পারতিস। সব পেটভাতা কাজে লেগে যেত। শহরে যা হয়, গ্রামে তা হয় কখনো ?

গিরি ঈষৎ হেসে বলেছিল, ও সব কথা থাক দাদা। এখন বল দেখি, হাদোকাঁহালী জনা সব জমি পাচ্ছে, তা তোমার গে রাজীবের বাপ পেতে পারে না।

সে চেষ্টা করেছে ? এয়েছে আমার কাছে ? কখনো বলেছে কিছু ? সরকারের কাজ করি, ডাক্তারের ডান হাত হই, নিশ্চয় পারতাম।

আমি যেয়ে পাঠাচ্ছি।

গিরির মনে হচ্ছিল সব যেন স্বপ্ন স্বপ্ন, অলীক অলীক। ঘর হচ্ছে, জমিও হতে পারে। স্বামী তার অত্যন্ত বাউণ্ডুলে তা সে জানে। তবু স্বামীর ওপর অপার মমতা হচ্ছিল তার। ঘর নেই, জমি নেই, এমন মানুষ কি পিণ্ডিতু হবে ?—হ্যাঁ গো দাদা, পাঠাব তাকে ?

তোর বাপকে দেখতে পাচ্ছিস না ? পঞ্চায়েতে ঢুকে গেছে বললে হয়। মামাকেও বলি ! জমি একটু আউলচাঁদ যাতে পায় সে ব্যবস্থা তো করাটা আগে দরকার।

বলেছিলাম, সে হাটের মধ্যে আমাকে অপমান করে চলে গেল। বলল, জমি সে নিজেই পেতে পারে।

গিরি এর কিছুই জানে না—অ বংশী দাদা ! ব্যাগাতা করি তোমার, একটু বল কি করতে হবে। সে মানুষ তো ওই এক ঘাঁচের। এখন ঘর একখানা হয়েছে, তাতে রাতে চাঁদ দিনে সূর্য হাসে। চালে পাতা নেই, খড় নেই বলতে গেলে। বেলার বিয়ে দেব, কুটুম এসে বসবে কোথায় ? ছেলে একটা দেখে দাও।

ছেলে রয়েছে, দেখতে পাও না ? আমারই পিসাতো ভাই। ছেলে কেমন দোকান দিয়েছে একটা। মুদী দোকান।

গিরি বেঁচে গিয়েছিল এ কথা শুনে। রাজীব বলেছিল, তাহলে আমি যেয়ে জামাইদাদার দোকান থেকে রোজ ধার করে তেল-নুন আনব তাই বল মা ?

গিরি ছেলেকে ঠোনা মেরেছিল।—বাপের ছেলে হয়ে উঠেছে। ধারে খাব, বগল বাজাব।

দু-দিনের জায়গায় ছয়দিন হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাপের বাড়ি ছেড়ে ফেরার সময়ে গিরির পরণে গোটা কাপড়, ছেলেমেয়ের গায়ে বাংলা-দেশের 'নিলাম! নিলাম!' মরা সায়েব মার্কা জামা প্যান্ট, গিরির মাথায় চালের পোঁটলা, এমন কালে বংশী বামালি বাতাসের মুখে কুটোর মত উড়ে এসে দুঃসংবাদটি দেয়।—সর্বনাশ বল সর্বনাশ, ভাল বল ভাল। সংবাদ বড় প্রচণ্ড হে মামা! আউলচাঁদ বলেছে—চল বেলা, মামাবাড়ি যাবি। তাই বলে মোহনের সাজসে মেয়ে নিয়ে গেছে কান্দী। সেখানে সেই মা-চেনা নিনু ভীরু বারো বছরের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে ভিনদেশীর সঙ্গে। তারা বিদেশী, বিহার দেশে থাকে। এমন পাঁচটি বেলারাণীকে পাঁচজন বিয়ে করে চলে গেছে দেশে। এ সব মেয়ে-ব্যাপারী কারবার হে মামা। যে ঠিকানা দিয়ে গেছে সব জাল। এমন কারবার এখন খুব চলছে। আউলচাঁদ করকরে চারশো টাকা পেয়েছে। এখন মোহন আর আউলচাঁদ দুজনে ঘরে বসে নেশা করছে আর আউলচাঁদ 'বেলা! বেলা!' বলে খুব কাঁদছে আর পঞ্চায়েতের কালীবাবু আউলচাঁদকে যাচ্ছেতাই গাল দিচ্ছে।

এমন সংবাদে গিরির মাথায় আকাশ ভাঙে। হাহাকার করে কাঁদে সে। বাবা বলে, চল, আমি লোকজন নিয়ে যাচ্ছি। মেয়ে বের করব, মেয়ের বাপকে লুলা করে দেব হাত ভেঙে। এই সঙ্গে মোহনকেও নিকেশ করব।

মোহনকে পাওয়া যায়নি। আউলচাঁদ একই সঙ্গে নাক-কান মলে, হাহাকারে কাঁদে, আর মাঝে মাঝে তড়পে বলে, আমার মেয়ে আমি বিয়ে দিয়েছি, কার কি?

খুব খোঁজতল্লাস হয়। গিরি তার রুপোর হার নিয়ে বাবুদের কাছে কাঁদে।—পুলিশকে বল গো বাবু! রেডিওতে বলা করাও। বেলা আমার তালসনা ছাড়া কিছু জানে না। তোমরাও তো জানো যে মিনসে পিচাশ। কেন বা ওর হাতে মেয়ে দিলে ছেড়ে।

বাবু গিরির বাবাকে বুঝিয়ে বলেন, থানা পুলিশে বিস্তর হাঙ্গামা, খরচও অনেক। যা কেলেঙ্কার হবার তা হয়েছে। এ এক নতুন ব্যবসা হয়েছে। বিয়ের ভুজুং করে মেয়ে চালান দেয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র

চলছে কারবার। এসে কয়েকশো টাকা দেয়। শাকের ক্ষেত দেখে ক্যাঙাল পাগল হয়। থানা পুলিশ ছেঁড়া মামলা নেবে না। বলে দেবে, বাপ মেয়ের বিয়ে দিলে থানা কি করবে? বেলারও কপাল!

বাপ, প্রতিবেশী, বাবুর বউ সবাই গিরিকে সে কথাই বোঝায়।—কপাল হল সবার ওপরে। কি করবি বল? মেয়ে যদি তোর কপালে থাকত, সে তো ভালই হত। ছেলে নয়, মেয়ে। মেয়ের নাম ফেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি। বাবা নিশ্বাস ফেলে বলে, তোর মেয়েটা যেন নিজের জীবন ভাসিয়ে বাপকে ঘর তোলার টাকা দিয়ে গেল।

দুঃখে পাগল পাগল গিরি বলল, তুমি আর বাঁশ পাঠিও না বাবা। পিচাশ যা পারে করুক।

থানা পুলিশ করে লাভ নেই মা।

গিরি দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে থাকে। চোখ বুজে থাকে সে। বড় দুঃখে তার মনে সত্যি কথার ঝিলিক জাগে। মেয়েমানুষকে নিয়ে অত ভাবতে কেউ রাজী নয়। তারও ভাবা উচিত নয়। সেও মেয়ে। তার বাপ তো খোঁজখবর না নিয়ে এমন অমানুষের হাতেই তাকে দিয়েছিল।

আউলচাঁদ বোঝে যে হাওয়া নরম। তাই সে বলে, আপনার মেয়ের তো দোষ কম নয়। মেয়ের খোঁজ করতে হবে তাতে হার বেরোল। গয়নাগুলো দেয় যদি, তাহলে ঘরও ওঠে, মেয়েও বেচতে হয় না। তারপর দেখুন, লজ্জার কথা কি বলব। অপোরেশোন করে ফরসা হয়ে এলো। বলে, খেতে দিতে পারো না, ছেলে দিয়ে কি হবে? কি হবে সে তো দেখিয়ে দিলাম। মেয়ে হলেও লাভ থাকত কত এই যে টাকা পেলাম—

এ কথার জবাবে গিরি নিজের মাথা কুটতে থাকে ভীষণ রাগে ও দুঃখে। সবাই তাকে থামায়।

ক্রমে এ ব্যাপারে আলোড়ন থেমে যায়। বাবুর পিসি জ্ঞানী মানুষ। তিনি বলেন, আইবুড়ো মেয়ে বাপের সম্পত্তি। তুই কেঁদে কি করবি বল?

গিরি কাঁদে না আর। শক্ত মুখে পরীকে দিয়ে যায় বাবুর বাড়ি। বলে, বাপ নিতে এলে গিয়েছ কি কেটে ফেলে দেব।

আর আউলচাঁদ কথা বলতে এলে কোন জবাবই দেয় না। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। আউলচাঁদ ভয় পেয়ে যায়। বলে, দ—ঘ ঘরের জন্যে। ঘর বাঁধবে বলে?

হ্যাঁ রে।

কোন্ দেশে মানুষ যায় জেনে আসতে বল মোহনকে। সে দেশে এ তিনটেকেও বেঁচে দিয়ে এসো না। পাকা ঘর হবে। মোহন জানে না? আউলচাঁদ বলে, তোর মত নির্মায়া মানুষ তো দেখিনি বউ। ছেলেমেয়ে বেচে দিতে বলছিস? এই জন্যেই বাঁজা হয়ে এসেছিস বোধ হয়। তুই এমন কথাটা বললি? আর বাপ দিতে চেয়েছিল, বাঁশ নিলি না ব কেন?

গিরি ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় শোয়। আউলচাঁদ খানিক ভ্যান-ভ্যান করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু সময় বলে কথা! ক্রমে গিরিও মেনে নেয় সব। আউলচাঁদ বাঁশের ঝাঁপ বেড়া কিনে ঘর বাঁধে। চালটি থাকে তালপাতার। রাজীব হয় কালীবাবুর বাগান আর মরুনী উঠোনে খেলা করে করে বড় হয়। পরীর দিকে চাইলেই গিরির বুক পুড়ে যায়। বেলার মত হাসি, মাথা কাত করে চেয়ে থাকা। বাবু গিন্নি বলেন, খুব লক্ষী মেয়ে রে। এত কাজ ভালবাসে।

কাজ ভালবাসে বলে পরী বাবুদের বড় বড় ঘর দালান দশবার ঝাঁট দেয়, পুকুরে নিয়ে বাসনের বস্তা কাচে, মাঠ-ময়দানের মত উঠোন গোবরনেতা করে। পরীকে দুটো মুড়ি ঝোলাভাজা কি আতুর লাড়ু খাইয়ে গিরি বাবুদের বাগানে ঘুরে ঘুরে ডালপালা কুড়োয়। নিস্তব্ধ দুপুরে তার চারদিকে পাতার সরসর, কাঠবিড়ালীর ছুটোছুটি, আর ঝিরঝিরে বাতাস। গিরির রুক্ষু চুল বাতাসে ওড়ে। মনে পড়ে বেলার গলার কাতর মিনতি, আজ তো তুমি মুড়ি ভাজছ মা! বাবুদের বাড়ি থেকে ডাকতে এলে একটু বলবে, যে বেলা কাল কাজে যাবে, আজ ঘরে থাকবে?

অত বড় মেয়ে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোতে ভালবাসত বাবুর পিসির বসে তেলমাখার পিঁড়িটা পায়ে পড়ে পা ছেঁচে গিয়েছিল। শেষে পিদিমের পোড়া তেল গরম গরম দিতে বাথা সারে। গিরির জ্বর হলে বাবুর বাড়ি বলে একটু সময় চেয়ে নিয়ে ছুটে এসে বাড়িতে ভাত রেঁধে রেখে যেত।

বেলা, বেলারাণী, বেলি—
ফেলি নয় তো বেলি—
মেয়ের নাম বেলি
যমকে দিলেও গেলি
জামাইকে দিলেও গেলি।

গেল, কোথা গেল ? কত দূর ? কোন্ পুর ? ভাবতে ভাবতে গিরি অস্ফুটে বলত, যাই যাই। যেখানে থাকো বেঁচে বর্তে থাকো মা ! কোথায় আছ জানলে উড়াল দিয়ে পাখপক্ষীর মত চলে যেতাম। জানি না মা। ঠিকানা নিয়ে বাবুকে দিয়ে চিঠি করিয়েছিলাম। সে জানে ঠিকানা মা !

ঘরে ফিরে গিরি ভাত রাঁধে। মঙ্গলীকে নিয়ে নিজে খায়। আউলচাঁদের ভাত হাঁড়িতে পড়ে থাকে। যেদিন বেরোয় না, সেদিন দাওয়ায় পড়ে থাকে। যেদিন কাজ থাকে, ফুটফরাকে যায়। তাদের তৈরি কৃষ্ণচক – নিশিন্দা বাসপথ দিয়ে বাস যায় এখন। বাসে চেপে বোস, দেড়ঘন্টায় কান্দী পৌঁছবে। এখন সেচখাল থেকে জলনিকাশী নালা কাটার কাজ হচ্ছে। গিরির বাবুর ছেলে এখানে হরিতরি করে এখন। ঠিকেদারি করতে করতে সে বাসের পারমিটও বের করে নিয়েছে।

এখানেই বংশী ধামালিকে দেখতে পায় গিরি। বংশী বেশ আন্তরিক উদ্বেগেই বলে, চিনতে পারিনি গো গিরি। এমন কালীবরন চেহারা করেছ। অ, সেই মেয়েটার জন্যে হাপসে হাপসে···তা কি আর করবে বল ?

না গো দাদা। পরীটার দশ বছর হল যে।

দশ বছর ?

ও মা ! যেবারে তোমার ডাক্তারবাবু দালান দিল, নিশিন্দার ইলেকট্রিসিটি এলো, সেবারেই তো পরী হল।

তাই তো।

তোমার কথা শুনে সবশুদ্ধ যদি যেতাম তখন। ছেলেটাও বাগালী কাজ করছে। শহরে গেলে ওরা ইস্কুলেও যেত।

ইস্কুলের কথা জানি না। তবে টাউন এখন সাগরসমান। ছেলেমেয়ে কাজে লেগে যেত।

গিরি বোঝে যে তার ছেলেমেয়ে ইস্কুলে যেতে পারে এ কথা বলায় বংশী রেগে গেছে।

যাকগে দাদা। সেই তো খেটে খাবে, দু'পাতা পড়ে বা কি হবে ওদের। তা পরীটার জন্যে একটা ছেলে দেখ না।

বলব, আউলচাঁদকে বলব।

না, আমাকে বোল।

এ তোমার মিছে রাগ বাছা। একটা কাজ করে ফেলেছে তার কি ক্ষমা হয় না ? বিয়ের কথাবার্তা মেয়েছেলের সঙ্গে হয় ? কুটুম ভাববে

ওদের কি দোষ আছে বুঝি। ছেলের বিয়ে দাও, তখন তোমার কথা শুনবে কুটুম। মেয়ের বিয়েতে শুনবে ?

আমি যেন জানতে পাই।

দেখি। কেষ্টচকে রিক্‌শা চালায়, একটা ছেলে আছে। বয়স একটু বেশি হবে। ধর বছর পঁচিশ।

তা হোক।

কেষ্টচকেই থাকবে মেয়ে। জমিজমা নেই, তবে রিক্‌শা ভরসা। তাতেও দিন চার-পাঁচ টাকা থাকে। সন্ধেবেলা ছেলেটা বিড়ি বাঁধে। তবে ঘর করতে হবে। ভাত জল দেবার লোক নেই বলেই সে বিয়ে করতে চায়।

দেখ তুমি। হয় যদি তো এই মাঘেই দেব।

বেলা চলে যাওয়া থেকে যে মন বিপর্যস্ত ছিল, সে মনে যেন আশার আলো জ্বলে ওঠে। গিরি বলে, যা রেখেছি, সব দেব। আর তো থাকে মরুনিটা, সে পরে ভাবব এখন। আমার মেয়ে, নিজমুখে কি বলব গো দাদা, বাবুর বাড়ি খাটে বটে, তবু খেয়ে মেখে যেন দলমলে চেহারা। কে বলবে ও দশ বছরের মেয়ে। এসো দাদা, দোকানে একটু চা খাও।

চা খেতে খেতে বংশীই বলে, মামার তো আরো দু' খানি জমি হল, আর দুখানা গোলা। সত্যি, মামা খুব অবস্থা করেছে। দেখলে চোখ জুড়োয়। ওরা তো আসে না, খোঁজখবরও নেয় না।

কথাটা শুনতে মন্দ লাগবে বোন, কিন্তু আপন হলেও আপন হয় না। মামার যাওয়া আসা এখন তার সমান ঘরে ঘরে। তোমার অবস্থার মানুষের সঙ্গে নয়।

গিরি নিশ্বাস ফেলে। কোলআঁচলের খুঁট খুলে চায়ের দাম দেয়। বলে, পরীর কথাটা মনে রেখ, অ দাদা।

মনে রইল।

আউলচাঁদের সঙ্গে বংশীর দেখা হয়, রিক্‌শাওলা ছেলের কথাও হয়। আউলচাঁদ উল্‌সে ওঠে। বলে, দাদা, রিক্‌শাওলা ছেলেই তো আমিও দেখেছি। সে বহরমপুরে রিক্‌শা চালায়। এই চুল, এই দাড়ি গোঁফ, মরা সায়েবের কোটপ্যান্ট পরে তার বোলচাল কি ! এ নিয়ে তুমি আর ভেবনি।

বংশী এর পরে গিরির সঙ্গে দেখা হতে বলে দেয়, আউলচাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তুমি আর ভেবো না।

আউলচাঁদ যায় মোহনের খোঁজে। মোহনই এ সব ব্যাপারে আউলচাঁদের কাণ্ডারী। লালবাগ, ধুলিয়ান, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, ফরাক্কা—কোথায় যায় না সে? দিল্লীতে, মীরাটে, ধানবাদে, টাটায় গণিকালয়ের ব্যবসা জেঁকে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের রুচি রুচি মেয়েদের চাহিদা খুব। বড়লোক ও ব্যবসায়ী খদ্দেররা রুচি মেয়ে পছন্দ করে। খাওয়ালে-মাখালে কয়েক বছর বাদেই মেয়েটিকে দিয়ে সব খরচ উসুল করা যায়।

বিয়ের একটা ভুজুং দরকার করে বাপু সিধা টাকা ফেললে গ্রামের মানুষ গণ্ডগোলাই দেবে। তাই বলতে হয়, বিহারে মেয়ের বড় আকাল···

বিয়ে পুরুত ডেকেই হয়। তারপর বলতে হয়, দেশে গিয়ে বাকি আচার নিয়ম সারব, তারপর যাকে বলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক···তাই হবে। আজ্ঞা-অনুমতি করেন, বউ নিয়ে যাই।

কয়েকবার 'বিহার থেকে বিয়ে করতে এসেছি' বলে মেয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন নতুন কৌশল করতে হচ্ছে। মেয়ের খোঁজ দিতে পারে স্থানীয় টাউট। সেও সব জানতে পারে না। সে বোঝে যে কারবারে গুড়ের মধ্যে বালি আছে কোথাও। কোথায় যে জালিয়াতি তা সে জানতে চায় না। বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজতে বলেছে, মেয়ের খোঁজ সে দেয়।

মেয়েদের বাপ-মা-দাদা-কাকা সত্যিই জানতে পারে না। তারা জানে যে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি, পণ পাচ্ছি। বিদেশীর সঙ্গে বিয়ে, তাই গোপন করছি সব। মানুষ তো ভাল নেই আর। এত টাকা নিয়ে বিয়ে দিচ্ছি জানলে ভাংচি দেবে। আমাদের বিদেশী পাত্রই ভাল। বাঙালী ছেলে কন্যা পণ দেয় বটে এখনো, যে জাতে পণ দেওয়া নিয়ম, কিন্তু ঘড়ি দাও, সাইকেল দাও, রেডিও দাও—একেবারে পাঁচ-সাত হাজার টাকার ধাক্কায় ফেলে।

আউলচাঁদ যায় মোহনের খোঁজে। বেলারাণীর কেচ্ছার পর কালীবাবু বলেছিল, তোমাকে আর ফুটফরাকের কাজ দেব না। পঞ্চায়েতী কাজ তুমি পাবে না।

মোহন এখন তার চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যে নিয়ে নিশিন্দা ব্লক আপিসের আশেপাশে আসর জাঁকিয়েছে। চাষীদের হাতে সার পড়লেই সেটি বেচে দেওয়া, কৃষিঋণে খাবল মারা—এখন তার অনেক কাজ।

আউলচাঁদের কথা শুনেই সে সবেগে মাথা নাড়ে—না বাবু। মোহন মণ্ডল আর তোমার কারবারে নেই। পরোপকার করেছি অনেক, ঢের

হয়েছে। আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দেওয়া হল গে পুণ্য কাজ। টাকা পেলে তুমি, আমি কি পেলাম? ওরা তবু চল্লিশ টাকা ঠেকাল। তুমি? টাকা নিয়ে ছাঁচবেড়ার ঘর করলে। তোমার বউকে ভয় করি বাপু।

আহাহা, সে-ই বলেছে।

বটে?

শোনই না। আউলচাঁদ বলে, কেষ্টচকের রিক্সাওলা কেন? তুমি সামনে থেকোনি। যোগাযোগ কর, শহরের রিক্সাওলা হয় না? অনেক দিনের ইচ্ছে বহরমপুর টাউনে কুটুম করি। তাতে গা-গেরামে মান বাড়ে, আমারও একটা খুটো হয় টাউনে।

টাউনের রিক্সাওলা?

হ্যাঁ হে। দেখ না। বহরমপুরে দেখো কিন্তু। সে বিহার দেশের লোক খুঁজো না। টাউনের রিক্সাওলা ছেলে হবে, মেয়ে টাউনে থাকবে। আমরা যেতে-আসতে, আনতে-নিতে পারব। বেলার মা আমার ওপর গুমরে থাকে। তার মনটাও পক্কের হবে।

মিতেনের সঙ্গে ভাব করতে চাও?

হলেই ভাল। সে মাগী তো আমাকে মানুষ মনে করে না। দেখিয়ে দিতে চাই যে মেয়ের বিয়ে আমিও দিতে পারি। তুমি না হলে হবে না।

মোহন হাসে। বলে, যাও। আমি কিন্তু কোথাও থাকব না। শুধু যোগাযোগ করে দেব। টাউনের জামাই চাইছ, সে যদি কর্ম ফেলে দেয়?

কর্ম করতে হবে।

বুঝেছি, এখন যাও।

মোহন বোঝে যে এবার তাকে খুব খাঁতেঘোঁতে এগোতে হবে। 'বিহার থেকে আসছি' পার্টি থাকবে পিছনে। সামনে থাকবে রিক্সাওলা। বিয়েটা তার সঙ্গেই হবে। ভালই হল। এবার পাঁচটা মেয়ে জোগাড় করার কথা। রিক্সাওলা, রিক্সাওলা, কাকে পাওয়া যায়? টাউনে যেতে হচ্ছে।

পরীর বিয়ের ব্যাপারেই গিরি ও আউলচাঁদ আবার খানিক কাছাকাছি আসে। শেষে মোহন আউলচাঁদকে বলে, যাক। ছেলের খোঁজ পেয়েছি।

খাঁকতি কেমন?

ঘড়ি তার আছে। রেডিও আছে। রিক্সা চালায়, সাইকেল সে চায় না। বরসজ্জা, মেয়েসজ্জা, মাদুর-মাতা-জুতো, মোটামাটি কমবে বলতে

পারো।

পণ দেবে ?

একশো টাকা।

ঘরদোর আছে ?

ভাড়া ঘরে থাকে। তবে রিক্‌শা নিজের।

আউলচাঁদ ও গিরি খুব খুশি হয়। ছেলে যখন আসে মেয়ে দেখতে, গিরি আড়াল থেকে ভাল করে দেখে। ছেলের নাম মনোহর ধামালি। খুব হট্টাকট্টা চেহারা, গোঁফ দাড়ি। মনোহর ধামালি নামে জনৈক রিক্‌শা চালক বহরমপুরে আছে। এ ছেলে পানু। ডাকা ও কেসে প্রমাণাভাবে সদ্য খালাস। সে কথা আউলচাঁদও জানে না। জেল থেকে বেরিয়ে পানু করাক্তায় একটি ও জলঙ্গীতে একটি, দুটি পরীবালাকে বিয়ে করে তার নতুন মনিব 'আমরা বিহারী' দলের হাতে তুলে দিয়েছে। পাঁচটি বিয়েতে তার প্রাপ্য পাঁচশো টাকা, তাই সই। তারপরই শিলিগুড়ি চলে যাবে পানু।

গতবার বেলার বিয়ে নিয়ে আত্মস্বজন ডাকা হয়নি। এবার গিরির মা বাবা আসে। শাঁখ বাজে, উলু পড়ে। গিরি ঘামতেলা মুখে ভাত-মাংস রাঁধে। বাবুর ঘর থেকে গয়না এনে পরীকে পরিয়েছে। মা নতুন কাপড় দিয়েছে। বাবুর বাড়ি থেকে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করেছে। বাবা চাল এনেছে। ছেলে বিয়ে করতে আসে বাসে চেপে, পাঁচজন সেবো নিয়ে। পরীকে হলুদে আলতায় খুবই বেলার মত দেখায়।

পরদিন আবার সদর রাস্তায় বাস ধরে ওরা চলে যায়।

সেই যে যায়, সেই পরীর মুখখানা শেষ দেখা। পরদিন আউলচাঁদ রাজীব আর গিরির ভাইকে নিয়ে মেয়েকে দেখতে টাউনে যায়। সেই যে যায়, আর তারা ফেরে না। বিকেল যায়, সন্ধে হয়। রাত গড়িয়ে চলে। গিরির উঠোনে জুতোর মশমশ শব্দ। শুনেই গিরির মনে কু ডাকে। দোর খুলতে দেখে বংশী ধামালি। বংশী রাজীবকে ধরে আছে। রাজীব ডুকরে বলে, মা। আর গিরি অমনি বোঝে আবারও তার সর্বনাশ হয়েছে। সে চেয়ে থাকে। ভাই বলে, দিদি! আমি বলছি।

বলার থাকে না বেশি কিছু। টাউনে যে মনোহর ধামালি থাকে, সে এক আধবুড়ো মানুষ। শুনেমেলে সবাই বলে, ঠিকানায় মানুষ পাঠান ? পাবে কোথা থেকে ? ও তো পানু বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কয়েক দিন খুব বিয়ে করে বেড়াচ্ছে। কি একটা কারবারে ভিড়েছে মনে হয়।

গিরি ঘাবা দিয়ে বলে, মোহন নেই এতে ?

সে-ই তো নাটের গুরু।

রাজীবের বাপ ?

সে দৌড়ল মোহনের খোঁজে। সবাই বলে মোহন পরীর বিয়েতে পাঁচশো টাকা না সাতশো টাকা পেয়েছে। মেয়ে চাই, টাকা চাই, সেও পাগলপানা করছে তো !

গিরির উঠোনে লোক জেগে পড়ল। মোহনকে ধরে মারো। চল, থানা-পুলিশ করি। এ কি মগের মুলুক না কি ? অনেক কথা, অনেক হই-চই।

আউলচাঁদ ভোর রাতে ফিরে এলো। ঘাঁনা। গুরুত্বে অভিভূত আউলচাঁদ নেশা করে এসেছে। টাকা পেল কোথেকে ? হাঁ হাঁ, আউল-চাঁদ সর্দার নাম হে আমার ! মোহন যাবে কোথা ? তার গলায় মোচড় মেরে টাকা নিয়েছি। নেব না কেন বল ? মেয়ে আমার নয় ? ভাঁওতা দিয়ে তাকে তুমি বেচনি ? টাকা তুমি নেবে ? দেব কেন ? পরীর মা কোথায় ? কেন যে অপোরেশোন করে এলি বউ, যত মেয়ে তত টাকা। তোকে আমি খেড়ো ঘর বন্দিনা তুলে দিইছি—পরী রে !—হাউ হাউ করে কাঁদে আউলচাঁদ তারপর দাওয়ায় শুয়ে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ে। গিরি অনেক কষ্টে শুকনো গলায় বলে, যে যার ঘরে যাও গো।

সবাই সরে যায়, চলে যায়। গিরি কি করবে তাই ভাবে। মরবে হয়তো, হয়তো জলে ঝাঁপ দেবে। সবাই বলে, মরুনিটারও অমনি দশাই হবে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে এ কি ব্যাখ্যানা মা ? মা গিরি, বাবুর হাতে-পায়ে ধরে থানা পুলিস কর।

গিরি তার আশ্চর্য চোখ মেলে চেয়ে থাকে। মাথা নাড়ে। না, কোন চেষ্টা সে করবে না।

আউলচাঁদ টাকা পেয়েছে, সে করুক চেষ্টা। গিরি অবাধ্য মাথা নেড়ে চলে 'না না' বলে।

বংশী ধামালি বলে, বিধাতার কি ইচ্ছে কে জানে। এক মেয়ে হতে ছাঁচ বেড়ার দ্যাল, এক মেয়ে হতে চাল।

গিরি তার দিকে চেয়ে থাকে।

কেঁদে কেঁদেই আউলচাঁদ খেড়ো চাল বাঁধে। যত জল তার চোখে, গিরির চোখ শুকনো থাকে।

বাবুর পিসি বলে, মেয়ে সন্তানের মা তো গিরি ! কথায় বলে, মেয়ের নাম কেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি। তা তোর কপালে তাই হল। কাঁদছিস না কেন ? তা কি বুঝি না ? অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর হইছিস। কাজে লেগে পড় দেখি। সব সয়ে যায় মা, পেট তো মানবে না।

গিরি তার দিকেও চেয়ে থাকে তারপর বলে, গিন্নিমাকে বল। আমার টাকাগুলো দাও।

টাকা নিয়ে আঁচলে বাঁধে গিরি। ঘরে ফিরে উঠোনে দাঁড়ায়। বেশ ঘর। ঝাঁচবেড়াতে কাদা লেপা দেয়াল, খেড়ো চাল, বেশ ঘর। এমন একখানা ঘরই তো সে চেয়েছিল। সে বোধ হয় বড্ড বেশী চাওয়া। তাই বেলিকে পরীকে বেস্তার দালালের হাতে দিতে হল। বেস্তাই তো, বেবুশ্যে। মেয়েছেলে কিনে নিয়ে গিয়ে কেউ কি সংসার করে ? কখনো নয়।

এমন ঘর ! আউলচাঁদ মরুনির দিকে আড়ে আড়ে চায়। তারপর ভোরা বাঁধতে থাকে। গিরি তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে। আউলচাঁদ মনে মনে বোঝে, যত দুঃখ পাক, ঘরটি নিশ্চয় মনে ধরেছে।

সকালে উঠে সবাই অবাক হয়ে যায়। কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, গিরিবালা ভোর রাতে মরুনিকে কোলে নিয়ে রাজীবের হাত ধরে সদর পথে বাস ধরে টাউনে চলে গেছে। পরে খবর আসে, নিশিন্দার নেমে সে বংশী বামালিকে বলে গেছে, পরীর বাবাকে বোলো, সে যেন তার ঘরে জন্ম জন্ম বাস করে। গিরি টাউনে কি খাটবে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবে। আউলচাঁদ যদি খোঁজ করতে যায়, গিরি তাহলে রেলের লাইনে মাথা দেবে।

এ কথা জেনে সবাই অবাক হয়ে গেল, মাথা নাড়ল। বেলা আর পরীর যা হয়েছে, সে তো এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। তা বলে স্বামী ছেড়ে চলে যায় কে ? কোন্ মেয়েছেলে ?

সবাই নিশ্চিত হল যে আউলচাঁদ নয়, গিরিবালা মেয়েটি আসলে মন্দ। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে তবে সবাই কি স্বস্তি যে পেল, তা কি বলি !

আর মরুনিকে বুকে চেপে টাউনের পথে হাঁটতে হাঁটতে গিরি ভাবল, আগে যদি বুকে এ সাহস জোয়াতো, তাহলে তো আগেই আসি। তবে কি পরি যায়, বেলা যায় ?

ভাবতে ভাবতে তার মুখ চোখের জলে ভেসে গেল। তবু সে হেঁটে চলল।

(প্রসাদ/১৩৮৯)

ভাত

মহাশ্বেতা দেবী

লোকটার চাহনি বড়বাড়ির বড়বউয়ের প্রথম থেকেই ভাল লাগে নি। কি রকম যেন উগ্র চাহনি। আর কোমর পর্যন্ত ময়লা লুঙ্গিটা অত্যন্তই ছোট। চেহারাটা বুনো বুনো। কিন্তু রামুন ঠাকুর বলল, ভাত খাবে কাজ করবে।

—কোথা থেকে আনলে?

এ সংসারে সব কিছুই চলে বড় পিসিমার নিয়মে। বড় পিসিমা বড় বউয়ের পিসি শাশুড়ি হন। খুবই অদ্ভুত কথা। তাঁর বিয়ে হয়নি।

সবাই বলে, সংসার ঠেলবার কারণে অমন বড়লোক ঘরেও ওরা মেয়ে বিয়ে দেয়নি। তখন বউ মরে গেলে বুড়ো কর্তা সংসার নিয়ে নাটাখামটা হচ্ছিল্।

বড় বাড়ির লোকেরা বলে, ওর বিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে। উনি হলেন দেবতার সেবিকা।

বড় বাড়িতে শিবমন্দিরও আছে একটা। বুড়ো কর্তা এ রাস্তার সব-গুলো বাড়িই শিব-মহেশ্বর-ত্রিলোচন-উমাপতি, এমন বহু নামে শিবকে দিয়ে রেখেছিলেন। দূরদর্শী লোক ছিলেন। তাঁর জন্যেই এরা করে খাচ্ছে। বড়পিসিমা না কি বলেছিলেন, উনি আমার পতিদেবতা। মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিও না।

এ সব কথা সত্যি না মিথ্যে কে জানে। বড়পিসিমা চিরকাল এ সংসারে, হেঁসেল দেখেছেন, ভাড়াটে বাড়িতে মিস্তিরি লাগিয়েছেন এবং তাঁর বাবার সেবা করেছেন।

বড় বউয়ের কথা শুনে বড়পিসিমা বলেন, কোথা থেকে আনলে মানে? ঝড় জলে দেশ ভেসে গেছে। আমাদের যাগিনীর কে হয়। সেই ডেকে আনলে।

বড়বউ বলে, কি রকম দেখতে!

—ময়ূরছাড়া কার্ত্তিক আসবে নাকি? তোমরা তো দশটা পয়সা দিতে পারবে না প্রাণে ধরে। এই চোদ্দ দফার কাজ করবে, পেটে দুটো খাবে বই

তো নয়। কেনা চাল নয়, বাগা থেকে চাল আসচে। তা দিতেও আঙুল বেঁকে যাচ্ছে?

বড়বউ চুপ করে যায়। বড়পিসির কথায় আজকাল কেমন যেন একটা ঠেস থাকে। "তোমাদের" মানে কি? বড়পিসিমা কি অন্য বাড়ির লোক না কি?

বড়পিসিমা শেষ খোঁচাটা মারেন। তোমার শ্বশুরই মরতে বসেছে বাছা। সে জন্যেই তো মি যচ্ছি হচ্ছে। তার জন্যে একটা লোক থাকে...

বড়বউ কোন কথা বলে না। সব কথাই সত্যি। তার শ্বশুরই মরতে বসেছেন। বিরাশি বছরটা অনেক বয়েস। কিন্তু শ্বশুর বেশ টনকো ছিলেন। তবে ক্যানসার বলে কথা। ক্যানসার যে লিভারে হয় তাই বড়বউ জানত না। বড়বউ প্রায় দৌড়ে চলে যায়।

আজ অনেক কাজ। মেজবউ উনোন পাড়ে বসেছে। শাশুড়ির মাছ খাওয়া বুঝি ঘুচে যায়। তাই কয়েকদিন ধরে বড় ইলিশ, পাকা পোনার পেটি, চিতলের কোল, ডিমপোরা ট্যাংরা, বড় ভেটকি মাছের যজ্ঞি লেগেছে। রেঁধে-বেড়ে শাশুড়িকে খাওয়ানো তার কাজ।

শ্বশুরের ঘরে নার্স। বড়বউ এখন গেল সে ঘরে। সে একটু বসলে পরে নার্স এসে চা খেয়ে যাবে। সেজ ছেলে বিলেতে। তার আসার কথা ওঠে না। ছোট, মেজ ও বড় ঘুমোচ্ছে। এ বাড়ির ছেলেরা বেলা এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। সেই জন্যেই তাদের চাকরি করা হয়ে ওঠে নি। আঠারোখানা দেবত্র বাড়ি আর বাগা অঞ্চলে অসাগর জমি থাকলে কাজ বা করে কে?

শ্বশুরের ঘরে বসে বড়বউ ভাবতে চেষ্টা করে শ্বশুর নেই, সে অবস্থাটা কেমন হবে।

ক্যানসার, লিভারে ক্যানসার, তা আগে বোঝা যায় নি। বোঝা গেল যখন, তখন আর কিছু করার নেই। বড়বউ ভাবতে চেষ্টা করে, তখনো চাঁদ সূর্য উঠবে কি না। শ্বশুর তার কাছে ঠাকুরদেবতা সমান।

তাঁর জন্যে দই পেতে ইসবগুল দিয়ে শরবত করে দিতে হত, শত ঠাকুর থাকুক, তিনি খেতে আসার পাঁচমিনিট আগে বড়বউকে করতে হত রুটি লুচি। তাঁর বিছানা পাততে হত, পা টিপতে হত। কত কাজ করতে হত সারা জীবন ধরে। এখন সে সব কি আর করতে হবে না, কে জানে।

ডাক্তারেরা এলে দিয়েছে বলেই তো আজ এই যজ্ঞিহোম হচ্ছে। ছোট বউয়ের বাবা এক তান্ত্রিক এনেছেন। বেল, ডাওড়া, অশ্বত্থ, বট, তেঁতুল গাছের কাঠ এসেছে আধ মণ করে। সেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে। কালো বিড়ালের লোম আনতে গেছে ভজন চাকর। শ্মশান থেকে বালি, বেশ্যা ঘরের হাতআশি, এমন কত যে ফরমাশ।

তা ওই লোকটাকে ধরে আনা কাঠ কাটার জন্যে। ও নাকি ক'দিন খায়নি। বাসিনী ধরে এনেছে। বাদায় থাকে অথচ ভাতের আহিংকে এতখানি। এ আবার কি কথা? বাদায় চালের অভাব না কি? দেখ না একতলায় গিয়ে। ডোলে ডোলে কতরকম চাল ধরে ধরে সাজানো আছে।

নার্স এসে বসে। বড়বউ নেমে যায়। আজ খাওয়াদাওয়া ঝপ করে সারতে হবে। তান্ত্রিক হোমে বসবার আগে। হোম করে তান্ত্রিক স্বস্তয়ের প্রাণটুকু ওই হাতআশিতে ধরে রাখবেন। তান্ত্রিক নিচের হলঘরে বসে আছেন।

বড়পিসিমা বলেন, নামতে পারলে বাছা? চালগুলো তো বের করে দেবে?

—এই যে দিই।

বিদেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড় বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, ছেলে আর ছোটর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন-চাকর-ঝিদের জন্যে মোটা সাপটা চাল।

বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।

—হ্যাঁ বাসিনী, এত নানা বিধি চাল?

—বাবুরা খায়।

—ওই পাঁচ জাগে ভাত হয়?

—হবে নে? বাদায় এদের এত জমি। চাল এনে পাহাড় করছে। বড়পিসিমা বেচেও দিচ্ছে লুকে লুকে। আমিই বেচতেছি সে চাল।

—বাদায় এদের চাল হয়! তা দে দেকি বাসিনী। এক মুষ্টি চালই দে। গাসে দে জল খাই। বড্ড ব্যামন আঁচড় কাটতেছে পেটের মদ্যিখানে। সেই ক'দ্দিন ধরে আঁদা ভাত খাই না। দে বাসিনী, বাপ্যত্তা কত্তি তোর।

—আরে আরে! কি কর উচ্ছব দাদা। গাঁ সম্পর্কে দাদা তো হও। কেন বা এমন করতেছ। পিসিমা দেকতে পেলে সর্বনাশ হবে। আমি ঠিক ভাগেবাগে দে যাব। তুমি হাত চালিয়ে নাও দেকি। বাবা! এদেরকে বলিহারি যাই। এট্টা লোক ক'দিন খায়নি শুনচ। আগে চাট্টি খেতে দে।

বাসিনী চালগুলি নিয়ে চলে যাবার সময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। লোকটির নাম উৎসব। চিরকালই সে উচ্ছব নাইয়া নামে পরিচিত। গত কয়েকদিন সে সত্যিই খায়নি। কপালটা মন্দ তার। বড়ই মন্দ। যতদিন রান্না খিচুড়ি দেয়া হচ্ছিল ততদিন সে যেতে পারেনি। অ চন্দ্রনীর মা। চন্দ্রনীকে। তোমরা রা কাড়না ক্যান? —কোতা অইলে গো!

বস্তুত এ সব বলে সে যখন খুঁজছিল বউ ছেলে মেয়েকে, তখন তার বুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। একদিকে তুমুল ঝড় বৃষ্টি, ছেলে মেয়েকে জাপটে দাপটে ধরে বউ কাঁপছিল শীতে আর ভয়ে। সে ঘরের মাঝ খুঁটি ধরে মাটির দিকে দাবাচ্ছিল। মাঝ খুঁটিটি মাতাল আনন্দে টলছিল, ধনুষ্টংকার রোগীর মত বেঁকে বেঁকে উঠছিল। উচ্ছব বলে চলছিল ভগমান! ভগমান! ভগমান! কিন্তু এমন দুর্যোগে ভগবানও কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোন বোধ করি। ভগমান! ভগমান! উচ্ছব বলছিল। এমন সময়ে মাতলার জল বাতাসের চাবুকে ছটফটিয়ে উঠে এসেছিল। জল উঠল। জল নামল, উচ্ছবদের সংসার মাটিতে লুটোপুটি গেল।

সকাল হতেই বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশের বহরখানা। তারপর কয়েকদিন ধরে ঘরের চালের নিচ থেকে কোন সাড়া পাবার আশায় উচ্ছব পাগল হয়ে থাকে। কে, কোথায়, পাগল না কি উচ্ছব? সাধন দাশের কথা উচ্ছব নেয় না। সাধন বলে, তোরেও তো টেনে নেচ্ছেল। গাছে বেধে রয়ে গেলি। উচ্ছব বলে, রা কাড় অ চন্দ্রনীর মা। ঘরের পাশ ছেড়ে সে নড়তে চায় না। তা ছাড়া টিনের বেশ একটা মুখবন্ধ কৌটো ছিল ঘরে। তার মধ্যে ছিল নিছুঁই উচ্ছবের জমি চেয়ে দরখাস্তের নকল। উচ্ছব নাইয়া/পিং হরিচরণ নাইয়া/সে কৌটোটা বা কোথায়?

যা আর নেই, যা ঝড়-জল-মাতলার গর্ভে গেছে, তাই খুঁজে খুঁজে উচ্ছব পাগল হয়ে ছিল। তাই রান্না খিচুড়ি তার খাওয়া হয়নি। তারপর যখন তার সম্বিত ফিরল, তখন আর খিচুড়ি নেই। ডাইভোল। চালগুলি সে চিবিয়ে জল খেয়েছিল। এ ভাবে কিছুদিন যায়। তারপর গ্রামের লোকজন বলে, মরেচে যারা তাদের হুরাদ করতে হয়। এ কাজ করার জন্যে

তারা মহানাম শতপদিকে খবর দেয়। কিন্তু মহানাম এখন আর দুটো গ্রামে অনুরূপ প্রাহশান্তি সেরে তবে এখানে আসবে। গ্রামবাসী অন্যেরা মাছ-শুগলি-কাঁকড়া যা পাচ্ছে ধরতে লেগেছে। উচ্ছবকে সাধন বলে, তুমি একা কলকেতা যাব বলে নেচে বা উটলে কেন? সরকার ঘর কত্তে খরচা দেবে শুনচ না?

উচ্ছব হঠাৎ খুব বুদ্ধিমান সাজতে চায় ও বলে, সে এটা কতা বটে।

ঝড়-জলে কার কি হল, মা-ভাই-বোন আছে না গেছে দেখতে বাসিনী আসতে পারেনি। তার বোন আর ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল। ওরা কিছুকাল ঠিকে কাজ করবে। উচ্ছব আগেও গিয়েছিল একবার। বাসিনী যেখানে কাজ করে, সে ঘরবাড়ি দেখেছিল বাইরে থেকে। বারবাড়িতে ঠাকুরদালান আছে, মন্দিরের মাথার পেতলের ত্রিশূলটা দেখেছিল। বাসিনীর মনিব-বাড়িতে হেলা চেলা ভাত, এ গল্প গ্রামে সবাই শুনেছে। উচ্ছবের হঠাৎ মনে হয় কলকাতা গিয়ে খেয়ে মেখে আসি। কেন মনে হয়েছিল তা সে বলতে পারে না। উপোসে, এক রাতে বউ ছেলে মেয়ে ঘরদোর হারিয়ে সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে, কোন কথা গুছিয়ে ভাবতে পারে না। খুব ভাবে সে, না না। এইবার গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। কি যে হল তা একনো দিশে হচ্ছে না তেমন। ভাবতে গেলেই তার প্রথমে মনে হয় ধানে গোছ আসার আগেই ধান গাছ থেকে সবুজ রং চলে যেতে থাকে। কার্তিক মাসেই ধান খড় হয়ে গেল। তা দেখে উচ্ছব মাথায় হাত দিয়েছিল। সতীশ মিত্তিরের হরকুল, পাটনাই, মোটা, তিন ধানে মড়ক। উচ্ছব তো সতীশ বাবুর জমিতে কাজ করেই ক'মাস বেঁচে থাকে। অ উচ্ছব, মনিবের ধান যায় তো তুই কাঁদিস কেন? কাঁদব না, সাধন বাবু, কাঁদব না? লক্ষী না আসতে সেধে ভাসান যাচ্ছে তা কাঁদব না এতটুকু? আমরা খাব কি?

তা গুছিয়ে চিন্তা করতে বসলে আগে মনে হয় ধান ক্ষেতে আগুন লাগার কথা। তারপরই মনে পড়ে যে রাতে ঝড় হয়। সেই সন্ধ্যেয় অনেকদিন বাদে সে পেট ভরে খেয়েছিল। এই এত হিঙ্কে সেদ্ধ আর এত শুগলি সেদ্ধ নুন আর লংকা পোড়া দিয়ে। দিনটা এমন ছিল যে সেদিনে গ্রামের সকল উচ্ছবেরা ভরা পেট খেয়েছিল। খেতে খেতে চন্দ্রনীর মা বলেছিল, দেবতার গতিক ভাল নয়কো। লোকো নে যারা বেইরেচে বুঝি বা বোট মারা পড়ে।

এ কথাটাও বেশ মনে পড়ে। তারপরেই মনে পড়ে মাকড়ুটিটা সে মাটির দিকে ঠেলে ধরে আছে। মা বসুমতী যেমন সে খুঁটি রাখতে চায়নে, উগরে ফেলে দেবে। ভগমান! ভগমান! ভগমান! তারপর বিদ্যুচ্চমকে ক্ষণিক আলোয় দেখা মাতলার সঙ্কেত জল ছুটে আসছে। ব্যস, সব ঘোলামেলা একাকার তার পর থেকে। কি হল। কোথায় গেল সব। তুমি কোথায়, আমি কোথায়। উচ্ছব নাইয়া/পিং হরিচরণ নাইয়া/কাগজ-সহ কৌটোটি কোথায়। বড় সুন্দর কৌটোখানি গো! চন্দ্রনীদের যদি রেখে যেত ভগবান, তাহলে উচ্ছবের বুকে শত হাতির বল থাকত আজ। তাহলে সে কৌটো নিয়ে সবাই ভিক্ষের বেরোত। সতীশ বাবুর নাতি ফুট খায়। উচ্ছব কৌটোটা চেয়ে এনেছিল। অমন কৌটো থাকলে দরকারে একমুঠো ফুটিয়ে নেয়া যায়। চমৎকার কৌটো।

—কি হল, হাত চালাও বাছা। উদিকে শুষচে কত্তা, হোম হবে, তা কাট্ গুনো দাঁ ফরে দেখচ?

বড়পিসিমা খনখনিয়ে ওঠে।

—বড় খিদে লেগেচে মা গো!

—এই শোন কত্তা! ভাত নামলেও খাওয়া নেই একন। তান্ত্রিকের মতুন বিধেন হল, ধুনুয় রেঁধে রাখো, হোম হলে খেও। তুমি হাত চালাও।

উচ্ছব আবার কাঠ কাটতে থাকে। প্রত্যেকটি কাঠ দেড়হাত লম্বা হবে। ধারাল কাটারিটি সে তোলে ও নামায়। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বড় উতলা করে। এদিক ওদিক চেয়ে বাসিনী ঝুড়ি বোঝাই শাক নিয়ে উঠোনে ধুতে আসে। ঝপ করে একটা ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলে, ছাতু খেয়ে জল খেয়ে এস রাস্তার কল হতে। দেরি কোর না মোটে। এ পিচাশের বাড়ি কেমন তা জানদি দাদা। গরিবের গতর এরা শস্তা দেকে।

—কে মরচেচে, হ্যাঁ বাসিনী?

—তেকেলে বুড়ো। বাড়ির কত্তা। মরবে নে? মর রে, মেয়েছেলে রে, ওই যে হোমের জোগান দিচ্ছে, ওই মুটকি ওনার খাস ঝি। কত্তা মোলে পরে ওকে সাত নাতি না মেরেচি তো আমি বাসিনী নই। তেকেলে বুড়ো মরচে তার ঝক্কি হোম।

ছাতু কটি নিয়ে উচ্ছব বেরিয়ে যায়। বাপ রে! এত তরকারি, এত চাল এত মাছ, এ একটা যজ্ঞি বটে। সব না কি বাদার দৌলতে। সে কোন বাদা? উচ্ছবের বাদায় শুধু শুগলি-গেঁড়ি-কচুশাক-সুশনো শাক। উচ্ছব

হাতুটুকু একটু খায়, মিষ্টির দোকানে উঁড় চেয়ে নিয়ে জল খায়। হাতু না কি পেটে পড়লে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই হোক। পেটের গভর ভরুক। কিন্তু সাগরে শিশির পড়ে। উচ্ছব টের পায় না কিছুই। আবার সে ফিরে আসে।

—কোথা গেছলে ?

—এট্টু বাইরে গেলাম মা !

কাঠ কাটলে হোম, হোম হলে ভাত, উচ্ছব তাড়াতাড়ি হাত চালায়।

মেজ বউ চেঁচিয়ে বলে, খাবার ঘর মুছেচ বাসিনী ? সব রান্না তুলতে হবে

বাসিনী বলে, মুছিচি।

বড় বউ হেঁকে বলে, সব হয়ে গেল ?

—মাচের ঘরে সব হল।

এ সব কথা শুনে উচ্ছব বুকে বল পায়। ভাত খাবে সে, ভাত। আগে ভাত খাবে, জিভে ভাতের সোয়াদ নেবে। আসার সময়ে গাঁ-জেয়াতি বলেছিল, কলকেতা যাচ্ছ যখন, তখন কালীঘাটে ওদের হরাদ সেরে দিও। অপঘাতে গেচে ওরা। হ্যাঁ, তাও করবে উচ্ছব। মহানাম শতপথি তো এল না। এলে পড়ে নদীর পাড়ে সারবন্দি হরাদ হবে। উচ্ছব কালীঘাটে হরাদ সারবে। সতীশ বাবু বলেছে, উচ্ছবের মতিভ্রম হয়েছে বই তো নয়। বউ ছেলে মেয়ে অপঘাতে মরল, মানুষ পাগল হয়ে যায়। উচ্ছব ভাত ভাত করচে দেখ।

তুমি কি বুঝবে সতীশ বাবু ! নদীর পাড়েও থাক না, মেটে ঘরেও থাক না। পাকা ঘর কি ঝড় জলে পড়ে ? তোমার ধান চালও পাকা ঘরে রেখেছ। চোর ডাকাতে নেবে না। দেশজোড়া দুর্যোগেও তোমার ঘরে রান্না হয়। ভাত খেতে দিলে না উচ্ছবকে। তোকে এগলা দিলে চলবে ? তাহলেই পালে পালে পঙ্গপাল জুটবে নে ? এ হল ভগমানের মার। এর চোট থেকে তোরে বাঁচাতে পারি ?—তা তুমি ভাত দিলে না, দেশে ভাত নেই। সেই যে পোকায় ধান নষ্ট, সেই হতেই তো উচ্ছবের আধপেটা সিকি পেটা উপোসের শুরু। পেটে ভাত নেই বলে উচ্ছবও প্রেত হয়ে আছে। ভাত খেলে সে মানুষ হবে। তখন বউ মেয়ে ছেলের জন্যে কাঁদবে। দুঃখ তো ওর হয়নি। ও শুধু পাগল হয়ে বউ মেয়েকে ডেকেছিল কয়েকদিন ধরে। তখনি উচ্ছব প্রেত হয়ে গেছে। মানুষ থাকলে ও ঠিকই বুঝত যে

জলের টানে মানুষ ভেসে গেছে। কত গরু মোষ ভেসে গেল, চন্নীর মা তো কোন্ ছার। উচ্ছব কাঠ কাটা শেষ করে। আড়াই মণ কাঠ কাটল সে ভাতের হতাশে। নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।

পাঁচ ভাগে কাঠ রেখে আসে দালানে। উঠোনে কাঠের কুচো, টুকরো সব ঝুড়িতে তুলে উঠোন ঝাঁট দেয়। তারপর বড়পিসিমাকে দেখতে পেয়ে শুধোয়, মা! বাইরে যেয়ে বসব?

বড়পিসিমা কোন জবাবই দেন না। কেন না তান্ত্রিক হঠাৎ "ওঁ হ্রীং ঠং ঠং ভো ভো রোগ শূন্ন শূন্ন" বলে গর্জে উঠে রোগকে দাঁড় করান, কালো বেড়ালের লোমে রোগকে বেঁধে ফেলেন ও হোম শুরু করেন। একই সঙ্গে ওপর থেকে নার্স নেমে এসে বলে, ডাক্তারকে কল দিন।—বড়, মেজ ও ছোট ঘুমভাঙা চোখে বিরস মুখে হোমের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, বাসিনী উচ্ছবকে বলে, তুমি যেয়ে বাইরে বোস দাদা। না, মন্তর বললে বটে! যেমন হাঁকুড় পাড়লে অমনি কত্তা টাল নিলে? কত্তার দেহ থেকে ব্যাধিটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে বেইরে এল। চ্যান করবে তো করে নাও কেন?

—এখন চ্যান করব নে। মাতায় জল পড়লে পেট মানতে চায় নে মোটে।

বাইরে এসে উচ্ছব শিবমন্দিরের চাতালে বসে। কেমন মন্দির, কেমন চাতাল! বাপ রে! এ সব না কি বাদার দৌলতে। সে বাদাটা কোথায় থাকে? ভাত তো খায় নি উচ্ছব অনেকদিন। ভাত খেয়ে দেহে শক্তি পেলে উচ্ছব সেই বাদাটা খুঁজে বের করবে। উচ্ছবের মত আরো কত লোক আছে দেশে। তাদেরকেও বলবে।

মন্দিরের চাতালে তাস পেটে তিনটি ছেলে। তারা বলে, বুড়োকে বাঁচিয়ে তুলতে হোম হচ্ছে।

—ফালতু!

—কি ফালতু?

—বেঁচে ও কতদিন জীবন পাবে? একশো? যত সব ফালতু।

উচ্ছব চোখ বোজে। এমন যজ্ঞির পরেও বুড়োকত্তা বেশিদিন বাঁচবে না? কি কাণ্ড! মাতলা নদী যদি সে রাতে পাগল হয়ে মাতাল মাতনে উঠে না আসে তো উচ্ছবের বউ, চন্নী, ছোট খোকা অনেকদিন বাঁচে। উচ্ছবের চোখের কোলে জল গড়ায়। ভাত খাবে আজ। সেই আশাতেই প্রেত উচ্ছব মানুষ হয়ে গেল না কি? বউ মেয়ে-ছোট খোকার কথা মনে

হতে চাখে জল এল এমন হঠাৎ ? ভাকই সব। অন্ন লক্ষ্মী, অন্ন লক্ষ্মী, অন্নই লক্ষ্মী, ঠাগমা বলত। ঠাগমা বলত, রত্নো হল মা নক্ষী।

—কি হে, কানছ কেন ?

—আমারে শুদোচ্ছেন বাবু ?

—হ্যাঁ হে।

—আবাদ থেকে আসতেচি বাবু গো! ঝড়ে জলে সব নাশ হয়ে, ঘরের মানুষ.....

—ও।

তাসপিটানো ছেলেগুলি অন্যদিকে পড়ে। বয়স্ক ছেলেটি বলে, ঠিক আছে তাই ঘুম এসো।

উদ্ধব সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়েই থাকে সে অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। অবশেষে কার পায়ের ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙে তার!

ইস! এ যে সাঁঝবেলা গো। কিন্তু তাকে ঠেলা দিচ্ছে কেন লোকটা ?

—ওঠ ওঠ, কে তুমি ?

—বাবু···আমি···

—চুরির মতলবে পড়ে আছ ?

—না বাবু, এই বাড়িতে কাজ করতেছিলাম।

—ওঠ ওঠ।

উদ্ধব উঠে পড়ে। তারপর সে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি। লোকের ছোট ছোট জটলা।

—কি হয়েচে বাবু ?

কেউই তার কথার জবাব দেয় না। উদ্ধব বাড়িতে ঢোকে। ঢুকতেই বড়পিসিমার বিলাপ শোনে, তোমার ছোট বেয়াই কি ডাকাতে সন্নেসী আনল গো দাদা! যজ্ঞি হল তার তুমিও মলে। অ দাদা! তুমি যে বিরেশিতে যাবে তা কে জানত বল গো! তোমার যে আটানব্বুই বচ্ছর থাকার কথা গো দাদা!

বাসিনীকে দেখতে পায় না উদ্ধব। তবে খুব কর্মব্যস্ততা দেখে। কেত্তন না এলে বেরুনো নেই। কে যেন বলে।

—কেত্তন কি বলছিস বড় খোকা। বোনরা, দিদিরা, আসুক। বড়পিসিমা বলেন।

চরন খাটছ কেউ ?

—খাটের টাকা কে নিয়েছে ?

—বাগবাজারে ফোন করোচো ?

ফর্দটা দেকে দাও দিকি কেউ। খই, ফুল, ধুতি। শববস্তর...

উচ্ছব পাঁচিলের গায়ে সিঁটিয়ে লেপটে দাঁড়িয়ে থাকে। কত যে সময় যায়, কত কি যে হতে থাকে।

মস্ত খাট আসে। রাতে রাতে বের করতে হবে। রাতে রাতে কাজ সারতে হবে। নইলে দোষ লাগবে।

অনেক তোড়জোড় হয়, মেয়েরা এসে কাঁদে! হোম যজ্ঞ করেও বুড়ো কত্তার প্রাণটা যে রইল না, তাতে তান্ত্রিককে এতটুকু কুণ্ঠিত দেখা যায় না। তিনি লাইন করে ফেলেন তাঁর। ফলে বড়পিসিমা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, তিন ছেলে হোম ছেড়ে উঠে গেল যে ?

এসব কাজে বিধি পড়লে রক্ষে আছে ?—এ কথার আলোচনায় খুব সরগরম হয় বাড়ি। শোকের কোন ব্যাপার থাকে না। বাড়ির উনুন জ্বলবে না। রাস্তার দোকান থেকে চা আসতে থাকে। অবশেষে রাত একটার পর বুড়োকত্তা বোম্বাই খাটে শুয়ে নাচতে নাচতে চলে যান। পেশাদারী ও দক্ষ শববাহকেরা আধা দৌড় দেয়। ফলে কীর্তন দলও দৌড়তে বাধ্য হয়। বড়পিসিমা বলেন, বাসিনী। সকলের রান্না পথে ফেলে দিগে যা। ঘর দোর মুক্ত কর সব। বউরা যাও না। দাঁড়িয়ে যা রইলে কেন ?

উচ্ছবের মাথার মধ্যে যে মেঘ চলছিল তা সরে যায় সে বুঝতে পারে, সব ভাত ওরা পথে ফেলে দিতে যাচ্ছে।

বাসিনী বলে, ধর দেকি দাদা।

—এই যে ধরি !

উচ্ছবের মাথায় এখন বুদ্ধি স্থির, সে জানে সে কি করবে।

—আমাকে দে ভারিটা

মোটা চালের ভাতের বড় ডেগচি নিয়ে সে বলে, ঘুরে ফেলে দে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নয়তো কুকুরে ছেটাবে, সকালে বাঁকে ঠোক দেবে—বামুন বলে।

বেরিয়ে এসে উচ্ছব হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক হেঁটে সে আধা দৌড় মারে। ভাত, বাবার ভাত তার হাতে এখন। পথে যেতে

খেবে ? কাক কুকুরে খাবে ?

—বাদা !—অত বাসিনী প্রায় ছুটে আসে. অথচ বাড়ির ভাত খেতে কি বাদা !

— খেতে নি ? মিও খেয়ে বামুন হয়েচ ?

— অ দাদা, ব্যাগাতা করি—

উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায় তার চোখ এখন বাদার কামটের মত হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।

উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে, ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ডুবিয়ে দিতে সে স্বর্গসুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্দ্রনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন। আছে, আরেকটা বাদা আছে। সে বাদাটার খোঁজ নির্ঘাত পাবে উচ্ছব। আরো ভাত খেয়ে নি। চন্দ্রনী রে ! তুইও খা, চন্দ্রনীর মা খাও, ছোট খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা ! আঃ ! এবার জল খাই, জল ! তারপর আরো ভাত। ভোরের টেনে চেইপে বসে সোজা ক্যানিং যাচ্ছি। ভাত পেটে পড়েচে এখন ঝানচি বে ক্যানিং হয়ে দেশঘরে যেতে হবে।

উচ্ছব হাঁড়িটি চাপটে, কানায় মাথা ছুঁইয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পেতলের ডেগটি চুরি করার অপরাধে সকালে লোকজন উচ্ছবকে সেখানেই ধরে ফেলে। পেটে ভাতের ভার নিয়ে উচ্ছব ঘুমিয়েছিল, ঘুম তার ভাঙেনি।

মারতে মারতে উচ্ছবকে ওরা থানায় নিয়ে যায়। আসল বাদাটার খোঁজ করা হয় না আর উচ্ছবের। সে বাদাটা বড়বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।

(১৩৯০)

চড়ক

মহাশ্বেতা দেবী

ফাল্গুন শেষ হতে এখনো দুদিন দেরি, নতুন সন্ন্যাসীরা গাজনগাছ গোড়ে পুকুর থেকে তোলেনি, গোপালীকে ওর নাতি ছটা এসে বলল, 'ঘরে চ ঠামা, তোরে মাসি ডাকতেছে।'

গোপালী তখন কাদা সেঁচে গুগলি তুলছিল। আজ কতদিন ও চোখে শুধু ধোঁয়া দেখে। যেন রবি কেটে নিয়ে যে ক্ষেত জুড়ে উনোন জ্বেলে ভাত রাঁধছে। গোপালীর চোখে শুধু ভাতের ধোঁয়া আর উনুনের ধোঁয়া। 'সব যামন ধোঁয়াবন্ন একাকার যে ছটা,' বলে গোপালী বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। চোখে যদি সর্বদা ভাতের ধোঁয়া, উনোনের ধোঁয়া ভাসে, তবে গোপালী কেমন করে শহরের পথে বেরোবে? চোখে যখন ধোঁয়া দেখে তখনি ভয়ে ওর গলা বসে যায়। কেমন করে গোপালী চেঁচাবে, 'বাবা তারোকেনাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদে-এ-এ-এ-ব?'

ছটা বলেছিল, 'ধোঁয়াবন্ন দেকবি না? আত নি, দিন নি, কেঁদে কেঁদে মত্তেছিস? আসপাতালে নে যাই সে সময় আমার আছে? চাল বইতে যাব, না তোরে নে আসপাতালে যাব?'

'কাঁদলে পরে চক্ষু ধোঁয়াবন্ন দেকে?'

ভাষা অবাক হয়েছিল গোপালী, ঘন ঘন মাথা নেড়েছিল। কাঁদছে ও গোপালী সেই অযুত নিযুত কাল ধরে। রাবণের মা নিরবধি হয়ে যেদিন থেকে ছেলের পর ছেলে, নাতি নাতনি, বউ, মেয়ে, জামাই একে একে খেতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে ওর কান্না শুরু। ভগবান ওর চোখ কান্নার জন্যেই গড়েছেন, তা সেই চোখ কেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে?

হারার মা বলেছিল, 'আমাদের আর চক্ষু দিদি! আমাদের আর আসপাতাল! গুগলি নে আয়, সিদ্ধে খা।'

সেই থেকে গোপালী ভরদুপুরে আগুন তাতে এসে গুগলি খোঁজে। গুগলি সেঁচে খেয়েছিল বলে তেনা দুটো সেলাই করতে পারল। তেনা সেলাই করল। গেরিমাটিতে রং করল। ছটাকে বলল, 'মোকে এট্টা ধোবা দিবি, তুই ভিরগুলটা দিবি।'

'কদ্দুরে যাবি বল্ দিনি ঠামা ? শওর সবটা দেকে আসবি ?'

'শওর তুই দেখ্‌গে যা !'

জটা তখনি পালিয়ে গিয়েছিল। দুতো ধরিয়ে দিলেই ঠাকুমা যত আশকেলে বাস কথা বলে সেই কবে আকাল হয়েছিল, সেই কবে জোত-জমা ছেড়ে শহরে এসে জটার ঠাকুরদা মুখ থুবড়ে পড়ে মরেছিল ! তখন নাকি জটার বাবা ঠাকুমার দুধ খায়, এত কচিটা। সেই আকালের পরেও নাকি ওদের রাজপুরে জোতজমা ছিল, দুবেলা গরম ভাত রান্না হত।

জটা জানে সব মিছে কথা। চিরকাল ঠাকুমা পুকুর থেকে আঁকশি দিয়ে হিকে কলমি তোলে আর জটা খালপারে মহাজনের চালের বস্তা বয় জটা তাই ঠাকুমার কথা কানেও নেয়নি। ওর আর ঠাকুমার ভেনা-ভেনা, কাপড় দুটোতে গেরিমাটির রং দেখে ওর মন নেচে উঠেছিল। বছর বছর হারারা চড়কের সন্নেসী হয়, শহরের পথে ভিক্ষে করে, ভিক্ষের চাল সন্ধ্যায় রেঁধে খায়।

ঠাকুমা একবারও যায়নি। ঠাকুমা তখন বলত, 'ওদের গেলে দোষ নি। তোর আমার চলে ? কোতা কোলের বাজার, কোতা খোটির বাজার. সব্ব জায়গায় জেয়াতিদের দোকান আছে তা জানিস ?

'তারা তোকে চেনে ?'

না চিনল বা ! যদি চিনে ফেলে ? না বাবু, সবংশে মুক পোড়াতে আমি পারবনি। ওরা জার জাক। মোদের বংশ যুগীবংশ। জানিস, একনো দেশে ঘরে মোদের জেয়াতিদের মল্লে পরে শলুতে পোয়ায় না, বইসে দাহ করে ? এককালে বইসে মাটিতে সামাজ দিত।'

'তাতে আমার কি ? আমার যামন সন্নেসীর ভাত, এক গুক্ত গরম ভাত খেতে সাদ জায় না ? আমানি আর পান্ত খেয়ে অষ্টপ্রহর মানুষ রইতে পারে ? আকুসি ?'

রাক্কসী বললেই ঠাকুমা কাঁদে, তখনো কেঁদেছিল, কিন্তু কিছুতে চড়কের সন্নেসী হতে রাজী হয়নি। এবার হাল অন্যরকম। তিন সাঁঝে চার সাঁঝে উনুন জ্বলে না। তাছাড়া জটার যখন জ্বাবা হয়, তখন হারার মা জটাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলেছিল, 'ডাক্তারে আচ্ছা কতা বললে গো মাসি। দু গুক্ত না পার, এক গুক্ত গরম ভাত আর দুমুর পার দুমুর, পেঁপে পার পেঁপে, সিজ্যে না দিলে এ খোকাটাও অইবে না।'

শুনে ঠাকুরমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সেদিনই ঠাকুমা হারাকে দিয়ে

কাকিরখানে সোয়া পাঁচআনার সিন্নি মানত জানায়। বলে দেয়, 'আমি যামন কানতেছি তেমনি বেঁদে বলবি হারা, তোমার সতেটুকু যামন তিনি থাকে

হারা হরদম টেনে চাল বয় ওর অভিজ্ঞতা, কথাবার্তা, সব কিছুতেই বেশ ভারিক্কি ভাব। হারা বলেছিল, 'আত্তিদিন খিদে খিদে কর কেন? সিদিন শুনলে না লালা বলল ওই খিদে খিদে বলে তুমি সবারে খেয়েছ. ভটারেও খাবে? মত্তে বললে খিদে গেলনি?'

গোপালী তখন কিছু বলেনি কিন্তু ভরদুপুরে আঁকশি দিয়ে ছিকে কলমি টানতে টানতে ভেবেছিল বুঝি বা ওরা যা বলে তাই সত্যি। নইলে পাঁচবিঘে জমি কেন জ্ঞাতিরা নেবে, কেন চার চারটে জোয়ান ছেলে, তিনটে বউ, পাঁচটা নাতি একে একে মরবে? কেন বা সব এই পোড়াপেটে পুরে তবু ওর রাত নেই, দিন নেই, সেই ত্রেতাযুগের কথা মনে হবে? যখন ও ভাত রাঁধত, ভাত বেড়ে দিত, ভাত বেড়ে নিত? যখন ওর রুক্ষ মাথা দেখলে বড় ছেলে কৈলাস তেল এনে দিত ওর পরনে ছেঁড়া কাপড় দেখলে মেজবউ চালের বাতা থেকে ছুঁচ সুতো নিয়ে পলকে সেলাই করে দিত?

সেদিনই রাতে, অনুতাপে, চোখের জলে ভেসে ও ভটাকে বলেছিল, 'তুই মোর বুকে থাক ভটা। তোর বাপ থাকতে নি. কোতা কেমনে বেইরে গেছে, খবর নি, বাত্তা নি। তুই এতটুনি ধয্যি ধরে জীয়ে থাক, ই চক্কে মোরা সন্নেসী হয়ে বেরাব।'

'সত্যি, ঠামা?'

'হ্যাঁ, রে। তিনসত্যি। সন্নেসী হয়ে বেরাব, সাঁঝে গরম ভাত খাব। শওরে গেলে ভাত চাল। ভ্যাত পয়সা।'

'অনেক চাল, না ঠামা?'

'হ্যাঁ রে। শওরে য্যাত মানুষ, ভ্যাত সোম্মসার। চক্কে সন্নেসী হলে তারা নিয্যাস ভিক্কে দেয়।'

সেই থেকে ভটা দুরু দুরু বুকে শুধু ফাল্গুন শেষ হবার দিন গুনেছে। গোপালীকে বলেছে, আঁধার রইতে ঝাঁ করে বেরে চাট্টি জবাফুল নে আসব কাঁড়ি রইতে। ভিরগুলে মালা দিলে তবে বেরে দেকতে ভাল হয়। হারাদের সাতে কাবেনা জানলি? ওরা হটং হটং হাটবে, তুই পেইছে পড়বি। মাসিদের সাতে যাব। মেসোর ঢাক আছে জানলি? মেসো ঢাক বাজাবে, আমি কাঁসর বাজাব।'

এই আনন্দে কদিন গোপালীর চোখেও ঘুম ছিল না। জটার বাবা লখিন্দ, ওর শেষ সন্তান, যখন থেকে মদে নেশায় উচ্ছন্নে গেছে, বাড়ি ছাড়া হয়েছে, তখন থেকে ওই জটাই ওর সম্বল। এখন আর ঘুঁটেগোবর করতে পারে না গোপালী, কোমর ভেঙে ব্যথা করে। এখন শুধু ও হিজে তোলে, কলমি তোলে। থানকুনি পাতা, বনের ডুমুর সংগ্রহ করে। সব হারার মা বাজারে বসে বেচে আসে। জটা আছে, চাল বয়ে কোনদিন বারোআনা, কোনদিন আটআনা আনে। তাতে যেন চলে না। তাই, চড়কে সন্ন্যেসী হবে বলে গোপালীর বড় আনন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল তেনা পরে, রুক্ষ মাথায়, খালি পেটে গুগলি সেদ্ধ আর আমানি খেয়ে খেয়ে যেন ও অশুচি হয়ে যাচ্ছিল। ঠাকুর ওকে সন্ন্যেসী হবার সুবুদ্ধি দিয়েছেন। এবার গোপালী শুদ্ধ হবে। কেন যেন মনে হচ্ছিল এবার একটা কিছু ভাল ঘটবে ওর আর জটার জীবনে।

কি যেন মনে হয়েছিল ওর, সেই কোন যুগে শোনা কথা!

কার মাথায় তেল, পেটে ভাত? না, যে শুদ্ধ আচারে থাকে, দেবদ্বিজ মানে।

কার মাথায় জট, অঙ্গে খড়ি, পেটউপোসী? না, যে নেই-দিনে থাকা জানে না।

প্রথমজন ভাগ্যমানী। দ্বিতীয়জন লক্ষীছাড়া, মরার বাড়া। গোপালী সেই লক্ষীছাড়া, মড়ার বাড়া হয়ে বেঁচে আছে অনাদি অনন্তকাল। এবার ও শুদ্ধ হবে।

কিন্তু জটা যেমন এসে বলল, 'ঘরে চ ঠামা, তোরে মাসি ডাকতেছে', অমনি গোপালীর বুকের ভেতর যেন কি ধ্বক করে বাজল।

'ডাকতেছে? মাসি?'

'হ্যাঁ। বলতেছে আমার বাবা এয়েছে।'

'তোর বাপ? লখিন্দ?'

'চ, ঘরে চেয়ে দেখগা।'

গোপালীর এখন সেদিন নেই। আগে জল থেকে ঘড়া কাঁখে সটান উঠে আসত। দিনেমানে অমন দশ ঘড়া জল ও তুলত। এখন বুক কাঁপল, পেটের ভেতর কি যেন খামচে ধরল, শিরদাঁড়া বেয়ে ব্যথা উঠে এল। আজ দুদিন ভাত কটা জটা খায়, ফ্যানে জলে মিশিয়ে গুগলি সেদ্ধর টাকনা দিয়ে খায় গোপালী। তাই কি এমন উত্তেজনার খবরে ওর শরীর ঝিমঝিম করল?

'মোর হাত ধর জটা, আমি উঠতে পারি না।'

গোপালী জটার হাত ধরে ধরে নিয়ে এল।

লখিন্দই বটে। পেটফোলা, হাড়কাঠি হাত পা, মুখের রং ছাইবর্ণ। ও নাকি আষাঢ়ে পড়ে অসুখে মরছিল। ওখানকার গুঁড়ি বাসে টিকিট করে তুলে দেয়। বাসের লোকেরা রাস্তার পাশে নামিয়ে দেয়। লখিন্দ পথেই শুয়েছিল। হারার বাপ চিনতে পেরে রিকশায় বসিয়ে নিয়ে এসেছে। 'কি হয়েছে বাপ?' বলে গোপালী তখনি কাঁদতে বসেছিল কিন্তু হারার বাপ বলল, 'ওরে আসপাতালে দিতে হবে মাসি। ওরে বড় রোগে ধরেছে।'

'কি ওগ বাবা? ও মরেশ, বল না বাবা, তোমার বাগাতা করি।'

'সে আমি জানি?'

'আসপাতালে কেমন করে নেব, ও বাবা মরেশ।'

'দেক, যদি রেকশা ভাড়া বের কত্তে পার, তবে কাল নে যাব।'

'রেকশা ভাড়া!'

'নয় ত কি হেঁটে যাবে?'

গোপালী ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল। আজকাল ঘাড়ের ওপর মাথাটা কেন যেন টুক টুক করে নড়ে। রিকশা ভাড়া কুপিতে কেরেসিন এক ফোঁটা, তাই জোটে না বলে গোপালী পথের বাতির নিচে বসে আমানি খায়। রিকশা ভাড়া ও কোথা থেকে জোটোবে?

নড়িটা টেনে নিয়ে গোপালী সেই ভোরের তাতে মল্লিক বাড়ি গেল। ওর পুরনো মনিব বাড়ি। একসময়ে ওদের বাড়ি কাজ করেছে গোপালী। গোয়াল কেড়ে, ধান ভেনে দুটো মুনিষের কাজ করেছে। সেই মনিববাড়ি গিয়েই ও কেঁদে ভেঙে পড়ল, 'দুটো টাকা দে মা, আমার লখিন্দ মরে যায়।'

পরদিন হারার বাপ লখিন্দকে নিয়ে গেল, আবার ফিরিয়েও আনল। হাসপাতালে লখিন্দকে নেয়নি। ওদের জায়গা নেই। তা ছাড়া লখিন্দকে হাসপাতালে রাখলেও আর কিছু করার নেই।

'কেন বাবা মরেশ?'

'ওর শরীলে নানা রোগ ধরেছিল মাসি। তা কাঁ করে না, কৌ করে না, ডাক্তারকে বলল বলে জানা গেল উ পেচ্ছাবে অক্ত সরতেছে।'

গোপালী কপালে ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগল। এ কি রোগ লখিন্দ? কত বা বয়স তোর, বউ মরতে কেন বা যেয়ে বিবাগী হলি, কোথায় প্রাণটা শেষ করে এলি?

'এখন কি করি মরেশ ?'

'দেক, থান থেকে চরণামেত এনে দিয়ে দেক

গোপালী এখন জটাকে ধরে কাঁদতে লাগল,

বাপরে বাঁচা।'

হারার বাপ বলল, 'বাঁচা বললে কি বাঁচে মাসি ? সময়ে এট্টা কওনি, কি খেটে লেখার কড়ি যোগাল নিয়েছে, ক্যানিংে গিয়ে খালপারের ঘরে থাকত। লেখাতাই করত, নইলে উ দশা হয় ?'

গোপালী বলল, 'সকল গুলো মরে ঘরে ওই যে এট্টা ছিল বাপ !'

পরনের তেনার খুঁট দিয়ে ও লখিন্দের মুখ মোছাল, বলল, 'কি কষ্ট ? ও বাপ আমার কি কষ্ট ?'

লখিন্দ এপাশ ওপাশ করে মাথা নাড়ল ! মুখ দিয়ে কথা বেরোল না চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

গোপালীর আছাড়ি-পিছাড়ি দেখে হারার বাপ পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকল বটে, তিনিও দু পুরিয়া ওষুধ দিয়ে ঘাড় নেড়ে উঠে গেলেন। বললেন, 'আর কি দেব ! দেখ, ওষুধ গলায় যায় কিনা।'

হারার মা বলল, 'মাসির দুক্কু জনমভোর বাবু। জন্মে ছেলেকে কড়া কতা বলল নি, সি হতভাগা কোতা খেয়ে জীউটা শেষ করে শেষ করে শেষে বুড়ো মারে দম্মাতে এল বল দি নি ?

ডাক্তারকে সচরাচর কেউ ডাকে না। জটার কাছ থেকে নিয়ে হারার বাপ ওকে ষাট পয়সা দিয়েছিল। এখন গলার কণ্ঠির কাছটা চুলকে ফুটো ছাতা খুলে উনি বললেন, 'এ বাচা নাড়ির টান। ওকি অমনি এসেছে ? ওকে টেনে এনেছে, বুঝে না ?'

ডান হাতটি উনি একবার বাতাসে ঘুরিয়ে এনে যেন ইঙ্গিত দিলেন কে লখিন্দকে লিভারে মা, বুকে শ্বাস আর এনিমিয়া শুদ্ধ গোপালীর তেনা আঁচলের ছায়ায় টেনে এনেছে। যেন সেই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রা এই খোলার ঘর, উঠোনে মেলা গামছা, বাঁশ ঝাড়টা।

আজ গোপালী ঘরে কুপি জ্বালল। কাঠগোলায় লালার বউ একটু কেরোসিন দিয়েছিল। কুপির আলোতে বসে বসে গোপালী লখিন্দের মুখে চরণামৃত দিতে থাকল ফোঁটা, ফোঁটা আর কথা কইতে লাগল। কোথ থেকে এত কথা মনে পড়ল ওর, লখিন্দের সম্পর্কে হাজারটা স্মৃতি। সব স্মৃতিতে সত্য নেই, কত কথা ওর মনে হচ্ছে বলে সত্যি মনে হচ্ছে।

'কোনদিন মোরে কষ্ট দেওনি, ও আমার বাপ! সবারে হারিয়ে সবার দুঃখ ভুলে ছিলাম, তুমি মোর কোল জুইড়ে ছিলে। কেন বউ মন্তে চলে গেলে বাপ? ঘরে অইলে আবার সোমসার হত, আন্ধলা হয়ে অইতে তুমি! তোমার জটারে যে আমি বুকে আগলে আখি বাপ, একোবার কি এসে দেকতে হত না? ই কি চায়রা নিয়ে এলে ও বাপ! সে সোনার কান্তি, সে ঝলমলে চায়রা কোতা গেল?'

জটা দেখতে লাগল কুপির আলোয় মশা উড়ছে। ঠাকুমার চুল দুলছে, ঠোঁট নড়ছে। যেন কতকাল ধরে ছেলের অন্তিম শিয়রে বসে কাঁদছে ঠাকুমা। দেখে দেখে ওর ভয়ে চোখ বুজল। কখন ঘুমিয়েও পড়ল।

সকালে হারার মাকে ডাকল জটা।

'ও মাসি! বাপ লড়ে না চড়ে না, এমন কত্তেছে কেন?'

দরজায় উঁকি দিয়েই বুঝল হারার মা। বলল 'কারে চরণামেত দিতেছ, ও মাসি! লখিন্দ কি আর আছে? দেক না, বুজি আতেই হয়ে গেছে বা? তুমি জেয়ানী মানুষ, বুঝনি?'

গোপালী ঘোলাটে, অশ্রুস্তিত্ব চোখ তুলল। বলল, 'দূর হ!'

হারার মা চমকে উঠল। জীবনেও ও যুগীমাসীর মুখে এমন কথা শোনেনি, এমন চাহনি দেখেনি ওর।

'দূর হ! আজ চত্তিরমাসের শুরু। আমি সন্নেসী হব, আমার ছেলে মরেছে?'

'অতচ হলে সন্নেসী হয়?'

'হয় না?'

সহসা হাহাকার করে কেঁদে উঠল গোপালী। ছেলেকে জীবনে যা বলেনি তাই বলে গালি দিয়ে উঠল। বড় অশ্রাব্য সেসব কথা, বড় কুৎসিৎ গালাগালি। প্রচলিত অভিশাপ। সকালকে অশুচি করে দিল গোপালীর হাহাকার, সব অশুচি হয়ে গেল, বিবর্ণ দাদা থানে যেন বলির রক্ত ছিটল। গেরুয়া কাপড় পরে কালো কালো রোগা লোকগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিল।

দূরে চড়কের সন্নেসীদের ভিক্ষারম্ভের বাজনা, কাছে বাজনা। গোপালী হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। ছিল, এই চড়কে ভিক্ষাপাত্র হাতে তারও বেরাবার কথা ছিল। শহরের প্রতিটি পথ, প্রতিটি বাড়ির দরজায় গোপালীরও আজ যাবার কথা ছিল।

'শত্রু, শত্রু, শত্রু।'

গোপালী রাক্ষসীদের মত আঙুল নাচিয়ে মৃতদেহকে ভীষণ অভিশাপ দিল। ঢাকের বাজনায় ওর আর্তনাদ, ওর হাহাকার শুধু বুকফাটা চিৎকারের মত শোনাল, কথাগুলো বোঝা গেল না। তাই হারার বাপ ঢাকে কাঠি দিতে দিতে বলল, 'বুড়ি পুত্রশোকে কানতেছে।'

(১৯৭২)

বড়াম মায়ের থানে

মহাশ্বেতা দেবী

মোহনচাঁদবাড়ি গ্রামে তোমরা কেউ বল করে বেড়াতে যাবে বলে মনে করি না। গেলে আমি খুব খুশি হতাম। ছুটিতে তোমরা, যারা বেড়াতে যাও, কত দূরে চলে যাও। কাশ্মীর থেকে উটি। বোম্বে থেকে আন্দামান, হিমালয়ের বুকের শহর, কত জায়গা! আমার তো খুব ইচ্ছে করে যে গ্রামে যাও, গ্রাম দেখ। গ্রাম না দেখলে দেশ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামে আরাম কম, সুবিধে কম, সবই কম কম, তবে মানুষ তো আছে।

অবশ্য মোহনচাঁদবাড়িতে কি দেখতেই বা যাবে! তিরতির করছে একটা গ্রাম। বম্বে রোড ছেড়ে দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে একটা জঙ্গলের এলাকা। তারই পরে মোহনচাঁদবাড়ি। সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাত, এমন কয়েক ঘর। গরিব তারা, ভীষণ গরিব। হ্যাঁ দেখার মতো বাড়ি বটে হরকান্ত মহাপাত্র বাবুর। তাঁরই বাড়িতে মোহনচাঁদজীউদের মন্দির।

মোহনচাঁদজীউ খুব সৌখিন দেবতা। পেতলের ঝকঝকে চেহারা, হাতে রুপোর বাঁশি, পায়ে রুপোর নূপুর, হাতে সোনার বালা আর গলায় সোনার মালা। মাথার রুপোর জালে তৈরি কটকি ময়ূরপুচ্ছটি দেখার মত।

এই যে খবর চলছে, গরিবের পেটে ভাত নেই, মোহনচাঁদ কিন্তু দুধে পাক করা মোহনভোগ খেয়ে দিন শুরু করেন, দুপুরে সরু চালের ভাত, পঞ্চব্যঞ্জন আর পায়েস, বৈকালীতে ফলমূল, স—ব তাঁর চাই।

সাঁওতাল ছেলে রতন হেমব্রম বড্ড পাজি। সে পুরুতকে বলে, সব যদি ওই ঠাকুর খাচ্ছে, তবে সে মোটেই মোটা হচ্ছে না, আর তুমি দিন দিন চালের জালার মত পেট মোটা হচ্ছে, এর কারণ কি?

পুরুত ঠাকুর মোটা-সোটা নাদুসনুদুস বটে। তবে মানুষটা বেশ ভালো। পুরুত বলে,—রতন রে! এই যে মোটা দেখছিস, এ শুধু ঠাকুরের দয়া।

রতনকে পুরুত ঠাকুর বেশ পছন্দ করে। তার একটা বড় কারণ হল, পুরুতের ভাইপো সনাতন তার চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে চুরি ঘাটপাকি

জোচ্চোরি সবই করেছে। শেষে মন্দিরের বাসনকোসন চুরি করে ওড়িশা পালিয়েছিল। সবাই বলেছিল, যাক! আপদ গেছে।

আবার বছরখানেক হল সনাতন গ্রামের বাইরে রাস্তার ওপর একটা চায়ের দোকান খুলে বসেছে। ঠিক নিজের মতন খেয়াড়া কয়েকটা ছেলে সেখানে জুটেও গিয়েছে! সনাতন বলে, কাকা— জোঠা মানি না। একদিন যাব, কাকার মাথায় বাড়ি মেরে মন্দিরের সব লুটে আনব।

পুরুত ঠাকুর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। এই সনাতনের দলই সেদিন রতনদের লাল-সাদা ছাগলটা ধরেছিল, কেটে খাবে বলে। রতনরা কয়েকজন রীতিমত মারপিট করে ছাগল ফিরিয়ে এনেছে।

বয়সে যারা অনেক ছোট, তাদের হাতে মার খেয়ে সনাতনের তেড়িবেড়ি খানিক কমেছে। তাতেই পুরুত খুব খুশি।

রতন কি করে তা বলা উচিত। রতন, হারা, মনাই, রাজা, গোপাল, সে এক দঙ্গল ছেলে যাকে বলে। ওদের বাবারা পারমিট নিয়ে বন থেকে কাঠ কুড়োয়, মরা গাছ, জ্যান্ত গাছ কাটে। রতনরা হাটে বাজারে কাঠ বেচে।

তা ছাড়া পাতা আনে, মাটি খুঁড়ে নানারকম কন্দ আনে। যখন কাজ পায়, কাজ করে। হরকান্ত বাবুর জমিতে কাজ করে। তবে বর্ষার নামগন্ধ নেই। চাষবাসও নেই। রতনের দাদু ভৈরব বলে, গ্রামদেবতা বড়াম মায়ের পুজো দাও, জল হবে।

হ্যাঁ, বড়াম মা ঠাকুরানী এই সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহাতদের কাছে অনেক বছর হল পুজো পাচ্ছেন। আজকাল ওরাও বিশ্বাস করে না যে বড়াম মায়ের পুজো দিলে কোনো সুরাহা হবে।

ভৈরবের বিশ্বাস টলে না।

সে বলে, সেবার যখন ঝড় হল, মা ছুটাছুটি করে ঝড়কে অন্য পথে পাঠাল তা জানিস? সকালে দেখি মায়ের পাটের চুল উসকোখুসকো, শালুর শাড়ি আলুথালু, সে কি চেহারা! হবে না? মা যে জাগ্রত।

রতন বলে, হ্যাঁ, খুব জাগ্রত। তাতেই যারা বড়াম মায়ের ভক্ত তাদের পেটে ভাত নেই। যারা বড়ামকে মানে না, সেই হরকান্ত বাবু রোজ ভাত খায়।

রতন!—রতনের মা ধমকে ওঠে: ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলছিস তা মনে রাখিস।

ভৈরব বলে, তোরই তো দোষ। সেই যে ইস্কুলে পাঠালি, দু বছর পড়ে লিখে মাথাটা ওর কেমন হয়ে গেল।

রতন আর কিছু বলে না। তবে বাবা-মা-নিজে, তিনজনে অনেক কষ্টে জোগাড় করা চালের ভাত আর বনের তুমা আলুর তরকারি যখন খায়, তখন তার মনে হয়, পিতলের ঠাকুর এত এত খাবে আর রক্তমাংসের মানুষ মোটে খাবে না, এই বিচারটা কি মোহনচাঁদজীউ, কি বড়াম মা, কোনো দেবতাই কি সুবিচার করেছে।

মোহনচাঁদ জীউ বা কেমন জাগ্রত? পুরুত বলে, খুব জাগ্রত।

তখন রতন বলে, সনাতন যখন বাসন চুরি করছিল তখন জাগ্রত ঠাকুর কি মজা দেখছিল?

—ঠাকুরের লীলা!

—লীলা আবার কি?

—ঠাকুর বাধা দেবে কেন? সে যে নতুন বাসনকোসন চাইছিল। তাই বাধা দেয় নি।

—যত বাজে কথা! আমাদের ছাগল ধরেছিল, বলেছিল দেব পাঁচটা তা মারধোর করে কেড়ে আনলাম বলে না ছাগলটা পেলাম?

—ও তুই বুঝবি না।

এমন করেই চলছিল সব। কিন্তু একদিন সকালে গ্রামে হই হই কাণ্ড। মন্দিরটা হরকান্তের বাড়ির উঠোনে। উঠোন পাথরের পাঁচিলে ঘেরা, পাঁচিলের গায়ে ভারি দরজা। মন্দিরের দরজায় ভারি তালা। মন্দিরের দালানে দারোয়ান ঘুমোয়। এত সব পাহারাদারি সত্ত্বেও না কি মোহনচাঁদ-জীউ চুরি হয়ে গেছে। হরকান্ত বাবুর বুড়ি মা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। সে উঠবে না, জলও খাবে না, ঠাকুরকে ফিরে এনে দিতে হবে।

মন্দির বন্ধ করে পুরুত। চাবি দেয় বাবুর কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে দেউড়ির তালাও খোলা, মন্দিরের তালা খোলা। যে এমন কাজ করেছে, সে চাবি দিয়েই খুলেছে।

এমন কাণ্ড ঘটলে যা হয়, পুলিশ চলে এল। তারপর রতনদের সে কি দুর্ভোগ! কেউ কাজে যেতে পারে না, কেউ নড়বে না গ্রাম থেকে, যতক্ষণ না চোর ধরা পড়ছে, ততক্ষণ কারো নড়া চলবে না।

ভৈরব বলল, এ কেমন কথা? আমরা বাবুর ঘরে ঢুকি না, মন্দিরের সামনে যাই না। আমাদের আটকে রাখলে কেন?

—চুপ করো বুড়ো।

রতন বলল, আমাদের আটকে রাখলে আমরা জঙ্গলে যাব কেমন করে?

—আজ যাবি না।

—তবে খাব কি?

—তা কি জানি।

—নাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দাও না বাবু।

কে রে তুই?

—রতন হেমব্রম।

—অ। তুই ছোঁড়া তো দাঙ্গাবাজ। সনাতন বাবুর সঙ্গে মারপিট করেছিস।

—সে আমার ছাগল নিয়েছিল কেন?

—বুনো জংলী কাকে বলে আর! বামুনের ছেলে তোর ছাগল কেটে খাবে, সে তো ভাগ্যি।

—টশ্‌ন্‌!

দারোগাটা এসাকায় নতুন এসেছে। সে সাত পাঁচ না ভেবে রতনের গালে খুব জোরে একটা চড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল রতন।

কালো কালো মানুষগুলোর মুখ পাথর পাথর হয়ে গেল। ভৈরব বলল, আমরা চললাম বাবু। ওঠ রতন চল্। চুরি করি নি, চুরি জানি না, আটক হয়ে থাকতে পারব না।

হরকান্ত বাবুকে ভৈরব বলল, তোমার বাড়িতে এই উঠোনে আমরা কখনো ঢুকি নি। অথচ সে কথাটা তুমি একবারও বললে না।

ভৈরবের পিছন পিছন সবাই বেরিয়ে গেল। হরকান্ত বাবু বললেন, এটা কি করলেন আপনি? ওরা সাদাসিধা, ভালো তো ভালো,—রাগলে পরে ক্ষ্যাপা মোষ। আমার বাবার আমলে ধানকাটা ঝগড়ায় আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল তীর ধনুক নিয়ে।

সবাই বলল, এ কাজটা ঠিক হয় নি।—দারোগা বেশ খানিক চুপসে গেলেন।

রতন ক্ষেপে গেল ভীষণ। মুখ গোঁজ করে ও বেরিয়ে গেল ছুটে। বাবার ডাক শুনল না, বন্ধুদের ডাক শুনল না।

মা বলল, ঘুরে ঘুরে রাগ পড়ুক, দুঃখ ভুলুক, ঠিক আসবে।

রতন কিন্তু ঘুরে আসবে বলে ছুটে চলে যায় নি। ওর দুঃখ আর রাগ

তো খুবই হয়েছে। আর হয়েছে অপমান। সে হল রতন হেমব্রম। সমবয়সী সব ছেলেদের সর্দার। তাকে বিনা দোষে দারোগা চড় মারবে কেন?

জঙ্গল পেরিয়ে, বড়াম মায়ের ছোট মন্দির পেরিয়ে, ঝাঁপালো একটা বটগাছে উঠল রতন ঝুরি বেয়ে। তারপর ডালে ডালে জড়ানো একটা জায়গা বেছে সেখানে হেলান দিয়ে বসল। এ জায়গাটা রতনের খুবই প্রিয়। এখানে বসলে ওকে কেউ দেখতে পায় না, ও সকলকে দেখতে পায়। হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে ও বুঝল, এখন হচ্ছে নিমনিমে বেলা। সূর্য ডোবে ডোবে। ওই তো হর্ণ শোনা যাচ্ছে, এ সময়ে পালবি বাবুর "জয় জনার্দন" বাসটা যায়। তবে সাঁঝ লেগে গেল বটে? এখন নামতে হয়। একটু পরেই কোটর ছেড়ে পেঁচাগুলো উড়ে যাবে খাবারের খোঁজে। এখন নামা দরকার। এভাবে চলে এসেছে, খিদেও পেয়েছে খুব। পাখি যদি হত, তাহলে পোকামাকড় বা বটফল খেয়ে পেট ভরাত। কিন্তু গাছের নিচে কারা কথা বলছে?

এ কি, এতো সনাতন আর পুরুতের গলা।

দুজনে ফিসফিসে গলায় কি বলছে? তবে না কাকা-ভাইপোতে খুব ঝগড়া?

—তুই যে এলি, তোকে কেউ দেখে নি ত?

—না না, ভয় পেও না।

—দেখিস বাপু। সবাই জানে তোতে-আমাতে জবর শত্রুতা, সেটা যেন বজায় থাকে।

—তা থাকবে। বাসনের বেলা কে ফেলেছিল?

—ওঃ! খুব ভয়ে ভয়ে আছি।

—সব রেখেছ কোথায়?

—সে শিবের অসাধ্যি জায়গায়। মেঝের মাটি খুঁড়ে বাসনকোসন, মোহনচাঁদ জীট, সব পুঁতেছি। তারপর মাটি সমান করেছি। তারপর সেখানে চালের জালা পর পর বসিয়ে রেখেছি।

—মালগুলো ব্যবস্থা করব কবে?

—গোলমালটা মরুক, সব ঠাণ্ডা হোক। তারপর তোর কাকিমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছতে ময়ূরচঞ্চ যাবি।

—সেখানে লোক আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন যা। সাবধানে থাকবি, আর লোককে শুনিয়ে আমাকে খুব গাল পাড়বি।

—এবার আমি মোপেড কিনব, হ্যাঁ!

—কিনবি, কিনবি।

ওরা দুজনে দুদিকে চলে যায়। রতন মনে মনে বলে, দাঁড়াও, তোমাদের জব্দ করতে হচ্ছে।

খানিক বাদে রতন নামে। এবার ও বড়াম মায়ের থানে যাবে। কিন্তু তার আগে মনাই হোক, হারা হোক, একজনকে ধরে বন্ধুদের খবর দিতে হবে। মনাইদের বাড়িটা কাছে পড়বে। মনাই নিশ্চয় এখন ডোবায় জল খাওয়াচ্ছে গরুকে।

রাত আটটা না বাজতে গ্রামের সবাই দৌড়োয় বড়াম মায়ের থানে। অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। রতন হেমন্তমকে সকাল দশটা থেকে কেউ দেখে নি। এখন দেখ সে ছেলে আর ছেলে নেই। সে মানুষই নেই মোটে। দুই হাতে ভর দিয়ে সে শুধু দুলছে আর বলছে, আমি মা বড়াম ঠাকরুণ! পুজো দে আমাকে, পুজো দিবি না?

পরেশ মাহাত বাবুর বাড়ি থেকে চেয়ে হ্যাজাক এনেছে। কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না পরেশ। আরে বাপ রে! কে বলে মা জাগ্রত নয়? গ্রামের ভক্তজনেরা পুলিসের হাতে আজই নাকাল হয়েছে। তাই স্বয়ং মা এসে ভর করেছেন। পুজো দাও, ঘন্টা বাজাও।

বড়াম মায়ের পূজারী মধু শবর। সে আসে। বলে, তোরা সরে যা সবাই। মাকে পুজা দেব, তোরা সরে যা।

রতনের মা, বাবা, ঠাকুরদা, কাউকে চিনতে পারে না রতন। শুধু বলে, পুজো দে, পুজো দে!

মনাই, হারা সব বন্ধুরা ভিড় করে দাঁড়ায়। খুব ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। মধু শবর নিজের ঘর থেকে মুরগি আনে, আতপ চাল, ধুপধুনো। রাজা সাইকেল চেপে দুরের দোকান থেকে বাতাসা আনতে যায়।

রাজার ঠাকুমা হঠাৎ আছড়ে পড়ে, মা গো! আমার জামাই কবে ঘরে ফিরবে গো!

—আসবে, আসবে। তোর উঠোনে যখন ঢেঁকি নাচবে, তখন আসবে!

সবাই বলে, এই দেখ ! শীতকালে তবে নিশ্বাস সে ফিরবে। মায়ের কথা !

পুরুত হইচই শুনে মজা দেখতে এসেছিল। রতনটা বজ্জাতি করছে কিনা জানা দরকার। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সে বলে, মা মা, মাগো ! মনে একটা ইচ্ছে করেছি। ঠাকুর চুরি, তাতে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। কি করে প্রায়শ্চিত্ত করি তা বলতে পার ?

রতন তো এখন বড়মা মা ! আর যাত্রা দেখে দেখে কথাবার্তা কইবার ধরন সে ভালোই রপ্ত করেছে। সে বলে ওঠে, হতো দে ! হতো দে ! বালক বিগ্রহ, না খেয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে ! আঃ ! আঃ ! তার কান্না আমি শুনতে পাচ্ছি। নিরম্বু উপোস থেকে হতো দে !

—নিরম্বু উপোস !

—সে যে তোকে ছাড়া কারুকে জানে না রে !

এ কথায় পুরুত যেন চমকে ওঠে। তাই হবে মা !—বলে সে দৌড়ে চলে যায়।

সকাল অবধি এরকম চলে। সকালে ভিড় আরো বাড়ে। একসময় মধু শবর রতনকে স্নান করায়। লালপেড়ে কোরা কাপড় পরতে দেয়।

আর বেলার দিকে মোহনচাঁদবাড়ি থেকে একটি পালকি আসে। পালকির সঙ্গে সঙ্গে হরকান্ত বাবু, পুলিশ, আরো লোকজন। হরকান্ত বাবুর মা বলেছেন, ঠাকুরের ভর হয়েছে যখন, তখন আমাকে যেতেই হবে। আমি জানতে চাইব আমার ঠাকুর কোথায় ?

দারোগা অবশ্য "এসব বুজরুকি" বলেছেন। কিন্তু হরকান্ত বলেছেন, আপনারা কতদিনে চোর ধরবেন কে জানে। আমার মা নিরম্বু উপোসী থাকলে মরে যাবেন না ?

তা দারোগা হেসে বলেছেন, চলুন, মজাটা দেখে আসি। কাল তো খুব বকলেন আমাকে। আমার হাতে চড় খেল বলেই ছোঁড়ার ভর হয়নি তো ?

—দূর মশাই ! আমি মারদাঙ্গাকে ভয় পাই। একে এখন মানুষের মেজাজ রুক্ষ চড়া, তাতে এদের চটিয়ে বসবাস করা খুব কঠিন

—চলুন, মজাটা দেখা যাক।

গ্রামের হর্তকর্তা হরকান্ত মহাপাত্রের মা যখন এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসলেন, সমবেত পাঁচখানা গ্রামের লোক চমকে গেল। কখনো বাড়ি থেকে

বেরোয় না বুড়ি, আজ ছুটে এসেছে।

হরকান্তের মা হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলেন, মা! আমার মোহনচাঁদ কোথা গেল মা!

—কেন, আমার কাছে কেন? তোরা তো আমাকে মানিস্‌ না।

—মানি মা! এই যে ছুটে এসেছি।

—বটে! ঠাকুর চুরি গেছে তাইতে এসেছিস।

—বল মা! কি করতে হবে?

—এই যে আমি ভাঙা ঘরে থাকি, আমার ভক্তজন এসে জলে ভেজে, রোদে পোড়ে……

—মা গো! পাকা মন্দির করে দেব, সামনে ছাউনি দেয়া চাতাল থাকবে।

—পুজো হলে পুজো পাঠাস?

—পাঠাব মাগো!

—তিন সত্যি কর্‌।

– সত্যি, সত্যি, সত্যি!

—ঠাকুর পেলে আমাকে মন তুষ্ট করে পুজো দিবি? পাঁচশো এক টাকা দিয়ে?

—দেব গো মা!

হরকান্ত বাবু এগিয়ে পড়েন। পাকা মন্দির, পাকা চাতাল, পাঁচশো এক টাকা, এ যে অনেক টাকার ধাক্কা। ওঃ, কি প্যাঁচে পড়া গেল। তবে মা যখন বলছেন, তখন দিতেই হবে। এ সম্পত্তি তো মায়ের। মাতামহ মাকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

—ঠাকুরকে ফিরে চাস?

—হ্যাঁ মা!

হাতে একটা তীর নিয়ে রতন চলতে থাকে। ক্ষিদে, তেষ্টা, পরিশ্রমে সে খুবই অবসন্ন। এখন যে চলছে, তা শুধু ঝোঁকের মাথায়।

সঙ্গে চলে সবাই। এখন সবাই খুব উত্তেজিত, হরকান্ত আর দারোগাও। মধু শবর আগে আগে চলে নেচে নেচে। সে বলে চলে, জয় মা! জয় মা!—তার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। আহা! রতন বড় ভাগ্যবান ছেলে। বড়াম মায়ের নতুন মন্দির হবে, দালান হবে ছাউনি দেয়া। এ সবই মায়ের অসীম, অপার কৃপা।

রতন যখন চলতে চলতে পুরুতের ঘরের সামনে চলে আসে তখন সবাই হই হই করে ওঠে। পুরুত যেন ফাঁদে পড়া জন্তু। ভিড়ের চাপে সে নড়তে পারে না।

রতন এবার তীরটা তুলে ভীষণ গর্জনে পুরুতকে দেখিয়ে বলে, এই সেই পাপী। এ আর এর ভাইপো। মোহনচাঁদকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে তার উপর চালের জালা চাপিয়ে রেখেছে। আহা, বালক দেবতা গো! সে আমাকে কেঁদে কেঁদে সব জানাল, দিদি গো! খুড়ো ভাইপো মযুরভঞ্জে গিয়ে আমাকে বেচে দেবে।

—না, আমি নয়! আমি নয়!

সনাতন পালাতে চেষ্টা করল। দারোগা ঝপ করে তার হাত চেপে ধরে মোলায়েম গলায় বললেন, আহা! পালাচ্ছেন কেন?

পুরুত মেঝেতে ঝপ করে বসল আর চোখ উল্টে অজ্ঞান হয়ে গেল।

মানুষ তখন উত্তেজিত। বাইরে ঠেলে এনে ফেলল চালের জালাগুলো। কোদাল আর শাবল এনে মেঝে খুঁড়ে ফেলল।

হরকান্ত বাবু আর দারোগার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মোহনচাঁদ জীউ, তামার ঘড়া, পুজোর বাসন, পিলসুজ রে, থালা রে, সে এক কাণ্ড বটে!

হরকান্তের মা বললেন, হরকান্ত! মায়ের পুজোর টাকা এখুনি দে।

—আনছি মা!

রতন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, চোখ বুজল। ভৈরব হেমব্রম একবার দারোগা একবার হরকান্ত বাবু, দুজনের দিকে চাইল।

তারপর কি হল তা তো বুঝতেই পারছ। দারোগা তো পুরুত আর সনাতনকে নিয়ে চলে গেলেন। রতনকে নেয়া হল বাড়িতে।

রতনের ভর ছেড়ে গেল। এরপর যখন টাকা এসে পৌঁছল, তখন সেই সঙ্গে চালটাও হরকান্তের মা পাঠিয়েছিলেন। ফলে কত মাংস আর কত ভাত রান্না হয়েছিল পুজোর পর। তা ভেবে দেখ।

মন্দিরের কাজে নাকি বর্ষার পরেই হাত পড়বে। আমরা যতদূর জানি রতনের পদমর্যাদা ওগ্রামে খুবই বেড়ে গেছে। সকলেই তাকে সমীহ করে চলছে। কে জানে, আবার যদি বড়াম মা ভর করেন?

কিন্তু মায়ের ভর তো আর হবে না।

সে কথা শুধু রতন, মনাই, রাজা, এই সব ছেলেরাই জানে।

(শারদীয়া পক্ষীরাজ / ১৩৯০)

ভাসাভাসি

মহাশ্বেতা দেবী

সাপে কাটলে জলে ভাসিয়ে দেয়, মানুষ যখন মরে যায়। নয়নকে নাকি জ্যান্ত ছেলেই জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওকে দুধের ছেলেকে তিন নৌকোয়, তা কেউ জানে না। অধর বৈরাগী মাছ ধরতে খালে নেমে সেই নৌকো ধরেছিল।

"বৈরাগী" পদবী মাত্র, বৈরাগী বোস্টম অধর নয়। অধর মাঝে মাঝে চুরি করত। মাঝে মাঝে জেলে যেত। চুরি করলেই সবাই জেলে যায় না। অধর যেত কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সামলে ওঠা ওর স্বভাবে ছিল না।

যখন জেল থেকে ফিরত, তখন ও বলত, আর চোট্টা কাজ করব না, শুনলি চুনী? এবারে সৎভাবে বাঁচতে হচ্ছে। কেন, খেটে খেলে কি পেট চলে না?

—তুমিই জানো।

আশ্চর্য, চোর অধরও কাজ পেত। ঘর ছোলো তো বেড়া বাঁধতে, নয় চাল বইতে ওর দক্ষতা ছিল খুব। কাজের সময়ে কয়েকদিন ভূতগত খাটবে, কাজেই বলবে, ঘটি বাটি সব সামলে রাখুন গো। অধর চোর কাজে লেগেছে।

ঘন ঘন বিড়ি খাবে, ঠিক কাজটি তুলে দেবে। গ্রামের লোকও বলত, কেন যে চুরি করিস? খেটে খেলে তোর ভাতের অভাব কি?

—সব তো বুঝি গো। কিন্তু খেটে খেতে মন চায় না। স্বভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে, জানলেন বাবু?

—বয়স তো বাড়ছে। এবারে ভাল হ'।

—দেন, না দেন, কাঠগুলো ফেড়ে দিয়ে যাই। এবারে ভালো হতে হচ্ছে।

—বউটাকেও দেখিস না।

চুনী ভাগে ছাগল পালত, বিলে ঘাস কাটত, গেরস্তবাড়ি জোগান দিত, নয় জলের শাক বোঝা করে তুলে মাসিকে দিত। মাসি গ্রাম থেকে শাক

পাতা ডুমুর মোচা কিনে শহরে বেচতে যেত।

চুনীর আগে বড় দুঃখ ছিল, তার কোলে ছেলে এল না। আধবুড়ো হতে সে দুঃখ তার চলে গিয়েছিল। বিধাতার বিচার আছে, জানলে? সাধে কি আমাকে বাঁজা করে রেখেছে? ছেলে হলে তো সবাই বলত "চোরের ছেলে।"

—না, আর ও পথে নয়।

—থাক, আর বোল না।

চুনী ছিল খরখরানি, আত্মসম্মানী। অধর চোর, সবাই জানে। তাই ও গেরস্তকে গরুর ঘাস বাড়ির সামনে নামিয়ে দিত। ভাগপোষানি ছাগল পালত, ছানা বড় করে বেচে দিত। শাকপাতা তুলে মাসির বাড়ির সামনে নামিয়ে দিত।

না, কারো ঘরে ঢুকত না চুনী। বলত, না বাবু। তোমাদের ঘটি বাটি সরে যাবে, বলবে যে অমুক চোরের বউ ঢুকেছিল।

এমন লোককে গ্রামের মানুষ পছন্দ করে না, সমীহ করে চলে। চুনী প্রতিবারই ভাবত, এবারে অধর ভাল হয়ে যাবে। মাঠে কাজ করো, খালে মাছ ধরো, কোন্ কাজটা পারো না? দুটো প্রাণী, পেট কি চলে না?

তখনো কলকাতার খিদে এত বাড়ে নি। বিলে ঘাস, জলে কলমি হিঞ্চে, খালে চুনো চাপাটি মাছ তখনো ছিল।

অধরও বলত, দুটো প্রাণী, পেট কি চলে না?

কিন্তু তারপরেই ও চুরি করত। ধরা পড়ত। তখনো দিনকাল অন্যরকম। মহেশ সামন্ত বলেছিল, অধর রে! ঘটিটা, বাটিটা, থালাটা, কতবার তোকে থানায় নিই. ধরতেই তো পোষায় না। এবারে আর থানায় দেব না। পাঁচ চুলো করে মাথা মুড়িয়ে দেব, তাতে যদি তোর লজ্জা হয়।

অধরেরও লজ্জা করত। দেখুন দেখি বাবু। আমার স্বভাব শোধরাতে পারি না, তাতে আপনারও হয়রানি, বউও জ্বলে মরে!

তোরই বা কি ভালোটা হচ্ছে?

অধর সলজ্জ হেসে বলত, ঘটি-বাটি-থালা,—দামী জিনিস তো নিই না। তাতেই ভালো হয় না।

—যা তুই, দূর হ!

—রেগে গেলেন বাবু? ইশ্! ঘাটের পৈঠা যে বসে যাচ্ছে। দাঁড়ান, ঘাটটা বেঁধে দিয়ে যাই।

—চোরের কখনো ভালো হয় ?

—না বাবু !

বাবুকে বলত "না বাবু" ! আর চুনীকে বলত, দেখ ! চুরি করলেই যে মন্দ হয়, তা কিন্তু নয়। কলকাতায় যেয়ে যেয়ে কত জানতে পারবি ! মটর গাড়ি চুরি করে বেচে দিচ্ছে, দোকানে যেয়ে দেখ্, ওজনে চুরি ! মহেশবাবুর কাকা তো পাঁচজনার জমি বাবপাড়ি করেই নিলে। তাদের কি মন্দটা হচ্ছে ?

চুনী ওর কথার জবাব দিত না।

—সিঁধ কেটে যে সর্বস্ব নেব, সে কাজ অধর কখনো করেনি, করবেও না।

—নয় তাই করো। করে দশ বছর জেলে যাও, আমার হাড় জুড়োক।

—কি যে বলিস ! ওই ঘটিটা ! বাটিটা ! নয় ঘাটে ডোবানো থালা দুটো ! কেন যে করি।

শ্মশানঘাটে মহাজ্ঞানী সাধু ছাড়া কেউ বসে না। শ্মশানের সাধু বলত, অধর ! তোর হাত যখন নিশপিশ করে, তখন হাত দুটোয় কোনো দুষ্ট আত্মা ভর করে, জানলি ? তোকে বলে বা কি করব। এক বছর ভালো হয়ে থাকবি, এমন মাদুলি তো দিতে পারি।

—না বাবা। তোমার মাদুলি পরলে মন আর সংসারে থাকবে না। সন্ন্যেসী হয়ে যাব।

চুনী বলত, তাই যাও !

—চুনী ! এবারে দেখিস……

তা মাছ ধরতে গিয়েই অধর নৌকো ধরেছিল। তখন ঠিক বিকেল। চারদিক অবসন্ন করে আষাঢ়ের বিষণ্ণ বিকেল থমকে আছে। মাঝি নেই, বাঁড় নেই, এ কেমন নৌকো আসে ?

অধর নৌকো ধরেছিল। প্রাচীন সংস্কার বশে ঠাকুর দেবতার নাম করেছিল। নির্জন স্রোতস্বিনী খালে, সাঁ সাঁ করে যদি নৌকো ভেসে আসে, সে কোনো অতিলৌকিক ছলনা হতে পারে। জলে মড়া ভাসলে ধোর না, সিন্দুক ভাসলে ধোর না, ও সব মক্কপিশাচের ছলাকলা। কিন্তু এ তো নৌকো।

নৌকোতে কাঁথায় সোয়ানো শিশু। মাস ছয়েক বয়সই হবে। বাছা শুকিয়ে গেছে, কাঁদতে গেছে। ওই গঞ্জের দিক থেকে ভেসে আসা নৌকো। কে এমন কাজ করল ? অধর আগে ভাবেনি, পিছে ভাবেনি, সে ছেলে

তুলে নিল। বেঁচে আছে গো! কেষ্টর প্রাণী! ঘরে নিলে, একটু দুধ জোগাড় করে খাওয়ালে ও বেঁচে যাবে।

চুনী অবাক হয়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। তবু সে ছেলেটি কোলে নিল। এমন কথা গ্রামের বাতাসে নিমেষে ছড়ায়। অধর মাথায় হাত রেখে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা বুঝতে চেষ্টা করছিল। চুনী বলল, ধরো, আমি দুধ চেয়ে আনি।

—এ কি হল?

—দেখি! এদিকে এসো।

—বল্।

—এই ছেলে তুমি রাখবে?

—কি করব, বল্?

—পাঁচজনে নানা কথা বলবে।

—তা বলবে।

—মানুষ তো তুমি করবে না, আমি করব। তা আমি করতে পারি, যদি তুমি দিব্যি করো যে আর চুরি করবে না।

—দিব্যি করব? যদি……

—বুঝেছি। ধরো।

গ্রাম ভেঙে সবাই এসেছিল। না, রংটা পরিষ্কার, তবে হাতে গলায় গয়না নেই, কোমরে কালো সুতো। অ চুনী! জাতের জন্মের ঠিক নেই, অমন ছেলে ঘরে রাখবি?

—কি করব?

থানায় ফেলে দে, তারা বুঝবে।

—সে আমি পারব না।

অবশেষে শ্মশানের সাধু বলল, খাল বেয়ে বেহুলার পড়ছে, বেহুলা বেয়ে গঙ্গায় পড়ছে। খালের জলও গঙ্গা জল। সেই জলে ভেসে এসেছে। ও ছেলেতে কোনো দোষ নেই।

মহেশ সামন্তও সব শুনে বলল, অধর নৌকো ধরেছে। রাখলে রাখবে, না রাখলে থানায় জমা দেবে। তবে থানায় খবর একটা দিয়ে রাখ্ অধর। যদি কারো ছেলে চুরি হয়ে থাকে, তারা খবর করলেও করতে পারে।

থানার ছোটবাবু অধরকে দেখে বলল, অধর বৈরাগী যে আপনা হতে উদয় হলে?

—বাবু ! একটা কথা।

—বল্। এঃ, লজ্জা পাচ্ছিস যে !

—খালে মাছে ধরছিলাম বাবু···

অধর কথাটি বলল। ছোটবাবু বলল, কেমন ছেলে ? কত বড় ?

—মাস পাঁচ ছয় হবে।

—কার না কার, তা এই একটেরে থানা, এখানে কে তার হেপা নেবে। তোর ঘরে রাখিস। কেউ খোঁজ ডাঁজ করলে জানাব।

—রাখব বাবু ?

—রাখবি রাখ্, না রাখবি যা হয় কর্। কচি ছেলে ! আমি কি বলব। একদিন নিয়ে আসিস। দেখব, লিখে রাখব।

—কি লিখবেন বাবু !

—কোথাও কোনো জড়ুল, কোনো তিল, কিছু চিহ্ন আছে কি না। ঘর যদি কারো ছেলে হয়, সে তো খোঁজ করবে ওসব কথা বলে।

আসব বাবু। একটু তাজা হোক। এখন যেন নেতিয়ে আছে।

নেতিয়ে আছে, মানে ?

—মানে পেটে কিছু ছিল না, দুধ জল তেমন টানতে পারছে না। এখন তাজা হোক।

—তাই আসিস।

—আসব বাবু।

—তোর তো ছেলে পিলে নেই।

না বাবু।

—দেখ, ভাল হয়ে থাক্‌গো যা। চুরিও করিস, ধরাও পড়িস, জেলেও যাস। তা ক'বার হল ?

—আপনার আশীর্বাদে বার ছয়েক।

—সে কি ? আমি তো দু'বার···

—আপনার আগে অন্য বাবুরা ছিল।

অধর উৎফুল্ল হয়ে থানার সামনের নিষ্ফলা আমগাছটা দেখায়।

—ওটা যখন এতটুকু, তখন হতে বাবু···

—তুই মহা বেহায়া। যা, কাজ করতে যে।

সনাতন বেরাকে ছাতা মাথায় ঢুকতে দেখে অধর। বড় চুরি, বড় ডাকাতির বাসনকোসন উনিই কেনেন। গোপালগঞ্জে ওর বাসনের দোকান,

কলকাতার বৌবাজার-শেয়ালদার মোড়েও।

অধর চলে আসে। সনাতন বেরা কি মন্দ আছে, না থানার ছোটবাবু মন্দ আছে? ছেলে অবশ্য অধরই যায়। কিন্তু শ্মশানবাসী সাধুবাবা বলে, হাতে করে যে চুরি করে সে যেমন চোর, অন্যেরাও সমান চোর, জানলি অধর? চুরির ফল যে ভোগ করে সেই চোর।

এসব কথা অবশ্যই সে সনাতন, ছোটবাবু। মহেশবাবুর কাকাকে বলে না। তার প্রতিষ্ঠিত শ্মশান কালীর বছরে চারটি পুজো হয়। চারবারই চলে সারাদিন সদাব্রত। সে সময়ে ওরাই দেয়, আসেও। সনাতন বেরা তো কালীকে রুপোর জিভ গড়িয়ে দিয়েছে।

ছেলেকে তাজা করে থানায় নিতে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। আঁচলে ঢেকে চুনী তাকে আনে। না, তেমন কোন বিশিষ্ট চিহ্ন নেই। এমন কি টিকের দাগও নেই।

—যা, নিয়ে যা।

—রাখতে পারব তো বাবু?

—যা, রাখ্‌গে।

—এই জামা গায়ে ছিল, আর কাঁথাটা···

—তা দেখে আর আমি কি করব?

অধর ও চুনী ছেলে নিয়ে ঘরে ফেরে। চুনী বলে, নৌকো ধরলে, ছেলে আনলে মাসি বলছিল শ্মশান থেকে মায়ের প্রসাদ এনে খাইয়ে দে। ওকে ভক্ত করে নে।

—দাঁড়া···দোকান থেকে একটু চিনি কিনি।

—কি হবে?

—চিনি আর বাতাসা, খাবে।

—কেনো।

অধরদের বাড়িতেও কেউ আসে না। চুনীও কারো ঘরে ঢোকে না। কিন্তু যে সকলের মাসি, সেই তারামণি পাড়ার গেজেটও বটে। সে চুনীকে অবাক করে একদিন ডাকে। দেখ্‌ চুনী, তোদেরও গুরুমন্তর হয়নি, হাতের জলও শুদ্ধ নয়। গুরুমন্তরটা নেয়া থাকলে বলতে হত না। তা নেই বলে বলতে হচ্ছে।

গুরুমন্তর দিয়ে কি করব মাসি? আমার হাতের জল কে খাচ্ছে? ঘরের মানুষকে তো চেনো। অন্নের যোগাড় রাত নেই, দিন নেই···আমি।

—ওকে তো দিচ্ছ বাছা ! ও ছেলে কোন জাতের কে জানে। তাকে সপাটে ঘরে তুললে। চেহারা দেখে মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে। দিব্যি গৌরবর্ণ, কটা চুল। তা ভালো জাতের ছেলেকে তো ওই হাতে খাওয়াচ্ছ মাখাচ্ছ। একদিন যেয়ে পুজো দাও। দোর গোড়ায় জাগ্রত কালী !

অধর বলে, জলে ভেসে এসেছে, ও ধরো গে, জলের জীব একটা। মাছ কাঁকড়া, চিংড়ির মাতা যে খাও, সে কি শুদ্ধ করে খাও ? মন হল সব, কি বলো ! তাতেই বলছি।

—তোমার মনের খবর তুমিই রাখো বাছা। তবে যা হয় আচার নিয়ম না মানলে আমি বা চুনীর কাছে শাক তুমুর নেব কি করে ?

অধর তখনো বলে, বাবুরা ওর ঠেঙে ঘাস নিচ্ছে।

—না বাছা, আমি পারব না।

চুনী বলে, ঠিক আছে মাসি, তাই করব। তোমার ব্যাগাতো করি। এ কথা তোমাতে-আমাতে থাক।

—যা করবে তাড়াতাড়ি কোর বাছা।

মাসি গ্রামের অনেক নেড়ী বুঁচির অন্ন জোগানদার যারা শহরে যায় না, তারা বাজারের চেয়ে অনেক কম দামে কমদামী শাক কলমী তুমুর থানকুনি মাসিকে বেচে দেয়। তা ছাড়া সে গরিব গুরবোর মধ্যে সুদেও টাকা খাটায়। দারিদ্রাসীমা ছোঁয়া সমাজের যে অর্থনীতি, এ গ্রামে সে অর্থনীতিতে মাসিও একজন নিয়ন্ত্রা। ঠকঠক করে সে বেরিয়ে যায়।

—ও তো তোকে ঠকায় তুই নিজে যেয়ে স্টেশনে, যদি শহরে যাস ?

—কোনো দিন সং পথেও থাকো নি, বাজারের নিয়মও জানো না। মাসি শাক বেচে, সবজি বেচে, ঘর পালা ডিম বেচে চারটে চালও বায়। রেলের লোকজনের সঙ্গে ওর বন্দোবস্ত। তা ছাড়া বাজারে যে যায় সেই কি বসতে পারে ?

—ও তো বসে রাস্তায়।

— রাস্তায় বসলেও যাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত, তারাই বসতে পারে। আমি বসতে গেলে জায়গাও পাব না, মাসিও শত্রুতা হবে।

ও মাগী এখন গেঞ্জেট করবে।

—করতে দেব কেন ?

চুনী শক্ত মুখে বলে। তারপর বলে, বাবুদের অত মাথাব্যথা নেই। মাসির মত লোকরাই হিংসেয় মরছে।

—ধুর ! আমাদের হিংসে করে কেউ ?

অবরের কাছে কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। সে চিহ্নিত গোর। চুনী সারা বছর কাজ খুঁটে বেড়ায়। জমিজমা নেই, বাস্তুটুকু রায়তি বটে। তাও বসবাসের চালা জীর্ণ। একই চালার নিচে বেড়া দিয়ে আধখানা করা। ওদিকে চুনীর ভাগপালনি ছাগল পাঁঠা থাকে। একটি কড়াই, তাতে ভাত রান্না হয়। একটি পিতলের সানকি, তাতে দুজনে খায়। মাটির কড়াইটিতে শাকটা, মাছচিংড়ি জুটলে সেটা রান্না হয়। কি দেখে হিংসে করবে ?

চুনী তার চেয়ে সমঝদার। সে বলে, যা আছে তা দেখে হিংসে নয়। ওরা ভাবছে, ছেলে পেলে, তুমি যদি ভালো হও, খেটে খাও। চুনী বোরেগণীকে চিরকাল টোকা বোবা ক'র চলতে দেখেছে, তার যদি বিভূতিভূ হয়,—যদি হয় তাহলে তো তোমাকে চোর বলতে পারে না, আমাকে ধরা করতে পারে না। তা ভেবে হিংসে উঠে গেছে।

—তাহলে চল্, শ্মশানবাসীর কাছেই যাই।

—চলো। ছেলেটাকে তো ফেলতে পারব না।

যা বলিস।

—যেয়ে জেনে এসো।

—তুললাম যখন, তখন ছেলেটাকে যেন খুব গৌরবর্ণ দেখেছিলাম। তত তো নয়।

—আষাঢ়ের বিকেল ! মেঘ চাপা আলোয় দেখেছিলে তাতেই মনে হয়েছিল। কার এমন মতি হল কে জানে ! না রাখো জন্মাতে দিলে কেন ? এত বড়টা করে ভাসিয়ে যে দিলি, ছেলে তো মরে যেতেও পারত।

—মানুষ কত রকম হয়। একজনা ছেলে খাটছে, জানলি ?

সাত বছর ধরে বউকে নিয়ে ঘর করছে। বউয়ের উপর সন্দেহ করে বড় মেয়েটাকে সরিয়ে দিল। তা বাদে বউকে কাটল, তিন মাসের ছেলেটাকে প্রাণে ধরে মারতে পারেনি, ঘরে ফেলে রেখে ঘর বন্ধ করে তালা মেরে পালিয়েছিল।

—থাকুক। তোমার যেমন ছেলের ভাত ছাড়া রোচে না, তেমনি সব পাপীতাপীর গল্প।

শ্মশানবাসী সাধু প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জানাল। এটা তারই জয়-জয়কার। এই যে গ্রামে বসে আছে, সে বসেই আছে, এর ফলে কি মানুষের

ভালো হচ্ছে, না মন্দ ? অধর তো চোর, তারও দেখ কেমন হৃদপরিবর্তন।

মহেশ সামন্তও বলল, ভালো ! ভালো ! সবই মা করাচ্ছেন বলতে হবে।

—সেই মায়ের আজও ইটের মন্দির জুটল না।

—সেটাও দেখতে হচ্ছে।

—সনাতন বেরা তো চায়……

—না না। আমি আছি, সরিকরা আছে, তার মধ্যে ভিন গ্রামের লোকের নাম হবে, তা কি হয় ?

শ্মশানবাসী সাধু মাটিতে চাপড় মেরে বলল, ভালো কাজে বিলম্ব করতে নেই।

—বর্ষাটা যাক।

—মা তো তোমাকে কম দিচ্ছে না মহেশ ! চারটে পুজো হয়, চারবার মেলা বসে, দোকান পাটও তোমার, লাভও তোমার।

মহেশ সামন্ত মনে মনে স্বপ্ন দেখে। খুব বড় স্বপ্ন সে নিজে দেখতে সক্ষম নয়। সাধুর উসকানিতে স্বপ্ন জেগে ওঠে।

—হাঁ। মন্দির হল, ক্রমে ক্রমে লোকজন এসে বসার জন্তে চাঁদোয়া করে দেব, সার সার ঘর। দোকানঘরও পাকাপোক্ত……

—সে তুমি যা হয় করোনা কেন ! মেলাতে যাত্রা আনো, কালীকীর্তন আনো, তবে হুঁ, ধর্মপথে চলতে হবে। মাকে ঘরের মতো ঘরে রাখো। দেখ ! অধরের ছেলেটাকে পয়মন্ত বলতে হবে। তার কথা বলতে যেয়েই মায়ের ছামার খেড়ো ঘর ঘুচে পাকা ঘরের ব্যবস্থা হল।

—ওঃ, তাহলে তো অধরের দুঃখও ঘুচবে !

শ্মশানে বাস, শ্মশানকালীর পুজো, শবযাত্রীদের প্রণামী, এ সব নিয়ে থাকলে কি হয়। সাধু বাস্তব জ্ঞানে বুনো পাখা। সে পায়োরিয়ার গন্ধ ছড়িয়ে উদাত্ত হেসে বলে, এ তুমি কি বললে মহেশ ! অধরের যা তোমরাও তা ? অধরের দুঃখ ঘুচে সে কি তুমি হবে ? ও বেটার বহুরকি হাত নিষ্কণ্টক করে তো তাই অনেক। রমরমা তোমার হতে পারে, যদি না কি ধর্মপথে চলো।

—তাই চলব।

মনোহর ডোম সাধুর প্রসাদে সর্বদা মদ ও গাঁজায় ডুবে ও ভেসে থাকে।

মহেশ চলে যেতে সে বলে, সবই মাকে জানিয়ে হবে, মহেশকে লাথোপতি করে দেবে, মা কি আঙুল চুষবে ?

শ্মশানবাসী বলে, যা হবে সব তো মায়ের রে মায়ের মাহাত্ম্যটা মানুষ যত বুঝবে, তত আসবে। তোর কি? তুই যেমন পাঁঠার মাথা পাস, তাই পাবি

—পাব?

—পাবি।

ডোমও বলে, ছেলেটা পরমন্ত বলে মনে হচ্ছে। ইশ! আমিও তো নৌকো যেতে দেখলাম। কাঁঠালতলায় গাঁজা টেনে ভোঁস মেরে বসেছিলাম। তাতেই বুদ্ধি হয়ে গেল। আমি যদি নৌকো ধরি তো বেঁচে আমি পাই।

—মা চায় নি যে তুই ধরিস।

—মা চাইল যে অধর ধরুক?

—নিশ্চয়। তার ইচ্ছেয় চাঁদ সূর্য উঠছে।

মনোহর ডোম এতদিন শ্মশানকালীকে তত শক্তিশালী মনে করে নি। এখন তার মনে হয়, হয়তো সাধুর কথাই সত্যি। চিন্তা করতে গিয়ে তার মাথা ঘুরে যায় এবং সে হতাশ্বাসে বলে, তা হলে শ্মশানে মড়া আসে না কেন তেমন?

গাঙুইরা আসবে, মদ দেবে···

সে ঘুমোতে চলে যায়।

নানা কারণেই শ্মশানবাসী খুব উদার হয়ে যায় অধরের প্রতি। মাত্র পাঁচ টাকার মধ্যে সে পুজো সারে, প্রসাদ দেয় ও বলে, ছেলেকে নয়নকালী নাম দিলাম। ওই নামে ডাকবি।

শ্মশানবাসী, মনোহর ও মহেশবাবু, তিন জনের মুখেই যখন শোনা যায় যে নয়ন পরমন্ত ছেলে, মাসিদের মত গাঙুইরা তা মেনে নেয়। গ্রামের মাথা মহেশবাবু যা বলবে, তা মানতে হবে।

পেটের বাচ্চা অধর ও চুনীর একরকমই থাকে। অধর, বাধ্য হয়েই ভালো হয়ে যায়। সে ছেলেকে না দেখলে চুনী বেরোতে পারে না। অধর বলে, নয় মাস কাটতে আমি যাই, তুই ঘরে বোস।

—যার যা কাজ সে করুক।

অধর বোঝে, এখনো তার সম্পর্কে চুনীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আসে নি। আরো বোঝে, ছেলে সম্পর্কে তার মমত্ববোধ বোধ হয় একটু বেশি। নিঃশ্বাস ফেলে সে ছেলে কোলে নিয়েই বাবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—কোনো কাজ দিন বাবু।

—ছেলে বিয়ে কি কাজটা করবি ?

—নয় ছোন দিন, দড়ি পাকাই ঘরে বসে। নয় বাগলো দিন ঘরে বসে পাতা চাঁছি।

—চুনী কোথা ?

—সে যা করে তাই করছে।

"হবে না, বেরে" বলতে গিয়ে মহেশ সামন্তের মনে জন্মের সংস্কার বেজে ওঠে। এই ছেলে পয়মন্ত, এর কথা বলতে গিয়েই সেদিন শ্মশান-কালীর মন্দির ঘিরে একটি ছোটখাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করে এসেছে। ছেলে নেই। এটাই দুর্ভাগ্য তার চারটিই মেয়ে। দেখবে কে ? নয় ছোট মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখবেন। মহেশ বলে, আজ যা, কাল আসিস।

—ছেলেটা খুব মায়াবী, জানলেন বাবু ?

—তুই বোকগো যা !

চুরি ছেড়েই দেয় অবর ক্রমে ক্রমে। সংসার যেমন চলত তেমনি চলে। শুধু মাঠে নামার সময়ে চুনী থাকে ঘরে, অবর যায় কাজে।

কয়েক বছরেই অবর বোঝে, বড় সময়ে সে স্বভাব পালটেছে। ছোটবাবু মহেশবাবুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসে বলে, ঠিক থাকিস অবর। এখন মানুষের মেজাজ পালটাচ্ছে। চোর ধরলে আর থানায় যাচ্ছে না কেউ। বেদম পিটছে।

—সে কোথা, বাবু ?

—অন্তত হচ্ছে। এখানেও হাওয়া লাগবে। মারতে মারতে মেরেও ফেলছে।

মহেশ সামন্ত বলে, সে তো আপনাদের ভালো হল। থানার কাজ কমছে।

—না মশাই, এতে কি ভালো হয় ?

—এখন মানুষ পালটে যাচ্ছে।

—এখানে অবশ্য তা হবে না চট করে। দেবস্থানে মাহাত্ম্য একটা থাকবেই।

কয়েক বছরে শ্মশানকালীর মন্দির ঘিরে সত্যিই ছোটখাট মহেশ সাম্রাজ্যই গড়ে উঠেছে। মন্দিরটি শ্মশানবাসীর মনোমত উঁচু হয়নি বটে। কিন্তু বাঁধানো চাতাল, পাকা চাঁদোয়া হয়েছে।

দোকান ঘরগুলি বেড়া চাটাই ও খোলার তৈরি।
দোকান ঘর।

মহেশ সামন্তকে জবর টেক্কা দিয়েছে সনাতন বেরা। শ্মশানের জন্যেই শ্মশানকালী! তা শ্মশানে আসে যে গাঙুইরা, তারা মড়া নিয়ে রোদে পুড়বে, জলে ভিজবে, এটা কেমন কথা? মা, মা গো! তোর তাতে বড় দুঃখ মা! তা দেব, আমিই ব্যবস্থা করে দেব।

এত কথা বলে, বিস্তর মানুষকে জানিয়ে সনাতন বেরা শ্মশানযাত্রীদের সুবিধার্থে একটি দু'দিক খোলা ঘর করে দিয়েছে।

অবশ্যই পাশের কাঠগোলাটি মহেশ সামন্তের। কিন্তু মনোহর ডোম তো বলেই বেড়ায়, মহেশবাবু কাঠ বেচেও পয়সা করছে, দোকান থেকেও পয়সা করছে। এতে কি পুণ্য হয়? সনাতন বেরাকে দেখ, কেমন ভালো কাজটি করল।

মহেশ সামন্ত কোনোদিনও অকূল নির্বাচনে দাঁড়াবে বলেও ভাবেনি। তবু তার মনে হয়, সনাতন নিশ্চয় দাঁড়াবে, এটা তার চাল মাত্র।

শ্মশানবাসীকে সে বলেছিল, ওই বুদ্ধিটা আমাকে দিতে কি হয়েছিল?

—আমি তো ওকে বলি নি।

ও আপনা হতে ভালো কাজ করল?

—ওই মনোহর! ও বলেছিল। তবে হ্যাঁ, মনোহর একবার বলতে না বলতে সনাতন বেরা যে গাঙুইদের জন্যে ঘর করল, এটাও মায়ের ইচ্ছে মা মনোহরকে বলল, "বল্" আর সনাতনকে বলল "যা বলছে তা কর্।"

—মনোহর তো আমাকেও বলতে পারত। যে সব করল, সে কি অতটুকু করতে পারত না?

শ্মশানবাসী এখন লাল টেরিকাপড়ের লুঙ্গি পরে এবং কালীর রমরমা প্রসাদাৎ মন্দিরে যত বোতল প্রণামী পড়ে, সবই সে উদারচিত্তে খায় ও বিতরণ করে। এ মন্দিরে পুজো দিতে হলে মদ ও গাঁজা দিতেই হবে, এ নিয়মও কয়েক বছরের।

ফলে সর্বদাই শ্মশানবাসী বেশ প্রফুল্ল থাকে। সহৃদয় মেজাজে সে বলে, তোরা সবাই মায়ের সন্তান। ছেলেরা ভাগেজোগে মায়ের কাজ করবে তাতে রাগ কেন রে? জীবন তো দু'দিনের রে শালা। তারপর তো মনোহরকে দেহটি ছেড়ে দিয়ে টিকিট কাটতে হবে।

এই "তুইতোকারি" ও "শালা", সবই শ্মশানবাসী বিগত কয়েক বছরে

আরম্ভ করেছে।

ছোটবাবুর মুখে "দেবস্থানে মাহাত্মা একটা থাকবেই" শুনে মহেশের এত কথা মনে পড়ে।

—অধরের সঙ্গে ছেলেটা কে?

—ও তো সেই ছেলে, নয়ন।

—সেই ভেসে আসা ছেলে?

—আবার কে?

—দুজনেই এখানে?

—না না, ছেলেটা আমার গরু বাঁধে, ঘাস খোল দেয়। অধরই করাত কথা। তা দুজনেই মিলেমিশে……

—গরুও তো অনেক।

—গিন্নি তো ওই নিয়েই আছেন, না? সবই কপালে করে মনাই। গিন্নির মেয়ে নাড়ী। যে তিনটে মেয়ে শ্বশুর ঘরে দিলাম, তাদের ঘরে বাতি হল।

ছোটটাকে ঘরজামাই রেখে বিয়ে দিলাম, তারও মেয়ে নাড়ী। জামাইটার কোনো দোষ থাকবে। নইলে আট বছরে দুটো দৌহিত্রী হতে পারে?

ছোটবাবু পরম সন্তোষে হাসে। আমার দেখুন দুই ছেলে, এখনো চাকরি বিশ বছর আছে। দুজনকেই দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাব এমন ভরসা রাখি।

—আমার তো সবই অভরসা হয়ে গেল!

জোতজমা ও কালীতলার মালিক মহেশ সামন্ত বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ে। যে কোনো সম্রাটের মতই তার দুশ্চিন্তা, এমন সাম্রাজ্য সাত টুকরো হয়ে যাবে। এখন মরলে মেয়েরা ভাগ করে নেবে সব।

—এবারে ঘরে যাব বাবু?

অধর এসে দাঁড়ায়।

—কেন, এখন কেন?

—রাত হয়েছে বাবু…ছেলেটার ঘুম লেগেছে…

—বাড়িতে লোক এসেছে দেখতে পাচ্ছিস না?

অধরকে দেখলে আজকাল মহেশের বিজাতীয় রাগ হয়।

অধর। অধর চোর। সেও দেখ কেমন ছেলের হাত ধরে লণ্ঠন হাতে

করে যাচ্ছে।

শ্মশানবাসীকে বলে দেখ। কোনো দরদ পাবে না। "মহেশ সামন্ত" নামটি না থাকার যে কি বেদনা তা সে বুঝবেই না। বরঞ্চ সে বলে, অধরের পুত্র লাভ থেকে তোর বাড়বাড়ন্ত। তুই ভুললেও আমি ভুলিনি।

বোঝ! নয়নকে কি সে শুকিয়ে রেখেছে? সকালে মুড়ি, বেলায় মুড়ি, বিকেল গড়িয়ে ভাত, পুজোয় প্যান্ট গামছা, কি দিচ্ছে না?

অধর বলে, রাতের ভাতটা না খাও, ধান তো দেবে বাবু। যতজন খাবে, তাই তো দেয়।

—যত পাস, তত খাঁই বেড়ে যায়। ভাত কি পাস না মাঝে মাঝে?

যেমন আজকে পাবে।

গামলায় ভাত নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত অনেক হয়ে যায়। অধর ছেলের মাথায় হাত বুলোয় আর বলে, বড্ড খাটনি, তাই নয় বাপ?

—হ্যাঁ বাবা।

—কি করব বল্। ঘর সারতে বাবুর কাছে খড় নিলাম, বাঁশ নিলাম, দেনদারি হয়ে গেলাম। বাস্তও তার, তাতেই, নইলে কি আর তোকে···।

—ঘরে চলো বাবা, ঘুম ধরেছে।

ঘরে গিয়ে নয়ন ভাত না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। চুনী বলে, থাক, সকালে খেয়ে কাজে যাবে।

নয়নও বড় হয়েছে, নয় বছরেরটি হয়েছে, আর এই কয় বছরে অধর আর চুনীর দুঃখ বেড়েছে বই কমেনি। ভাগপাল নি ছাগলের ঘরটি শূন্য। বেচে বেচে পেটে খেতে হয়েছে। যা ছিল বাবা, তা এখনো আছে। কিন্তু ঘাস কেটে মহেশকেই দিতে হয়। কলকাতার কিদেও বাড়ছে, কলকাতা হাত পাও বাড়াচ্ছে।

ফলে মানুষ বেড়েছে। শাকপাতা শিকারী এখন অনেক। চুনী আর পেরে ওঠে না তাদের সঙ্গে। নয়ন অবশ্য বলে, আমি কেন যাই না মা?

—অমন ভুলও করিস নি নয়ন। বাবুর বাড়ি আছিস, তবু খেতে পাস একবেলা।

অধর বলে, বাবু তো দুজনাকে দেয় না রে চুনী। বলে, রেখেছি তোকে। একজনার মতো পাবি। ভাগে জোগে খাবি তো খেলি, না খেলি তো না খেলি।

—খড়ে বাঁশে কত বা দেনদারি হলে, যে বাবু রাত বলে ভাত দেয় না,

ধারে দেয় না। না একটা কাপড়!

অধর বলে, বাবু কি কম বুদ্ধি ধরে? বলে "চোর" নাম তোর দিকে দিকে। আমি বলেই সাহায্য হই। না পোষায় তো গেলেই পারিস? কিন্তু চুনী: যখন চুরি করতাম, তখন কিন্তু বাবুর মনে এর চে' বেশী দয়া ছিল।

—ওই পাপেই অপুত্রক।

—চুরি তো করতে মন চায় না আর···

—ভাবছ চুরি করলে জেলে যাবে, পাকা ঘরে থাকবে, ভাত খাবে? সেদিন নেই আর। একবার ও কাজ করলে আমাদের দুই প্রাণীকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। মাসিও হয়েছে তেমনি। বাজারে সর্বত্র দাম বেড়েছে। সে দেখ, থালি সস্তায় কিনছে। বললে বলে, বাজারে দর বেড়েছে যেমন, আমাকেও তেমনি এতগুণো গুণতে হয় চুনী। মাঝপথে যারা নেয়, নেবার মানুষও দাম বাড়িয়েছে।

—কি যে করি!

—ছেলে ভেসে এল, তাকে তুললে। এখন আমরাই ভেসে যাচ্ছি।

—আমার তোর বয়স গেল, বুড়ো হব হব, তখন ছেলেটা পেলাম। এখন ওর যে কি হবে!

—শ্মশানবাসী কিছু বলে না?

—কি বলবে? মন্দির ওর। কালীতলা তো বাবুর। বাবুতে ওতে দশ-ছ'আনা-নইলে সে পারত আমাকে আর নয়নকে ব্যবস্থা করে দিতে।

তখন বলত, ছেলে পরমন্ত। ওর মুখে প্রসাদ দেবার কথা বলাবলি করতে যেয়েই বাবু কবুল হল যে পাকা মন্দির করে দেবে, যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। দোকানও সমচ্ছন্দে চলবে।

—আর পরমন্ত। পাঁচ বছর না হতে হয় শাক তুলছে, নয় ক্ষেত গুড়োচ্ছে। সাত পুরতে তো বাবুর বাড়ি নিলে।

—তুমি বা কি করবে বল! ভাবলে, আমি খাটব খাব, তা নয়ন খাবে না? তাতেই···

চুনী অধরের গায়ে হাত রাখে। বলে, মন্দ ভেবে করোনি। কিন্তু এখন তো বাবু যা করছে···বাস্তু নাকি বাঁধা পড়েছে, তা তুলে দিতে পারে?

—মন হলে পারে।

—তাহলে কোথা যাবে?

—যাব যেথা হয় নয় লাইনের পাড়ে রেলের জমিতে ঘর তুলব। নয় কলকাতা যাব।

কলকাতা! ভাবলে এখনো চুনী ও অধর দিশাহারা বোধ করে। এত কাছে কলকাতা, তবু এত দূর। কলকাতা গেছে ওরা বার দুই। নয়নকে দেখিয়ে এনেছে কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ। সেও মাসির ছেলের সঙ্গে।

—ছেলে যদি পয়মন্ত হবে···

—কেন চুনী? বাবুর ভালো হচ্ছে, শ্মশানবাসীর ভালো হচ্ছে, ওদের ভালো হচ্ছে।

—আমাদের কি হবে?

বৃদ্ধপ্রায় দুটি মানুষ শুয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে চেয়ে। শামা পোকার মত ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে চিন্তা। নয়ন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও জেগে থাকলে দুজনে এত কথা বলে না। চুনী বলে, নাও, ঘুমোও।

—সনাতন বাবুর কাছে যাব?

—তাহলে আর এখানে বাস করতে হচ্ছে না।

—তাও তো বটে।

এর মধ্যেই এসে পড়ে ভাদ্র মাস। ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র চার মাসে চারটি পুজো। এ' ছাড়াও সম্বচ্ছর যে কোনো লোক যে কোনো কারণে শনি বা মঙ্গল দেখে পুজো দিতে পারে। সনাতন বেরা এ গ্রামে গাঙুইদের পাকা ঘর করে দিয়ে নাম কিনেছে।

গোপালগঞ্জেও সে মুখ হারিয়েছে। খালের ধারে আমাদের গঞ্জ। ও গ্রামের তুলনায় টাউন বললেও হয়। সেখানে ধনীমানী মানুষ তুমি। সচ্ছন্দে কালীমন্দিরে তুমিও প্রতিষ্ঠা করতে পারতে। যদ্দিন শ্মশানকালী খেড়ো চালায় গরিব ভাবে ছিল, সে ছিল তোমার মৌকা। এখন ওখানে রমরমা, এখন কি করবে তুমি?

সনাতন একথা শোনে ও হাতের তালু চিৎ করে। তার কি ক্ষমতা আছে? সবই প্রথমত মায়ের ইচ্ছে। তারপর, ভুলে যেও না যে মহেশের নাম ডাক হচ্ছে বটে। কিন্তু গাঁটের টাকা তার সামান্যই গেছে! ওর এক বেয়াই ইটখোলা মালিক. সে দিয়েছে ইট। আরেক জামাই ঠিকাদার, সে দিয়েছে মাল মশলা। তা ছাড়া, মায়ের একটা ইচ্ছের কথা ভুলে যেও না।

সেই যে নৌকো, সেই যে শিশু, সেই যে অধর রোগী সে নৌকো

বরল ? সেই শিশু এ সবের মূলে আছে।

—তা কেমন করে হবে ?

—হায় রে অবিশ্বাসী ! এ কথা সত্যি না মিথ্যে, তা শ্মশানবাসীকে জিগ্যেস কোর। মহেশ মিছে বলবে, তো সে বলবে না। মহেশ মহেশ করছ সবাই, মহেশ একজনের তাতে অবর আর বেটাকে রেখেছে, তা জান ?

—তাই ?

—যাও, দেখে এসো গে। হায়রে কলি কাল ! যদি ধর্ম বলে কিছু থাকে, তাহলে মহেশ এর শাস্তি পাবে।

অবর আর তার ছেলেকে সনাতন সাহায্য করতে পারত কি না, এমন প্রশ্ন কেউ করে না। কেননা অবর যতদিন চোর ছিল, তখনো সনাতন তার মাল কেনে নি। এখন তো সনাতন সম্মানিত লোক, সবাই জানে সে পঞ্চায়েতে দাঁড়াবে। হয়তো তার চেয়েও কোনো বড় স্বপ্ন তার আছে।

সনাতন বলে, নাম চাই না, নাম চাই না। মহেশ যা করছে তাতে তার পয়সা হচ্ছে। আমি জনসেবা বুঝি। তাতেই গান্ধীদের জন্যে ঘরটা..... মা গো, মা। অবরকে দেখ দিখি। চিরকাল করত চুরি, লোকো বরল, মন বদলাল। এখন ওকে আর ছেলেটাকে যে কষ্ট দিচ্ছে মহেশ ! এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে। মায়ের আদালতে বিচার শুনা। আমি নাম চাই না, মানুষের সেবা করতে চাই.....ভাবছি কালীতলায় বাঁধানো কলতলা করে দেব।

ভাদ্র মাসে তার কালীর পুজো হবে। দোকানপাট ছেঁকে ওঠে। নয়ন এ সময়ে কালীতলায় বড় ব্যস্ত। মনটা কেবলই ওদিক পানে যায়। অবরও ব্যস্ত, মহা ব্যস্ত।

এমন সময়ে মা কি বোঝেন কে জানে। তাঁর আদালতে বিচার হয়ে যায়। বিশাল প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতে দিতে ব্যস্ত অবর নয়নকে বলে, ঘর থেকে দেখলাম তোর মা আসে নি। বাপের শাস কাটতে গেছে এমন বিলম্ব তো সে করে না। আজ বাবু ভাত দিল, ভাত নিয়ে গেলাম ! একবার যা তো বাপ। ঘুরে একবার দেখ।

—বাবু যে বলল, চাকরীদের কি লাগবে দেখতে···

—যা যা···বুড়ো মানুষ...তোর মুখ চেয়েই খাটে

নয়ন ছুটে ছুটে যায়।

কালের আদালতে উলটো বিচার হয়ে যায়। চারটি মাস পীড়া করা,

খাউলিটি হাতে ধরে চুনী উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওপর হাতে বোতল খেলে হাসপাতালে নিলেও মানুষ বাঁচে না।

তবু অবর বাবুর ব্যাগাতা করে। গাড়ি দাও বাবু, গোপালগঞ্জে নিই। সেখানে হাসপাতাল আছে।

পরম অভিজ্ঞ মনোহর চুনীকে উলটে দেয়। বলে, কোন সকালে কেটেছে, কখন হয়ে গেছে তার ঠিক কি? তুমি শালা বউকে সাতসকালে পাঠিয়ে বিকেলে খোঁজ নিতে লেগেছ? কেমন আক্কেল।

—বুঁচু বেঁচে আছে।

বড় উতলা হয় অবর বড় আছাড়ি পিছাড়ি করে। মনোহর আজকাল পকেটে আশি রাখে ও চিরুনি। বর্তমানে সে লম্বা চুল রাখছে এবং ফুল-ছাপা লুঙ্গি পরছে। আশি ধরে সে চুনীর নাকের কাছে।

—দেখ, থামছে না আশি।

অবর ওর ওপরেই রুখে ওঠে, আমার বউ বেঁচে আছে, কি মরে গেছে তাও তুমি বলে দেবে? তুমি বলার কে? কালীতলার বাড়বাড়ন্ত, তুমিও ফুলে ফেঁপে উঠেছ, নয়? আমার ছেলে হতে সবার সব···তাকে হাসপাতালে নেওয়া তাও তুমি হতে দেবে না?

মহেশের ওপর ক্রোধবশে যে কথাগুলি মনে জমে, তা অবর মনোহরকেই বলে। শোকে তাপে মানুষের এমন বুদ্ধি হয়ে যায় বটে।

মনোহরের কাছে মৃত্যু ও মৃতদেহ জীবিকার উপায় মাত্র। সে বিশেষ বিচলিত হয় না কখনো। এবং নিরক্ষর কালী মার্কা ও গাঁজা প্রসাদাৎ তার মাথাও বহুকাল আজন্ন। সে বলে, ভাব বুঝে বললাম।

কিছু লোক তবু জমে। আশি অবরের গায়ে হাত দেয়। বলে, চলো বৈরেগী। আগে তাকে ঘরের ওঠোনে নাও। তারপর, বাবু না দিলে কি গাড়ি ছুটবে না, না নেবার মানুষ পাবে না?

—ঘরের উঠোনে নেব?

—হ্যাঁ, মাচাং চাই।

মাচাং আসে। অবরের আছাড়ি পিছাড়িতে পাঁচ মাথা এক হয়ে চুনীকে গোপালগঞ্জে নেয়। অবর চুনীর গায়ে হাত রেখে চলে ও মনে মনে কত কথা বলে।

—এখন আমার বুক খালি, আমাকে ছেড়ে যাস না চুনী। মন্দ তো আমি ছিলাম, তোকে তো কেউ কোনো দিন মন্দ বলতে পারেনি চুনী।

কোনোদিন তোর দিকে চাই নি, তুই চিরকাল খেটে খেটে···

হঠাৎ সে বলে, বাদায় চিরকাল যায়, বাঘা এমন শত্রুতা হল ?

জল, বাদা, ঘাস, এরা কোনো শত্রুতা বা বন্ধুতা করে না। সে কথা কেউ অধরকে বলে না। মাসি নয়নের হাত চেপে ধরে চলে ও বলে, বলুক। বলে হালকা হোক।

গোপালগঞ্জেও ডাক্তার বলে, এ তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পরিষ্কার কাপড় কেটেছে

—এনেছে যখন, তখন লিখে দেন বাবু।

—লিখে দেব ?

ডাক্তার লিখে দেয়, নাম চুনী দাসী, হিন্দু রমণী·····

মৃতাবস্থায় আনীত ·····সর্পদংশন···

আবার ওরা গ্রামে ফেরে। মাসি বলে, কপালে ছিল মহাশ্মশান !

—না।

—জ্বালাবি না ? এখন তো জ্বালায়।

—না। ওখানে নয়।

—তবে ?

—খাল যেয়ে বেহুলায় পড়েছে, বেহুলা বেয়ে গঙ্গায়···ভাসিয়ে দেব। একখানা কাপড় কিনে নিই।

নতুন কাপড় পরানো যায় না ছেঁড়া দিতে হয় দেহে। সিঁদুর, আলতা। বৃষ্টি, বৃষ্টি, ভাদ্রের বৃষ্টি। পরদিন বেলা হয়ে যায় অনেক। বলার ভেলাটি ঠেলে দেয় অধর ও নয়ন। ভিজতে ভিজতে ওরা ঘরে ফেরে। অধর নয়নকে কাছে নিয়ে ঘরে বসে। বসেই থাকে।

এ শুধু ভাসাভাসি। এক আষাঢ়ে নয়ন ভেসে এসেছিল, এক ভাদ্রে চুনী ভেসে যায়। বান নেই, বন্যা নেই, এ কেমন ভাসাভাসি ?

—নয়ন !

—বাবা !

—কাছে আয় বাপ !

নয়ন কাছে আসে।

—খিদে লেগেছে বাপ ?

—না ! মা···

নয়ন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সবই জানে সে। গ্রামবাসীর কাছে বহু

কথা শুনেছে। এরা তার বাপ মা নয়। অধর ছিল চোর। এক আষাঢ়ের বিলে নয়ন ডিঙি নৌকোয় ভেসে এসেছিল। কিন্তু নয়ন তো অত মা, অত বাপ জানে না। না, মা তাকে নিয়ে আদর করত না, আহ্লাদ দিত না। বড় ব্যস্ত থাকত সে। নয়নের কোনো শৈশবও ছিল না। কবে থেকেই তো সে বাবুর বাড়িতে। তবু ভালো কাঁথাটি মা তাকেই পেতে দিত, কদমা কিনে কৌটোয় রেখে দিত। এখন এ ঘরে তারা আছে, মা নেই, নয়ন হাতে মুখ ঢাকে।

—দাঁড়া লক্ষ্মটা জ্বালি।

লক্ষ জেলে অধর বিড়ি ধরায়। বলে, মুড়ি খা দেখি, এক গাল মুড়ি খা, জল খা। এইখানে শো' তুই। আমি আছি, তুই ভাবিস কেন?

নয়ন শুয়ে পড়ে। অধর বসে থাকে।

পরদিন সকালে ভিজতে ভিজতে আসে মাসি। বলে, এই কলা কয়টা ···আর চালের ক্ষুদ ছিল ঘরে···

—রেখে যাও মাসি।

—মহেশ বাবুর ঠেঁতে গিয়েছিলাম।

—অ!

—বলে, এখন ওদের অশুচ। যেন না আসে। মানে কাজে না আসে···

—বেশ তো!

—দেখলাম তোমার জন্তে বসে আছে।

—কি রকম?

—এমন হয়ে গেল···সাহায্য করবে···তা নয়ন যেয়ে দাঁড়ালেই সাহায্য হবে।

—বেশ তো।

অমন ভোমা মেরে থেকো না অধর। যা হল, তা তো হলই। যাকে বলে অপঘাত হয়ে গেল। তিনদিনে কাজটা করতে হয়···

—সেই তো।

মাসি গভীর দুঃখে মাথা নেড়ে চলে যায়। কেমন হয়ে গেল মানুষটা!

অধর ঢাকের শব্দ শোনে। বৃষ্টির শব্দে ঢাকের শব্দ ক্ষীণ। অতি ক্ষীণ। বাবু ভাবছে, অধর ছেলে নিয়ে এল বলে। চিরকাল এসেছে, আজ কি আর না আসবে?

অধর নয়নকে নিয়ে স্নান করে আসে জল ধরলে। চালে ক্ষুদে কেনা

ভাত রাঁধে। বাপ ছেলেতে খায় ও'র বলে,

—ভাত এনেছিলাম, বাবুদের গামলাটা···

—ফেরত নিয়ে যা।

—না না। তুই যাস না। মাসিকে দিয়ে আয়। বলবি বাবা বলেছে বাবুদের পৌঁছে দিতে।

—ঘরে চলে আসব বাবা?

—হ্যাঁ বাপ। আমার কাছে থাকো।

মহেশ সামন্ত অত্যন্ত অবাক হয়। সর্বাবস্থায় যে সাহায্য চায়, সে এখন সময়ে এল না? এটিকে তার "আস্পর্ধা" বলেই মনে হয়, কিন্তু বউ বিরক্ত হয়ে বলে, শোকতাপা হয়ে আছে, তাতে আসে নি।

—গামলা কে দিয়ে গেল?

—মাসি।

—নয়ন এল না?

—জানি না বাবু অত কথা।

—মাগুড়া ছেলে···কাছা নেবে···আসবে···

শ্মশানবাসী সর্বদা এখন ত্বরীয় মার্গে থাকে। কোন্ কথাটা কার বুকে কেমন লাগবে, সে সব ও ভাবে না। কেন না নিজেকে সে মনে করে সাধক, এবং অন্যদের মনে করে সংসারের কাদায় কিলবিল করা পোকা। সে ঈষৎ হাসে ও বলে, এলে তুমি কি তাকে রান্না করে দিতে? যদ্দিন এল গেল, গো-ঠকান্ ঠকালে, এখন হামলাচ্ছ?

—তুমি বোঝ না।

—এই যে তোমার বাড়বাড়ন্ত, এর মূলে কে? অধর নৌকো ধরল, ছেলে আনল, আমার কাছে বিধান নিতে এল···তুমি ভুলতে পার, আমি ভুলি নি।

মনোহর হ হ করে হেসে বলে, তুমি যা তাকে কি করেছ ঠাকুর? মাহের নামে কাপড় পড়ছে, দোকানে কেঁকে দিচ্ছে, একখানা দিয়েছ?

—ওরে! সাধু দেয় না, সংসারী দেয়।

—ধুর বাবু! গরীবকে কেউ দেয় না। অধর বেটার বুদ্ধির নেই। থাকলে সনাতন বেরার কাছে যেত।

—কেন? সেখানে কেন?

মহেশ ফুঁসে ওঠে।

—তোমার যেমন হয়েছে, তারও তেমন বাড়বাড়ন্ত হত।

—তা তোমার তো খাটি ভোঁ ভাঁ। তুমিও শালা পাঁঠার মাথা মারছ। তুমি গিয়ে একবার তার খবরটা, উঠোনে না ওঠো, হেঁকেও তো জিগ্যেস করতে পারতে?

তুমি বা কোন মন্দটা আছ?

মনোহর পরম গাম্ভীর্যে বলে, তাদের অশুচ, তাতে তাদের যেমন আসতে নেই, শ্মশানের ডোম বা সেবা যাবে কেন? কখনো যায়? জীয়ন্তে মনোহরও কারো নয়, কেউ মনোহরেরও নয়। মরলে পরে, হ্যাঁ!

এসব কথাবার্তা মহেশকে বড় বিবশ করে ফেলে। ভাদ্র কালীর পুজো হল। দোকানপাট জেঁকে উঠছে। থানা বাবু, বি. ডি. ও. অন্তত দুটি বড় রাজনৈতিক দলের অঞ্চল নেতা, গোপালগঞ্জের দু'জন "বিজনেস ম্যান", সবাইয়ের আতিথ্য ভার তারই ওপরে। এক ব্যবসায়ী তো প্রচুর ধুমধামে পুজো দিতেই আসছে।

অথচ মনে হয়, অধরকে, নয়নকে, তার আরো দেখা উচিত ছিল বোধহয়! কি ভাবে, তাও মহেশ জানে না। কেননা সে এতদিন নিজেকে বিবেচক ও দয়ালু বলেই জানত। নিজের মনেই ও প্রশ্ন ও উত্তর চালায় কিছুক্ষণ।

—আমি না হলে কে চোরকে কাজ দিত?

—সেই থেকে অধর চুরি করে নি।

—বাপ ছেলে দুজনকে রেখেছি।

—একজনার ভাতে দুটো মানুষ পেয়েছ।

—ঘর মেরামত করতে বাঁশ খড়···

—মূল্য ধরে নিয়ে দেনদার করে রেখেছ···

—চুনী মরে গেল জানছি বলে গাড়ি দিইনি···

—দিতে পারতে।

মহেশের কাছে এসব অভিজ্ঞতাও খুবই নতুন। নিজের মনে নিজের কারণ বিষয়ে প্রশ্নোদয়, খুব নতুন। ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। চিন্তার অভ্যাস নাই। চিন্তা করতে গিয়েই সে ক্লান্ত হয়। এবং যেহেতু সে প্রাচীন সংস্কারে অন্ধ, সেহেতু মনে হয়, নয়ন ও অধর কোনো না কোনো ভাবে তার কালীতলা সাম্রাজ্যের পিছনে স্থপতি।

এমন চিন্তা যে ভিত্তিহীন, তা সে ভাবতে পারে না। বুঝতেও পারে

না। তার শুধু মনে হয়, ওদের কেন্দ্র করে সনাতন বেরা সম্ভবত তাকে নৌকা দেবে।

সে বলে, ছুতোরি শালা! সে হারামী এসে বসুক কেন?

তাকে বাস্তু আমি ছেড়ে দোব।

এ কথাটি বলেই তার নিজেকে মহীয়ান ও উদার মনে হয়। সে বলে, দেখি! ঘরে এখন অনেক কাজ। যতজন লোক, তত বিছানা রে, মশারি রে!

সনাতন বেরাও কানাকানিতে খবর পায়। সে পঞ্চায়েত সদস্যকে বলে, পরমন্ত, না অলক্ষুণে, ওসব বুঝি না। আমি বুঝি মানুষ। ওই যে মহেশ সামন্ত গ্রামে বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে আর অন্যায় করছে···একজনের ভাতে মুড়িতে দুটো লোককে খাটায়···ভিন্ন গ্রাম হোক! এক অঞ্চল তো বটে। এসব আমি করতেও পারব না, বরদাস্তও করা কঠিন। তোমরা বলবে নামী-দামী লোক···কিন্তু ঠাকুর ভাঙিয়ে ব্যবসা করা কি সৎ কাজ?

না, মোটেই না, তা সদস্যটি মানে। কিন্তু সে বলে, কাশ্মীর বলে দেশ আছে জানো?

—খুব জানি। আমার শালা গিয়েছিল।

—সেথা ট্যুরিস্ যাচ্ছে বলে দেশে আয় হয়।

—মহেশের কথায় সে কথা কেন?

—কালীতলায় মানুষ আসছে ফলে গ্রামের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া বৃথা। তুমি নিজের অর্থনীতি ছাড়া কিছুই বোঝ না।

—আমার? অর্থনীতি? দেখ! গাল দিও না। অর্থনীতি মানে কি? ওসব কথার মানে বুঝি না বলে বোকা বোকাচ্ছ?

—"অর্থনীতি" মানে গালাগাল?

—নয় তো কি? লম্বা কথা শুনতে হয়, স্কুলের সারদের কাছে শুনব। তুমি! তুমি তো নাইনেও ওঠোনি। জানিনা না কি? আমি তোমাদের মতো শুকনো কথায় মানুষ বিদেয় করি না। আসুক অবর ছেলেকে নিয়ে তাকে ভাত-কাপড়ে পুষব। আমার নাম সনাতন বেরা।

অবর এত কথা জানতেও পারে না। দু'দিন সে নীরবে ঘরে বসে ভাবে আর ভাবে। তারপর তিনদিনের দিন নয়নকে খুব ভোরে ঠেলে তোলে।

—নয়ন! চল্ বাবা।

—কোথা যাব যাবা ?

—চল্, হেঁটে যেয়ে রেলগাড়িতে তো চাপি। তারপর যেবা হয় সেথা যাব। নয় কলকাতা যাব।

—মার কাজ করবে না ?

ধুর বোকা! সে দেহ নিয়ে গঙ্গায় গেছে। পাপীতাপী না কি, যে কাজ হবে ? নয়ন মেনে নেয়। অধরের কথা মেনে নেয়া তার অনেক দিনের অভ্যাস।

—কাঁধাটা···কাপড় চোপড়···লক্ষটা···চল্ নয়ন।

আজ রাতে পুজো। ঢাক বাজুনীরা ভোর বেকেই ঢাকে তালিম দিচ্ছে। ঢাক গুড়াগুড়, টাকুর টাকুর শব্দ। অধর ও নয়ন হাঁটতে শুরু করে। নয়ন ভেসে এসেছিল, চুনী ভেসে গেছে। অধর সস্নেহে বলে, বানবন্তের ঘর ভাসলে মানুষ অন্তত যায় না ?

—যায় তো।

—মনে কর, আমরা তেমনি যাচ্ছি। ভাসতে ভাসতে কলকাতা।

চলতে চলতে অধরের মনে হয় পারবে সে, ঠিক পারবে। কত লোক কত ভাবে করে খাচ্ছে, সে কেন পারবে না ? কলকাতা খুব বড় জায়গা, জানলি নয়ন ? তুইও দেখেছিস ছোট বয়সে। মাসি নিতা যায়, সে কোনো ধান্দা করে দিতে পারে। সেথা ধাপার মাঠে জঞ্জাল টুকেরেও কতজনা করে খাচ্ছে, জানলি ?

মনে মনে ও ছেলের সঙ্গে কথা বলে। অনেক কথা বলে।

বলতে বলতে গোপালগঞ্জেও পৌঁছে যায়। তারপর স্টেশন। ট্রেন এখনি ছাড়বে। ওরা উঠে বসে।

(কলেজ স্ট্রীট / পূজা / ১৩৯১)

মানত

মহাশ্বেতা দেবী

সদামণি বলেছিল, মানত কর্ অনুর মা! সকল চেষ্টা তো করে দেখলি। এখন মানত মানসা কর্। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, অনু তোর একটা। কেমন অসুখ ডাক্তার তো ধরতে পারছে না।

—মানত করলে সেরে যাবে?

—করেই দেখ।

—মানত তো ওর বাপের বেলাও করেছিলাম।

—মনে বিশ্বাস নিয়ে করোনি বাছা

—কে বললে? মনে যদি বিশ্বাস নাই থাকবে, তাহলে অমন হতভাগার জন্যে কেউ মানত করে?

—এই দেখ! ছেলে শুনছে, তুমি স্বামীকে হতভাগা বলছ। মরা মানুষকে গাল দেয় কেউ?

—ভালো কথা তো ভাবতে চাই। মনে আসে না। চিরকাল নেশা ভাং করে বেড়াল। লাইট মিস্তিরির কাজ জানত, কখনো একটা পয়সা দেখাল না! কি খেটে খেটে ছেলে নিয়ে···শেষে মরণকালে ঘাড়ে এসে চাপল!

সে কথা সবাই জানে। গোলক দাসের মৃত্যুর কথা বস্তির মানুষ না জানলে কে জানবে। তাদের হাত পা ধরেই দোইখোই করেছিল অনুর মা। তারাই তো বলতে গেলে গাঁট খরচার গোলককে দাহ করে আসে। শ্রাদ্ধ-শান্তিও করিয়ে দেয় কার্তিক ঘাটে।

হ্যাঁ, মানুষটা ভাল ছিল না। কামাত, উড়িয়ে দিত, বউ ছেলেকে দেখত না। তা বলে···

সদামণি বলে, তাকে মন্দ বলে এখন কি হবে বলো বাছা? করেছ, স্বীকার করি। তা নিজের স্বামীর জন্যে করেছ। সে আর এমন কি কথা? এ তো কর্তব্য।

অনুর মা ক্লান্ত গলায় বলে। হ্যাঁ মাসি! তবে কথা কি, আমার কর্তব্য আমি করলাম। তার কর্তব্য কি সে করেছিল? বাবা তো আমাকে

যা হোক এক ভরি সোনা, পাঁচ ভরি রুপো দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। সবই তো···

—আমরা কিছু দেখিনি বাছা।

—তার আগেই তো সব নিয়ে ওর বাপ···

—এখন বলছি, সামনে জাগ্রত ঠাকুর। যে যা মানসা করছে সব হচ্ছে। সেখানে যাও।

—ডাক্তার তো এলে দেয়নি এখনো।

—ভাল করতে তো পারছে না।

—তাহলে যাব ?

কতবার বলব ? যাও, জোড়া পাঁঠা মনসা কর, মনোতুষ্টি পুজো দেবে বলো···

—কোত্থেকে, মাসি ?

—ধার করেও মানসা দিতে হয়।

—ধার আর কত দেবে মনিববাড়ি ! ছেলেটাকে কমলালেবু, ডাব, তাই দিতে পারিনি।

—ওগো ! বিশ্বাস রাখো। বলো, মনোতুষ্টি করে পুজো দেব তোমার, অসুকে ফিরিয়ে দাও।

—দেখি ! ছোনেকে বলি।

বর্তমান সময়ে মধ্যবর্তী বা দালাল না ধরলে থানা, দেবালয় বা শ্মশানে পৌঁছনো যায় না। পথের মোড়ে শীতলা আছেন। সিমেন্টের শীতলা, সিমেন্টের গাধা। দেবী ও বাহনের পিতলের চোখ, দেবীর হাতের ঝাঁটাটি পিতলের। দেবী রোলেক্স, নাইলন, নানা রেলা পরেন। কোনো ভক্ত বাহনের চারপায়ে রুপোর তোড়া পরিয়ে দিয়েছে। পুজো পেয়ে তুষ্ট হলে বা দীর্ঘকাল পুজো না পেয়ে অসন্তুষ্ট হলে দেবী বাহনের পিঠে ঝাঁটা মারেন ও গাধা তোড়া বাজিয়ে নাচে। ছোনে ও সেবায়েত ছাড়া কেউ শোনে না।

ছোনে একদা মনা রায়ের পেয়ারের আদমি ছিল। সে সময়ে তার বড়ই রেলা ও রং ছিল। চেম্বার ফোটাতে ও সিদ্ধহস্ত ছিল এবং মনা রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহুজনের খোমা বদলে যাবার মূলে ছোনের বাঁ হাতের ঘুষি।

মনা রায় নির্বোধের মতো উঠ্‌তি ছুটকুদের হাতে ফুটে যাবার পর ছোনে ভালো হয়ে গেছে। এই ভালো হবার মূলে অবশ্য উঠ্‌তি ছুটুক বা চারাপোনারা।

তারা গম্ভীর সততায় বলেছিল, ছোনেদা, আমাদের একটু গাইডেন্স দেবে ?

ছোনে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বলেছিল, না রে ! আমি আর লাইনে থাকব না।

—লাইন ছেড়ে দেবে ? এখন তো···

—হুম্‌মা। এমন সুদিন আর পাব না তা জানি। কিন্তু মনটা বোরেগী হতে চাইছে।

—বোরেগী হবে ?

—মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাকব।

—তুমি কান্না নিইছিলে !

—ওরে ! মনাদা ছিল হতভাগা। যার জন্যে কেও চোখের জল ফেলে না, সে কেমন হতভাগা তাই বল্। তাতেই কান্না নিইছি। এখন তোরা যদি চাস্, আমাকেও···

—ছি ছি, এ কি বললে ?

—অতুচ অবস্থায় মনাদার দেয়া চেম্বার ছুঁয়ে বলেছি, লাইনে থাকব না একেবারে।

—বেশ ছোনেদা।

—তোরাও যেন মাকে পুজো দিতে ভুলিস না। মনাদা তো সেদিনে পেন্নামটা ঠুকতেও ভুলে গিছল।

—আমরা এবারে ঠাকুরকে, দেখ না···যাত্রা কিই করব। তোমার আশীর্বাদ থাকলে পেতলের ঠাকুর দেখে যাবে, পেতলের বাহন।

—এই মনটা বজায় রাখিস।

ছোনে কার্তিকঘাটে মনা রায়ের শ্রাদ্ধ তো করলই। তারপর সকলকে চমকিত করে মন্দিরের চাতালে ফলক বাঁধাল।

"মোনোমোহন রায় তোমারে ভুলীব না।" শ্বেতপাথরের ফলক, তাতে পেতলের চাকতি বসানো।

বন্যার দিনে ছোনে ধুমধামে পুজো দিল। লাইনের লোকজন, পাকা রুই থেকে চারাপোনা সকলে তাকে সাধুবাদ দিল। ছোনে বেঁধে বলল, মনাদা স্বর্গে যাবে। টাইম লাগবে বটে। ফলকে লাখো মানুষের পা না পড়লে তো স্বর্গ হয় না।

সেই থেকে ছোনে, ভক্ত ও মানসাধীর এবং শীতলার মধ্যবর্তী এজেন্ট।

সেবায়েত এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। এর ফলে লাইনের ছেলেদের উৎপাত থাকবে না। তারা ছোনে সম্পর্কে এখন উচ্ছ্বসিত। কলজেটা দেখ। সাহসটা দেখ গ্যাঙের লড়ায়ে মনা রায় মরল। সে সময়ে তার জন্যে অশৌচ পালন। না, মনা থাকতে ছোনেকে চেনা যায়নি। ওর মধ্যে একটা সম্ভ্রমী ছিল।

এ কথাটি এমন ছড়ায়, যে থানাবাবুও বিশেষ প্রভাবিত হন। ছোনে একটি বিশেষ পুজোয় তাঁকে ডাকতে গেলে, সে দরজায় দাঁড়াতেই তিনি বলে ফেলেন। এ যে মেয়ে ডুয়ার্সের খাড়া এক যোগী!

ছোনে মধুর হাসে। এখন তার চুল লম্বা। বিনাস্ত গোঁফদাড়ি, পরনে গেরুয়া টেরি লুঙ্গি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, গলায় রুদ্রাক্ষ।

এই ছোনের কাছেই যায় অনুর মা। ছোনে সকাল থেকেই চাতালের পাশে বটগাছের নিচে চেয়ারে বসে। গোলকের সঙ্গে একই ঠেকে সে অনেক নেশা করেছে এক সময়ে। সকল নেশার আড্ডা, জুয়ার চক, সবই মনা রায়ের ছিল। তবে হ্যাঁ, ছোনে এখন সব ছেড়েছে। শুধু টাবলেটটি। টাবলেট মনকে বড় তুরীয় মার্গে রাখে।

—তোমার কাছেই এলাম গো।

—কে, গোলকের বিধবা নয়? এসো মা।

—হে বিপদ বাবা!

আগের মতো "ছোনে" বলা চলে না। ছোনে যদি সবল স্ত্রীলোককে "মা" বলতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও তাকে "বাবা" বলবে। ইস্পাতের হাড়িকাঠ বসানো চাতালে এখন বড়ই মানবিক প্রেমপ্রীতির সুবাতাস। পরিবেশদূষণ সপ্তাহের পোস্টারগুলি ছোনে এলাকায় লাগাতে দেয়নি। পরিবেশই বা কি, দূষণই বা কি! প্রতি এলাকায় কর্পোরেশন উদ্যোগ নিয়ে মাতৃ মন্দির করে দিক। বাতাস শুদ্ধ ও নির্মল হতে বাধ্য।

—কি বিপদ গো, বলো

—ছেলে তো খুব ভুগছে···

—অ। মানসা করবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—করা হয় কি?

—বাবুদের বাড়ি বাড়ি···

—ছেলে কি করে?

—বারো বছর বয়স মোটে···

—পড়ে ?

—যায়, যায়ও না। ওই একটাই !

তা দেখ, মিছে বলব না।

—বলো বাবা।

—যেমন উদ্দেশ্য, মানসাও তেমন করতে হবে। মায়ের সংসারে নিয়ম বাঁধা। নিয়ম টপকাতে যেয়েছ কি মরেছ।

—তা এমন ক্ষেত্রে কি মানসা করব ?

—দেখ ! বিষম সংকটে পড়লে যখন মানসা করবে, সে তুমি মামলার জন্যে করো, বা ভাড়াটে তুলতে করো, বা রোগ সংকটে করো, নিয়ম একই।

—কি নিয়ম বাবা ?

ছোনে দীর্ঘকাল সকালে চারঘণ্টা ও সন্ধ্যায় চারঘণ্টা অনেক ওপরে মহাব্যোমে নক্ষত্রদের কাছে বিরাজ করে। সে সময়ে তার কাছে ঠিকাদার লালবিহারী সিং চন্দেলা, বা বিলিতি মদের ভারতীয় রূপান্তর বিক্রেতা অম্বেজরবাবু, বা মাল রিসিভার পেটো দত্ত, বা অনুর মা, সবাই সমান।

—জোড়া পাঁঠা, আটটা কাপড়, মনোতুষ্টি পুজো, বুক চিরে রক্ত, এই তো !

—সে যে অসাধ্য বাবা !

কিসে ? পাঁঠা আমার ঠেঙে কিনবে, মায়ের নামে দোকান, সেথা কাপড় কিনবে, শীতলা সমবায় ভাণ্ডারে সব পাবে। মাতে, আমাতে, সেবায়েতে সমবায়। জানলে ?

—কত খরচ হবে ?

—চলে যাও ভাণ্ডারে, ছাপা ফর্দ পাবে।

—অত পারব না বাবা। একে হাসপাতালে নিতে···কত কষ্টে ভর্তি করিছি···

—হাসপাতালে ভর্তি করেছ ?

—ডাক্তার যে বললে।

—দেখ মা ! মানসা মানে মনে মনে মানত। তা আমি তো জানি যে সংসারী জীব কাদায় থাকে···

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে যে কাদা থইথই। তাতেই ডাক্তার বললে স্যাঁতা লেগে যাবে। তাতেই হাসপাতালে···

—সে কাদা নয় !

ছোনে গর্জে ওঠে. এ কাদা বিষের কাদা। সংসারী মানুষ, তার মনও কাদামাখা। তাই তার হয়ে আমার মন দিয়ে জেনে নিই, মা কি চাইবে। ছেলের রোগ মুক্তির জন্যে মানসা করবে। তাতে দর কষব ?

—না বাবা ! ঠিকে খেটে খাই·

—হায় রে মূর্খ ! তোমার জন্যে সর্বরোগহরণ পুজো দিতে হবে। তা বাদে তোমাকে "ওঁ ক্রীঁ কং সং সং সঃ হং সঃ" মন্ত্রটি একমাস জপাতে হবে·

—সোয়ামি নয় বাবা ! ছেলে '

—ওই হল। ছেলে ওটি একশো আটবার জপবে আর মন্তরপড়া ঘি একমাস খাবে। শতমঅষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ। মাসৈকং পলমাত্রং সর্বরোগহরণং—এই মন্তর পড়ে দিলে ঘি হবে যাকে বলে অভিমন্ত্রিত। ওই তো ! মনাদাকে যারা কেলাল। সেই খোনা হাবুর জ্বর হতে তার বউ একটি মাস শুদ্ধাচারে থেকে ঘি খাওয়াল। এখন তাকে দেখলে চিনতে পারবে না।

—দেখি বাবা ! চেষ্টায় যাই।

—কর্দ নাও।

শীতলা সমবায় ভাণ্ডার সম্ভবত একমাত্র দোকান, যেখানে অলৌকিক দেবী দুটি লৌকিক মানবের সঙ্গে সমবায় করেছেন। এই কো-অপারেটিভ যেহেতু অলৌকিক পদ্ধতিতে চলে, সেহেতু এ সমবায় রেজিস্ট্রি করা হয়নি, এবং সরকারী নিয়মাবলী মানতেও এ বাধ্য নয়। ব্যাপারটি পাড়ার রাজনীতিক ছেলেপিলে পছন্দ করে না। কিন্তু বর্ষীয়ান নেতা বলেন, ছোনেকেই ডিসিপ্লিন করা যায়নি এতকাল, তার শীতলা ! কোনো ভাবে চামড়া তুলতে দাম বোঝে না। বেটা রাজনীতিক দল ছেড়েছে সেই যথেষ্ট।

—এটাও তো অপসংস্কৃতি, না কি, বলুন !

—পাড়ায় যে ভি. ডি. ও. সেন্টার চালাচ্ছে, সেটা বন্ধ করতে পেরেছ ? অপসংস্কৃতি !

—আমরা আলোচনায় বসছি।

আলোচনায় বসে ওরা বেশি দূর এগোতে পারে না। কেন না ভি. ডি. ও. প্রসঙ্গে মতামত কয়েক ভাগ হয়ে যায়। অবশেষে ওরা তোতলা অমরের পানের দোকানকে বলে,

—দোকানে ভালো ঘড়ি রাখতে পার না ?

শীতলা সমবায় ভাণ্ডার বিষয়ে কিছু করা যায় না। কেন না সিমেন্টের শীতলার এখন জনানুগত্য প্রচুর। নেতা বর্ষীয়ান ও প্রাজ্ঞ। তিনি বলেন, ও কি দৈশনের গায়ে, তাতে যত উড়কো মানুষের এলাকা। এখানে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে কথা কইতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে অঞ্চল খানিক ঠাণ্ডা হয়েছে। এখন তা' ধরালে ছোনে আবার মস্তানি শুরু করবে। ও যদি শীতলার সঙ্গে সমবায় করে তো করুক, মরুক।

শীতলা সমবায় ভাণ্ডারে যায় অনুর মা। গোলাপী পাতলা কাগজে ছাপা কর্ণটি নেয়। পড়তে তো জানে না। আঁচলে বেঁধে নেয়। মানত মানসা যার যেমন সাধ্য তেমন বুঝে করে। কিন্তু মায়ের মতিগতি বড় দুর্বোধ্য।

কে পড়ে দেবে ?

বিকেলের আগে তো হাসপাতালে যেতে পারবে না। শশীবাবুর দয়ার প্রাণ। তাতেই বাঙুরে ফ্রি বেড হয়েছে। একবারটি মনিব বাড়ি যাবে। পুরনো মনিব তবু দয়াধর্ম রাখে। মাইনে চল্লিশ, অথচ তিনবার ঘুরে আসে কাজ করতে, এমনটি আজকাল পাওয়া বিরল। বউদি যদি পড়ে দেয় !

সদামণি বলে, কর্ণ যখন পেয়েছিস, তখন ওখেনেই তোর চিন্তা দূর কর্। মায়ের ওপর ছেড়ে দে।

—আমার তো হাত পা উঠছে না।

—মাথায় তেল জল দে। রাঁধবি না ?

—অনু ঘরে এলে রাঁধব।

—দাঁড়া, স্নান কর।

স্নান করে অনুর মা। বাটিতে মুড়ি নিয়ে জল ঢেলে খায়। সর্বরোগ-হরণ পুজো ? আগে পুজো, পুজোর কালে মানসা মানত ? একটু ঘি একমাস খেলে তবে রোগ সারবে ?

কে জপ করবে ? কে ঘি খাবে ? তনু তো জ্বরের ওষুধ খাচ্ছিল। জ্বর ছাড়ে না। ডাক্তার বলল, ম্যালেরিয়ার সকল লক্ষণ, কিন্তু ওষুধ তো ধরছে না।

তখন নতুন পশার জমানো নতুন ডাক্তার। নতুন ডাক্তার বলল, কত্‌দিন এ ওষুধ খাচ্ছে ?

—সাতদিন হল।

—এ ওষুধ যে পড়ছে, রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল ? ও, তাও হয়নি ? এখন কি আর এ ওষুধের পর অন্য ওষুধ কাজ করবে ? দেখি···

ওষুধ লিখে দিয়েছিল ডাক্তার। তারপর বলেছিল, এই ঘরে এমন রোগী···

—নিচে খড়পালা দিয়ে তারপর বিছানা··

—কান্না তো উঠছে ঘরে।

—ভালো হবে তো বাবু ?

—দেখছি, দেখছি।

নতুন ওষুধ। দামী দামী ক্যাপসুল সব। দু'দিন পড়ল। তাতেও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর কাল ভোর-রাতে অনু বলল, পায়খানায় যাব। কোলে করে তুলবে অনুর মা, অমনি অনু "মা! মাথা তো গেল, বড্ড যন্ত্রণা" বলে সেই যে চলে পড়ল আর তো চোখ মেলে না।

নতুন ডাক্তার দেখে বলল, এখনি হাসপাতালে নাও বাছা। পায়খানা হয়ে গেল ?

—কালো কালো হচ্ছে।

—হুঁ···মেলেনা স্টার্ট করে গেছে···হাসপাতালে নাও।

তারপর সব যেন দুঃস্বপ্ন। সদামণির ভাড়াটে মণি, মদ গাঁজা খাক, মানুষ ভালো। সেই দৌড়য় শশীবাবুর কাছে। শশীবাবুর ভায়ে ওই হাসপাতালেই। মণিই ট্যাক্সি ডেকেছিল। হাসপাতালে গাড়ি ঢুকতে অনুর কষ বেয়ে রক্ত। অনুর মা আর্ত অথচ অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিল, এ যে রক্ত গো!

মণি অনুর দিকে তাকায়নি। বলেছিল, অমন কোর না। ও শুনলে ভয় পাবে।

হাসপাতাল। এমার্জেন্সি। লাল রেডক্রস, কাচের বাক্স। বাতি তখনো জ্বলছে। শশীবাবুর ভায়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ধরে। অনুকে দেখে ডাক্তার মুখ থেকে সকল অভিব্যক্তি সরিয়ে ফেলে। কেমন করে যেন বেড়েও নেয়। শশীবাবুর ভায়েকে বলে। একেবারে শেষ করে তবে হাসপাতালে আনবে আর রোগী টাল খেলে আমাদের পেটাবে। কয়েকদিন আগে আনতে কি হয় ?

—কি হয়েছে ?

—বললে কি বুঝবে ? দাঁড়াও, হাতটা দেখি। রক্ত দিতে হবে।

—বাঁচবে তো বাবু ?

—আমরা চেষ্টা করছি। তবে···

—বাবু ! এই টাকা ক'টা।

—টাকা দিয়ে কি হবে ? যাও, বাইরে যেয়ে বোস। ক'দ্দিন হয়েছে ?

—তা নয় দিন হল···

—যাও।

শশীবাবুর ভাগ্নে বলে, নিচে যেয়ে বোস মাসি। আমি আছি, দেখছি।

অনুর মা ও মণি নিচে বসে থাকে। অনুর মা দেয়ালে হেলান দেয়। মণি গিয়ে দু ভাঁড় চা নিয়ে আসে। বেলা গড়ালে শশীবাবুর ভাগ্নে নেমে আসে। বলে, রক্ত দেয়া হচ্ছে, রক্ত টানছে ভালো। গ্যাসও দিচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও এখন। বিকেলে চারটের পর, জানো তো !

—কেমন দেখলে ?

—রোগ জটিল বটে, তবে চেষ্টা চলছে খুব। এখন তো ভালো আছে। যাও, থেকে বা কি করবে ?

—যাব ?

—যাও।

শশীবাবুর ভাগ্নের চোখে মণি কোনো খবর পড়ে ফেলে। সে অনভ্যস্ত নরম গলায় বলে, বিকেলে তো আসবে। এখন দেরি কোর না।

একজন ডাক্তারকে নেমে আসতে দেখে অনুর মা। এই কি অনুকে দেখছে ? ডাক্তারটিকে জিগ্যেস করা হয় না। মনের মাঝে কি যেন বাজে। শশীবাবুর ভাগ্নে এখানে পুরনো কর্মী ! সে মণিকে বলতে বলতে এগোয়। খুব অসাধ্য হে ! প্রথম দিকে না হোক, এখন ভাইরাস ডেঙ্গু ধরে গেছে। ভেতরে খুব···

গলাটি নিচু রাখতে হয় ! টপ করে ওরা ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ে। চব্বিশ-উনত্রিশ নম্বর ট্রাম আসছে। ওপাশে খাটিয়া, ফুল, দড়িদড়া বিক্রির ব্যবস্থা। অনুর মা তাকায় না।

ঘরে ফিরে অনুর মা বলে, তোমার বার জীবনে শোধ হবে না মণি।

মণি এ কথার উত্তরে বলে, বিকেলে একলা যেতে পারবে ? না, সঙ্গে যেতে হবে।

—পারব।

—সদা মাসিকে নিয়ে যেও। আমি একবার কাপের ঠেকে ঘুরে আসি। নয় খবর নিয়ে আসব।

সদামণি এ সব কাজে সদাই রাজী। সে পরের কাজে পাকা মাথাটি সর্বদা গলায় এবং শর্ত একই, তার কথা অন্তকে দিয়ে মানিয়ে ছাড়ে।

পরদিন সেই অনুর মাকে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে বলল, মানত মানসা করো।

কর্দটি আঁচলে বেঁধে অনুর মা পুরনো মনিব বাড়ি দৌড়য়। গিন্নিমা কন্যালয়ে। বউদিই গিন্নি। অনুর মার দেয়া কর্দ পড়ে সে বলে, এ তো হাজার টাকার কর্দ গো!

—হাজার টাকা!

—তার বেশিই হবে।

—অনুকে তো হাসপাতালে দিয়েছ।

—দিয়েছি।

—কথা বলছে?

—না বউদিদি।

—কর্দ দিয়ে বা কি হবে? মানসিক যে জন্যে করা তা পূর্ণ হলে তবে তো?

—আগে যে একটা কি পুজো দিতে হবে···তা বাদে জপ করবে, মন্তরপড়া ঘি খাবে···রোগ সারলে তবে পুজো। তখন ঐ কর্দ।

—ও, সর্বরোগহরণ পুজো···এও তো তোমার একশো টাকার পুজো। তায় ঘি···

—পায়ে ধরি বউদিদি, ও টাকা তোমার হাতের ময়লা···আমি খেটে শোধ দেব।

—আজ ন'দশ দিন তুমি ঠিকমত আসতেও পারনি। বুঝলাম, ছেলের অসুখ। তা টাকা তো তোমায় ক্ষেপে ক্ষেপে অনেক দিলাম।

—দাও বউদিদি। কেন বা ডাক্তার ডাকতে গেলাম···কেন বা এত-গুলো দিন নষ্ট করলাম···তখন যদি ছেলেকে নিয়ে হতো দিই, তাহলে তো···

—ছেলের অসুখ···হাসপাতালে দিয়েছ···তারা ও সব ঘি খাওয়াতে দেবে কেন? শোনো অনুর মা! হাতে টাকাও নেই, লোকের কথায় নেচে উঠো না।

—হাসপাতাল থেকে নয় নিয়ে আসব।

—তাই কখনো হয় না কি?

—টাকা দাও বউদি।

বউটির পা ধরে কাঁদে অনুর মা। তার মতো হতভাগী কে আছে? অনুর বাপ তো জীবনে দেখেনি। কচি ছেলে নিয়ে কাজ করে খাওয়া! জীবনে ঠাকুর দেবতার কথা ভাবতে সময় পায়নি। সবাই বলছে, তাতে পাপ হয়েছে বিস্তর। তা এখন মন বলছে শীতলাই তোর শেষ ভরসা। সেটুকু করতে না পারলে মন মানে না।

—তুমি ছেলের মা! বুঝে দেখ বউদি। সন্তানের বিপদে তুমি কি আছাড়ি-পিছাড়ি কর না?

"বউদি" বললে কি হবে, তার বয়স সবে তিরিশ। সংকটে, সন্তানের সংকটে সে এতাবধি দু'বার পড়েছে। ছেলেকে ইংরিজি মিডিয়ম স্কুলে ভর্তি করার সংকট এবং মেয়ের স্কুলে যাস না পাবার সংকট। দুটি গাঁইই উতরে গেছে। দুটি সংকট কাটাবার জন্যেই ধরাধরি করতে হয়েছে বিস্তর।

কোনো সময়েই বউটি ওই শীতলা নামক অশিক্ষিতদের দেবতার ওপর ভরসা করেনি। বউটির মা এবং শাশুড়ি দুজনেই একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাপুরুষের ভক্ত। ভি. ডি. ও. ক্যাসেটে আমেরিকায় তাঁর দিনচর্যা দেখা যায়।

তাঁর সব কিছু এত সুন্দর, অভিজাত, আধুনিক।

আর শীতলা! পাঁঠাবলি, কাঁসর ঘণ্টা, অসভ্য বর্বরদের দেবী যাকে বলে। ধর্মের প্রথম শর্তই তো হচ্ছে নির্মল পরিচ্ছন্নতা।

বউটি অত্যন্ত বিরক্ত, অত্যন্ত বিব্রত, একই সঙ্গে অনুর মায়ের জন্যে ভীষণ কাতর হয় ও ভুরু কুঁচকে কুড়ি টাকার একটি নোট ধরিয়ে দেয়।

—আর আর বাড়িতে দেখ।

অনুর মা ঘাড় হেলায়।

—ছেলের কেমন খবর হয়···

অনুর মা ঘাড় হেলায়।

বিকেল তো হ'তে হবে। হাসপাতালে যাবে, না মন্দিরে? মাথার মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুলে পোকা ওড়ে। সব যেন ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন। সবই এলোমেলো। তাতেই অনুর মা ছোনেকে বলে। অনুর নামে সংকল্প করে পুজোটা করিয়ে দাও বাছা। তোমার কর্দমতো মানসা পুজো দেব।

—ঠাকুর তো এখন শয়নে গো !

—তাকে জাগাও !

অনুর মায়ের লালচে চোখ, অস্থির চাহনি, ঝোঁক দিয়ে দিয়ে জোরে জোরে কথা বলা, এ সবে ছোনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়। খানিকটা অভিভূতও। সময়টি বিকেলও নয়, দুপুরও নয়। দ্বিতীয় ট্যাবলেট এখনও খায়নি। প্রভাতী ট্যাবলেটের ঘোর খানিক কেটেছে।

—কর্দ দেখেছ ?

—টাকা মেলেনি।

—সে কি ?

—কুড়ি টাকা এনেছি তা কি মা মানবে না ? সরে যাও ছোনে, আমি হতো দেব, মাথা খুঁড়ব।

ছোনে এর মধ্যে মায়ের মহিমা দেখে সহসা। যে অনুর মা, অর্থাৎ গোলকের বউ, কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলে না। স্বল্পকেশ মাথার ঘোমটা ফেলে না, সে কিসের জোরে সাক্ষাৎ ছোনেকে হেঁকে ডেকে "ছোনে" বলে কথা বলছে ? পুত্রের আরোগ্যলাভের জন্যে কাতর এক জননীকে পুজোর টাকা পুজছে না বলে তাড়িয়ে দিলে তার নিজের ভাবমূর্তিও চোট খেয়ে যায়।

ছোনে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বলে, আলবৎ মানবে মা। ডাকার মতো করে ডাকো, ঘাট থেকে ছেলে ঘুরে আসবে।

সে সেবায়েতকে ডাকে। হইচই তুলে দেয়। কুড়ি টাকার অষ্টভাঁজ নোটটি থালায় ফেলে দেয় অনুর মা। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। অনুকে ভালো করে খাও, ভালো করে পাও, তাকে এনে তোমার কাছে ফেলে দিচ্ছি।

এ কথা বলেই চলে সে ঝিড়ঝিড় করে। এ ক'দিন বলতে গেলে পেটে ভাত নেই। রাতে ঘুম নেই। ডাক্তারের বাড়ি। ওষুধের দোকান। কাঁকে কাঁকে মনিব বাড়ি। আবার নতুন ডাক্তার। আবার ওষুধের দোকান, হাসপাতাল, বউদির বাড়ি। হেঁটে হেঁটে অবসন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর। অনুর মার ঘোর লেগে যায়। তলিয়ে যেতে থাকে সে। আচ্ছন্ন চেতনায় মনে হয়। দেবীকে সে জাগাতে পেরেছে। এখন দেবী পায়ের মল বাজিয়ে তার চারপাশে ঘুরেছে আর ঘুরছে। শরীর কেঁপেঝেঁপে স্থির হয় তার, এলিয়ে যায়। জ্ঞান হারাতে হারাতে অনুর মা যেন "জয় মা !

জয় মা !" ধ্বনি শোনে। কাঁসর ঘণ্টা। বহু দূর থেকে ছোনের মতো গলায় কে যেন বলে। মায়ের নাকি মহিমে নেই ? ভক্তিতে মুক্তি আসে কি না, অবিশ্বাসীরা দেখে যাক !

এমন অবেলা, যখন ট্রেন থেকে ভেণ্ডার নামছে। দোকানী ঝাঁপ ওটাচ্ছে। বাজারিয়ারা সব্জির ঝাঁকার চট সরিয়ে জল ছেটাচ্ছে। ঠিকে ঝি-রা কাজে বেরোচ্ছে। পাণ্ডারারা চোখ রগড়ে সোয়ারি নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, এমন অবেলায়ও ভিড় জমে মন্দিরে। পেতলের থালা উঁচু করে দশ পয়সা, সিকি, টাকা পড়তে থাকে। ছোনে নেচে নেচে কাঁসর বাজায়। আর অনুর মা কোনো গভীর শান্তির স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। মায়ের পায়ে সব চিন্তার বোঝা ফেলে দিলে এমন শান্তি মেলে তা কেন সে আগে জানেনি ?

এ ভাবেই বিকেল হয়। সন্ধ্যা আসে।

অনুর মায়ের ঘোর ভাঙে। চেতনা ফেরে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চায় সে।

তার তফাতে দাঁড়িয়ে এত লোক কেন ? সবাই কেন চুপ করে আছে। চেয়ে আছে তার দিকে ? সে তাকাতেই সবাই কেন চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ?

বাইরে প্রগাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে হ্যাজাক জ্বলছে। তাহলে কারেন্ট নেই। সময় যা কত।

ছোনেকে দেখা যায় না। সেবায়েতকে নয়। অনুর মা আস্তে আস্তে উঠে বসে। সবাই দেবীপ্রতিমার দিকে তাকাচ্ছে। তার দিকেও।

অন্ধকার থেকে আলোকিত চাতালে উঠে আসে সদামণি। স্বভাববাড়া নরম গলায় বলে। হাত ধরো। ওঠো।

—এই উঠি।

—চলো।

—কোথা ?

—ঘরে চলো।

পিছনে দাঁড়িয়ে মণি। আরো কে কে।

—অনু ?

সদামণি ওকে জাপটে ধরে। বলে, মণি তো কখন এসেছে···তুমি বেহোঁশ। নাও, চিনিজলটা খাও। সরো গো বাছারা। আমাদের যেতে দাও।

—কোথায় যাবে ?

মণি বলে, হাসপাতালে।

তারপর প্রবল ক্ষোভে বলে। জ্বর দিয়ে শুরু। তা বাদে কি বলে, কি বলল গো ভায়ে ?

শশীবাবুর ভায়ে নিরুৎসাহ গলায় বলে, হেমারেজিক ডেঙ্গু না কি··· ভেতরে সব রক্তপাত, জানলে ? আমি তো বার বার ওর কাছেই ! তা মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে, পেটে, সর্বত্র সব যাকে বলে হেমারেজ···ডাক্তাররা তো অবাক মেনে গেল যে এতটা জ্বঝল কেমন করে।

মণি বলে। থাক্‌গে সে কথা।

অনুর মা প্রায় ফিসফিস করে বলে। অনু তাহ'লে...কখন ?

সদামণি বলে, সে অনেকক্ষণ

সবগুলি মুখ, চাতাল, হাজাক, হাড়িকাঠ, প্রতিমার স্থির স্থির চোখ, সব ঘুরতে থাকে অনুর মার সামনে। সব ভাঙছে, দুলছে. ঘুরছে, আবার স্থির হচ্ছে, আবার ভাঙছে।

ক্রমে সব আবার স্পষ্ট হয়, স্থির হয়। অনুর মা বোঝে। এতক্ষণে তার মাথা কাজ করে।

কোথায় ভীষণ শক্তি পায় ও। নিজেকে শক্ত করে, বের করে নেয় সদামণির আলিঙ্গন থেকে। তীক্ষ্ণ, তীব্র চীৎকারে সব ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়।

একটি শব্দও মৃত পুত্রের জন্য শোক নয়। প্রতিটি শব্দে দেবী প্রতিমার বিরুদ্ধে আক্রোশ।

—রাক্ষুসী ! পিশাচী ! এই তোমার ক্ষমতা ? ভিক্ষেসিক্ষে করে টাকা আনলাম, হত্যে দিলাম, তুমি এই করলে ? তোমার কাছে পড়ে থাকলাম, হাসপাতালে গেলাম না। বিশ্বাস করে এই করলে ? মরো তুমি মরো, তোমার মন্দির নিপাত যাক !

সবাই হতচকিত, বিমূঢ়। এ সব কথা মানুষ মানুষকে বলে। অনুর মায়েরা কখনো শীতলাদের বলে ? সকলে কোনো সংশয়ে ওর দিকে চায়। প্রতিমার দিকে চায়। ছোনেকে দেখা যায় না। সে ঘণ্টা খানেক আগে। "ছেলে তোর বেঁচে গেল" বলে বড়ই নেচেছিল এবং ঢাকী ঢাকের বোল যেমন তোলে তেমন মুখে বোল দিয়েছিল।

অনুর মায়ের চীৎকারে দৈবী মায়ার পরিবেশটি হারিয়ে যায়। শীর্ণ

শরীর। প্রৌঢ়া এক কি দাপাদাপি করাতে নগ্ন বাস্তব ফিকে আসে। "সবই কপাল" বলে কেউ কেউ। সকলে সরে যেতে থাকে।

সদানন্দ বলে, চুপ চুপ!—কিন্তু অনুর মা থামবে না। শীতলা তার সময় নিয়েছে। মনোযোগ নিয়েছে। টাকা নিয়েছে। সবই সে ছেলের জন্যে রেখেছিল।

ওরা ওকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। মণি অভিজ্ঞ। মণি অনুর মাকে থামতে বলে না। সে জানে। এর পর কান্না আসবে।

—এখন লাশ আনা.. খাটে নেয়া...

মণি হিসেব করে।

—পাঁচ দোয়ে চাইতে হবে, সে অস্ফুটে বলে। ডিকেসিসকে করে কত টাকা প্রণামীর থালায় রেখে অনুর মা হতে দিয়েছিল? থালাটির দিকে ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। কুড়ি টাকার ভাঁজ করা নোটটি দেখা যায় না। থালায় খুচরো পয়সা-সিকি-আধুলির পাহাড়। অনুর মার দাপাদাপিতে শীতলা এখন গর্বিত মহিমা। সেবায়েত মন্দিরের দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। মন্দিরের ভেতরে কোণে বসে ছোনে কপাল মোছে। উঃ! ঠাকুর দেবতা যে এমন ভাবে ফাঁসাবে তা কি সে জানত?

(বিভাব/১৯৮৪)

কুড়োনির বেটা

মহাশ্বেতা দেবী

মায়ের নাম ?

কুড়োনি।

ছেলের নাম ?

ছুড়ন।

ছেলের বাপ কোথা ?

কেউ বলে খাদানে ফেলে দিয়েছে। কেউ বলে কাগজকলের আবর্জনা-বহা পচা নালায়।

তুমি জান না ?

না বাপ। আমি জানি না। আমি জানি না বাপ। তোমার পায়ে ধরি, ছুড়নের বাপের কথা আমাকে শুধিও না।

সে কেমন কথা ?

লধা বউয়ের কথা আর কেমন হবে বাপ ? আর বা কেমন হবে ?

জানি না, আমি জানি না। বলতে বলতে জঙ্গল থেকে বেরোয় কুড়োনি। মাথায় থাকে কাঠের বোঝা। পেটকোঁচড়ে থাকে ভুজা আলু, হাতে খন্তা ও দা।

দা দিয়ে কাঠ কাটি। খন্তা দিয়ে ভুজা আলু খুঁড়ে তুলি। এ ছাড়াও কাঁটা আলু, চুন আলু, পান আলু, চুরকা আলু, যখন যা পাই। বাঁউলা আনব, ঘরে ঘরে বেচব। কেঁদ, ভুরুরু, ভুঁইকুমড়া, বেঁইচি, কুল, সেঁদা কুল, বদা কুল, পিয়াল, আমলকি, যখন যা ফল পাব তা আনব।

বনটাই তো বাঁচায় লধাকে, বনটাই বাঁচায়। যদি বলো, কেন ?

তবে কুড়োনি বলে শোনো।

লধা লোক, বনচণ্ডীর সন্তান। সেই লক্ষ কোটি বছর আগে যখন দেশ-জুড়ে বন ছিল অপার, সেই কালে লধাজাতির আদি পুরুষ বনে যেত।

তার নাম কালকেতু। তার বউয়ের নাম ফুল্লরা। নগরবাসী রাজা চণ্ডীপূজা করে। রোজ চণ্ডী নীল গন্ধরাজের মালা পরেন। চণ্ডী তো কালকেতুর হাতে পূজা চান। কালকেতু তা জানে না। সে শিকার করে।

তার বউ মাংস, ছাল, শিং, পালক, নানা অরণ্যবেসাতি নিয়ে হাটে যায়।

তা সেদিন নগরে হুলস্থুলু। রাজার মালী আতিপিতি যায়, শূন্য সাজি ফেলে দিয়ে কাঁদে। রাজা! নীল গন্ধরাজের গন্ধে বন আমোদ করে, কিন্তু ফুল তো পাই না।

রাজা বলে, কে ফুল আনতে পার, তাকে ধনদৌলত দিব, নানানিধি সামগ্রী—ভাঙা ঘর থাকলে গোটা হবে, শূন্য গোহাল থাকলে পূর্ণ হবে, সকল কিছু দিব।

তা রাজার রাজত্বে তো দিকে দিকে ভাঙা ঘর, শূন্য গোহাল, শূন্য গোলা। মানুষ আবিপিবি যায়। নীল গন্ধরাজ মিলে না। ফুল! তুমি কোথা আছ? বনের মাঝে ফুলের ঝাড়, যে দেখল আমি তার। কেউ তো দেখে না ফুল। আর দেউলে বসে দেবী বনচণ্ডী সে কি আকুলিবিকুলি না করে। আমি হই বনচণ্ডী, কালকেতু বনের ব্যাধ, আমি তার পূজা নিব, সে কেন ফুল আনে না?

আর কালকেতু বনে যায় সাঁ সাঁ করে। বনে কেন আজ হাতি ডাকে না, বাঘ গর্জায় না, হরিণ ছুটে না, ময়ূর নাচে না? তবে কি আজ বনে পশু নাই রে? শিকার করলে মাংস পাব, সে মাংস ফুল্লরা বেচতে যাবে, মাংস বেচলে চাল কিনবে, তবে আমি ভাত খাব।

পশু তো নাই। তবে ওই যে হলুদ গোলাপ, ওই বর্ণগোধা, ঘাসে লুটায় আর আমাকে মিটিমিটি দেখে, ওইটা অলক্ষণ। যাই, বর্ণগোধাটাকে ধরি।

থাক থাক! আগে ফুলের খোঁজ করি। এই দেখ কত নীল গন্ধরাজ। সবুজ গন্ধরাজ। সবুজ বনে নীল গন্ধরাজ জোনাকির আভায় জ্বলে। সুবাসে বাতাস ভারি। ফুল নাই বলে তো দেবীর পূজা হয়নি আজ। কালকেতু সে ফুল পেটকাপড়ের খুঁটা ভরে তোলে। তারপর মন্দিরে দৌড়ায়।

—হেই পূজারী ঠাকুর! ফুল নাও হে। দেবীর পূজা কর। ডাকো রাজাকে। দেখাও কত ফুল কালকেতু এনেছে। ব্যাধ আমি, আমারে কি দিবে রাজা? হাটের বেপারিদের বলে দিক, তারা যেন কালকেতুর কাছ থেকে লক্ষ কাহন কড়ির ছাল, শিং, মধু, মোম, ধুনা কানাকড়িতে আর না কেনে। আমার তো নাই গোহাল, গোলা। সুদামের জিনিস কুদামে বেচি এই ব্যাধের দুঃখ।

—আরে আরে ব্যাধ! দেবীর মন্দিরে উঠিস, সকল অপবিত্র করিস?

পুরোহিত প্রহরীকে ডাকে। প্রহরী কালকেতুকে কোড়া মেরে মন্দির হতে নামায়।

বড় দুঃখে, বড় রাগে কালকেতু এখন ফুল ফেলে দেয়, বনে ধায়। দেবী! বনচণ্ডী! তোর পূজার ফুল নিয়ে যেতে এমন অপমান হলাম। তা তোর বন আজ উজাড় করব। সব পশু মেরে দিব।

হায়! বসে নাই পশু। সেই স্বর্ণগোধা কালকেতুর রোষ দেখে পরম কৌতুকে। তাকেই বেঁধে ছেঁদে নিয়ে যায় কালকেতু।

ফুল্লরা! বউ! চাল চেয়ে আন্। আমি স্নান করতে যাই। আজ গোধার মাংসই খাব।

ফুল্লরা যায়, কালকেতু যায়, দু'জনে দু'দিকে। আর কখন তারা দেখে?

তখন নীল গন্ধরাজের মালা পরে বনচণ্ডী বসে থাকে কালকেতুর ঘরে। বাবা কালকেতু! তুমি ব্যাধনগর বসাও, আমার মন্দির কর।

কালকেতু ও ফুল্লরা করজোড় করে।

এই তো সেই কাহিনী। কালকেতুর কারণে আজও লধা!

জানলি জুড়ন!

শিকারে যাবার কালে গোধা দেখে অলক্ষণ মানে। আর দুর্গাষ্টমীতে বনে যেয়ে যে লধা গোসাপ মারতে পারে, সে হয় কালকেতুর মত মহাবীর।

এ-সব কথাই কুড়োনি বলে। সবই সে জানে। জানবে না কেন বলো? জুড়নের বাপ ছিল গজবলার জাদুকর। লধা ছিল সে। লধাদের ডেকে ডেকে বলত, লধার জীবনে কি কোন ভাল কথা নাই? লধার জীবনে কি শুধুই আঁধার?

—আর কি আছে?

—তবে শুন্।

—বলো।

লধা ঘরে খিয়াসল গ্রামে রাতে জ্বলে না বাতি। কোথা পাবে কেরাচিনি? বড় জোর কুপি জ্বালতে পার। ভাঙা ঘরে বাস, ডোবার জলে কাজ। উঠানে বস না কেন? আগে বল, আজ কী খেয়েছ ভাই? সকলে কী খেয়েছ?

—হাঁ হাঁ, সকাল হতে জঙ্গলে যেয়ে গাঙের লাঠি খেলাম আমি, কাঠ বেচতে যেয়ে বাবুর ছড়া খেল বউ, আর বাগাল খাটে যে ছেলেটা সে আজ

পেল্লায় প্রহার খেল বাবুর ছেলের হাতে। এ ভাবে গুরুভোজন হয়ে গেল আজ।

—ভাই! গুরু ভোজন সবারই চল।

—তবে তো ভাই! লধার আন্দাজে ঠিকই আহার জুটেছে। তাতেই তো বাবুরা বলে, জীব দিয়েছে যিনি আহার দিবে তিনি।

—হাঁ হাঁ, তিনি আমাদের সিজেছেন তো লাথি-লাঠি দায়ের কোপ-খানার গুঁতা-জেলের প্রহার এমন পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে পাঠিয়েছেন।

—বাবুদের বেলা জিভ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি! ভাত রে! মুড়ি রে! মাছ-মাংস-তরকারি, সব দিয়ে পাঠিয়েছেন।

—তাতেই তো বলি ভাই! লধা-জীবনে কী কী কথা আছে জানতে হবে।

—তুমি বল না কেন?

—জুড়নের বাপ বলত কালকেতুর কথা, রাঙাহাড়ি বিষহরচণ্ডীর কথা, কালারুদ্র দেবতার কথা। লধা ঘরে রক্ষিত দেবতা জগন্নাথের কথা।

লধা জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাদের সবই কেড়ে নিয়ে ভোগ করে বহিরাগত সমাজ। তাতেই কালকেতু রাজা গড়েও রাজ্য হারায় আর তার সন্তানদের রেখে যায় বনচণ্ডীর বনের আঁচলে।

লধাজাতির দুর্ভাগ্য যে ব্রাহ্মণ নিয়ে যায় জগন্নাথকে পুরীধামে আর লধারা দেখ আজ! সবার পিছনে।

কুড়োনি ছেলেকে ঘুম পাড়াতে সে-সব কথা শুনত। সবাই বলত, কুড়োনি! তোর স্বামী লোচন দিগারের মত জ্ঞানী-জন লধা ঘরে নাই।

কেমন কথা! কেমন বুদ্ধি!

বাবুরাও বলত, লোচন চুরি-ডাকাতি জানে না, মনিষ-মজুর খাটে। তার তুল্য লধা দেখা যায় না।

সব মনে পড়ে কুড়োনির। যখন সে জঙ্গলে ঢোকে। আর তখন যদি তুম্বা আলু মিলে তো কুড়োনি সেটি পেটকাপড়ে বেঁধে নেয়। তারপর, যদি কেউ কাছে না থাকে, শুধু থাকে কুড়োনি আর বিজুবন, তখন ধীরে, অলক্ষ্যে নীল গন্ধরাজের গন্ধ তার মনের তৃণভূমি ব্যাপ্ত করে। এ-গন্ধ মেঘের মত ঘন ও মমতাময়। নীল গন্ধরাজের গন্ধে মনের চরাচর ছেয়ে বনচণ্ডী আসে।

ঠিক যেন লধা ঘরের সুন্দরী মেয়ে। কুড়োনি তাকে চোখে দেখে না, কিন্তু ঠিক জানে। দেবীর রং মাজা তামার বাসনের মত। কৃষ্ণ চুল উঁচুতে

তুলে একটু বাঁকা ছাঁদে খোঁপায় জড়ানো। গলায় গুঞ্জা মালা। হাতে পলা কাঠির বালা, ডুরে কাপড় গাছকোমর করে বাঁধা, কানে পিতলের মাকড়ি। দেবীর পা-দুটি ধুলোমাখা।

—মা! বনচণ্ডী মা!

—আমি বনচণ্ডী। তুমি কী চাও?

—একবার তাকে দেখতে চাই।

—কাকে?

—জুড়ুনের বাপকে।

—কেন?

—তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না যে!

— থাকতে পার না?

কুড়োনির দুঃখে বনচণ্ডী বুঝি হা হা নিশ্বাস ফেলে কোথায় লুকায়। গাছপালা সরসর, গাছের পাতা ঝরঝর, বনের বাতাস মরমর।

কুড়োনি গাছের গায়ে হেলান দেয়। তেরোতে বিয়ে, ষোলতে মা, বাইশে বিধবা; তাও তো তিন বছর হয়ে গেল।

তবু কেন তার কথা মনে জাগে?

বিয়ের কালে সে গান কারা গেয়েছিল? কুড়োনি ধীরে ধীরে গায়,—

পহাড়ে পর্বতে যামু আলু-তুঙ্গা খামু
যাহার দেখমু খন্তা-কোদাল তাহার সঙ্গে যামু
মারিব শাবলের গুঁতা আলু-তুঙ্গা বার করামু,
আলু-তুঙ্গা খামুরে পাহাড়-পর্বত যামুরে···

এবং সে চলতে থাকে ঘরপানে। বনচণ্ডীকে পিছনে ফেলে রেখে সে ঘরে ফেরে রোজ।

—আজ কী পেলিরে কুড়োনি?

—তুঙ্গা রে দিদি!

—আর বোন! বন আছে তো আমরা আছি।

বন তো গেল।

—বনচণ্ডী ফিরে দেখে না।

—দিদি! বন যায় তো সেও গেল। বন আছে বলে বনচণ্ডী আছে। বন না থাকলে দেবী কোথা থাকবে?

—লধারা কী করবে?

—তা তো জানি না।

কুড়োনি জানে না। বনচণ্ডীর ক্ষমতাতেই কি বিশ্বাস আছে তার? লোচনকে দেবী রাখতে পারেনি। দেবীমাহাত্ম্যের কথাকার লোচন আজ কোথা?

দেবীর বন বা কোথায়? শালগাছগুলির মৃত্যুকাণ্ড হয়ে গেছে। এ দণ্ড মকুব হবার নয়। এখন সব সমাজভিত্তিক বন। ইউক্যালিপটাস। এ বনে মাটি জলে যায়। আটিজঙ্গল, কন্দামূল ফল থাকে না। কুড়োনিরা কোথায় যাবে?

কুড়োনি ঘরে ফেরে। লতাপাতা কাঠকুঠোর জ্বাল জোগাড় রেখে স্নান করতে যায়। লোচন ডোবার জলে স্নান করে গেছে। নতুন পঞ্চায়েতী পুকুর দেখে যায়নি। অঞ্চলের লোধাদের উন্নয়নে কত বছর ধরে নাকি কত টাকা আসে।

লোধারা সে টাকা দেখেনি।

লধারা সে টাকা দেখেনি গো জুড়নের বাপ। বাবুরা দেখেছে।

এবার তবে পুকুর হল।

তবে ভোটের দিন আসছে কি বা?

নতুন পুকুরে স্নান করে কুড়োনি ঘরে আসে। ভাত রাঁধে, শাক রাঁধে।

আর নতুন পুকুরে যখন তারার ছায়া ভাসে, তখন জুড়ন এসে দাঁড়ায়।

—মা!

—ঘরে এলি জুড়ন?

—এলাম রে মা।

—বোস, খেতে দিই।

দু'জনে এক সানকি থেকে ভাত খায়। তারপর ছেলে নিয়ে শোয় কুড়োনি।

—আজ তো মারেনি বাবু?

—না মা।

—চরণ বাবু যে গ্রামে নাই। সে এলে তোকে ছাড়া করাব।

—করাবি?

—হ্যাঁ বাপ।···আজ কি খেলি?

—কেন। ডাল আর ভাত?

—মাছ হয় না ?

—হয় না আবার ! ওরা খেতে পারে না, এত মাছ। আজ পুকুরে জাল দিয়েছিল যে।

—তোকে দিল না ?

—তাই দেয় ?

কুড়োনি জুড়নের গায়ে হাত বুলোয়। কে বলবে দশ বছর হতে চলল। এখনো যেন সাত বছরের ছেলে। কী করবে, পেটে খেতে জোটে না। নইলে চরণবাবু তো এবার খুব হইচই তুলেছিল।

—গ্রামে ইস্কুল তো লবা ছেলেরা যায় না কেন ? এ কেমন কথা ?

সে একটা কথা বটে।

—কী কথা ?

—বাবু ! আমার দিকে চোখ মেলে চেয়ে যদি বলো ভুবন। তোমার ছেলেরা যায় না কেন ? আমি তবে নাচার।

কী বলছ ?

গোলাপী এগিয়ে এসেছিল।

—আমি বলব। এক কথা। আমাদের ছেলেরা চার বছর পড়লেও অ-আ শিখে না। কেন পাঠাব ছেলেদের ? মাস্টার লবা ছেলে দেখলেই বলবে, তোরা যদি পড়বি, তবে বাবুদের বাড়ি বাগালী করবে কে ?

এখন সবাই কলকল করে কথা বলে, সব মেয়েরা। লোধা মেয়েরা বড় সপ্রতিভ।

—আমাদের ছেলেদের দেখলেই বলবে, বাগানে জল দে, কাঠ কেটে দে।

—বলবে, নোঙড়-ঘাঙড় বটে তোরা।

—বলবে। করবি তো চুরি। যা চুরি বিদ্যা শিখ্‌গে যা।

—হাঁ ! লোধা জাতে যারা চুরি করে তারা চুরি করে। খিয়াসলে কে চোর আছে ?

—একে তো ঘরে ভাত নাই, তাতে ছেলেদের বাগালী কাজে রাখলে ঘর হতে ভাত জুটাতে হয় না। তবু তোমার ছড়া খেয়ে কিছু ছেলে পাঠাচ্ছিলাম। তা মাস্টার যদি খুব ছাই করে তবে ছেলেমানুষ তারা, যেতে চাইবে কেন ?

—তারপর বই দাও। খাতা দাও। তবে যে তুমি বললে সব সরকার দিচ্ছে ?

—ছেলেদের নামে জামা এল। তা কোথায় বিক্রি হল তা জান না? তবে যে শুনি লখা চুরি করে। বাবুরা চুরি জানে না?

—কথা বলে লাভ নাই। সাঁওতাল মাস্টার কি লখা মাস্টার দিতে পার না?

এত কথা শুনে চরণ খুবই ফাঁপরে পড়ে। কিন্তু এবার তার হাতে তুরুপের তাস। সেই তাসটি সে বের করে। বলে, একটা কথা।

—বল না।

—আমি কি তোমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করি, তোমাদের ঘেন্না করি?

—না, তা কর না।

—ধরো, আমি যদি মাস্টার হই?

—খিল্লাসলে?

—হাঁ গো।

—তাহলে···

এখন গোলাপী সকলকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তা হলে তুমি আমাদের ছেলেদের বই দেবে, জামা দেবে, দুপুরে খেতে দেবে?

—নিশ্চয়।

—তাহলে ছেলেরা যাবে।

—টাউন থেকে ঘুরে আসি।

—তোমাকে দেবে কেন, তুমি তো পার্টি কর না? তাহলে দেবে কেন?

—সে বুঝা যাবে।

চরণদের পরিবারের লোকজন এ অঞ্চলে জমিজমার ধনী এবং জমিজমা-রক্ষার্থে বহুজনই কয়েক বছর পার্টি করছে। চরণ সেই জোরেই কাজটির ব্যবস্থা পাকা করেছে।

কিন্তু এখনো তো চরণ আসেনি। আর চরণ যখন থাকে না, তেমন এক বন্ধ্যা সময়ে কুড়োনির ছেলে ছুটন একদিন মহাপাত্র বাবুদের বাড়ি গরু-বাগালী কাজে লেগে যায়। বাবু কুড়োনির পেছনে লেগেই ছিল। দে, তোর ছেলেটাকে দে। ঘরের ছেলের মত থাকবে। মাসে তিন টাকা মাইনে, সকালে জলখাই, দুপুরে ভাত, বছরে একটা প্যান্ট, একটা গামছা।

—চরণবাবু এলে ও যে পড়বে বাবু।

—ওরে। চরণের কথা শুনলে উপোসে মরবি। বাগাল চাইলে দশটা পাই। তবে কিনা, লোচনের ছেলে। লোচন আমার ঘরেই খাটত। মা

হল তা তো হয়েই গেল। তবু মনে তো হয় সেজন্যেই বলি।

সে তো চুরি করেনি বাবু। সে তো চাঁদাবিলা গিয়েছিল পিসির বাড়ি। আর শীতের জাড়ে আগুন জ্বালবে বলে তোমার পলার থেকে চারটি খড় নিচ্ছিল। সে তো চুরি করেনি।

—আরে! চোর চোর রব উঠে গেল, আঁধারে ঘরে পিটাচ্ছিল। যে লোচন, তা কি জানি?

—দেখতে পেলাম না বাবু। ঝাড়গ্রামে নিল পুলিশ। তা আর তো ফিরল না।

—সে তো হয়ে গেছে রে।

—জুড়ন কি পারবে?

—পারবে, পারবে। না পারলে তোর চলবে কেন। এই তো, তোর বাস্তু লোচন বেচে গিছে সনাতনের কাছে। আমি বলি, দখল নিও না। সামান্য আড়াইশো টাকা, সে আমি দিয়ে দেব।

—সনাতনের কাছে?

—হাঁ রে! ও টাকা বরং আমি দিয়ে দিলাম। সেটাও তো একটা—যাকে বলে উপকার!

বাবু কথাগুলি যথেষ্ট মোলায়েম গলায় বলেছিল। যেন গরম আটার রুটির ওপর ঘিয়ের পুরু সর বিছিয়ে দিচ্ছে, তাতে চিনি ছড়াচ্ছে। এই মোলায়েম কথার আড়ালে যে হুমকি ছিল, তা কুড়োনি চিনেছিল।

—ভেবে দেখি বাবু।

—তোকেই তো ভাতুয়া রাখতে চেয়েছিলাম!

লোধা মেয়েরা দেখতে ভালো। কুড়োনি বরাবরই সুদর্শনা। এত দুঃখেও ওর চেহারা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। বোঝায় যায় যে খেলে মাখলে চেহারা ঝলমলে হবে। বাবুর ভাতুয়া রাখার প্রস্তাবটি সেজন্যেই।

কুড়োনি সে কথায় আমল দেয়নি। লোচনকে যারা পিটিয়ে মারল, তাদের ঘরে ভাতুয়া থাকবে কুড়োনি? লোচনকে মেরে ফেলেছে শুনে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই তো লোচনকে আর দেখা হয়নি। ঝাড়গ্রামে নিল পুলিশ। লোধা মেরে ফেলার সময়টা যা কিছু চেঁচামেচি আর দাপাদাপি।

তারপর সব খুব সুশৃঙ্খলায় হয়।

পুলিশ আসে, লাশ ঝাড়গ্রামে নেয়, ট্রাকে, জোড়া সাইকেলে মাচাং বেঁধে, গরুর গাড়িতে, অপর লোধাদের কাঁধে, খুব সুশৃঙ্খলা।

ঝাড়গ্রামে চেরাই-ফাড়াই, লাশ কোনো গাড়োয়ার অথবা ঝাড়গ্রাম পেপার মিলের নালায়।

খুব সুশৃঙ্খলা।

তারপরেই খাতাবন্ধ। হবে না কেন বলো? লোধা মরলে কখনো কি খুনীকে কেউ ধরে? লোধা মেরে আসার পর সব স্বাভাবিক কাজকর্ম করা চলে। বাজারে যাও, ক্ষেতে তদারকি করো, ছেলে কোলে করো। প্রতিবেশীকে বলো, এ বছর কি গম বেচতে পারব? মনে তো হচ্ছে না। আমার সোয়েন জমিটায়, বুঝলে···

লোচনের মত চেনাজানা নিরীহ মানুষকে পিটিয়ে মারার পরও তার যুবতী বউকে ভাতুয়া থাকার কথা বলা যায় লোধাদের সব কিছুই তো বাবুদের।

লোধা মরলে তার মা-বউ-বোন ঘরে কাঁদে। বাইরে দেখায় অবিচল মুখ।

কুড়োনির ব্যাপারটি আলাদা। ও এখনো লোচনের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে।

বাবুর ঘর থেকে এসে কুড়োনি গিয়েছিল সনাতন কি সকুর ঘরে।

—তুমি আড়াইশো টাকায় আমার ঘর কবে কিনলে মাঝি?

সনাতনরা এ-গ্রামে মাত্রই তিন ঘর। মহাপাত্র বাবুদের বাড়ি সনাতন মুনিষ। কবে সে কি ধার নিয়েছিল, এবং মুনিষ হয়ে যাবার আগে কীভাবে সে জমি হারায়, কেমন করে মুনিষ খাটতে শুরু করে, কিছুই তার কাছে স্পষ্ট নয়।

এখন কুড়োনির কথা শুনে সে বেদনার্ত, ম্লান ও ম্যালেরিয়া জ্বরে হলদেটে চোখ দুটি তুলে চায়।

—কে, জুড়নের মা?

—হাঁ গো মাঝি।

—কি শুধালে?

কুড়োনি আবার বলে।

—জুড়নের মা! খাতায় তো আমি বর্গাদারও বটে, তবে বর্গা-ভাগ পাই না। ওই কথাটা বাবুর ছল! ধনামে কিনতে পারে না। তাই খাতায় দেখায় আদিবাসী সনাতন আদিবাসী লোচনের জমি নিল। তবে এটা বুঝি ওর ছল! ও তোমার ছেলেকে নেবে,আর তোমাকে কব্জা করবে। হাঁ, তাই হবে।

আর কিছু নয়।

—কেন মাঝি ?

—তুমি যে যুবতী মা! বাবুকে জান না ?

—তার আগে কাটারি দিয়ে তারে কাটব। কেটে নিজের গলায় কোপ দেব।

—আর মা ' বাবুর এখন জোর কত।

সব বুঝে, সব জেনেও কুড়োনি জুড়নকে কাজে দেয়। জুড়ন কেঁদে ফেলেছিল।

—তবে যে বললে আমি পড়ব ?

—চরণ আসুক আগে।

—কেন যাব মা ?

জুড়ন রে! ঘরে ভাত থাকলে কি তোকে যেতে দিই ? বনে যাব, পারমিট আছে, তবুও গাডরা কর্ত তাড়ায়, কত বার জরিমানা করে। তোর বাবা যাবার কালে আমার যৌবনটা নিয়ে যেত, তবে তো এমন জ্বালা থাকত না। এসব কথা তোকে কি বলব ?

কুড়োনি শান্ত গলায় বলে, ঘরে ভাত জোটে না জুড়ন। বাবুর বাড়ি তবু দুই খেতে পাবি। সেইজন্যে ' চরণ এসে পড়লে তোকে আমি ছাড়িয়ে আনব।

—বাবুরা খেতে দেবে ?

—বলেছে তো যা খাবে তাই খাওয়াবে।

এ-কথায় জুড়ন খুবই খুশি হয়েছিল। বাবুরা অনেক রকম জিনিস খায়, আর রোজই খায় পেটপুরে। বাবুরা যা খায়, জুড়ন তা খাবে ? এ সময়ে জুড়নের মনে এক প্রশ্ন জেগেছিল। প্রশ্নটি বড়ই অস্বস্তির কারণ।

কয়েকদিন আগে জুড়নরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। বাবুর বাড়ির মুনিষ সনাতনের নাতি কিরণও ছিল। জুড়নরা জল খাবে, তা কিরণ ওদের নিয়ে গিয়েছিল বাবুর বাড়ির বাগানে। চাপা-কলের জল খাওয়াবে ওদের। চাপা-কলেরই তেষ্টা পেয়েছিল।

বাবুর কাকা ওদের বাগানে ঢুকতে দেয়নি। বলেছিল, এরাও হয়েছে এক ঢঙের, আর তোরাও লাই পেয়ে মাথায় চড়েছিস। বাগানেই চাপাকল বটে, আর এ কল তোরা ধরিস, তাও জানি। আমার সামনে আর সে কাজ করিস না তোরা। নয় জল হোই পুষ্করিণী হতে খা। বাগানে তো

ফুলগাছও আছে, পূজার ফুলও নিই আমি যখন আসি। চোখের সামনে আর লোবা, সাঁওতাল, জল নয় নাই নিল।

বাবু এখন পঞ্চায়েতও করে আর ছুয়াছুতও মানে না। এই না-মানার ব্যাপারটি বাইরের চাপাকল অবধি অনুমোদিত। বাড়ির মধ্যে? ও বাবা!

কেউ কিছু বললে বাবু বলে, আমরা হলাম নতুন দিনের মানুষ। হাঁ! এ রাজ্যে ভেদাভেদ রাখব না। কিন্তু অন্দরে তো মায়েদের রাজত্ব। সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। এ-রাজ্যে আমরা যখন এসেছি তখন কোন ভেদাভেদ রাখব না।

'মায়েদের' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। বাবুর তিন মা, তিনজনই জীবিত। ছোট মা বাবুরই বয়সী। এমন একাধিক বিয়ে এদিকে অনেক দেখা যায়।

বাবুরা আগে সব আদিবাসীকেই হেইছেই করত এবং তাদের ছোঁয়া বাঁচাত। এখনো ছুয়াছুতির কঠোরতা বেশ কঠোর, তবে আগের চেয়ে কম।

ফুড়ন বলে, আমাকে খেতে দেবে, জল দেবে, বাবুরা তা মানবে তো?

কুড়োনি বলে, মানবে।

—তবে আমাকে ছাড়িয়ে আনিস?

—আনব।

এটিও মিথ্যে স্তোকবাক্য নয়। লোচন বলত, আমার তো হল না রে! ছেলেটা যদি ইস্কুলে যায়, যদি পড়ে, তাহলে আমার শান্তি। শালবনী, নারায়ণগড়, ডেবরা, তবু দেখবি তারা পড়ছে কিছু খানিক। আমাদের বেলবাড়ি থানায় চলে না এমন। কেউই পড়ে না। খানিক পড়ে, তারপরে পলায়ন।

কুড়োনি বলত, ঘরে ভাত নাই।

লোচন বলত, তুমি আমি ভাত জোগাব। দেখ্, পড়েশিখে তবে চোখ ফুটে। লখা আতি চোখ থাকতে কানা। নয়তো আমরা এমন ছিলাম না।

—কবে ছিলাম না?

—ওরে, দিকে দিকে দেবদেবতার মন্দিরে লখা-পূজারী কেন আছে? সেদিনে লখারা নিশ্চয় উপরে ছিল। নয়তো দেবদেবতার পূজারী হতে পারত কি?

—কবে হতে সুদিন গেল?

—তা বলতে পারি না। পড়তে জানলে খুঁজেখুঁজে হদিস করতাম। তা, আমার তো হল না। কোমরে ইজের থাকে না, তখন বাগাল, তা বাদে

ভাতুয়া, তা বাদে মুনিষ। লধা বিনা বাবুদের কাজ চলে না আর প্রচার দেয়, লধা কামচোরা।

—যত দেশে চুরি হয়, সব লধা করে?

—লধা পায় কানাকড়ি, মার খেয়ে মরে। লধার ঘর হবে বলে টাকা, লধাদের ছাগল দিয়ে বলে টাকা, লধারে চাষীবাসী করবে বলে টাকা! লধার কপালে কিছু হয় না, বাবুদের দালানকোঠা, দোকানপাট, ক্ষেতখামার হয়।

না, লধা পায় না হে কিন্তু জুড়নের বাপ! যাহার দেখমু খন্তা-কোদাল, তাহার সঙ্গে যামু। লেঙ্গামারা গ্রামে যেতাম মাসির বাড়ি। তারা যে-ডোবায় বাসন মাজে, তাতে গুহর অবধি নামতে ঘেন্না করে।

—পড়বে, জুড়ন পড়বে।

লোচন তো থাকল না। শান্ত, নিরীহ মানুষ, চোখ দুটি হাসিমাখা, তামাটে চুল কোঁকড়া। সেবার ঝমরমে বর্ষা নামতে কুড়োনিকে পাঁজাকোলা করে ঘরে উঠোনে নামিয়ে ভিজিয়েছিল। আর ওই আমগাছটা! থাকুক, জুড়ন আম খাবে। গাছটিতে মুকুল আসেনি এখনো।

লোচন মরে যাবার কয়েক মাস বাদে পড়শিরা, আত্মীয়রা, সবাই বলেছিল, জাতি দেওর পাঁচকড়িকে বিয়ে করে ঘর কর।

কুড়োনি মাথা নেড়েছিল। লোচনের জায়গায় পাঁচকড়ি? কখনো হয়, না হতে পারে?

জুড়নকে অনেক বুঝিয়ে বাবুদের ঘরে দিয়ে এসেছিল কুড়োনি।

এখন, কুড়োনি যখন বনে যায়, দেখতে পায় জুড়ন বাছে গরুর পাল নিয়ে।

কখনও দেখে জুড়ন হাট যায় বাবুর সঙ্গে।

কখন জুড়ন বাস রাস্তায়। পিঠে তার কচুর বোঝা। বাবু হাটবারে দূরে দূরে তরকারি পাঠায়।

দেখে তার বুক কাটে। এমন তো সব লধা-মা দেখে। কুড়োনির বুক কাটে কেন?

বুক তাদেরও কাটে। কিন্তু একবেলা ভাতটা দিতে হয় না এই বিবেচনা করলে মুখ ফোটে না।

এমনি করেই দিন যায় আর একদিন বাবু ডেকে পাঠায় কুড়োনিকে।

—হাঁ রে, জুড়ন টাকা তোকে দেয়?

—আর কাকে দিবে বাবু ?

—সেদিন হাটে লেবেনচুষ কিনছিল ?

—আমি দিয়েছিলাম।

—তাই বল্। হে হে হে···আমি ভাবলাম, চুরিচামারি করে নাই তো। লোচন অবশ্য···তবু লধা তো !

—লধা তো চুরি না করলেও চোর, ডাকাতি না করলেও ডাকাত। তবে সন্দেহ যদি কর বাবু, ওকে ছাড়িয়ে দাও। ওর বাপ তো চোর না হয়েও চোর হয়েছিল। জুড়নকে ডেকে দাও, নিয়ে যাই।

—ওরে, তুই যে ভারি আবুকা। সনাতনকে বলে আমি অত বড় জিনিসটা ঠেকিয়ে রাখলাম, সে টাকার হিসেবই করলাম না, ছেলেকেও টাকা দিই। তা তিন টাকা ও সিক। তুইও গোহাল পাটকাজ করলে দশ টাকা হিসেবে কাটতাম আর টাকাও দু'বছরে শুধে যেত।

কুড়োনি নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। তার চাহনিতে মনের ভাব ধরা পড়ে না। আদিবাসী, তপশীলী, বা যেকোন গরিব যখন গ্রামের ধনী-লোকের দিকে তাকায়, তাদের চাহনি এমনই হয়। ধনীদের কাছে, গরিব লোকদের বিষয়ে সবচেয়ে আপত্তিকর বাস্তবতা হল এই চাহনি। ওরা যে কী ভাবছে তা বোঝা যায় না।

তারপর সে বলে, যাই বাবু।

কুড়োনি কাঠের মত বোঝাটি মাথায় তুলে নেয় ও চলতে থাকে। তার দিকে চেয়ে বাবুর বুক পুড়ে যায়। খেলেমাখলে ওই দেহ কেমন হত। এমন একটা ব্যাপার হাতের কাছেই আছে, অথচ বাবু পাচ্ছে না, এ বড় অবিচার। কেমন করে এর উপায় করা যায় ?

বড়ই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে সব। গ্রামের এসব মেয়ে-বউ বাবুদের ভোগে আর লাগতে চায় না। আছে, এখনো ক'জন আছে। তবে ইচ্ছায় আছে কি ?

সবই খুব গোলমেলে আজকাল।

কুড়োনির ওপর রাগে বাবু জুড়নের ওপর ক্ষেপে ওঠে।

বলে, গরু ছেড়ে দিয়ে গুলি-ডাং খেলবি না। কাজ করতে এসেছিস, না খেলা করতে ?

—খেলাই না তো বাবু।

বাবুর গিন্নি বলে, খেললে তো ভাল ছিল। ওর মতলব তুমি জান না।

কাজ করবে উড়াউড়া আর বড়খোকার পাছে ঘুরবে।

—কেন ?

—বলবে 'অ' কেমন দাদা ? 'আ' কেমন দাদা ? করবে তো চুরি, তা লেখাপড়া না শিখলে কি এখন লধার চুরি-কাজও চলে না ? দিনকাল খুব বেজুত।

—অ্যাঁ ! এই বিদ্যে ধরেছে ?

—হ্যাঁ গো। লধা ছেলে বিদ্যেসাগর হবে।

বাবু এ-কথাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কেননা, এক, জুড়ন তার কাছে আটকা থাকলে কুড়োনিও থাকে ছেলের কারণে আবদ্ধ। দুই, জুড়ন ছোট্ট ছেলে, কিন্তু লোচনের যোগ্য সন্তান। তার কাজের হাত খুবই ভাল। এই বয়সেই সে উঠোন ঝাঁট ও গোবর-ঝাঁটার চমৎকার করে। বাগানের আগাছা তোলে নির্মল ক'রে। তিন, কুড়োনির জুড়নকে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করার মধ্যে কোথাও একটা স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যাপার আছে। এটিতেই বাবুর মুখ্য আপত্তি।

গ্রামের সকল গরিব পড়বে, এসব সরকারী প্রচার মাত্র। ঘরে ভাত নেই, ছেলেরা পড়তে পারবে না। বাগাল হয়ে জীবন শুরু করতেই হবে। তবু যদি কুড়োনিরা জুড়নদের স্কুলে পাঠাতে থাকে, তাহলে বাবুদের দখল নড়ে যায়। দখল এখনো রাখা গেছে। নড়ে গেলে সর্বনাশ। বাবু কখনো সরকারের বিপক্ষে থাকে, এখন তো সমর্থনে আছে। কিন্তু দখল ছাড়া যায় কি ?

গভীর অস্বস্তিতে বাবু জুড়নকে দাঁত খেঁচায়, শালা গরিব দেখে দয়া করলাম, তাতে আমাকেই কলা দেখাবে ? 'অ' কেমন ? শালা তোকে বাঁকিয়ে 'অ' বানিয়ে গাছের ডালে টাঙিয়ে রাখব। চিরকাল কাটল আমাদের এঁটো খেয়ে, নয় আমাদেরটা চুরি করে, আজ আর লেখাপড়া না শিখলে হচ্ছে না। শালা তোদের মত লধা এ-জেলায় বছরে বিশটা কাটা পড়ে। তাতে শিক্ষা হয় না।

জুড়ন অবশ্য ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ বাবু ! এবং নেচে নেচে উঠোনে গোবর ছড়া দেয়। কিন্তু পরে সে সনাতনকে বলে, দাদু ! চুরি করলে লধাদের মারে তা জানি। বাবু বলছে লেখাপড়া শিখলেও মারবে ? তুমি জান কিছু ?

—দূর বেটা ! তোকে ভয় দেখাচ্ছে।

—আমার বাবাতো চুরি করেনি। তবে তাকে চোর বলে মার করলো কেন ?

—লধা হলে জুড়ন···

জুড়ন চুপ করে যায়। লধা হলে···লধা হয়ে জন্মানোটা যে খুব খারাপ, এ জুড়ন আগে ততটা জানেনি। বাবার মৃত্যুর সময়ে জানল। যদিও তখন তার বয়স মাত্রই ছয়, তবু সমাগত জনের কথা শুনে নিমেষে সে বড় হয়ে যায়। তিন বছর হয়ে গেল। তবু সে স্মৃতিতে গভীর অস্বস্তি।

বাবার কথা জুড়নের তত মনে পড়ে না। যদিও চাকা লাগানো একটি রাঙা লাঠি কে যেন তার হাতে দিয়ে বলেছিল, ছেলের জন্যে এনেছি।

বাবার কথা তত মনে পড়ে না। ছয় বছরে পিতৃহারা, এখন তার বয়স নয় হতে যাচ্ছে। এ সময়ে মনটা দ্রুত বদলে যায়। কিন্তু গোলাপী পিসির শুকনো ও বুকফাটা কান্না মনে পড়ে, তবে যে লোচন এত ভাল, অত ভাল, সেই লোচন মরল কেন ? মরল লধা বলে। সকল লধাদের এনে দিই, সকলেরে কেটে ফেল, বাবুরা ! শান্তিতে থাকো। লধাদের আজ একটা, কাল দশটা, পরশু ছয়টা, খেপে খেপে মারতে হবে না। সকলেরে মারো, মেরে শান্তিতে থাকো।

জুড়নকে ওরা টেনে এনে বাবার রক্তাক্ত পায়ে মাথা ছুঁইয়েছিল। আর তো দেখবি না বাপকে, তোর হাতের আগুন তো সে পাবে না।

সনাতন বলে, চরণবাবু এলে তুই পড়া করতে চলে যাস। নয়তো মেরে দিবে।

চড়টা, গুঁতোটা, জুতোহেঁড়া মারটা, এ জুড়ন খায়। মা বলে, সব দুঃখ চলে যাবে বাপ। তুই যখন পড়বি।

—পড়লে দুঃখ যায় ?

—তোর বাপ তো তাই বলত।

—বাবা সব জানত।

—সব জানত। তুইও জানবি। বাবার মুখের কথা শুনতে যেমন লোক এসে বসত, তোর কথা শুনতেও আসবে। এই উঠোন ভরে যাবে।

—তখন আমরা একটা হারিকেন কিনব।

—কিনিস। আমরা তো পারিনি।

তখন হারিকেন জ্বলবে। হয়তো, জুড়ন দাঁড়ালে, মানুষ হলে, ঘরটাও ভাল হবে। জুড়নের বউও হবে একদিন। তবে তার জীবনে, সেই অনাগত

পুত্রবধূর জীবনে যেন সেই গান সত্যি না হয়—

যাহার দেখমু খন্তা-কোদাল তাহার সঙ্গে যামু ॥

খন্তা-কোদাল শাবল নিয়ে একদিন চলত। এখন আর চলে না, চলা সম্ভবও নয়।

মাস্কিব শাবলের গুঁতা আলু-তুঙ্গা বার করামু ॥

সেদিন আর নেই। বন আর থাকছে না। থাকতে দিবে না। যেমন বনে আলু-তুঙ্গা হয়, সেই শাল, পিয়াল, কেঁদ, অর্জুন, সিধা, বহেড়া, আমলকী গাছের সে বন আর রাখছে না। ফরেসের বাবু, জঙ্গল ঠিকাদার বাবু, সব মিলে বন শেষ করছে আর চেঁচাচ্ছে, গ্রামের লোকেরা বন খতম করে দিল।

এখনকার বন মানে ইউক্যালিপটাস। জ্বালানি, দাঁতন, পাতা, ফল, ছাল, ধুনা, কিছু দেয় না। আর জঙ্গলের মাটি যেমন জ্বালিয়ে দেয়।

এখন আর খন্তা-কোদাল হাতে লধা, পিছনে তার বউ, এমন কথা ভেবে লাভ নেই।

জুড়ন বড় হোক। ওদের কালে সব অন্যরকম হবে। বিয়ের সময়ে বিয়ের নিয়মমতো জুড়ন অবশ্য উঠবে এক চালার উপর আর ভয়ের অভিনয় করে বলবে—আমি পড়ে যাব, পড়লে পরে মরেই যাব।

তখন জুড়নের বউ বলবে, তুমি নেমে এস। তুঙ্গা-আলু জোগাড় করে তোমাকে খাওয়াব।

কিন্তু সে হবে নিয়মের নিয়মে। বাস্তবে দেখা যাবে জুড়ন হয়ত চাকরি করছে কি দোকান করছে, তার বউ হাঁসমুরগী পালছে, সংসারটি দেখছে।

এমনই করেই চলতে থাকে দিন। লক্ষ অভাবেও কুড়োনি জুড়নের মাইনের টাকাগুলি টিনের কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে রাখতে ভোলে না।

জুড়নকে অবশ্য সে কথা ও বলে না। ছেলেকে বলে, সবই খরচ হয়ে যায় বাপ। তিনটে তো টাকা।

কিন্তু টাকা ও জমায়। কিছু জমলেই তো সেই আশ্চর্য জিনিস কেনা যাবে, যার নাম হারিকেন। লধা জানে না সঞ্চয় করতে গো। লধা জানে টাকা পেলে খেয়ে উড়াতে। কিন্তু লোচন, তার স্বামী, তাকে সঞ্চয়ের মূল্য শিখিয়েছিল। লোচন বলত, দশটা পয়সা হলেও ফেলে রাখ তুই কৌটোয়। মনে করবি ও-পয়সা নাই।

এমনি করেই চলতে থাকে দিন আর একদিন ভরত কোটাল বলে, শুনেছিস রে কুড়োনি ?

—কি ?

—চরণবাবু আসছে।

—মাষ্টার হয়ে ?

—নিশ্চয়। মাষ্টার তো সে হয়েই গিয়েছিল। শুধু খিরাসল গ্রামে আসবে বলে কাঠখড় পুড়াতে টাউনে গিয়েছিল।

ভালো, খুব ভালো।

হুমহাম করে এসে পড়ে চরণ। ছিচরণ পাটনাইক চাইছিল তার ভাই-পোকে আনতে। কিন্তু চরণ বলে, ওই সব ভুলে যান দাদা। এস. টি. সোকার স্কুল, এস. টি. পড়বে। আপনারা থাকলে তা হতে পাচ্ছে না।

—বটে !

— বটেই বটে।

অসম্ভব হুড়ো মেয়ে চরণ তিড়বিড়ে স্বভাববশে। কেমন করে ভাত ফুটাবে। জানি না। ছেলে পাঠাও, মেয়ে পাঠাও। আমি তোমাদের ছেলেমেয়ে এতজন পড়ছে তা দেখাব. ইস্কুলটা আট ক্লাস অবধি উঠাব, আর পঞ্চাশটা এস টি. দেখাতে পারি তো বন্ডিং করার চেষ্টা করব তখন। লম্বা, সাঁওতাল, তার অভাব তো থাকেই। কিন্তু ছেলেদের পড়তে পাঠাও। নয় তো আমার মুখে চুণকালি।

আর জুড়নের মরিব বলে, পড়বে ? ভালো, ভালো। কে বলল, চরণ ? শেষে চরণের ফাঁদে পড়লি জুড়নের মা ? তোরাদের ছেলে পড়িয়ে ও নাম কিনবে। বেটা পঞ্চায়েতে ঢুকবে, ভোটে দাঁড়াবে।

কুড়োনি কথা বলে না।

— আমার হিসাবটার কি হবে ?

—কিসের হিসাব ?

—তোদের বাস্তর টাকা ?

—আমি তো হিসাব বুঝি না। চরণবাবুকে বলব। সে এসে করে দিবে।

চরণের হিসাব আমি মানি না। তার কাকার সঙ্গে আমার দাদার মামলা ছিল। সে যে-হিসাব দেবে, তা নিশ্চয় উলটাপালটা।

—কোন হিসাব মানবে ?

—নয় তুই কাজ কর্।

—বাগালী করব ?

—পাট গোছাল করবি।

কুড়োনি এত কথার কিছু জবাব দেয় না। ঘরে ফিরে চরণকে শুধাতে যায়, ঘরে পায় না তাকে গোলাপী বলে, সব মিছা কথা। বাস্তু বেচল লোচন আর আমরা জানলাম না। সে টাকা যা কোথা গেল।

—তবে কি করি?

—কি আবার! আগাম তো নিসনি।

—না। বাবুটা সাপের মতো চায়। আগাম নিতে হলেও কথা বলতে হবে তো। নিইনি।

জুড়নকে কাল যেতে দিস না, ব্যাস।

—সে কি ধর্ম হয়?

বাবুর সঙ্গে আবার ধর্ম-আচরণ কিসে? সে তো ধর্ম করে নাই। বাঘ দেখলে কীর্তন গাও আর সাপ দেখলে প্রণাম করো, বাঘ তোমায় ভালবাসবে, না সাপ তোমায় আদর করবে?

—কাল যাক, পরশু হতে যেতে দেব না। কাল চল্ কেন, আমরা পুজা দিয়ে আসি শুশুনিতে।

গোলাপী খুব খুশি হয়। তাই চল্ বোন। কি আছে লখা জীবনে? আনন্দ নাই, আরাম নাই। বেশ সময় থাকতে চলে যাব। পথে কেন্দুসলে বসব খানিক। বোনের বাড়ি জিরাব একটু। শুশুনির ঠাকুরাইন তো আমাদেরি দেবী। লখা পূজারী। এই দেবীকে পূজা না দিলে কাজ হয়?

কুড়োনি জুড়নের টাকাগুলি নিয়েছিল, নিজের কিছু। আজ সে গোপাল মাহাতর দোকানে বারো টাকা জমা রেখে হারিকেন নেবে। বাকি চার টাকা ওই হপ্তায় দেবে। জুড়ন হারিকেন জেলে পড়বে অ-আ-ই-ঈ। প্যান্টটা ছিঁড়াভিড়া, তা ইজের একটা আছে। পুজোর আগে পুরনো জামা-প্যান্ট বেচতে আসে গাঁধিরাম। তার কাছে কিনবে প্যান্ট।

শুশুনিতে ছেলের নামে পুজো দিয়েছিল কুড়োনি, লোচনের শান্তি চেয়েও। হায়! পারলৌকিক সদ্‌গতি তো তার হয়নি। খাড়গ্রামে চেরাফাড়া, সেখানেই ফেলে দিল কোথা। লখা জন্মের অভিশাপ। দেখ, যেখানে থাকো শান্তিতে থাকো। তোমার জুড়ন পড়তে যাবে কাল। তুমি শান্তিতে থাকো। জুড়ন তোমার পড়তে যাবে। তুমি যে বলতে, লখা ছেলে পড়তে না জানলে তার উপায় নেই!

পুজো দিয়ে, হারিকেন কিনে মনটি তার বড় প্রসন্ন হয়েছিল।

কুড়োনি এক লধা বউ, লধা মা। তার মন এক অপার অরণ্য। সেই মনের অরণ্য আঁধারে আজ নীল গন্ধরাজ ফুটে উঠেছিল। সে গন্ধরাজের সুরভি মনকে শান্ত করে।

আর খিরাসলে পা দিতেই গোলাপীর মেয়ে, ঝিরু, শঙ্কর, ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছিল।

—মাসি! কতক্ষণ পুজা দাও, কোথা থাক এতক্ষণ, জুড়নকে বাবু কে মেরে ফেলে।

—জুড়নকে?

হারিকেন ফেলে দেয় কুড়োনি। পুজার প্রসাদ ছিটাছিটা হয়। শঙ্কায় ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত সে ছোটে। বাবু! তুমি আমার স্বামী নিয়েছ, ছেলেও নেবে? কাটারি তুলে তোমারে কাটব বাবু। কেটে ফাঁসি যাব। কুড়োনি বাতাসের আগে ছোটে। চিল্‌নি মায়ের মত ডানা কাপটে ছিল চিৎকারে সে চেঁচায়, জুড়ন রে! চরণবাবু গ্রামে এল, তবু তোরে ছেড়ে দিবে না।

বাবুর উঠানে অনেক লোক। বাবুর উঠানে হ্যাজাক জ্বলে। তবে কি সে নাই? জুড়ন কোথায়? জুড়ন! কুড়োনি এসে পড়ে।

ভরত কোটাল, সনাতন, লধা ও মাঝিপাড়ার কত লোক। জুড়ন কোথায়? ভরতের বউ কথা বলে না কেন? মাসি গো! তুমি জুড়নকে পৃথিবীতে এনেছিলে। এখন তাকে কোলে নিয়ে নিথর বসে আছে কেন? জুড়ন! কুড়োনি বুকে কিল মেরে কাঁদে।

—এ মেয়ে এমন করে কেন? তোর ছেলে বেঁচে আছে। চরণরা ডাক্তার ডাকতে গেছে।

—বেঁচে আছে? জুড়ন বেঁচে আছে? দাও, আমার কোলের দাও

ছেলে কোলে নিয়ে বসে কুড়োনি। দাও, আমি ওকে নড়াব না। কোথায় মেরেছে?

—যেথা পেরেছে।

—কেন মেরেছে?

—কিছু জানি না। সনাতন যেয়ে বলল, জুড়ন মরে যায়। ত' আমরা সব এসে পড়লাম। ভুবনরা চরণকে ঘর হতে ডেকে আনল। যখন এলাম তখন ছেলে ওই পিটালি গাছে বাঁধা। সে নাকি কাঁসার থালা চুরি করেছে।

-থালা চুরি করেছে ?

ছেলে এখনো অজ্ঞান। তাকে কোলে নিয়ে পূজার কারণে উপোসে বিশীর্ণ মুখে কুড়োনি বড় দুর্বোধ্য হাসে।

ডাক্তার নিয়ে চরণরা এসে পড়ে। গ্রামসেবক বিষ্ণু মাহাতকেও দেখা যায়। চরণই তাকে ধরে এনেছে এবং প্রবল পরাক্রান্ত বাবুর বাড়িতে বিরোধী দলের সঙ্গে এসেছে বলে বিষ্ণু খুবই কুণ্ঠিত।

ডাক্তার বলে, ওকে শুইয়ে দাও গো।

দেখেশুনে ডাক্তার বলে, ওষুধ দিচ্ছি। তবে একবার কেন্দুসলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নাও। এই যে কেটেছে। সেলাই করতে হবে। আর ইঞ্জেকশান।

চরণ এখন লোকবলে বলী। এবং এমন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবার ফলে গ্রামে তার পা রাখার জায়গা আরোই শক্ত হল। আবার একই সঙ্গে সে এসেছে অন্তরের টানে।

চরণ বাবুকে বলে, গাড়ি বের করুন।

বাবু তার ছেলেকে বলে, যা।

কুড়োনি চরণের দিকে চায়।

—জুড়ন বাঁচবে ?

—বাঁচবে, বাঁচবে।

কুড়োনি এখন ধারাল হাসে। বলে, জুড়নের বাপ জাড়ে আগুন পোহাতে খড় নিচ্ছিল, সে হল চোর। বাবু তারে মারা করালো।

—সবাই জানে।

—তার কোন বিচার নি।

—আর সে কথা !

—বাবু বলে, তোরে কাজে লাগতে হবে।' কেমন বাবু ? বলতে না ? জুড়নরে কাজে নেবে, সে না করলে আমায় করতে হবে।

বাবু নিরুত্তর থাকে।

— কেন করতে হবে ? জুড়নের বাপ নাকি সনাতনের কাছে ধান্য বেচে আড়াইশো টাকা নিয়েছিল। বাবু দয়ার সাগর। সে সেই টাকা শোধ দিয়েছে। তাতেই আমাকে ওর পাটগোহাল করতে হবে।

এ কথায় সবাই চঞ্চল হয় ও কথা বলতে থাকে। বাবু কি বলতে যায়। কুড়োনি তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকারে বলে, জুড়নের বাপ আড়াইশো টাকা পেল,

আমি জানি না ? সনাতনকে শুধাই। সে বলে, বাবু আমার নামে বর্গা রেকর্ড করায়। আমি কাগজে বর্গাই তা জুড়নের মা ! আদিবাসী লবার বাস্ত তো বাবু নিতে পারে না। তাতে আদিবাসী আমার নাম দিতে পারে। যে বেচল সে জানল না, যে কিনল সে জানল না, জানল একা বাবু। তাহলে বুঝে দেখ।

বিষ্ণু মাহাত বলে, যদি বার-কর্জ করা থাকে, তাহলে এমনটা হয় বটে, কিন্তু···চরণ বলে, কার হামা ধরছ ?

চরণের মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে, এ-ঘটনার শেষ অবধি দেখতে হচ্ছে।

সকলে বাবুর দিকে চায়। বাবু ওদের দিকে চায়, পিছন ফেরে, তারপর ঘরে চলে যায়।

গরুর গাড়ি আসে। জুড়নকে তোলা হয়। কুড়োনি ছেলে নিয়ে বসে। গোলাপী ওর হাতে হারিকেনটি দেয়। কুড়োনি হারিকেনটিও পাশে রাখে। জুড়ন যখন বেশ সজাগ হবে, জ্ঞান ফিরবে ওর, তখন হারিকেনটি ওকে দেখাতে হবে।

গাড়ি আস্তে আস্তে চলে কাঁচকোঁচ করে। ভরতরা বলে, রাস্তা এলে আমরা ঠেলে তুলে দেব। রাস্তা অনেক উঁচুতে, তাই নয় ?

কুড়োনি জুড়নকে আগলে বসে থাকে। এখন তার চারদিকে কিসের সুবাস ? নীল গন্ধরাজের ? অন্যেরা পাচ্ছে না কেন ?

কুড়োনির মন ক্রমে শান্ত হয়, স্থির। গরুর গাড়ি চলে।

(শারদীয় অনুষ্টুপ ১৩৮৯)

অর্জুন

মহাশ্বেতা দেবী

অঘ্রান যায় যায়, পৌষ আসবে, এখনো শীত তেমন পড়ে নি, রোদে আসেনি ওম্। বিশাল মাহাতোর ধান ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে কাল। ক্ষেত গুড়ানি, টুংকুড়ানি, ধানখেদাদের সঙ্গে সারাদিন কেতু শবরও ধান কুড়িয়েছে। সন্ধ্যার কুয়াশায় কেতু ভাবছিল একটু মদ কোথা থেকে পায়। পাবে না তা জানে। তবু চিন্তায় আমেজ কি!

বউ নেই, মহনী। স্বামী যখন জেল হাজতে, তখন সে মানবাজারে ধান কাটতে যাবে। ধান কাটা, মাটি কাটা, জঙ্গলে ঘোরা, কেতু তো যখন তখন জেলে। জঙ্গল কাটায় রাম হালদার, ধরা পড়ে কেতুরা। কেতু কি করবে বলো। কতবার ও বোঝাতে চেয়েছে, বাবু! আমার দিন গেলে চারটে টাকা চাই। গাছ কাটতে বলো কেটে দেব, মানুষ কাটতে বলো, কেটে দেব।

সত্যিই মানুষ ও কাটবে কিনা, তা কেউ ওকে চার টাকা দিয়ে পরখ করে দেখে না। ওটা কবার কথা তাও কেউ বোঝে না।

সরকারী বন কাটার জন্যে কেতু জেলে যায়।

রাম হালদার অন্য কেতুদের খোঁজে।

কেতু আর ভাবতে পারে না। পুরুলিয়াতে শবর ঘরে জন্মালে জঙ্গলে হাত দিতেই হবে, জেলেও যেতে হবে, এ একেবারে নিয়ম।

কেতু জেলে গেলে মহনী কাজ খুঁজতে যাবে, নিয়ম।

এমন নিয়মের রাজত্বেও শুধু কুটীর কেঁপে কুয়াশা গলে পড়ে। শরীর মদ চায়। একটু নেশা, একটু ভুলে থাকা।

এমন সময়েই হঠাৎ এসে দাঁড়ায় বিশাল মাহাতো। বলে, কেতু রে! কথা আছে।

—ভোটের কথা, বাবু?

—না না। সে তো আমি যাকে বলব তাকেই দিতে হবে, না কি বলিস?

—হ্যাঁ বাবু।

—রাম হালদার কি বলছিল?

—ওই, তুমি যা বললে।

—তুই কি বললি?

—তোমাকে যা বললাম।

—এটা কেমন কথা?

—বুদ্ধি নাই বাবু।

—যাকগে, ভোটের কথা থাক্। কাজের কথা ছিল একটা, শুনবি তো শোন্।

রাম হালদার ও বিশাল মাহাতো দুই জাতার লোক হতে পারে। কিন্তু কেতুর চোখে দুজনেই সমান। ওদের চোখে বোকাই সেজে থাকে ও, জবাবও দেয় বোকার মতো। দুজনকেই ওর দরকার। দুই দেবতাকে তুষ্ট না রাখতে পারলে অঞ্চলে টেকা মুশকিল।

ওরাও জানে যে কাজ বাগাতে হলে শবরদের আছে। বারবার জেল খাটার রেকর্ড ওদের। জাতা বাবুদের কথায় "না" বলবে কোন্ সাহসে?

কেতুর কৌতূহল হয়। সামনে ভোট। বিশাল বাবু নেচে বেড়াচ্ছে, সভা করছে। অথচ ভোটের কথা নয়, অন্য কোনো কথা বলবে।

কি কথা?

—তেমাথার অর্জুন গাছটা কাটতে হবে।

—কেন, বাবু?

—কাটতে হবে।

—এই জেল থেকে এলাম বাবু!

—তোকে আবার জেলে ঢোকাতে চাইলে তুই আটকাতে পারিস?

—না বাবু।

—এ কি রাম হালদারের কথায় জঙ্গল কাটা, যে জেলে যাবি? আমার কথায় সরকারী তেমাথার গাছ কাটবি। তোকে জেলে দেবে কে?

কেতুর মাথায় কুয়াশা সাঁতার কাটে। সত্যিই তো, কথাটা ও ভেবে দেখে নি। রাম হালদারের কথায় জঙ্গল কাটলে জেলে যেতে হয়। তা, বিশাল বাবুই এখন হাকিম হুকুম, তারাই দেশ চালাচ্ছে বুঝি! তাতেই বিশাল বাবুর কথায় সরকারী সড়কের ছায়াদানী গাছটি কাটলে জেল হাজত হবে না।

হঠাৎ ওর মনে চমক লাগে।

—বাবু, ভোট হবে বলে কি এবারে সড়ক পাকা হবে, তাতেই গাছ

কাটছে ?

—পাকা সড়ক ? এই জায়গায় ? ওরে কেতু ! সড়ক ত্রিশ বছরে হয় নি, আর হবে না।

হিমেল আকাশ, হিমেল বাতাস, ক্যাসেটে "সন্তোষী মা" যাত্রাপালা, সব কিছু যেন বিশাল মাহাতোকে দিয়ে সত্যি কথা বলায়।

—সড়ক নয় রে। গাছটা আমার দরকার।

—পাকা গাছ।

—পাকা গাছ।

—নেবে কেমন করে ?

—রামবাবুর ট্রাক আছে।

এখন সন্ধ্যা রাত্রির কোলে যাচ্ছে। সময়টি বড় অদ্ভুত। বানডিহির বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ। বিশালের কথার ধাক্কাটা নিরন্ন, নিঃসম্বল সন্তোষের কেরত কেতুকে যেন বুকে পাষাণ চাপিয়ে দেয়। অসহায় সে, চন্দ্র সাঁওতালের মতো। ধানকাটা সংঘর্ষে ওরা চন্দ্রের বুকে আধমণি বাটখারা চাপিয়ে চেপে ধরেছিল।

ভীষণ, ভীষণ চাপ। বিশাল মাহাতো এবং রাম হালদার দুই আতার লোক। একজন পঞ্চায়েত করে, অপরজন জেলার বাইরে কাঠচেরাই কারখানা করে। বক্তৃতায় এ-ওর বিরোধী। কিন্তু বিশালবাবুর কথায় যদি কেতুরা অর্জুন গাছটি কাটে, তাহলে রাম হালদারের ট্রাক সে গাছ চালান করে দেবে।

কেতুর ওপর ভীষণ চাপ। হায় ! গাছটিকে বাঁচানো গেল না। ওই গাছ জমিদারী আমলে বানডিহি জঙ্গলের শেষ প্রতীক। গাছটি দেখলে কেতুদের এখনো অতীতকে মনে পড়ে।

যখন জঙ্গলের মতো জঙ্গল ছিল, যখন শবররা ছিল বনজীবী। বাইরের মানুষ দেখলে যখন ওরা ত্রাসিত খরগোশ বা খেড়িয়ার মতো বনের পেটে ঢুকে যেত, সে সব দিনের কথা। সেইজন্যই কি ওদের নাম খেড়িয়া শবর ?

বৃদ্ধবৃদ্ধারা গাছটিকে বড় মানে, দেবাংশী গাছ। সেই গাছটিকে কেতু বাঁচাতে পারবে না। সে বলে, "হ্যাঁ বাবু, কেটে দিব।" এবং হাত পেতে দশ টাকা চায়। অলৌকিক, অলৌকিক সন্ধ্যা। কেতু বড় বিস্ময়ে বলে, বাবু, দশ টাকা !

—মদ খা, আরো দিব। একা তো পারবি না, যতজনা ফিরলি,

জোগাড় কর গা। মদ দিব, টাকা দিব।

রাম হালদার কোনো একটা গাছের কারবারে নেই। "বন বাচাও" ইস্তেহার আঁটো, সরকারী বন ডাকা করাও, বেআইনে উজাড় করো। যে সব হাত কুঠার ধরে, তাদের কারো বেলা টর্চ, টকাটক রেডিও, ঘড়ি, ক্যাসেট প্লেয়ার, সাইকেল, মদ অবশ্যই থাকে। মানুষ বুঝে জিনিস দাও। দোষে নির্দোষে শবরদের নামে জঙ্গল বাবু, থানা বাবু, কত না কেস করে। তাদের কি অত দেবে?

বিশাল বাবু দিচ্ছে?

—আমি এখন টাউনে যাব, মিটিং করব, গ্রামে শালা দেয়ালও নাই, লেখাও নাই। ইস্তাহার আনব।

—আমাকে খানিক দিও বাবু।

—দেয়াল কোথা তোর?

—মাটিতে বিছালে বাবু! ঠাণ্ডা ওঠে না।

—দিব, দিব। দু'চার দিনে গাছটা কেটে দে কেতু। আমি এসে তুলে নিব।

—অর্জুন গাছ!

—গোদা মহাপাত্রের মরণ! ওই গাছ চাই।

কুয়াশা ও অন্ধকার বাঁড়রে টুপি ও সোয়েটার শোভিত বিশালকে খেয়ে ফেলে। কেতু পরম ভাবিত হয়ে বনমালী, দিগা, পীতাম্বরের কাছে যায়। যেহেতু সে মদ নিয়েই যায়, সেহেতু বড় সাদর অভ্যর্থনা পাই। সকলেই জেনে বেটে এসেছে। যে কুঠার ধরে সেই জেলে যাবে, নিয়ম। রাম হালদার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে বাড়ি করবে, নিয়ম। নিয়মের রাজত্বে বেনিয়ম হবার উপায় কি? এদের মধ্যে দিগার সম্মান খানিক বেশি। কেন না ও আহ্লাদে গুণে চার দিন বিধিমুক্ত শিক্ষাক্রম ক্লাসে গিয়েছিল। দিগার গর্ভবতী বউ মুড়ি ও লঙ্কা এনে দেয়। দিগা বলে, ভাবতে হবে।

চারটি শবর চুল্লুর নেশায় ডুবে যায়, ভাবতে থাকে। বিয়েতে পরবে হোথা যেয়ে ঢোল বাজাই, মানসিকের চুল ফেললে হোথা পুঁতে দেই। ওষধি বৃক্ষ হে, দিগার বাবা তা জানত। পীতাম্বর অস্ফুটে বলে, সাঁওতালরা বাঁধনা জাগরণে গরু নাচাতে আসে।

গাছ কাটলে জেল, না কাটলে জেল, বনবিভাগের জমিতে সম্বন্ধ বানডিহি গ্রাম, খেড়িয়াশবরের অধিকার নাই কোনো। দিগা ভাবতে

ভাবতে বলে, তা একা কেন মরি, অন্যদেরে বলি, মিছা কেসে আসামী তো শবর হবে, কিন্তু গাছটি বলে সবার ভক্তি আছে, কি না বলো!

অর্জুন গাছটি পথের তেমাথায় থাকে, অনাদি অনন্ত কাল আছে যেন, কে বা খেয়াল করে দেখে। কিন্তু এখন যেন সকলের মনে হয় বুকের ভিতরে লাগছে। বনবিভাগের জমি মানেই বন নয়, পড়ে থাকা জমি। তা, শবররা যেথা যায়। সেথা হতে উচ্ছেদ হয়ে বনভূমি দেখে বসত করল, তা দেখ জঙ্গল চলে গেল, কে বা কাহারা কিনে বেচে দিল সব। শবররা আবার ত্রিশঙ্কু। কিন্তু ওই গাছটি যখন তরুণ ছিল, ওর নিচে পূজা দিয়ে সবাই শিকার পরবে যেত। এখন বার্ধক্যে বা ওর রূপ কত! সাদাটে গা, মাথাটি আকাশে, পূর্ণচাঁদের মায়ায় গাছ আর জ্যোৎস্না যেন এক হয়ে যায়। চৈত্র বৈশাখে দেখ, ছায়া ছড়ায়। তেমাথার গাছটি···

পীতাম্বর বলে, কতকাল আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে হে। বন বলতে ও একা, বনের সন্তান বসতে আমরা ক'ঘর। ওই গাছই চাঁই?

কেতু সদুঃখে বলে, সকলই তো বিশাল বাবুদের আর রাম বাবুদের।

পীতাম্বর বলে, যখন ঘর বাঁধি নাই, ওই গাছের নিচে কতদিন থাকলাম···তা বাদে তো মাহাতোরা ঘরের জমি দিল···

দিগা বলে, সাঁওতালদের ঘর জ্বালাল রাম বাবু, তা তারা এসে থাকে নাই?

ক্রমেই গাছটির বিষয়ে নানা কথা মনে পড়ে নানাজনের এবং কয়েকটি মানুষ, যাদের সরকার ও সমাজ বারবার শুধু উচ্ছেদ করে, ব্যবহার করে, ফেলে দেয়, ভাসিয়ে দেয়, তারা সহসা বোঝে যে গাছটির অবস্থা তাদেরই মতো।

দিগা বলে, বিশাল বাবু তো শহরে যাচ্ছে, তবে টাকা চেয়ে নিই?

—কাটবি?

—পাঁচজনাই যথেষ্ট। একশত টাকা দিক।

—জেলে যেতে হবে

দিগা ধূর্ত ও কৌশলী হাসি হাসে। বহুবার জেলে গেলে, অন্য সমাজের কাজে ব্যবহার হলে বারবার, শবরের মুখেও মুখোশ এঁটে বসে। একটি মুখ বিশাল বাবুদের জন্য, আসল মুখটি থাকে লুকানো। সে লঙ্কা চিবিয়ে বলে, পুরুলিয়াতে সে আমলে ইংরাজের থানা জ্বালাতে, এ আমলে পরের জমি দখল নিতে, পরের ধান কাটতে, পরের লাদ ফেলতে, সরকারের বন কাটতে, বাবুদের তো শবর জাতিই ভরসা। এমন যথা মেয়ে জেলে আর

কে যাবে ? তোরা ভাবিস না।

"অ" থেকে "হ" অবধি লেখা এবং জামসেদপুর, চাইবাসা, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার জেল খাটা দিগা শবর বিশাল বাবুকে মায়ের মতো ভরসা দেয়। তুই নিশ্চিন্তে ভোটের মিটিং করগা বাবু। টাকা দে। পরন্ত এসে দেখবি গাছ আর নাই।

—রাম বাবু ভড়ুপাবে।

—দেখা যাবে। সে তো তোকে টাক দিবে।

—বাইরে ভড়ুপাবে।

—দেখা যাবে।

বাওার বাওার বাইরে বিবাদ, ভিতরে দুধ কলা। বিশাল বাবু গো, বোকা শবরদের কতই শিখালে। বিধিমুক্ত শিক্ষা যাকে বলে!

বিশাল মাহাতো চলে যায়। দুই গ্রামীণ নেতা গভীর সখ্যতায় বিদায় নেয়। এখন জনসভায় এ-ওকে গালাবে, ও-একে। কাডাররা এত বোঝে না। খানিক খুনোখুনি করবে। সে তো হয়েই থাকে। অর্জুন গাছটি নিয়েও বিবাদ বিরোধ হতে পারে। তবে রামের চামচা আর গ্রামে ক'জন। সর্বত্রই বিশালের বিশাল প্রতিপত্তি।

টাউনে যেতে যেতে হাটে হাটে জনসভা, বাজারতলায় সভা। টাউনে গেরেও ছুটাছুটি থাকে। মোপেডের লাইট সারানো, নতুন জ্যাকেট কেনা, বউয়ের জন্ত গরম শাল, কিছু ওষুধ।

বড় নিশ্চিন্ত হয়ে বিশাল বানডিহি ফেরে। হায়! রাস্তা হয় নি। নেংসাই, টটকো, নদীর পর নদী পেরাও, তারপর বাস হতে নামো। এখন উত্তর-পশ্চিমে চলো তৈলপিছল চাকিচক-রক বিছানো উঁচুনিচু পাগলা রাস্তা ধরে। ভোটের ব্যাপারটিও বড় আশ্বাসপ্রদ।

এবং গ্রামের কাছাকাছি আসতে তার মাথা সহসা ঘুরে যায়। আকাশের মানচিত্রে সগর্ব তেজস্বী অর্জুন গাছটি আঁকা। গ্রামপ্রহরী যেন। একদা লক্ষ লক্ষ গাছ সৈন্ত হয়ে ভূমিরক্ষা করত। এখন ও একা। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সহস্রাধীদের স্মৃতি যেন ওকে একক ও অতন্দ্র করে দিয়েছে। ও ওর সাম্যমত মানভূমের উপেক্ষিত লুণ্ঠিত ভূমিকে পাহারা দিচ্ছে।

"অর্জুন বৃক্ষের পাতা মনুষ্য জিহ্বার সদৃশ।"

এবং উন্মত্ত বাজনা, ধামসা, নাগরা, ডমরু, ঢোল। উত্তেজিত বিশাল গ্রামে ঢোকে। গাছটি ঘিরে কত ভিড়, গাছের গায়ে জড়ানো আকন্দের মালা।

রাম হালদার সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে।

—কি হল ?

—গড়াম (গ্রাম) দেবতা করে দিল হে ওটাকে।

—কে, কোন্ বেজন্মা ?

—দিগা খবর স্বপ্ন পেল। তুমি টাকা দিয়েছ, পাথর বের দিয়ে থান করতে বলেছ, পূজা চলছে। সাঁওতাল, খেড়িয়া, সহিস, ভূমিজ, নানা জাতি হে !

—গ্রামদেবতা !

—হ্যাঁ, লোক আসছে তো আসছেই। মেলা বসে গেছে হে। বোকা ভাবতাম বেটাদের, গোহারায় হারিয়ে দিল না কি বল ?

বিশাল মাহাতো পরাজয়ের বহরটা বুঝতে এগিয়ে যায়। ভিড়, কি ভিড়। কেতু ঢোলক নিয়ে নিয়ে নাচছে, ঘুরে ঘুরে নাচছে। বিশাল কেন যেন ভয় পায়, দুর্বল বোধ করে। এই গাছ, এই মানুষ, সবাই তার চেনা। এদের আজ কেন অচেনা মনে হচ্ছে ? ভয়, ভীষণ ভয়।

(বর্তমান / ৭. ১২. ৮৪)

প্রবন্ধ

সূচীপত্র

জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৫

প্রবন্ধ		পৃষ্ঠা
১।	পালামৌ ১৯৮১ (বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড ২৭-৫-১৯৮১)	১
২।	পালামৌ : মে দিবস / ১৯৮৩	
	(বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড / ১৯৮৩ / অনুবাদ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়)	১৪
	বণ্ডেড লেবার (বসুমতী : ১-১২-৮১)	১৯
	বীরভূম পাঞ্জাব (বসুমতী : ২-১২-৮১)	২৫
	পশ্চিমবঙ্গের লোধাশবর (১)	৩০
	(ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি : ২৮-৫-১৯৮৩ /	
	বঙ্গানুবাদ লেখক ও শমীক ঘোষ)	
	পশ্চিমবঙ্গের লোধাশবর (২)	
	(ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি : ৪-৬-১৯৮৩ /	
	অনুবাদ—লেখক)	
	বিচার কর বাবু, দোষীদের ধরো (যুগান্তর : ২০-৭-৮২)	
	পুলিশ লাশগুলি কেন ফেলে দেয় (যুগান্তর : ২৪-৭-৮২)	
	ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস	
	(ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি : ১৬—২৩-৪-৮৩ /	
	অনুবাদ—লেখক)	
	তপশীলী, আদিবাসী ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ	
	(ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি : ১-৭-৮৩ ।	
	অনুবাদ—লেখক)	
	ভারতের দরিদ্র কল্যাণ সমিতিগুলিকে	
	সরাসরি উন্নয়নের ভার দেয়া হোক	
	(যোজনা / নভেম্বর ১৯৮৪ / অনুবাদ : নবারুণ ভট্টাচার্য)	

পালামৌ ১৯৮১ / ১লা মে

মহাশ্বেতা দেবী

ডালটনগঞ্জে উঠেছিলাম রামেশ্বরমের বাড়ি। এই অত্যুৎসাহী লোকটির বাড়ির মধ্যেই একটা ঘরে ওর প্রেস। রামেশ্বরম এক সাংবাদিক। ওর স্বপ্ন, ওর প্রেস থেকে কোনোদিন ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের করবে। সে ইচ্ছে অচিরে পূর্ণ হবে বলে মনে হল না। তাতে অবশ্য রামেশ্বরম তেমন নিরুৎসাহ হয় নি

ও. পালামৌয়ের ওপর তথ্য ও পরিসংখ্যান জোগাড় করে। একটি ভূমিদাস গ্রাম থেকে আরেকটি, শত শত মাইল পায়ে হাঁটে। যারাই আসল পালামৌ কি তা জানতে চান, তাঁদের সাগ্রহে রাখে বাড়িতে। ওর পরিবার আর কয়েকজন বন্ধু এ কাজে ওর পাশে থাকেন। ওর স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী, ওই ডালটনগঞ্জের ওপর দিয়ে বারোবারো অতিথি বসবার ভার পড়ে, সবই ও হাসিমুখে করে যায়। ওর ছেলেমেয়েরা দেখার মতো। ছেলে দুটো স্কুলে যায়, মেয়ে পড়ে কলেজে। ওরা রান্নাঘরে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে, কুয়ো থেকে জল টানছে, বাগানে জল দিচ্ছে, অতিথি সেবা করছে। নির্যাতিত হরিজন ও শোষিত ভূমিদাস বিষয়ে বাবা-মার মতোই ওদের উদ্বেগ। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত রাজনীতিক নেতাদের পরিবারে আমি মুখের কথা, কথানুযায়ী কাজ আর সেই মতো জীবনযাত্রা, এমন সততা খুব কমই দেখেছি।

খোলা ছাতে রাত কাটল। শেষ রাতে রামেশ্বরম আমাদের ডেকে উঠাল। রামেশ্বরম, আমি ওরাও মহাদেব টোপ্পো, ফোটোগ্রাফার শশী আর ছিন্দী কবি+ব্যাঙ্কের মেথর+হাওড়ার হরিজন সমিতির কর্মী শ্রবণকুমার, এই পাঁচজন যাত্রী। কোয়েল নদীর ধু ধু বুকে নেমে একটা কাঠের ট্রাকে উঠলাম। ট্রাকে চেপে চৈনপুরের মোড়। এবার কাঠফাটা রোদে ধুলো খটখটে পথে কয়েক মাইল হেঁটে সেমরা চললাম।

হঠাৎ সেমরার নাম খুব শোনা গিয়েছিল এক সময়ে। ভূমিদাস প্রথা নিষেধক অর্ডিনান্স জারি হবার পর ১৯৭৬ সালে সেমরাতে মার্চ মাসে "মুক্তদাস"দের একটা শিবির হয়েছিল। দাস বা বন্ধুয়ারা বলে "সিবির"। এই সিবিরে যোগ দেয় ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য

শ্রমমন্ত্রক। জেলা প্রশাসন সিবিল চালনায় সাহায্য করে। লোক সভার স্পীকার বলিরাম ভগত সিবিল উদ্বোধন করেন। পাটনার এ এ. সিনহা রিসার্চ ইনস্টিটিউট; রাঁচির বিহার ট্রাইবাল ইনস্টিটিউট; নিউদিল্লীর আই. আই. পি. এ; পাটনা ডিভিশনের কমিশনার ও তাঁর অফিসাররা; আই. এল. ও. সংস্থার ডঃ ফিলিপ হার্বস্ট্; জেলা প্রশাসনের অফিসাররা, সকলেই হাত মেলান।

সিবিলে এত লোকজন দেখে বন্ধুয়া (ভূমিদাস / বণ্ডেড লেবার) দের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা জাগে। পালামৌয়ে বন্ধুয়ারা কামিয়া, সেওকিয়া, হরোয়াহা, চরোয়াহা, নানা নামে আখ্যাত। ১৯৭৬ সালে ওই সিবিলে সন্মেলিত কামিয়ারা বলেছিল, চারজনের একটি পরিবারের দিন ছয় টাকা চাই। শুধা দুখা মৌসুমে জঙ্গল থেকে মহুয়া ও ফলমূল সংগ্রহের অধিকার চাই। পরিবার পিছু অন্তত দুই একর চাষ জমি, হাল-বলদ-বীজ-সার ও জলের কুয়া চাই। ডেপুটি কমিশনার কিছু লোককে "টাঁড়" বা অনুর্বর পাথুরে জমি বদল এবং ভূমি সংরক্ষণ বিভাগকে বলেন, [ক] ওই জমিকে কৃষিযোগ্য করতে, [খ] যাদের জন্য জমি, তাদেরকেই মজুর হিসেবে লাগাতে। বনবিভাগ ও অন্যান্য বিভাগকেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়। সবাই যেন মুক্ত বন্ধুয়াদের কাজ দেন। প্রাক্তন দাসমালিকরা এদের কাজ দিচ্ছে না। এ খবর ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউটের বুলেটিনে আর. এন. মহারাজ ১৯৭৬-এ লেখেন। ওই লেখাতেই বলা হয়, ডেপুটি কমিশনার ওদের মধ্যে কিছু মুরগী, শুওর ও দুধেলা গাই বিতরণ করেন। "ওদেরকে বিহার সরকার ধার্য ন্যূনতম মজুরি কি, তা জানানো হয়। ওদের ভালোর জন্যে কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তাও বলা হয়। দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজন করে দেখানো হয়, প্রত্যহ "বানি" [খাদ্যশস্যে মজুরি] ওদের কতটা প্রাপ্য, মালিক কত কম দিত।"

আটজন মুক্ত বন্ধুয়া সিবিলে যোগ দেয়। সেমরার আটজন ছিল।

ক্রমে আমরা সেমরার কাছে পৌঁছই। পথের বাঁ দিকে একটা বড় পুকুর দেখে রোদে পোড়া চোখ জুড়ায়। জল পানাপচা, সবুজ, পানের অযোগ্য। মোষ তাবত স্নান করছে, এক বৃদ্ধা কাচছে কাপড়। সেমরা আসলে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। পথের পাশে মস্ত গ্রাম সেমরা। খারো আর বাহেরা দূরে, পাহাড়ের ঢালে। পশ্চিমে লোহারসিমি। এই সব মিলিয়ে সেমরা। সব চেয়ে চোখে বেজেছিল, জঙ্গল কত দূরে সরে গেছে। চারদিকে খাঁ খাঁ

প্রান্তর, একটা গাছ নেই। প্রথমেই আমরা বসলাম গ্রামের নাপিতের বাড়ি। একটি ছেলে জল দিল। রামেশ্বরম ওকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলল। ও বলল, খারো চলো, বাহেরা চলো। সেমরা যেও না। সেমরা হল ব্রাহ্মণ মালিকদের গ্রাম। সরকারী রিপোর্ট মতে সেমরার চুরাশি জন বন্ধুয়ার মধ্যে সাতচল্লিশ জনকে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের চাষের জমি, হাল-বলদ, বসবাসের ঘর, দুবেলা খাই, সব দেয়া হয়েছে।

এই ছেলেটার ঠাকুরদা রঘুনন্দন হাজামের ছত্রিশ বিঘা ভালো আবাদী জমি ছিল। সেমরার কামেশ্বর পাণ্ডে তাকে মামলায় ফাঁসিয়ে সে জমি নিয়ে নেয়। রঘুনন্দনের তিন লড়াকু ছেলে আলিয়ার। কিসমত ও চানোন নয়া মালিককে জমির দখল নিতে দেয় নি। তারপর ব্রাহ্মণের বাড়ি কি পূজা হল। তিন ভাই রক্তবমি করে মরে গেল। ওরা কি পূজার প্রসাদ খেয়েছিল? ছেলেটি এ প্রশ্নে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়ল। শুধু বলল, দেবতার অভিশাপ। রঘুনন্দন এ লোকে মারা গেল। এখন ওদের তিন বিঘা জমি আছে, পরে কিনেছে।

আমরা কথা বলছি, আরো কয়েকটি লোক এসে জুটল। আমরা চলতে শুরু করলাম ক্ষেত পেরিয়ে, পাথুরে রাস্তা ধরে। বালিরাম ভুঁইয়া, এক মুক্ত কামিয়া, তার ঘর মেরামতের জন্যে মাটি কাটছে। মংরু মিঞা, আরেক মুক্ত কামিয়া এসে যোগ দিল। তারপর দুই ব্রাহ্মণ দাসমালিক, সুমের পাঁড়ে আর সুরেশ পাঁড়ে এসে আমাদের ঘেরা শুরু করল। বললাম, মুক্ত কামিয়ারা কেমন আছে, তাই দেখতে এসেছি। আমাদের যেতে দিন। আপনারা থাকলে ওরা খুলেমেলে কথা বলবে না। তখন ওরা চলে গেল। ক্রমে তিরিশ চল্লিশ জন এসে জুটল। আমরা পয়লা মে র খবরে.দে গ্রাম থেকে গ্রামে হাঁটছি। রামেশ্বরমকে ওরা চেনে, বিশ্বাস করে। ও তো সরকারী বাবু নয় যে ভাঁওতা দেয় আর চলে যায়। খইনি খাওয়া রামেশ্বরম ওদের খোঁজ নিতে আসে। রামেশ্বরম বলল, দিদি! আমরাই প্রকৃত মে-দিবস পালন করছি। একেবারে বন্ধুয়াদের সঙ্গে। যারা শোষিততম মনুষ্য।

মংরু মিঞা বছর তিরিশের যুবক। কিন্তু মুখ। দাঁত সব ক্ষেপে যেন বেঁকে গেছে। হ্যাঁ, ওকে গ্রাম থেকে বহুদূরে পাহাড়ের ওপর আশি ডেসিমেল পাথুরে জমি দেয়া হয়েছে। সে জমিকে আবাদযোগ্য করা দুঃসাধ্য। কুয়ো নেই, সেচ নেই। বর্ষার সময় বাদ দিলে খোঁড়ানালায়

জল থাকে না। মংরু যা বলল, সবাই সেই এক প্রশ্নই করল, ১৯৭৬ সালে সিবিল কেন হল? লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতির একটিও তো রাখা হল না। কেন মুক্ত কামিয়াদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর আশি ডেসিমেল করে জমি দেয়া হল? যেখানে জল নেই? আশি ডেসিমেল জমি চাষ করলে কি একটা পরিবারের পেট চলে? একজন বলল, এই জন্যে আমরা আবার দাসখতে টিপ দিয়ে বন্ধুয়া হয়ে যাচ্ছি।

মংরু, পুরণো মালিকদের দাসত্ব না করে বাঁচার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল। তারপর অযোধ্যা পাণ্ডে ওকে ধরে আনে ও বন্ধুয়া হতে বলে। মংরু রাজী হয় নি। ফলে ওকে বেঁধেছেঁদে মারা হয়। অযোধ্যা পাণ্ডে জুতো পায়ে ওর মুখ মাড়িয়ে থেঁতো করে দেয়। মংরু রক্তবমি করে, একটু জল চায়। অযোধ্যার ছেলে রামবল্লভ ওর মুখে প্রস্রাব করে। তারপর অন্য বন্ধুয়ারা এসে পড়ে এবং মংরুকে ডালটনগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সিবিল ওদের কিছুই দেয়নি। তবু সিবিল হয়ে ভালো হয়েছে। কেমন ভালো? সিবিলের আগে মালিকরা "ধরমাকু" প্রথায় কামিয়া জোগাড় করত। ধরমাকু প্রথায় মালিক বন্ধুয়াকে কোনো দাদন বা ধারকর্জ দেয় না। মালিকের মস্তানরা যে কোনো লোককে ধরে মেরে দাস বানিয়ে ফেলে। যত কামিয়া সবাই ধরমাকু নয়, তবে যে কোনো লোক যে কোনো সময়ে ধরমাকু হয়ে যেতে পারত। ধরমাকু হবার চেয়ে ধার নিয়ে কামিয়া বা দাস হওয়া তবু ভালো।

এই প্রথাটির কথা আমি আগেই জানতাম। যোগিপুরার এক মানুষ থেকো জমিদার বিহার রাজ্য লাক্ষা বিপণন সমবায় ফেডারেশনের মস্ত অফিসার। সে বিহারের লাক্ষা শিল্প কুক্ষিগত করেছিল, সেচ বিভাগ তার দখলে, শিক্ষক ইউনিয়ন তার দখলে, এক আত্মীয়কে দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে সে স্বীয় মহিমা প্রচার করত। গরিবদের কাছ থেকে সে সব ভূদান—খোদকার-রায়তী ও আধিভোক্তা জমি কেড়ে নিয়েছিল এবং যাদের জমি নিল তাদেরই ধরমাকু রেখে সে জমি চাষ করাত। ওর ছেলে আর ভাইপো ১৯৭৪ সালে দুজন আদিবাসীকে খুন করে। মানাতুর মৌয়ারের কথা সব কাগজে বেরিয়েছে। এর কথা বেরোয় নি। এই জগদীশ্বর পাঠক লুঠতরাজ চালাত, গরিবের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, ওর ছেলে ও ভাইপো খুন ও ধর্ষণ করত, তবু, সরকারী অফিসার সে থেকেই গিয়েছিল এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্য ও

হয়েছিল। পালামৌ জেলায় সবই সম্ভব। আমার মতে পালামৌ হল সমগ্র ভারতের দর্পণ স্বরূপ। ভারতের সর্বত্র কমবেশি তো এই রকমই চলছে।

রাজনীতিক মদত সরে যাবার ফলে বর্তমানে যোগি ঘুরার মানুষ থেকে খানিক হীনবল। তবে পুলিশী আইনের এতগুলি ধারা ভঙ্গ করার পরেও তার বিরুদ্ধে কোনো বিচার বিভাগীয় বা পুলিশী তদন্ত হয় নি এই পাঠক যে ভাবে আইনকে কলা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল, তাতে সেমরার ব্রাহ্মণ দাসমালিকরা খুবই প্রেরণা পায়। ডালটনগঞ্জেই পাঠকের বাড়ি। সেমরার ব্রাহ্মণরা ডালটনগঞ্জেও যথেষ্ট যায়। তারা বলতে থাকল, পাঠক হল মানুষের মত মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা, সে ব্রাহ্মণ, আমাদের জাতভাই। একজন পাঠক, একজন মানাবুর মৌয়ার, এরা যখন নেতাদের কাছে ষোল-আনা মদত পায়, তখন যে সব নিচু স্তরের সরকারী কর্মচারী হাতে কলমে বন্ধুয়াদের বিষয়ে নির্দেশ কাজে করবে, তারা ভালো করেই বোঝে যে এমন ব্যবস্থার মধ্যে সততা দেখানো কোনো কাজের কথা নয়। এবং সমগ্র ব্যাপারটির ফলে গরিব হরিজন-মুসলিম ও আদিবাসী বন্ধুরা হোক বা না হোক, কি ভাবে ভয় পায় তা অনুমেয়।

ছোট ছোট সরকারী কর্মচারীরা যে যার ক্ষেত্রে ছোট ছোট পাঠক বা মৌয়ার হয়ে ওঠে এবং গরিবদের যথেচ্ছ শোষণ করে, অত্যাচার চালায়। পালামৌকে নির্মোহ চোখে দেখুন, বুঝবেন যে জেলা প্রশাসন+জমি মালিক+ঠিকাদার, সবাই ভাবে, তাদের সেবা করবার জন্যেই গরিবগুলো জন্মেছে। গরিবকে শোষণ করা ওদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আরেকটি গ্রামে যেয়ে আমরা একটি আদিবাসী বন্ধুয়া পরিবারের ঘরে বসলাম। সঙ্গে ছাতু ছিল। ওরা জল আনল। সবাই পেট ভরে ছাতুগোলা জল খেলাম। পালামৌয়ে লু চলে এ সময়ে। প্রাণঘাতী লু থেকে বাঁচতে লবণ সহযোগে ছাতুগোলা জল খুবই সহায়ক। তারপর দেখতে গেলাম। সাতটি গৃহহীন পরিবারকে কেমন ঘর করে দেয়া হয়েছে। বাপ রে, সে কত দূরে! সেমরা থেকে অনেক দূরে লোহার সিমির উলটো দিকে তিন মাইল জঙ্গল ভেঙে পাহাড়ের মধ্যে টাঁড় জমিতে সাতটি বারাক-ঘরের কাদার গাঁথনি, তার ছাউনি নেই। সে জঙ্গল কাঁটা ঝোপের বন। জায়গাটির কোথাও জলের লেশ নেই। সরপঞ্চ বালেশ্বর পাণ্ডে এবং তার কর্মচারী বলল, বন থেকে কাঠ নিয়ে ছাউনি করে নাও।

কাঠ নেবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল বাবু কুজ সহায় ওদের ধরল। জঙ্গল বাবুর তাড়নায় এই সাতজন মুক্ত বন্ধুরা সরপঞ্চের কাছেই দৌড়ে গেল। সরকার মুক্ত বন্ধুরাদের যা যা দিয়েছে, সেই খাদ্যশস্য, হালবলদ, দুধেলা গাই, বলদ, সবই সরপঞ্চের জিম্মায় দিয়েছে। ঘর তৈরির খরচও। তারা হাতে কিছুই পায়নি। সরপঞ্চ বলল, জঙ্গলবাবুকে নয়শো তিরাশি টাকা দিতে হবে। সরপঞ্চ বলল, আমি ব্যবস্থা করছি। তোদের সত্তর কুইন্টাল গম দিয়েছিল, তা এক পাতে কিনল। বলদগুলো কিনল পারস পাতে। গাই, হালবলদ, সবই বেচে দিলাম। জঙ্গল বাবুকে তো খুশি করতে হবে। সরকার তোদের জঙ্গলের মধ্যেই বাস্তু আর চাষের জমি দিয়েছে।

আমরা দেখলাম সাতটি অসহায় পরিবার। চারদিকে কাঁটা গাছের জঙ্গল। মুক্ত তারা, কাজও পাবে না। জঙ্গলের কাঠ কাটলে জঙ্গল বাবু ধরবে। ওখানেই দেখলাম বিখন মোচি নামে এক বন্ধুয়ার ঘর। লোহারসিমি গ্রামের পঞ্চাশ একর আবাদী জমির মালিক মুনেশ্বর সাহার কাছে বিখন দশ বারো বছর আগে পঞ্চাশ টাকা ধার নেয়। এত বছর দাস হয়ে আছে, এখনো মালিক ওর কাছে আঠারো বা উনিশ টাকা পায়। বিখনের কোনো অভিযোগ নেই। এ রকমই তো হবার কথা। চারদিকে অনুর্বর পাথুরে পাহাড়। হিংস্র জঙ্গল, মালিকের শস্যসবুজ ক্ষেত, মদোদ্ধত ব্রাহ্মণ, গরিব হরিজন-মুসলিম ও আদিবাসীদের অসহায় বিপন্ন অস্তিত্ব। বিখন জাতে মুচি। এর চেয়ে ভালো ওর কপালে কি হবে?

বিখনরা কখনো প্রতিবাদ করে না, জানতে চায় না কি তাদের অধিকার, কেননা জানতে চেয়ে কোনো লাভ নেই। বিখন বলল, ওর মালিক না কি লোক ভালো। অন্যেরাও ওর কথায় সম্মতি জানাল। ও হল মালিকের চরোয়াহা। যেদিন কাজ থাকে, সেদিন মালিক ওকে খেতে দেয়। যেদিন কাজ থাকে না সেদিন বিখন জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করে। এটা করতে দেয় যখন, তখন মালিক ভালো। বিখনের দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ের সময়ে ছেলে দুটোকে দাস বানিয়ে ও আটশো বা নয়শো টাকা ধার নেবে। ও বলল, আয়সা তো আদত হি হ্যায়। এইরকমটাই হয়ে থাকে।

আমরা কথা বলছি, আবার সুরেশ পাঁড়ে হাজির। এখন সে জোরা-জোরি শুরু করল, এদের সঙ্গে ঘুরছ কেন? আমার ঘরে চলো। জিরোবে, জলখাবার খাবে। রামেশ্বরম্ বলল, ঠিক বলেছ। বাড়ি যাও,

আমরা আসছি।

ও চলে যেতেই একজন বন্ধুরা বলল, ও পুলিশের খোচর। আমাদের ওপর নজর রাখে. পুলিসকে খবর দেয়।

তারপর জঙ্গল থেকে বেরোলাম। আগুন ঢালা রোদে দেড়মাইল কাঁকরপাথর ভেঙে খারো গ্রামে পৌঁছলাম। রামেশ্বরমের সঙ্গে বন্ধুরা গৃহ-কর্তার পুরনো বন্ধুত্ব। গরম চা পেয়ে আমরা তো তাজ্জব। গৃহকর্তা বলল, কবে থেকে বলছ যে আসবে তুমি। কতদিন ধরে আমরা একটু একটু করে দিনমজুরি থেকে এটা ওটা কিনছি। বরাবর তো তোমার ঘরে গেলে খেয়ে আসি।—ওই রোদে ওরা সেমরা গিয়ে আমাকে পান কিনে এনে দিল। শ্রবণকুমার কয়েকটা গান গেয়ে ওদের লজ্জা ভাঙল। তখন ওরাও ঢোল বাজিয়ে গাইতে থাকল ওদের স্বরচিত গান। সে গানে দাস জীবনের দুঃখ আর মালিকের অত্যাচারের কথা। তারপরে এল সবচেয়ে অবাক করা খবর। চলো, তোমাদের খানা তৈরার। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি যে খাবার তোমরা ঘরে এনেছ। আমরাও জোগাড় করেছি সব। ওরা চার পাঁচশো জন চাঁদা তুলে পুরি ভেজেছে, আলু বেগুনের তর্তা বানিয়েছে, আর যা ওরা ছুঁতে পারে না, সেই দামী জিনিস চিনিও ছিল। আমাদের ঘরে আনা রুটি তরকারি, ওদের তৈরি খাবার, সবাই মিলেমিশে খেলাম।

তারপর শুরু হল কথাবার্তা। সব কথাই শুরু হয় ১৯৭৬ সালের সিবিল থেকে। ওরা সেমরার ব্রাহ্মণ দাসমালিকদের নাম বলল কয়েকটা। সকলের পদবী পাণ্ডে, সবাই ব্রাহ্মণ। রাজুরাম অযোধ্যা, গণেশ এবং তার সাত ছেলে, সুদর্শন, বালেশ্বর, বলদেও, ব্রিজদেও, লাডা, গিরজা, শঙ্কর, জোয়ালা, মঙ্গল, ধরমজিত, মনমোহন, সুমের, রামরাজ, রাঘব, সুরেশ। ধনীদের মধ্যে সাউ জাতের মুনেশ্বর, জিতন, বেলা, নারায়ণ, এরাও দাস-মালিক। সাউরা একশো টাকায় মাসিক ছয় টাকা সুদ ধরে তেজারতী কারবার করে।

এ সব জমিমালিকরা হরিজন-আদিবাসী-মুসলিম গরিবের জমি কেড়ে নিয়েছে তো বটেই, সে বন্ধুরা হোক, বা না হোক। তার ওপরে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার পর ওদেরকে সরকার যে জমি দেয়, তাও প্রাক্তন মালিকরা নিয়ে নিয়েছে। সেমরা গ্রামে চুরাশি জনকে বন্ধুরা বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিল, তেতাল্লিশ জনকে মুক্ত করা হয়। মংরু মিঞার মতো অনেককে "টাঁড়" জমি দেয়া হয়, সেচের ব্যবস্থা করা হয়নি, ফলে সে জমি

ওদের কাজে লাগে নি। মংরু বন্ধুয়া, তার ঠাকুমার যৎসামান্য আবাদী জমি ছিল, ঠাকুমা বন্ধুয়া ছিল না অযোধ্যা পাণ্ডে ওর ঠাকুমার দখলী পর্চা কেড়ে নিয়ে ঠাকুমার নামে খাজনা দিচ্ছে এবং জমি ভোগ করছে। ভুঁইয়াদের মধ্যে বহেরা, চতুর, মকর, সুদান, দুর্জন, প্রভু, কোরি, বনোয়ারি, রঘুনি, কৈলু, রামদাস, খারিকা এবং গরজু, এই তেরোজন মুক্তিপ্রাপ্ত বন্ধুয়া, সেমরার কাছে খানিক ভালো আবাদী জমি পেয়েছিল। চৈনপুর ব্লকের সালাডুরা গ্রামের দারোগা সাহ ওদের জমি ভোগ করছে, ওদের নামে খাজনা দিচ্ছে, অথচ দখলী পর্চা ওদের হাতে। সরকারী খাতায় ওরা জমিমালিক, বাস্তবে ওরা জমিতে ঢুকতে পায় না। আজ সুদান নতুন করে রাঘব পাণ্ডের বন্ধুয়া হয়ে গেছে, রঘুনি ও কৈলু ব্যাস পাণ্ডের বন্ধুয়া হয়েছে, রামদাস অযোধ্যা পাণ্ডের এবং খারিকা সুখচাঁদ মাঝির বন্ধুয়া হয়ে গেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির পর আবার ওরা কেনা গোলাম।

সেমরার বন্ধুয়া টোলিতে ১।৫।১৯৮১ তে যাদের দেখেছিলাম, কয়েকজনের তালিকা দিচ্ছি।

প্রথম তালিকা

নাম ও জাতি ; বয়স		গৃহীত ঋণ	দাসত্ব কাল	মালিকের নাম ও জাতি
খিকা / ভুঁইয়া	৫০	৫০০ টাকা		ভোলানাথ পাণ্ডে ব্রাহ্মণ
মহাবীর	৮০	২০০	৪ বছর	রামদত্তরাম পাণ্ডে
কেসো /	৪০	২৫০	১২ বছর	
পরভু /	৩৫	৮০	৪ বছর	অযোধ্যা
সেবক /	৭০	৩৫০	৩ বছর	ইন্দ্রদেব
গনোরি / ,,	৫৫	৫০০	৫ বছর	ভোরালা
সীতারাম / ,,	২৮	৫০০ (বাবা নেয়)	বাবা—৩৮ সীতারাম—১	
প্রসাদ মাঝি (আসে দুসাদ)	৪০	৮০ বছর	৩ বছর	অযোধ্যা পাণ্ডে

দ্বিতীয় তালিকা

নাম	কত নিষ্কৃতে (নিজে, ^^ পূর্বপুরুষ)	দাসত্বকাল	মালিক
১. প্রকাশ মাঝি	জানে না	জানে না	মঙ্গল পাণ্ডে
২. জগদীশ ভুঁইয়া	১০০ টাঃ	৯/১০ বছর	মঙ্গল পাণ্ডে
৩. সোকি ভুঁইয়া	১০০ টাঃ	৭ বছর	রামরূপ পাণ্ডে
৪. জহুর মিঞা	জানে না	জানে না	পুষ্কর পাণ্ডে
৫. সাজিক মিঞা	জানে না	জানে না	মোহন পাণ্ডে
৬. জহুরের ছেলে মুকুতা	জানে না	জানে না	মনমোহন পাণ্ডে
৭. প্রসাদ ভুঁইয়া	১৫০ টাঃ	৩ বছর	সুমের পাণ্ডে
৮. বাসবিয়া ভুঁইন (স্ত্রী)	জানে না	জানে না	সুমের পাণ্ডে
৯. প্রভু ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	বন্দে পাণ্ডে
১০. চানকু ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	ত্রিজদেব পাণ্ডে
১১. সন্তোষ ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	ত্রিজদেব পাণ্ডে
১২. দিগন ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	ত্রিজদেব পাণ্ডে
১৩. দুর্গা মুচি	জানে না	জানে না	ধর্মরাজ পাণ্ডে
১৪. নন্দু মুচি	জানে না	জানে না	সোমনাথ পাণ্ডে
১৫. হাতন ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	ধ্রুব পাণ্ডে
১৬. জামরুদ্দিন মিঞা	জানে না	জানে না	গোরখ পাণ্ডে
১৭. কেদার সিং চেরো (আদিবাসী)	জানে না	জানে না	বামদেব পাণ্ডে
১৮. রামজীব ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	সুদর্শন পাণ্ডে
১৯. রাজদেও ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	পরীক্ষিৎ পাণ্ডে
২০. সুদিত ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	সোমদেব পাণ্ডে
২১. কুঞ্জবিহারী ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	গিরা পাণ্ডে
২২. মোগল ভুঁইয়া	জানে না	জানে না	ননকু পাণ্ডে
২৩. বোধা ভুঁইয়া	১৭৫ টাঃ	জানে না	বালেশ্বর পাণ্ডে

(বালেশ্বর পাণ্ডে সেমরার সরপঞ্চ বা পঞ্চায়েত প্রধান। বোধা তার টাকা ফেরত দিতে চায়। বালেশ্বর তা নেবে না। ফলে বোধা দাস হয়েই আছে)।

	নাম	কত নিয়েছে (নিজে, বা পূর্বপুরুষ)	দাসত্বকাল	মালিক
২৪.	আণ্টু মেহ্‌রা (গ্রাম মিসিরডি)	জানে না	জানে না	ব্যাস পাণ্ডে
	ভারত ভুঁইয়া (গ্রাম ভাণ্ডার)	জানে না	জানে না	ব্যাস পাণ্ডে
	রামাধর মুচি	১০০ টাঃ	জানে না	শঙ্কর পাণ্ডে
	মোগল ভুঁইয়া (২নং)	৪০০ টাঃ	৬/৭ বছর	মঙ্গলকিশোর পাণ্ডে

মিসিরডি ও ভাণ্ডারের আণ্টু ও ভারত ছাড়া সকলের সঙ্গেই দেখা হয়। জগদীশ, সোফি ও ২নং মোগল ছাড়া ওরা প্রত্যেকেই ১৯৭৬ সিবিলে মুক্তি পেয়েছিল। আবার দাসত্বে ফিরে গেছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে দাসই হতে হবে। দু বছর আগে কৈলু ধরমবীর পাণ্ডের কাছে তিনশো টাকা নেয়। আবার সে ঋণ নিয়েছে, নতুন এক দাসখতে টিপ ছাপ দিয়েছে। ব্যাস পাণ্ডে সাতজনকে দাস রেখেছে। সবাই ভুঁইয়া। এদের মধ্যে কিরীট হল হরোয়াহা। কৈলুর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কৈলুর নেয়া ঋণের জন্য দাস। আগেই বলেছি, বন্ধুয়া নানা পর্যায়ের। কামিয়া ও সেওকিয়া (ক) সব কাজ করে, (খ) সকালে লুকমা বা সামান্য জলপানি এবং (গ) দিনান্তে নির্দিষ্ট মাপে বানি বা খাদ্যশস্যে মজুরী পায়। এই মজুরি কাঁচা দেরে দেয়া হয়। এ ওজনে এক সের ধান মানে ২৫০—৩০০ গ্রাম ধান। কৈলুর ক্ষেত্রে ব্যাস পাণ্ডে একজনকে লুকমা ও বানি দিচ্ছে এবং গোটা পরিবারটিকে খাটাচ্ছে।

কিরীট হরোয়াহা। হরোয়াহা রোজ কাঁচা আড়াই সের ধান পায়। এক বছর কাজ করলে হরোয়াহা পাঁচ কাঠা পালহাতু জমি পায়। দাসত্বকালে এ জমি তার। দাসত্বকাল ফুরালে পালহাতু জমি মালিকের। যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কাজ করে, সে ক্ষেত্রেও মালিক একজনকেই লুকমা ও বানি দেবে।

ব্যাস পাণ্ডে সেমরার মুখিয়া, বাজেশ্বর সরপঞ্চ। দুজনেই দাসমালিক। জোয়ালা পাণ্ডের কথা ধরা যাক। যখন সেমরার বন্ধুয়ারা ১৯৭৬ সালে মুক্তি পেল, তখন জোয়ালা গ্রামের মুখিয়া। ওর দাসরাও মুক্তি পেল। এই ব্রাহ্মণ পাণ্ডেরাই বরাবর গ্রামের সরপঞ্চ ও মুখিয়া। ১৯৭৬-এর সিবিলে বন্ধুয়ারা ভেবেছিল যে ওরা বোধহয় ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে মুক্তি

পেল। ওরা আনন্দ করেছিল। জলের মধ্যে জাল। জালে বন্দী মাছ লাফ মারে আর ভাবে এবার বুঝি অবাধে জলে যেতে পারব। পরিনামে দেখে, যে সে যেমন বন্দী তেমনই রয়ে যায়ে

সেদরাতে একচল্লিশ জন দাস রইল। তেতাল্লিশ জন মুক্তি পেল। সরকারী অফিসাররা ওদেরকে ওই সব মুখিয়া এবং সরপঞ্চের হাত থেকেই মুক্ত করল। তারপর ওদের পুনর্বাসনের জন্য জমি বিলির ভার, বলদ-গাই-ছাগল-শুওর-হাল-বলদ-বীজ-সার, ঘর তৈরি, পথ তৈরি ও কুয়া কাটার টাকা, মজুরির জন্য মাথা পিছু এক কুইন্টাল গম, সব গিল প্রাক্তন দাস মালিক ওই মুখিয়া ও সরপঞ্চদের হাতে।

কিছু কিছু তারা হাতে পেয়েছিল। কিন্তু মুক্ত হবার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, সে জন্য মালিকরা নজর রাখল, ওরা যাতে কাজ না পায়। তখন ওরা হাল-বলদ-যা পেয়েছিল সব বেচে খেল। অবশেষে নতজানু হয়ে প্রায় সকলেই আবার বন্ধুরা হতে চাইল। মালিকরা এখন আগের চেয়ে অনেক নির্মম শর্তে ওদের দাস বানাতে থাকল। এখন লুকমা যা বানি পাবে একজন, কিন্তু প্রতি বন্ধুরা ক্ষেত্রে সপরিবারে খাটতেই হবে। পালামৌয়ে বন্ধুরা হোক বা না হোক, জঙ্গল থেকে কাঠ এনে হাটে বেচেই সকলে বেঁচে আছে। ওরা যদি মৌয়া আনে, মালিক তার অর্ধেক কেড়ে নেয়।

এখন মালিক, জঙ্গল বাবু, ব্লক কর্মচারী, পুলিস, সবাই ১৯৭৬-এ মুক্তি প্রাপ্ত বন্ধুয়াদের নিয়ে হেসে গড়াগড়ি খায়। ওঃ, সরকার বন্ধুয়া মুক্তির নামে তামাসার মতো তামাসা দেখিয়ে গেল বটে। কেমন? এখন আগের চেয়েও দুর্গতিতে পড়েছ কি না বলো? সেদরার মিডল স্কুলে বন্ধুয়াদের ছেলেরা ঢুকতে পায় না। এ ইস্কুলে কেন? সরকার তো বন্ধুয়াদের ছেলেদের জন্যে রামকাণ্ডা আর কোরিয়াঘোতে স্কুল করে দিয়েছে। সেখানে যা।

আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। সরকারী রিপোর্টে কেন উল্লেখ করা হয় নি যে জোরালা প্রসাদ পাণ্ডেই ছিল গ্রামের মুখিয়া, সে দাসমালিকও বটে? আজ কেন সেদিনের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসেরা একের পর এক দাসত্ব বন্ধনে ফিরে যাচ্ছে? একবার বহু ঘটা করে, বহু প্রচার করে তাদের মুক্তি দেয়া হল কেন? সেই ১৯৭৬ সিবিলের গোটা ব্যাপারটাই কি ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের পক্ষে বন্দী দাসদের নিয়ে একটা নিষ্ঠুর প্রহসন নয়? যাঁরা মুক্তি দিচ্ছিলেন, তাঁরা তো জানতেন যে এইসব সরপঞ্চ ও

মুখিয়ারা দাস মালিকও বটে। এ কথাও তো জানতেন, যে বাস্তু+চাষ জমি+হালবলদ, সব মিলে এক একজন মুক্ত বন্ধুয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন চার হাজার টাকা। অর্থাৎ যা দেয়া হবে তা ওই টাকার মধ্যে। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে সব উচ্চ জাতের দাসমালিক সরপক্ষ ও মুখিয়া বন্ধুয়াদের ও যারা বন্ধুয়া নয়, তাদেরকেও জাতের কারণে মানুষ বলে মনে করে না। তাদের হাত দিয়েই ওদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা, জমি, সব দেয়া হল কেন? তেতাল্লিশ জন মুক্ত বন্ধুয়ার জন্যই একলক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা এসেছিল। সে টাকা সরপক্ষ, মুখিয়া কি করবে তা কি জেলা প্রশাসন জানতেন না? কেন জেলা সরকার লোক লাগিয়ে মুক্ত বন্ধুয়াদের মজুর খাটিয়ে জমিকে আবাদযোগ্য করতে, কুয়ো কাটাতে পারলেন না? এবং পাহাড়ের গায়ে আসি ডেমিমেল জমি দেবার মানেই বা কি? বর্ষাকালেও যেখানে ঘাস জন্মে না, জল নেমে যায়, তেমন জমি কোন কাজে লাগবে? তেতাল্লিশ জনের জন্যে যদি এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা এসে থাকে, সে বছরে পালামৌয়ে না কি ছয়শোর বেশি বন্ধুয়া মুক্ত হয়েছিল। টাকার অঙ্কটা ভাবতে ভয় পাই।

সমগ্র ব্যাপারটি থেকে একটা সত্যই প্রকট হয়। যে সরকার যা করেছিলেন, তার পিছনে "এতে বন্ধুয়াদের কোনো সাহায্য হবে কি না" সে বিষয়ে কোনো উদ্বেগ বা আন্তরিকতা একেবারেই ছিল না। আজ এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে বন্ধুয়াদের কাছে কিছুই পৌঁছয় নি। ওই পচা গলা দুর্নীতিদুষ্ট, জাতপাত নির্যাতনে অভ্যস্ত সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার আসলে যে ব্যাপারটা কিছুই দাঁড়াবে না তা তো কর্তাব্যক্তিরা জানতেন। তাহলে কেন হতভাগ্য দাসদের স্বপ্ন দেখানো, তাদের নিয়ে এ ঠাট্টা? সেসময়ে সিবিল নিয়ে এমন প্রচার, তথ্যচিত্র, রেডিও এবং সংবাদপত্রে এমন হইচই কেন করা হয়েছিল। সেসময়ে তো হতাশা, বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের অন্ধকার। আমি মনে করি সরকারের মহান কীর্তি সেসময় সিবিলে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা ঘটেছে, এটি যত তাড়াতাড়ি সংশোধন করা যায়, ততই ভালো।

বহু কীর্তিত সেসময়ের অবস্থাই যদি এমন হয়, তাহলে অন্যান্য বন্ধুয়া-গ্রামের অবস্থা কি? শুধু জঙ্গল, যে জঙ্গল বনোন্নয়ন পর্ষদ ও ঠিকাদারের ষড়যন্ত্রে প্রত্যহ নির্মূল হচ্ছে, শুধু সেই জঙ্গলই পালামৌয়ের হতভাগ দের দিনান্তে তবু দুটো রুটি দেয়। এক বৃদ্ধ আস্তে বলেছিল, যব জঙ্গল গিয়া,

হয় লোগ ভি গিয়া।

এ কাহিনী শেষ হবে না, যদি না দুটি ঘটনার কথা বলি।

এক, ১৯৮১-র পয়লা মে, মে-দিবসে খারো গ্রামের এক ঘাটা চটা দেয়ালে অপটু হাতে চক খড়িতে লিখেছিলাম, সেমরা বন্ধুরা মুক্তি মোর্চা।

সেদিনই পালামৌ জেলা বন্ধুরা মুক্তি মোর্চার বীজ রোপিত হয়। কেননা এর পরে আর "সেমরা" নামটি থাকে নি, জেলা সংগঠনে এটি রূপ নেয়।

দুই, কেরার সময়ে নাগপুরনগরে শিবাজী ময়দানে দেখেছিলাম বামপন্থী রাজনীতিক দলগুলি মে-দিবস অনুষ্ঠান করছে। আমার বিশ্বাস ১৯৮১-তে প্রকৃত অর্থে মে দিবস ভারতের মাটিতে সেদিন খারো গ্রামে সবচেয়ে সততায় উদ্‌যাপিত হয়। কেননা ভারতের শোষিততম শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠন সেদিনই গড়েছিল।

[বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২৭.৩.১৯৮১। অনুবাদ : লেখক]

পালামৌ-এ মে দিবস ১৯৮৩

মহাশ্বেতা দেবী

রাঁচি পর্যন্ত যাত্রায় বৈচিত্র্য বিশেষ ছিল না। তবে দিন বড় কঠিন এখন। গৌতমধাড়া স্টেশনে এক আদিবাসী রমণীর কাছ থেকে পাকা কেন্দু আর করঞ্জা ফল কিনলাম—২০ পয়সায় এক ঠোঙা। কেন্দু মানে বিড়ি পাতার গাছ। কচি কচি পাতা দিয়ে বিড়ি বাঁধা হয়। একটা বড় কেন্দু গাছ গ্রামের গরিব মানুষের কাছে খুব দামী। জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় আর ফল। রাঁচি থেকে বাসে চেপে আমরা ডালটনগঞ্জ পৌঁছালাম বিকেল ৪-টের সময়। আমি, মৈত্রেয়, চন্দন, মহুয়া—কারোর কাছেই ডালটনগঞ্জ নতুন নয়। কিন্তু এবার আমরা এসেছি বিশেষ একটা উপলক্ষে। পয়লা মে পালামৌ জেলার বন্ধুয়া মজদুররা তাদের চৌপল বা সম্মেলন করছে এখানে বন্ধুয়া মজদুররা এদেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশি শোষিত। সুতরাং এই সম্মেলন এবার পালামৌ-র মে দিবসকে সত্যিকারের মজুর দিবস করে তুলতে পেরেছে।

মনে পড়ছে ১৯৮১-র পয়লা মে। পালামৌর অসহ্য গরম পরোয়া না করে আমরা চারজন কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও এটা-ওটা গাড়ি ধরে এসে পৌঁছেছিলাম চৈনপুর ব্লকের সেমরা গ্রামে। গ্রাম হিসাবে সেমরার নাম আছে। পাতেরা সেমরা গ্রামেই থাকে। আর তাদের বন্ধুয়ারা থাকে—দূরে ছোট ছোট টিলার ওপর 'টেলি'তে। এরকম একটা 'টেলি'তেই বন্ধুয়া সমিতির জন্ম হয়। প্রায় ৪০০ জন বন্ধুয়া এসেছিলেন। কাজটার মধ্যে সাহস ছিল, খুবই সাহসের কাজ। বন্ধুয়াদের বর্তমান বা আগের মালিকরা সকলেই বেশ ক্ষমতাবান লোক। কেউ কেউ গ্রামের সরপঞ্চ বা মুখিয়া। এটা একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার যে, বন্ধুয়াদের কল্যাণের জন্যে যাবতীয় সরকারী কাজকর্ম হয় এই সব লোকেরই হাত দিয়ে। সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য—যাতে বন্ধুয়ারা নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠে নিজেদের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে পারে। এটা জানা ছিল যে, এরকম একটা সমিতি করা মানে উঁচু-জাত মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ধুয়ারা এগিয়ে এসেছেন: একজনের মুখের কথায়: কি এসে যায়, যদি

মরি ? আমরা তো পোকামাকড়ের মতো মরছি। তবু জানব যে, আমার ছেলে বা নাতিপুতিরা অন্তত বন্ধুয়া হয়ে মরবে না ? অবশ্য বন্ধুয়া শব্দটা তিনি ব্যবহার করেন নি। পালামৌ-এ বন্ধুয়াদের বলা হয় 'সেওকিয়া' 'কামিয়া', 'হরোয়াহা' 'চরোয়াহা'। শেষের দুটো নাম রাখাল বা ঘুব খাটনির কাজ যারা করে তাদের জন্যে। 'বন্ধুয়া' কথাটার মানে 'বাঁধা'—বণ্ডেড।

সমিতি ওই বছর [১৯৮১] থেকেই কাজ শুরু করেছে। পালামৌ থেকে কাগজ বের করেন রামেশ্বর—"ইসুমান"—একমাত্র কাগজ যেখানে পালামৌর সমস্যার কথা থাকে। মঙ্গল ভুঁইয়া, বিরজু, চেতন, মুণ্ডা বন্ধুয়াদের সঙ্গে দেখা করেন। বলরাম তিওয়ারি নামে এক তরুণ অ্যাডভোকেট বন্ধুয়াদের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেন। মালিকদের বিরুদ্ধে সেই সব মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলে বহুকাল চাপা পড়েছিল। বলরামের হিসাব অনুযায়ী, এক হাজারেরও বেশি কেস আছে। সমিতি যে কতটা কাজ করেছে, এই সংখ্যাই তার প্রমাণ। ভয়াবহ অত্যাচারের পরোয়া না করে মাইলের পর মাইল হেঁটে ডালটনগঞ্জে গিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যে সব বন্ধুয়ারা, তাদের সেলাম !

১৯৮৩-তে আমরা পৌঁছেছিলাম ৩০ এপ্রিল। রাষ্ট্রীয় বন্ধুয়া সংঘর্ষ মোর্চার সভাপতি স্বামী অগ্নিবেশ আর আলমোড়ার 'জঙ্গল কে দাবিদার' পত্রিকার সম্পাদক পি. সি. তিওয়ারীও এসে পৌঁছল সেই রাতেই। বন্ধুয়ারা আসতে শুরু করেন পয়লা মে ভোর থেকে। চৌপলের অনুষ্ঠানটি হয় শিবাজী ময়দানের টাউন হলে। হলটি মহাত্মা গান্ধীর নামে চিহ্নিত। আর সম্ভবতঃ এই প্রথম গান্ধীজীর হরিজনেরা এই হলের ভেতরে পা দেওয়ার সুযোগ পেলেন। বেলা দশটার মধ্যে প্রায় ২০০০ বন্ধুয়া এসে পড়লেন। নারী-পুরুষ-শিশু। পুঁটলিতে ছাতু আর নুন। সম্মেলন শুরু হল। বন্ধুয়ারা মঞ্চে উঠলেন। তাঁরাই পরিচালনা করলেন সম্মেলন। একে একে মঞ্চের ওপর উঠে তাঁরা শোনালেন অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী। বিশেষভাবে সরব হতে শোনা গেল মহিলাদের। পাথালগাড়ওয়া-র ভেত্রি ভুঁইয়া এক সময় ১০ টাকা ধার নিয়েছিলেন চমরু সাহুর কাছ থেকে। ১০ বছর ধরে তিনি সাহুর কাছে খাটছেন। সাহুর হিসাবে, দেনা এখন শোধ হয়নি। 'সেওকিয়া' ব্যবস্থায় সুদ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আজকের ১০ টাকা কয়েক বছরের মধ্যে হাজার টাকা হয়ে দাঁড়ায়। চৌপলে

আপদে বলে তেত্রি তার মালিকের কাছে মার খেয়েছে। তবু সে এসেছে মংগরুর মুখে শোনা গেল চৈনপুর থানার কারসো গ্রামের কথা। মুখিয়া-সরপঞ্চরা সেখানে বন্ধুয়াদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। সেখানকার ২২ জন বন্ধুয়াকে মালিকরা রীতিমতো ভয় দেখিয়েছে—তবু তারা চৌপলে এসেছে। তারপর মঞ্চে এলেন বৃদ্ধ মোহম্মদ কাশিম। গ্রাম সোলে। জীবনে কোনদিন মুখ খোলার সুযোগ তার হয় নি। অনেক চেষ্টা করে থেমে থেমে বললেন কয়েকটি কথা। চৈনপুর রাজার আত্মীয় জগ্‌গা সিং ঠোকাদির কাছ থেকে ১০/১৫ টাকা ধার করেছিলেন তাঁর বাবা। ৪৫ বছর সিং এর কাছে খেটে তিনি মারা যান। মোহাম্মদ এখন খাটছেন সিং এর ছেলে তারামণির কাছে। ৩২ বছর ধরে। 'ধার' এখনও শোধ হয়নি। তারামণি সিং, শোনা যায়, পণ্ডিত লোক। লাইব্রেরিতে বইয়ের মধ্যে বসে থাকেন। তার ছেলে পীতাম্বরই জমিদারি দেখাশোনা করে। তারামণির ৩২ জন বন্ধুয়া আছে। তারা সবাই বাঁধা।

পালামৌতে এক বিশেষ ধরণের বন্ধুয়া আছে ধরমাকু। মালিক এখানে কোন আগাম ধারও দেয় না, স্রেফ গায়ের জোরেই কোন নিঃসহায় পুরুষ বা নারীকে বন্ধুয়া করে ফেলে। ভাণ্ডার গ্রামের [থানা বিশ্রামপুর] পাণ্ডেরা খুব শক্তিশালী লোক। ব্রাহ্মণ, তার ওপর আবার অনেকেই, যেমন বদরি পাণ্ডে, গ্রামের সরপঞ্চ। সীতা পাণ্ডে বন্ধুয়া করে রেখেছে তেত্রি ভুঁইয়াকে। অমরেশ পাণ্ডের বন্ধুয়া বিদেশী ভুঁইয়া। অমরেশ আবার বিদেশীর বাস্তুভিটেটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

মনে হতে পারে, মালিকরা কি বন্ধুয়া উচ্ছেদ অভিজ্ঞানের কথা (১৯৭৬) কিছুই জানে না? জানে। তারা বন্ধুয়াদের বলে, টাকা ফেরৎ দাও, ছাড়া পাবে। কিন্তু কত টাকা?

নানকু ভুইয়ার কাহিনী: তার পূর্বপুরুষেরা বদরি পাণ্ডের পূর্বপুরুষের কাছে ১৮০ টাকা ধার করেছিল। নানকু ৩০ বছর ধরে খেটে সেই ধার শুধছে। তার বাপ-ঠাকুরদা কত বছর খেটে ছিল, নানকু জানে না। বদরি তাকে বলেছে ৬০০ টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। ঠিক তেমনি এই রকম ১৮০ টাকা ধারের জন্যে অশোক পাণ্ডের কাছে তিন পুরুষ ধরে খাটছে বুড়া ভুঁইয়া। অশোক পাণ্ডের দাবি—৬০০ টাকা। এ রকম আরও কত কাহিনী। তালিকা করলে এক মাইল লম্বা হয়ে যাবে। ১৯৭৫-এ অভিজ্ঞান পাস হবার পরও আরও কয়েক শো মানুষ বন্ধুয়া হয়েছে এই

সাত বছরে।

ভারত সরকার কী সত্যিই সেওকিয়া আর কামিয়াদের মুক্তি দিতে চায়? যদি সত্যিই সে ইচ্ছে থাকে তো কেমন করে? মালিক মানে উঁচু-জাত ধনী লোক। তাদের গায়ে হাত দেওয়ার ইচ্ছে কি সরকারের আছে? রাস্তায় এমন একটা পোস্টার-ও তো দেখলাম না। রেডিও-র বন্ধুরা মুক্তি নিয়ে কোন অনুষ্ঠান হয়েছে বলেও শুনিনি। অথচ পালামৌ-এ বন্ধুয়া-মজদুর ব্যবস্থা এতই প্রকট, এতই নগ্ন যে বন্ধুয়া নয় এরকম একজন গরিব চাষি বন্ধুয়াকে হিংসে করে। কারণ?—কারণ একজন সেওকিয়া অন্তত দিনে একবার সামান্য "জলখাই" খেতে পায় মালিকের বাড়ি।

চৈনপুরের এক গরিব চাষি পালোয়ান পাসি। বচন সাহু তার ৭ ডেসিমেল জমির অর্ধেকটা নিতে চায়। বচনের মাথায় হঠাৎ এই খেয়ালটা চাপে ২ বছর আগে। তারপর সে পালোয়ানের বউয়ের একটা হাত ভেঙে দিয়েছে, আর পুড়িয়ে দিয়েছে পালোয়ানের গোলা আর কয়েকটা গাছ। বচনের মতো ক্ষমতাবান লোক অবশ্যই এ সব স্বীকার করে না। বলরাম ভিওয়ারির সহায়তায় পালোয়ান এখন বচনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে বলে আশা আছে। লিডকি গ্রামের বিশ্বনাথ ভুঁইয়া এখন খড়ের ঘরে থাকে। তার বাপ পুটু সিংহের কাছে ২০০ টাকা ধার নিয়েছিল। সিং বিশ্বনাথের জমি কেড়ে নিয়ে তাকে উচ্ছেদ করেছে। ভাদোই ভুঁইয়ার বাবা ১০০ টাকা ধার নিয়েছিল চমরা সাহুর কাছ থেকে। সাহু তার কোপড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। সে এখন সাহুর জমিতেই থাকে আর ২০ বছর ধরে তার বাছে, খাটছে।

এক সময় খেরওয়ার আর চোরা জনগোষ্ঠীরা ছিল পালামৌর রাজা। আজ তাদের অবস্থা, ক্রীতদাসের চেয়েও খারাপ। বিন্দনাথ সিং খেরোওয়ার জানালেন, তাদের নামে ছাগল, বলদ অনেক কিছুই মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু হাতে কিছুই আসে নি। সরপঞ্চ আর মুখিয়ারাই সব নিয়ে নেয়। ব্রাহ্মণরা তাদের নির্যাতন করে। "কার কাছে যাব? দয়া করে বলে দিন।"

সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধুয়ারা নাচ গান করলেন। গানে তাদেরই জীবনের কথা। একটি সুন্দর একাঙ্ক নাটক-ও হল বন্ধুয়াদের নিয়ে। পরের দিন দোসরা মে মিছিল। প্রায় এক হাজার বন্ধুয়া চলেছেন ডালটনগঞ্জের পথ দিয়ে। সামনে আছেন নারীরা। তাঁদের স্লোগান: 'কামানেওয়ালা

খাবেগা লুটনেওয়ালা যাবেগা / নয়াজমানা আবেগা' / রাস্তার ছোট দোকানদার ফেরিওলা আর জুতো পালিশওয়ালারা এই স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন। আর হতবাক হয়ে দেখেছেন ভদ্রলোকেরা—বড়লোকেরা—যাদের অনেকেই বন্ধুয়াদের মালিক। কী করতে চায় বন্ধুয়ারা? কী সাহস! প্রকাশ্যে দাবি তুলছে—বন্ধুয়া মজদুরি নেহী চলেগা। মিছিল আদালতে পৌঁছল। জেলা কমিশনার বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলেন সে মিছিলের। জানালেন, বন্ধুয়াদের তিনি সমস্ত রকম সাহায্য করবেন।

চৌপল শেষ হল রাতে। দোসরা মে-র বিকালে আর ৪ তারিখের সকালে আমরা দেখা করেছিলাম জেলা কমিশনারের সঙ্গে। আলোচনার বিষয় ছিল—কীভাবে বন্ধুয়াদের খুঁজে বের করে, মুক্তি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। কমিশনার সকল রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ফেরার সময় নানকু, ভেজি, চেতন আর জসীদরা এল বিদায় জানাতে। পালামৌ থেকে এবার আমি ফিরছি একটা আশা নিয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুয়া সমিতি সংগ্রামের একটা নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। চৌপল সফল হয়েছে, তার কারণ বন্ধুয়ারা আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে এই চৌপলে যোগ দিয়েছেন। বন্ধুয়ারা আজ জেগে উঠছেন। বিহারের এই ছোট শহরে আজ যেভাবে উদ্ঘাপিত হল মে দিবস—ভারতে তার কোন নজীর নেই। পুনশ্চ : এই চৌপলে বামপন্থী বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল যোগ দেয় নি। আমি দুঃখিত যে, একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তিনি আমার লেখার গুণমুগ্ধ পাঠক—চৌপলে আসেন নি, কিন্তু এক সাহিত্যের আসরে আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েকজন বামপন্থী টাউন হলে এসে জানতে চেয়েছিলেন বিকালে মে দিবসের প্যারেডে বন্ধুয়াদের পাওয়া যাবে কি না। এ অনুরোধ-ও আমরা রাখতে পারি নি।

মূল ইংরেজি রচনা : মহাশ্বেতা দেবী
অনুবাদ : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

[মূল রচনাটি ইংরেজী 'বিজনেস স্টাণ্ডার্ড' পত্রিকায় জুন' ৮৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সামান্য ছোট করে নেওয়া হয়েছে।]

'বনডেড লেবার' ঃ
দালাল খোঁজে ঠিকাদার,
ঠিকাদার খোঁজে 'খাতেদার'

মহাশ্বেতা দেবী

কিছুদিন আগে দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের উদ্যোগে এক আলোচনাসভা হয়। বিষয়বস্তু ছিল রাজ্যান্তরী আদিবাসী শ্রমিক। আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম সে সভায়। যাওয়া আমার হয়নি। যে কাগজটি পাঠাই তাই অবলম্বন করেই এই লেখাটি লিখছি।

আমার মনে হয়েছিল, আদিবাসী, আদিবাসী নন, এমন সব রাজ্যে রাজ্যে কর্মরত ভিনদেশী শ্রমিকের কথাই আলোচনার মধ্যে থাকা উচিত হত। এই আলোচনাচক্র হয় এমন সব শ্রমিকের সুবিধার্থে এক আইন প্রণয়ন হবার আগে। এটুকু ভরসা করতে পারি যে, আইন যখন হবে, তা সব শ্রমিকের জন্যেই হবে। শুধু আদিবাসীর জন্য নয়। আমি মনে করি, যাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক "রাজ্যান্তরী বা স্থানান্তরী আদিবাসী শ্রমিক" বলছেন, তাদের মধ্যে বহুজন আদিবাসী নন। আমি এও মনে করি যে, এঁরা সবাই হলেন ঠিকাদার দ্বারা সংগৃহীত ও নিযুক্ত শ্রমিক। ফুরন প্রথায় এঁরা নিযুক্ত হন। এই ঠিকাদারী ফুরন প্রথায় কৃষি ক্ষেত্রের ভূমিদাসদের মত নির্মমভাবে শ্রমিকদের শোষণ করা হচ্ছে। তাই, আমার মতে, ভূমিদাস মুক্তি আইনে নতুন ধারা যোগ করে এদের নিরাপদ করা উচিত। যদিও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ভূমিদাস ও ফুরন-শ্রমিক ঠিক এক বস্তু নয়।

"বনডেড লেবার" বা ভূমিদাস প্রথা যখন নিষেধ করা হয়, তখন উড়িষ্যা রাজ্য সরকার তা মেনে নিলেন কিন্তু কৌশল করে ওড়িশায় প্রচলিত দাদন-শ্রমিক প্রথা চালু রাখলেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সস্তায় মজুর খাটবে এমন লোকদের খোঁজে পুরী ও গঞ্জাম জেলায় দালাল ও ঠিকাদার ঘুরছে। গরিব লোকদের লোভ দেখিয়ে নানা রাজ্যে মজুর খাটতে নিয়ে যাচ্ছে।

দালাল খোঁজে ঠিকাদার। ঠিকাদার খোঁজে "খাতেদার"। এই খাতেদাররা গ্রামবাসী। তারা মজুর আনে। বলা হয় যে কাজ করতে

হবে ১০০ দিন। কাজ করবে ১০০ দিন পাবে মাসে সত্তর (৭০) টাকা, রোজ ১ কিলো চাল, বিনা ভাড়ায় থাকার ঘর, হপ্তায় ৫ টাকা পকেট খরচ ও যাওয়া আসার রেলভাড়া।

১৯৬১-১৯৭৬ উপরের রেট বহাল ছিল।

দাদনমজুরের সঙ্গে খাতেদারের চুক্তি হবে মুখের কথায়। কিন্তু ঠিকাদারের সুবিধার্থে দাদন শ্রমিক সাদা কাগজে টিপসই দেবে। গ্রাম ছেড়ে বেরোবার আগে শ্রমিকরা ৫০-১০০ টাকা অগ্রিম পাবে, যা তাদের মাইনে থেকে কাটা যাবার কথা।

কর্মস্থলে পৌঁছবার পর (ক) দাদনশ্রমিক কাজ করে ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা। এক ঘণ্টা খাবার ছুটি। (খ) এদের ভীষণ প্রহার করা হয়। (গ) সর্বদা এরা নজরবন্দী থাকে আর প্রস্রাব-পায়খানাও প্রকাশ্যে করতে হয়। (ঘ) পালাবার চেষ্টা করলে নির্যাতন বাড়ে আর অনেকে মরে যায়।

১৯৭১—১৯৭৫, খুরদার একটি গ্রামের ১৩জন দাদনশ্রমিক মরে গেছে। ১৯৭৪-৭৫, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশে ১৫ জন মরে গেছে। এরা ১০০ দিনের বেশি কাজ করতে বাধ্য হয়। দূরদূরান্তের দেশ থেকে এরা পালাতে পারে না। এদের বাড়তি শ্রম থেকে যে মুনাফা ওঠে তার ভাগ কর্মস্থলের ঠিকাদার, ওড়িশার ঠিকাদার ও খাতেদার পায়।

ঘৃণ্য দাদনশ্রমিক প্রথা ওড়িশায় চলছে। দাদনশ্রমিকরা এই নতুন আইনের মদত পাবে কি? এরা কেন যায়? কেননা পেটের ভাত মেলে না ওড়িশায়।

রাজস্থানের বাঁশোয়ারা জেলার গরিবরা, সজ্জনগড় থেকে প্রতি বছর গুজরাটে ইটভাটায় কাজ করতে যায়। ভাটা মালিকের দালাল ও ঠিকাদার এদেরকে কিছু টাকা দাদন দিয়ে যায় ও একজন টাকা খিলে তার পরিবারকে সুদ্ধ কাজ করতে নিয়ে যায়। বাঁশোয়ারা দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলা। গরিবদের না গিয়ে উপায় নাই।

নতুন আইন কি এদের মদত দেবে?

রাঁচি, সিংভূম এবং বিহারের অন্যত্র হতে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানার ইটভাটায় যে শ্রমিক আনা হয়, তাদের বিষয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছে। একথা বলা দরকার যে, ভাটা বন্ধ হবার পর কয়েকটি ভাটিক যুবতীর খবর পেলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ভাটায় হানা দেয়, মালিক ও সর্দারকে ধরে, মেয়েদের উদ্ধার করে দেশে পাঠায়।

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার চারপাশে ও অন্যত্র ইটভাটার মালিক ভিনরাজ্যের শ্রমিক খোঁজে কেন? তার কারণ, স্থানীয় পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী মজুর এমন ঘৃণ্য শর্তে এখন কাজ করবে না। ভাটা মালিকরা শ্রমিক আনে সরাসরি সর্দার নামের অধিবাসী মেয়েদের সাহায্যে। এই সর্দাররা মালিকের দাসানুদাস হয়ে গিয়েছে। এদের চেহারাটা বদলে যায়নি, অন্তরটা বদলে গিয়েছে। সর্দাররা এসব শ্রমিকদের আনে, নিজেরা মোটা টাকা পায়। ভাটা মালিকরা যুবতী শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনকে "ভাণ্ডারী" করে। ভাণ্ডারীরা মালিকদের সঙ্গে ঘুমাবে, তাদের রেঁধে দেবে ও গর্ভবতী হলেই দেশে ফেরত যাবে। রেজা বা মেয়ে মজুররা মালিক, মালিকের বন্ধুবান্ধব, মস্তান, লরি ড্রাইভার, এদের দেহদানে বাধ্য। ইট তৈরিতে লাভ কেমন? ১০০০ ভালো ইট তৈরির খরচ ১৪৯.৯৫ পয়সা, মজুরী খরচ ৬৭.২৫ পয়সা, বিক্রি অন্তত ৪৫০ টাকা। মজুররা পাবে শুধু পেট খোরাকির খরচ ও ঘরে ফেরার রেল টিকিট। এবছর যারা ভাটায় আসছে তাদের কথা জানি না। ১৯৮১ সালের জুন মাসে যারা ভাটা থেকে ঘরে ফিরেছে, তাদের বাসস্থান, শৌচব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা সবই ছিল শুওরের খোঁয়াড়ের মত। এরা কোন পূজাপরবে ছুটি পায়নি। ১২ ঘণ্টা কাজ করেছে, পানীয় জল পায়নি। তবু এরা আসে, আসছে। কেননা দেশে এদের ভাত জোটে না।

একটি ইটভাটা মানে জমির উর্বরতা শত শত বছরের মত নষ্ট। শস্যক্ষেত্র বন্ধ্যা হয়, চিমনির উত্তাপে গাছপালা ঝলসে যায়, মদের ভাঁটি ও বেশ্যাবৃত্তি ব্যাপক হয়। গ্রামের জীবন অভিশপ্ত হয়।

নতুন আইন কি এদের বাঁচাবে?

এই ঘটনাটি জানুন।'

উত্তরপ্রদেশের বলবীর সিং ও রবীন সিং কল্যাণী, কাঁকুড়গাছি, বম্বে, বাঙ্গালোর ও তামিলনাড়ুতে কারখানা করেছে। সেখানে ছাঁট লোহা থেকে লৌহ ইনগট তৈরী হয়। কল্যাণীর কারখানা ও মজুরটোলি ভীষণ উঁচু পাঁচিল ঘেরা। সেখানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের ১১৫ মজুর ১৪ ঘণ্টা কাজ করে। সশস্ত্র শান্ত্রী এদের পাহারা দেয়। মালিকরা মজুরটোলির প্রবেশ পথে বাল্ব মৌমাছি চাষ করে। মজুররা কথামতো ঘণ্টা পিছু ১—১.২৫ পয়সা পায় না। বাইরের লোকদের সঙ্গে কথা বলা বারণ। সশস্ত্র শান্ত্রী এদের সঙ্গে কল্যাণী বাজারে যায়।

এদের নিয়োগ কার্ড নাই। বাড়ীর চিঠি মালিকের ইচ্ছামতো হাতে পায়। কল্যাণী ও কাঁকুড়গাছিতে এদের ২ দিন অন্তর চালাচালি করা হয়। মালিক এদের মারে। পিঠে ইট বেঁধে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখে। মৌমাছি বাক্সের কাছে বেঁধে মৌমাছি লেলিয়ে দেয়। উলঙ্গ করে কারখানায় ঘোরায়। মহেন্দ্র পাঠক নামে এক মজুর সিটু ইউনিয়নে দরবার করলে ২৮-২-৮১ তারিখে সিটুর ডাকে কারখানা হরতাল হয়। এই সিং এ্যালয়েজ এ্যাণ্ড ষ্টীল লিঃ-র মালিক, শ্রমিক, সিটু সদস্য এক আলোচনায় বসার দিন ঠিক হয় ২২-৩-৮১। কিন্তু ৫-৩-৮১তে মজুররা যখন সন্ধ্যায় রান্না করছে, তখন বর্শা, ছোরা, ফুটন্ত জল ভর্তি বালতি সহ কিছু গুণ্ডা তাদের আক্রমণ করে। নরনারায়ণ মাল্লাজী নিহত হয়। বহুজন গুরুতর জখম হয়। পুলিশ বলবীর, রবীন ও একজন শান্ত্রীকে ধরে। এরা জামিনে খালাস পায়।

এই যে কল্যাণী সিং এ্যালয়েজ এ্যাণ্ড ষ্টীল লিঃ এমন কারখানা সর্বত্র আছে। হাজার হাজার কারখানা শ্রমিকের রক্তে চলছে শ্রম দপ্তরীয় সব বিধি কানুন উপেক্ষা করে।

ঠিকাদারের ও দালালের আনীত মজুরে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ প্রকল্প ও নির্মাণের কাজ চলছে। সেখানে মজুররা কি পাচ্ছে ? নতুন আইন কি এদের কোন নিরাপত্তা দেবে ?

আমি পরের লেখায় পাঞ্জাবে দাস কেনার কিছু ঘটনা বলব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশে খামার-মালিকরা নগদ টাকায় বিহারের গরিবদের দাস হিসাবে কেনে, এ এক নির্মম পরিহাস নয় কি ? অথচ আমাদের বুঝানো হয় যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই। আইন এ দেশে কাগজের শোভা। আদিবাসী ও আদিবাসী নয় যারা, সে সব গরিব, অসহায়, দুঃখী মানুষ কোনদিন আইন হতে সাহায্য পায়নি এবং তারা আইনকে বিশ্বাস করে না। তবু আইন যখন হচ্ছে, তখন আমার বিনীত প্রস্তাব জানাই।

১) ফুরনবদ্ধ মজুর সাধারণত অগ্রিম দাদন নিয়ে অনম শর্তে কাজ করে। এই দাদনকে ঋণ বলে ধরলে এদেরকে বনডেড লেবারার বলে বিবেচনা করা যায়। আমার বক্তব্য, বনডেড লেবারারের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত ও উদার করা হোক।

২) ফুরনবদ্ধ মজুরকে চুক্তি থেকে মুক্তি দেওয়া যথেষ্ট নয়। আমার পরিচিত সেমরা গ্রামে গিয়েছিলাম। বিহারের পালামৌ জেলায় চৈনপুর

ব্লকের সেমরা গ্রামের বনডেড লেবারারদের মুক্ত করার ঘটনাটি প্রচুর বিজ্ঞাপিত হয়। কাগজের লেখায় তারা মুক্ত হয়। বাস ও কৃষি জমি পায়। হাল-বলদ বীজ ও টাকা পায়। বাস্তবে তারা কিছুই পায় নাই। প্রায় সকলে ফিরে গেছে নতুন করে দাসত্বের বন্ধনে।...কেন-না আইন কার্যকর করা হয়নি।

৩) যাঁরা বলছেন যে ঠিকাদার সংগৃহীত মজুরদের স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া চলবে না, তারা কি যুক্তি দেখাচ্ছেন তা আমি জানি না। রাজ্যে আমূল ভূমি সংস্কার করে এঁদের বাঁচার ব্যবস্থা করা নিশ্চয় চূড়ান্ত সমাধানে। কিন্তু সে তো বহু সংগ্রাম সাপেক্ষ। তাই আমি মনে করি, রাজ্যে রাজ্যে ছড়ান মজুরের নিরাপত্তার জন্য এখনি বহু ব্যবস্থা দরকার।

ক) এদের বনডেড লেবারার বলা হোক। কিন্তু ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুর সংগ্রহ যেহেতু ভারতবর্ষে আজ সর্বত্র চলছে, সেহেতু সরকারী, বেসরকারী, পাবলিক সেক্টর, সমস্ত নির্মাণ প্রকল্প, ইটভাটা, খনি, কৃষি খামার, যেখানেই ঠিকাদার মজুর আছে, সেখানেই ঠিকাদারদের নাম রেজেস্ট্রি করতে হবে।

খ) সকল ঠিকাদার, দালাল, সর্দার, খাতেদার, নিয়োগকর্তা যে রাজ্য থেকে মজুর আনছে ও যে জায়গায় কাজে লাগাচ্ছে, দুই জায়গায় শ্রম ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নাম রেজেস্ট্রি করাবে

গ) সে থানা থেকে মজুর আসছে ও যে থানার অধীন এলাকায় মজুর যাচ্ছে, দুই জায়গার থানাতে প্রতি মজুরের পিতা বা স্বামীর নাম, বয়স, গ্রামের নাম, ঠিকাদারের নাম, মালিকের নাম, প্রতিশ্রুত মজুরি, কাজের দৈনন্দিন সময়, সব লেখাতে হবে। এই নিয়মে দুই জায়গার শ্রম দপ্তরেও সব লেখাতে হবে।

ঘ) শ্রম দপ্তর দেখবে যে একজন ভারতীয় শ্রমিক যে সব অধিকারে অধিকারী, এরা যেন তা পায়। যেমন ন্যূনতম মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, বাসস্থান, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ, বোনাস, স্ত্রী শ্রমিকদের বিশেষ ছুটি (মাতৃত্ব), শিশু শ্রমিক বিষয়ক সুযোগ-সুবিধে, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার।

ঙ) দৈহিক নির্যাতন ঘটলে নির্যাতনকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। আমরা, সাধারণ শিক্ষিত সচেতন মানুষরা সকলেই জানি কি কি করা দরকার। আবার এ কথাও জানি যে দুষ্কৃতকারী অত্যাচারী মালিক

সর্বদা বেঁচে যায়। রাষ্ট্রমন্ত্রককে অনুরোধ, যাদের হাতে আইন-শৃঙ্খলার ভার, তারা বছরে একদিনও কাজের কাজ করবে, এমন কথা তাঁরা দিতে পারেন কি-না ভাবুন। মালিকরা শ্রমিকরা শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করবে এবং মালিকরাই আইনের মদত পাবে, এই দেখেই স্বাধীন ভারতের নাগরিক অভ্যস্ত। এই আইন প্রণয়নের পরও তাই চলবে তো? শুধু আইনের জন্য আইন প্রণয়নের কোন যুক্তি আছে কি? স্বাধীনতার পর আমরা আইন অনেক দেখলাম। এখন আমরা কাজ দেখতে ইচ্ছা করি

বীরভূম পাঞ্জাব

মহাশ্বেতা দেবী

(দুই)

অন্য রাজ্য থেকে ঠিকাদার বা দালালের মাধ্যমে মজুর নিয়ে গিয়ে যেভাবে তাদের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালানো হয়, তা বাঙালী পাঠক সব সময়ে জানতে পারেন না।

রাঁচির হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য সংস্থায় বহু পাঞ্জাব প্রদেশের লোক আছেন। পাঞ্জাব থেকে কৃষি খামার ও ইটভাটা মালিকরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরা হয় স্থানীয় দালাল। তারপর এরা গ্রামে যায়-আসে এমন দালালকে খবর দেয়। সেই লোক মজুর জোগাড় করে। মালিকের কাছ থেকে প্রতি মজুর পিছু স্থানীয় দালাল পায় ২০০-৩০০ টাকা, গ্রামের দালাল পায় ১৫০-১০০ টাকা। রাঁচি ও সিংভূম, দুই জেলাই গরীব। ব্যাপারটি বেশ মজার, তাই নয়? দুটি জেলা, বিশেষ সিংভূম, খনিজ ও অরণ্য, দুই সম্পদে অত্যন্ত ধনী। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, এদের কোটি কোটি টাকা দেয় সিংভূম। আর এই দুই জেলার লোকরা শুধু পেট ভরে খেতে পাবে বলে টাটা-অমৃতসর মেলে চেপে বসে। তারপর তারা পৌঁছায় টাণ্ডাওয়ালা, রাজপুরা, জলন্ধর, অমৃতসর, লুধিয়ানা। যাবার কালে দালাল, রেল পুলিশ ও কালেক্টরকে ঘুষ দিয়ে বিনা টিকিটে এদের নেয়।

পাঞ্জাবে পৌঁছলে টিকিট কালেক্টর ও জি আর পি এদেরকে মারধর করে বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য এবং তারপর এদের সঙ্গের টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে পাঞ্জাবী মালিকদের হাতে তুলে দেয়। অর্থাৎ বিহার ও পাঞ্জাবের মধ্যে এভাবে বেআইনী ক্রীতদাস চালাচালি চলে। তার মধ্যে রেল দপ্তর, স্থানীয় দালাল, গ্রামীণ দালাল, সকলের বখরা থাকে।

মালিক কেন সানন্দে এদের টাকা দিয়ে খুশি রাখে? তা এখন বোঝা যাবে।

(এক) দারোগা রাউতিয়া, পিতা দুনু রাউতিয়া, গ্রাম ও ডাক রাইকেরা, থানা বানো, জেলা রাঁচি। গ্রামীণ দালাল শিবশঙ্কর সাহ

দারোগাকে ফরিদকোট জেলার নারানা সিংয়ের কাছে ৩০০ টাকায় বিক্রি করে দেয়। বছরখানেক বাদে রাইকেরা গ্রামে দারোগার স্ত্রী বিরসি এক চিঠি পায়। তাতে জানা যায়, দারোগাকে রোজ মারা হয়। খেতে দেওয়া হয় না। রাঁচি কেমন করে যাবে তা জানে না বলে সে আসতে পারছে না। এর পর দারোগার প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ চিঠি লেখে যে দারোগাকে রোজ ১৬—১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়েছে। পালাবার চেষ্টা করলে তাকে মেরে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। পালিয়ে গিয়ে সে আখের ক্ষেতে লুকায়। তিন দিন বাদে ধরে এনে নারানার বাড়ির লোকেরা তাকে একই সঙ্গে মারতে ও গরম লোহা দিয়ে পোড়াতে থাকে। ফলে সে ২০-৫-৮১ তারিখে মারা গেছে। নারানা সিং এক তারিখহীন চিঠিতে জানায়, দারোগা মারা গেছে। বিরসিকে ৫০০ টাকা পাঠানো হচ্ছে দারোগার বেতন বাবদ।

(দুই) ডেমো চিক নামে গ্রামীণ দালাল, বানো থানা, রাঁচি জেলার জোরোবোরি গ্রামের লোকনাথ হরিজন (২৫), তার স্ত্রী সোমবারি (২০) ও শিশু সন্তানকে ফিরোজপুর জেলার জোহনেরা বস্তি গ্রামের কার্ণাল সিংয়ের কাছে বেচে দেয়। কার্ণাল সিং বলে, লোকনাথকে মাসে ১০০ এবং সোমবারিকে ৩০ টাকা এবং দু'জনকে খেতে দেবে। সকাল চারটা থেকে আটটা অবধি লোকনাথ গো-শালায় কাজ করত। আটটা থেকে রাত আটটা অবধি গমের ক্ষেতে। সোমবারি সকাল চারটা থেকে গো-শালা ও বাড়ি ঝাঁট দিত, যুঁটত, বাসন মাজত, কাপড় কাচত, তারপর আখের ক্ষেতে কাজ করত। কার্ণাল সোমবারিকে প্রত্যহ ধর্ষণও করত। সোমবারির গর্ভ হলে গর্ভ নষ্ট করা হয়। ৯ মাস বাদে লোকনাথ ও সোমবারি কাজ ছেড়ে দেয়। ৯ মাসের পাওনা ১১৭০-এর জায়গায় ওরা ৫০০ টাকা পায়।

(তিন) বানো থানার হারানি গ্রামের দালাল ভাগু সাহু, গুরুমোহন বাউতিয়া (২৮), তার স্ত্রী রত্নি (২২) ও তাদের তিন সন্তানকে পাঞ্জাবে হরিপুর গ্রাম, জেলা ফিরোজপুর নিবাসী সর্দার নিরঞ্জন সিংয়ের কাছে ৪০০ টাকায় বেচে দেয়। নিরঞ্জনের বিদ্যুৎচালিত পাম্প ও কাপড় ধোলাই কল এবং ট্র্যাক্টর আছে। গুরুর মাস বেতন ৮০ ও রত্নির ৪০ টাকা ঠিক হয়। ২নং উদাহরণের মতই এদের কাজের সময়ও ১৬—১৮ ঘণ্টা দাঁড়ায়। রত্নি তার সন্তানদের নিয়ে আখের ক্ষেতে যেত। সেখানে ক্ষেত পাহারা দেবার চালাঘরে নিরঞ্জন, তার পরিবারের অন্য পুরুষরা, তার বন্ধুরা,

সন্তানদের সামনেই রতনিকে রোজ ধর্ষণ করত চার মাসের মধ্যে রতনির গর্ভ নষ্ট করা হয় এবং স্থানীয় ক্ষেত মজুরদের সহায়তায় গুরু ও রতনি অন্ধকার রাতে পালায়। সে অবধি তারা একটি টাকাও পায় নি। এর পর তারা জোহানের বস্তির কার্পাল সিংয়ের কাজ নেয়। এখানে তারা একভাবেই ১৬—১৮, ঘন্টা খাটে, কার্পাল সিং রতনিকে ধর্ষণ করে। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাবে ? গুরু ও রতনি সব সহ্য করতে বাধ্য হয় ১ মাস বাদে তারা পালায়। কোসা গ্রামের সর্দার প্রীতম সিংয়ের কাছে। ১৬—১৮ ঘন্টা শ্রম ও রতনিকে ধর্ষণ এখানেও হয়। ১২ দিন বাদে হোসিয়ারপুরে সর্দার জ্ঞান সিংয়ের কাছে কাজ নেয়। সেখানে চার মাস একই অবস্থায় কাজ করে। রতনি ধর্ষিতা হয় তারপর যায় কাপুরতলার বাদালা গ্রামের সর্দার সরবন সিংয়ের কাছে। সরবন তাদের একই নির্মমতায় খাটায়। তবে রতনিকে সে স্পর্শ করে নি। স্বামী, স্ত্রী, তিন ছেলেমেয়েকে সে প্রচুর খেতে দিয়েছে। এক মাস বাদে সরবনের আত্মীয় এক তরুণ সর্দার রতনিকে ধর্ষণ করে। গুরু ও রতনি সরবন প্রদত্ত ১৫০ টাকা নিয়ে ফিরে যায় দেশে।

(চার) ভেমো চিক রমেশ রাউতিয়া (১০)কে ৩০০ টাকায় ফিরোজপুর জেলার পাইক বস্তি গ্রামের সর্দার রঘুবীর সিংয়ের কাছে ৩০০ টাকায় বেচে দেয়। মাইনে ৩০ টাকা। রমেশের কাজ হয় মালিকের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছানো এবং আনা, ঘুরে ঘুরে দুধ বেচা ও টাকা আনা, গৃহপালিত পশুর খড় কুচানো, ক্ষেতমজুরদের খাবার পৌঁছানো ও অন্যান্য কাজ। বাড়ির পুরুষরা রমেশকে সমকামলালসার শিকার করে। দু' বছর বাদে মাত্র ৩০০ টাকা হাতে নিয়ে রমেশ ঘরে ফেরে।

(পাঁচ) আগে উল্লেখিত শিবশংকর সাহ ফিরোজপুর জেলার কেন্দুর বস্তি গ্রামের বান্টা সিংয়ের কাছে মিশ্র, রাউতিয়াকে ৩০০ টাকায় বেচে দেয়। পনের দিন বাদে বান্টা সিং মিশ্রকে ৫০০ টাকায় পারক বস্তির মাখন সিংকে বেচে দেয়। ঘরে ফেরার কালে মিশ্র ৮৭০ টাকার (প্রতিশ্রুত মাইনে) ৬০০ টাকা পায়।

(ছয়) শিবশংকর সাহ যাকে বিক্রি করে, সেই ছোটো রাউতিয়া বলেছে. "১৬—১৮ বয়সী কুড়িজন তরুণকে শিবশংকর একসঙ্গে নিয়ে যায় ও কেন্দুর বস্তির বান্টা সিং পাইকারী দরে আমাদের কেনে। শিবশংকর আমাদের জন্য মাথা পিছু ২০০-৩০০ টাকা পায়। আমরা আট দিন ১৬—১৮ ঘন্টা

মালিকের গম ক্ষেতে কাজ করি ১০টি শুকনা রুটি খেয়ে। তারপর পাবক বস্তির সর্দার জাটা সিং আমাকে ৩০ টাকার কেনে। আমার বেতন ধার্য হয় মাসে ১০০ টাকা। আট মাস আমি ১৬—১৮ ঘণ্টা প্রত্যহ কাজ করি, মাইনে পাই না। মারধোর, উপবাস ও নির্যাতন ছিল নিত্য সঙ্গী। সেখান থেকে পালিয়ে আমি যাই ফিরোজপুরের সাপ্তেওয়ালা গ্রামের প্রীতম সিংয়ের কাছে। ১০০ টাকা মাইনে ঠিক হয়। তিন মাস ১৬-১৮ ঘণ্টা দৈনিক কাজ করি। বাড়ির বড় থেকে ছোট সকলেই আমাকে মারত প্রত্যহ। রাতে পশুর মত তালা বন্ধ করে রাখত। তিন মাস বাদে আমি ১০০ টাকা হাতে পাই। তারপর পালাই। আরেকজন দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং আমরা কোনমতে দেশে ফিরে আসি।"

এবার বলি,—

(ক) এইসব দাস মানুষরা হাতে ১০০, ১৫০, ৩০০ টাকা পেয়েছে মানে তারা রেল টিকিট বা বেলভাড়া, জামা-কাপড় কিছুই পায়নি।

(খ) নীচের তালিকাটি বুঝিয়ে দেবে কেন পাঞ্জাবের মালিকরা পাঞ্জাবের ক্ষেত-মজুরকে বঞ্চিত করে দাস দিয়ে কাজ করায়। কেন স্থানীয় (রাঁচির) দালাল ও গ্রামীণ দালালকে অত টাকা দিলেও তার লাভ থাকে। ১৯৮০ সালের লুধিয়ানার প্রচলিত হার—

১ একরে	গম চাষের মজুরী	৭৫ টাকা
১ একরে	ধান রোপণ	১১৫ টাকা
১ একরে	ধান কাটা/মাড়াই	১৮৪ টাকা

দাস মজুর আসার হার	সমগ্র পাঞ্জাব	লুধিয়ানা
১৯৭২	৪৫%	৫·২০%
১৯৮০	৩৪·৭%	৪০ ৫১%

পাঞ্জাবে ক্ষেত মজুরের মজুরী

ফসল কাটা ১০·৫০ (বা পাঃ) ন্যূনতম মজুরী ১৭·৫৫, দাস মজুর ১০ ০৮, ফসল মাড়াই ১১·৩৩ (যা পাঞ্জাবের ক্ষেতমজুর আদায় করেছে), ন্যূনতম মজুরী ১১·০০, দাস মজুর ১১·১২

মজা হল, পাঞ্জাবের ক্ষেতমজুর নিলে উপরের হারে দিতে হবে। দাস মজুরদের বেলা উপরের হার শুধু খাতায় থাকবে। হাতে সে কিছু পাবে না।

গ) খুব লক্ষণীয় হল, পাঞ্জাবের ক্ষেতমজুরেরা এই বাইরের মজুরদের

বিষয়ে সহানুভূতি রাখে তাদের নিজেদের কাজ পাবার অসুবিধা থাকলেও এদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। পশ্চিমবঙ্গেও ইটভাটার বাইরের মজুরদের বিষয়ে অঞ্চলের মজুররা সহানুভূতি রাখে। পাঞ্জাবের ক্ষেত-মজুরদের ইতিবাচক ভূমিকার জন্য পাঞ্জাবে মালিকরা ক্ষুব্ধ।

৬) পাঞ্জাবের খামার মালিকরা যথেষ্ট ধনী, বিদেশে তাদের যাতায়াত যথেষ্ট। পাঞ্জাবের ক্ষেতমজুর ঠিক আট ঘণ্টা কাজ করবে ও বেশি মজুরী নেবে। দাস মজুর ১৬ ঘণ্টা খাটবে পেট ঘোরাকে। পাঞ্জাবের খামার মালিকরা কৃষি উন্নয়ন করছে বলে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার তাদের মদত দেয়। দাসমজুর রাখলে তার মুনাফা বাড়ে।

আমাদের রেশনে পাঞ্জাব থেকে আনীত প্রতি গমের দানায় থাকে দাসমজুরের রক্ত। দেশী-বিদেশী পত্রিকায়, তথ্যচিত্রে পাঞ্জাবের খামার মালিকদের জয়গান গাওয়া হয়। পাঞ্জাব মানে হোটেল-ব্যবসা, খেলাধুলা, সেনা বিভাগ, নানা ব্যবসা ও ঠিকাদারী।

পাঞ্জাবের কৃষিসমৃদ্ধি মানে দাসমজুরের রক্ত। কেন দাসমজুররা আসে? কেন না দেশে তাদের ভাত জোটে না।

যেসব অঞ্চলের মজুরদের কথা বলেছি, সেসব অঞ্চলের ভয়াবহ দারিদ্র্যের কথা পরে কখনো বলব।

পশ্চিমবঙ্গের লোধা শবর

মহাশ্বেতা দেবী

লোধাদের সবথেকে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায়। যতদিন এখানে বনভূমি ছিল, তারা শিকারী হিসাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বর্তমানে অবিরাম, নির্মম বন উচ্ছেদের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে আজ তারা বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সময়ের নাগপাশে ধরা পড়ে কোনোমতে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ছে, হেরে যাচ্ছে, তবু লড়ছে। সংখ্যায় কম হবার ফলে তারা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও অসহায় বোধ করছে। এই ধরণের মানসিকতা পুরুলিয়ার খেড়িয়া, বিরহড় এবং পাহাড়িয়া প্রভৃতিদের মধ্যেও প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলির এই ক্ষুদ্র উপজাতিদের অস্তিত্ব অবহেলা করার অন্যতম কারণ হোল এদের মধ্যে ভোটারসংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার। নিম্নসংখ্যক হবার ফলে এরা কোন দলের কাজে লাগছে না। যখন লোধা হত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মাত্র কয়েকদিনের জন্য লোধারা সংবাদপত্রের পাতায় "সংবাদ" হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি যে রাজ্যের কোন রাজনৈতিক দল এই হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে প্রহ্লাদ ভক্তা লোধাদের মধ্যে একমাত্র স্নাতক। সে নিয়মিত আমার পত্রিকা "বর্তিকা"-র জন্য লেখে। সর্বপ্রথম তার লেখা থেকেই আমি লোধাদের সম্পর্কে জানতে পারি। ১৯৭১ সালে আমার বাবা মৃত্যুর পরে আমি 'বর্তিকা' (জেলা সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক) সম্পাদনার ভার নিই। বাবার জীবিত অবস্থায় বর্তিকা বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হোত। আমি যখন বর্তিকার বিষয় সম্পূর্ণ বদল করে সমাজের নিম্ন ও অবহেলিত মানুষদের জন্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করলাম তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম যে ভারতীয় জনগণ যদি নিরক্ষর বা কম শিক্ষিতও হয়, তারা কখনোই সভ্যতা, জ্ঞানবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতায় হীন নয়। সুতরাং বর্তিকাকে আমি তাদের হাতে তুলে দিলাম। বর্তিকাতে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রামসমীক্ষা বা কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, ক্ষুদ্র কৃষক বা বিড়িওয়ালাদের জীবন, ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি

সমস্তই প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ওদের লেখা। যারা আমাকে এই সমস্ত লেখা দিয়ে সাহায্য করেছে, তাদের লেখার পদ্ধতি বা ভাষা কোনটাই আমি পরিবর্তন করে অনুসন্ধান করিনি। 'সমাজের সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার কথা নিজের ভাষাতেই লিখে জানাবে। সমাজের শিক্ষিত লেখকরা তাতে বাধা সৃষ্টি করবে না'—বর্তিকার এই উদ্দেশ্য আজ অনেকাংশেই সফল হয়েছে। বর্তিকার অন্যান্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ ভক্ত অবশ্যই একজন বিশিষ্ট লেখক। একজন লোধার মুখ থেকে তার নিজের ঘটনা শোনার ফলে আমি স্বভাবতই উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। প্রহ্লাদ তার সমাজের সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটিয়েছিল লোধাদের দেখে আমার মনে হয়েছে তারা বুদ্ধিমান, বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং অবশ্যই বড় মাপের হৃদয়ের অধিকারী। আমার সমস্ত চিন্তাধারাই আজ তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রীয় সরকারের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী লোধা এবং খেড়িয়াদের একই উপজাতি হিসাবে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু খেড়িয়ারা লোধাদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া উপজাতি : ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী লোধা ও খেড়িয়া মিলে জনসংখ্যা ছিল ৪৩,১০৬ জন। এর মধ্যে লোধার সংখ্যা ছিল ৩৪,০০০। এই জনসংখ্যা অবশ্যই ১৯৮১ সালে এক থাকবে না, যদিও পরিবর্তন হবে খুব সামান্য। এই দুই উপজাতিই বিশেষ করে লোধারা যুগের পর যুগ ধরে সন্ত্রাসিত ও নির্যাতিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে। এর প্রতিফলন অবশ্যই তাদের জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করেছে। লোধাদের জন্মের হার আশানুরূপ বাড়ছে না। ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা গণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে লোধা খেড়িয়াদের মধ্যে কেবলমাত্র ৪'০৯ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছে। মাধ্যমিক বা তার থেকে ওপরে পাশের হার ০'৩১ শতাংশ। এদের মধ্যে মাত্র ১৮,৩৭৯ জন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে। সকলের মধ্যে বিশেষত লোধারা চরমতম দরিদ্র। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে এক লোধা যুবক কর্তৃক নিম্নলিখিত গ্রামসমীক্ষাটি আমার বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করেছে।

গ্রামের নাম—সাঁখারীডাঙ্গা
লোধা বাস্তু—৮৮টি
কৃষিযোগ্য জমি—১৪ ডেসিমেল থেকে ১ একর
৫৯ জন লোক।

মোট ভূমিহীন—২১ জন
বাস্তুভূমি নেই—১৮ জনের
মোট জনসংখ্যা— ৪৭০ জন
ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় —৩৩ জন
মজুরী পায়—১৬৪ জন
মাসে ১৫ টাকা রোজগার করে— ১৬ জন
৩০ —১৩০
৪৫ — ১৬
৫০ ,, — ২ ,,

সাঁথারীডাঙ্গা একটি লোধাগ্রাম। লোধাদের মিশ্র জনবাসে বাস করতে দেখা গেলেও তারা সাধারণত মহল্লা বা টোলীতেই বসবাস করে থাকে। লোধারা নিজেদের লোকেদের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে। লোধাদের জীবনে দারিদ্র্যই একমাত্র অভিশাপ নয়। ব্রিটিশরা একসময় এদের "অপরাধপ্রবণ" বলে আখ্যা দিয়েছিল এবং সাধারণ মানুষেরা আজও তাদের সেই চোখেই দেখে। যখনই কোন জায়গায় চুরি বা ডাকাতি হয়, পুলিশরা লোধাদের ঘরে পীড়ন করে। পুলিশ এবং প্রশাসন ভালো করেই জানে যে এই সমস্ত চুরিডাকাতির পেছনে গ্রামের উচ্চ স্তরের বড়লোকদের হাত আছে। কিন্তু লোধারা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। কেবলমাত্র সামান্য কিছু সংখ্যক লোধাই অপরাধকার্যে লিপ্ত আছে। অপরাধ এখন একটা শিল্পের আকার ধারণ করেছে। চোরাই মাল বেচাকেনা করাই প্রকৃত অপরাধ। কিন্তু এই কাজে যারা লিপ্ত থাকে তারা সাধারণত বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী হওয়ার ফলে পুলিশ তাদের ছুঁতেও পারে না। যখন চুরির ঘটনা বাড়ে, তখন লোধাদের হত্যা করা হয়। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করেছে এই অপরাধে ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ঝাড়গ্রামের কাছে তিনটি গ্রামে ছয়জন লোধাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু লোধাদের সম্পর্কে এই ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ বানানো গল্প। পাশের একটি গ্রামের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে আসল অপরাধী। কিন্তু কেউই সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়নি, কারণ লোধাদের সাহায্য করার জন্য কেউ নেই। লোধা হত্যা পশ্চিমবঙ্গে একটি নিয়মিত ঘটনা। যেমন,

১) ১৯৭৯ সালে ১০ জন লোধাকে পাইন রা হত্যা করা হয়।
২) ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে ৬ জনকে হত্যা করা হয় এবং

৮ জনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।

৩) ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঝাড়গ্রাম নুনমুনি গেছিয়াতে ২ জনকে হত্যা করা হয়।

৪) ১৯৮২ সালে মার্চ মাসে শাকপাড়া গ্রামে একজন লোধাকে মেরে ফেলা হয়।

৫) সরো, বাসবানপা এবং চাকুয়া গ্রামে ১৯৮২ সালের জুন মাসে ৬ জন লোধাকে হত্যা করা হয়।

এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ জানায়নি। কোন একটি ক্ষেত্রেও হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করা হয়নি। যারা লোধা হবার জন্যই আমরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা তাদের হত্যা করি অথচ হরিজন হত্যা, ইত্যাদির জন্য পাশের রাজ্যগুলোর সমালোচনা করে থাকি। লোধারা কি শুধুই অপরাধী! হত্যা এবং লুঠতরাজ আজ পশ্চিমবঙ্গে একটি নিয়মিত ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় লোধাদের বসবাস নেই। তাহলে শুধুমাত্র লোধাদেরই কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়? লুঠতরাজ বা অন্যান্য অপরাধ যদি আজকে লোধাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে তাহলে তারা আজও এত গরীব কেন? এ কাহিনী বড় জটিল। এ কথা গ্রামবাসীরাও স্বীকার করে যে চুরি বা ডাকাতির জন্য শুধুমাত্র লোধাদেরই প্রকৃত দোষী বলে মনে করা উচিত নয়। অথচ আশ্চর্য্যের কথা যে এরা নিজেরাও লোধা হত্যায় অংশ নেয়। জেলা প্রশাসন অথবা কলকাতার উচ্চপদস্থ বিভাগগুলি এই সমস্যার কথা ভাল করে ভেবে দেখেননি এবং সমাধানের কোন চেষ্টাও করেননি। লোধা হত্যা হবার পরে সেই জায়গায় একটা অস্থায়ী পুলিশ ছাউনি পড়ে। শোকগ্রস্ত পরিবারকে কিছু সাহায্য করা হয়। তারপর সবাই সে ঘটনা ভুলে যায় যতদিন না আবার কোন লোধা হত্যার ঘটনা ঘটছে। আমি শুধুমাত্র হত্যার ঘটনা উল্লেখ করেছি — উন্মত্ত জনতার দ্বারা যে সমস্ত লোধারা অন্ধ, পঙ্গু ও নিপীড়িত হচ্ছে, তাদের কথা আমি উল্লেখ করিনি।

আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে অন্যরা সবসময় লোধাদের সম্পর্কে কথা বলে। আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি ও সচেতনতা থেকে মনে হয়েছে যে লোধাদের কথা লোধাদের নিজেদের মুখ থেকে বলতে দিলেই সবথেকে ভাল হয়। আমার লোধাদের দেখে মনে হয়েছে তারা বুদ্ধিমান এবং সচেতন হবার ফলে নিজেদের কথা বলতে পারবে। যখন আমি জানতে পারলাম

যে তারা এক সময় লোধা-সবর উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করে রেজিস্ট্রি পর্যন্ত করিয়েছিল। আমি তাদের সেই সংস্থা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্যোগ নিতে বললাম।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জন্য যে নীতি নিয়েছেন, তাঁদেরকে হাততোলা করে রেখে দেবার সে নীতি একেবারে ভুল। এ নীতি হল, "আমরা যতটুকু দেব, তোমরা ততটুকু হাত পেতে নেবে।" ওদের জন্যে যে সব প্রকল্প, ওদেরকে তা রূপায়ণে কাজ করতে দিতে হবে। লোধা, বিরহড়, খেড়িয়া, পাহাড়িয়া, এদেরকে যদি বিশ্বাস করা না হয়, কোনো দায়িত্ব দেয়া না হয়। তারা কেমন করে আত্মবিশ্বাস পাবে, দায়িত্ববান হবে? তার ভালোর জন্যে যে সব প্রকল্প রচনা করা হচ্ছে, সেই কাজেও তার বুদ্ধি নিতে হবে। সাধারণত এ সব প্রকল্প তাঁরাই রচনা করেন যাঁরা জানেন না, বা জানার দরকারও বোধ করেন না যে আদিবাসী বাস্তবিক কি চায়, কি তার প্রয়োজন। যাঁরা নিরমে প্রকল্প রচিত হয়, তারপর সেটি ঠিকাদারের হাতে তুলে দেয়া হয়। আদিবাসীদের জন্য গৃহীত স্কীম থেকে কারবা কে তোলে তা পাঠকরা ভালোই বুঝবেন। লোধাকে কেন জিগ্যেস করা হয় না, কিসে তার অভাব মিটবে, কি তার প্রয়োজন? কেন স্বল্প ব্যয়ে রূপায়ণযোগ্য ছোট ছোট স্কীম তৈরি করা হয় না? স্কীম রূপায়ণ কালে তো মজুর চাই। লোধাদের দিয়ে ছোট ছোট শ্রমিক-সমবায় তৈরি করিয়ে তাদের দিয়ে কাজগুলি কেন করানো হয় না? শিক্ষাপ্রাপ্ত লোধারা এমন সব সমবায়ের সাহায্যে নিরক্ষর লোধা মজুর দিয়ে স্কীমগুলি রূপায়িত করতে যথেষ্ট পারেন। লোধাদের জন্যে ঠিকাদাররা যে সব ঘরদোর করেছেন, সে আমি দেখেছি। তেমন ঘরের চেয়ে বড়সড় মাটির ঘর অনেক ভালো। যেই ঠিক হল যে পাকা ঘর তৈরি হবে, সেই সিমেন্ট, ইট ও বালির সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদার মক্কে প্রবেশ করবেই করবে।

এতে লাভবান হয় কে?

লোধারা তো কখনোই নয়। তিন দশকের বেশি সময় ধরে লোধার নামে বিশাল অঙ্কে টাকা খরচ হচ্ছে তো হচ্ছেই, আর লোধারা দারিদ্র সীমার তল থেকে অতলে নামছে তো নামছেই। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন ডোম ও লোধাদের জন্য ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সত্যাভিহি, পিঙ্গলকাঁটি ও পোরিহাটিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দুই সারি অতি পলকা কুঁড়ে ঘর তৈরি হয়। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হন, ঘটনাটির

সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁরা সবাই এমন ভাব দেখান, যে পর্বতের মূষিক প্রসব দেখে তাঁরা বড়ই বেদনাহত। ব্যস, ওই পর্যন্তই। সমাজের নিম্ন স্তরের গরিবদের জন্যে রচিত স্কীম নিয়ে এ দেশে যার যা ইচ্ছে তাই করে বেরিয়ে যেতে পারে। ১৯৮২ সালে রাজ্য সরকারের জনৈক কর্তাব্যক্তিকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, "লোধাদের বক্তব্য ওদের ডেকে শুনুন, ওরা যে সব ছোট ছোট স্কীম করবে, সামান্য খরচে সেগুলি ওরাই রূপায়িত করবে।" তিনি আমার কথা তবু শুনলেন, কিন্তু আরেক উচ্চ ক্ষমতাশীল স্পষ্টই বললেন, লোধারা চোর ডাকাত। ওদের হাতে পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি তাঁকে জবাব দিই যে লোধার জন্যে বরাদ্দ টাকা মারছে ধূর্ত ঠিকাদাররা, এবং এ কাজে তাদের সাহায্য করছে সরকারী কর্মচারীরা, পঞ্চায়েত এবং রাজনীতিক দলের লোকেরা। (লোধাদের বিষয়ে এমন সব চিঠিরই কপি আমি রেখে দিয়েছি)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিয়মানুসারে প্রতিটি লোধা বসতি ও গ্রাম আই. টি. ডি. পি. স্কীমের আওতাভুক্ত। এই বহুল প্রচারিত ও মহানকীর্তিত আই. টি. ডি. পি. ব্যাপারটি বাস্তবে সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে, কেননা বাস্তবিক লোধারা তো কিছুই পায় না। কিন্তু লোধারা তো প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে মরিয়া, তাই তারা এ সব স্কীম চায়। স্কীম লোধার দোর গোড়া অবধি পৌঁছয় না, কেন না সেগুলিকে কার্যকরী করাই হয় না। এখন লোধারা নিজেরাই যে-যার গ্রাম সমীক্ষার কাজে নেমেছে এবং আমাকে তাদের রিপোর্টগুলি পাঠাচ্ছে। আমি একটি রিপোর্টের কথা বলি।

গ্রামের নাম মাধবপুর। থানা ও ব্লক নারায়ণগড়। লোধা পরিবার বত্রিশ (৩২)। জনসংখ্যা নিরানব্বই (৯৯)। সম্পূর্ণ ভূমিহীন বারোটি পরিবার। সতেরোটি পরিবার খাস জমি পেয়েছে। স্কুলে যায় তেইশটি ছেলেমেয়ে। স্কুল থেকে ওরা বই, টিফিন, জামাকাপড়, শ্লেট, কিছুই পায় না। সতেরোটি পরিবার পিছু মাসিক আয় ত্রিশ (৩০) টাকা; বারোটি পরিবার পিছু মাসিক আয় ষাট (৬০) টাকা। একটি পরিবারের মাসিক আয় কুড়ি (২০) টাকা, একটির একশো পঁচিশ টাকা (১২৫), একটি পরিবারের দুজনই বেকার, কোনো আয় নেই। যখন পরিবারে মানুষ ছয়জন, এবং পরিবারের আয় মাসে ষাট (৬০) টাকা, তখন এটাই তো স্বাভাবিক যে লোধা শিশু সাত বছর বয়স হলেই ছাগল গরু চরাবে বা অন্য কাজ করবে, স্কুলে সে যাবে না। যদি বা কোনো লোধা শিশু স্কুলে

যায়. সাধারণত অন্য জাতির শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, বিদ্রূপও করেন। কতবার আমাকে লোধা ঘরের জননীরা বলেছে, আমাদের গ্রামের স্কুলে সাঁওতাল বা লোধা শিক্ষক পাঠাও। উচ্চজাতের মাষ্টাররা আমাদে ছেলেদের ঘেন্না করে। তারা আমাদের ছেলেদের দিয়ে বাগানের কাজ করায়, জল টানায়।

সত্যি বলতে কি লেদামারা গ্রামে গিয়ে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। সেখানে গরিব বাপ-মা লোধা ছেলেমেয়েদের আর স্কুলে পাঠায় না। কেননা চার বছর যাওয়ার পরেও তাদের ছেলেমেয়েদের বর্ণপরিচয়টাও সঠিক ভাবে হয়নি। এটা একটা তিক্ত এবং অপ্রিয় সত্য, যে এই রাজ্যেও, বিশেষ করে আদিবাসী এলাকায়, শিক্ষক যখন আদিবাসী নন, তখন গরিব আদিবাসী ছেলে পড়তে এলে, তিনি ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। পশ্চিমবঙ্গে এটাও ঘটনা, যে আদিবাসী এলাকায় দেখা যাবে শিক্ষা ও যোগ্যতাসম্পন্ন আদিবাসী ছেলেমেয়ে বেকার আছেন, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকরা অন্যজাতির। পশ্চাৎপদ গরিবতম জেলা পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ও অন্যান্য আদিবাসী ব্লকে বহু স্কুল শুধু নামেই আছে। শিক্ষকও আসে না, স্কুলও চলে না।

শাঁখারিডাঙ্গা ও মাধবপুর হল লোধা গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তার মধ্যে দুটি। সরকারী নিয়মে তো লোধা হলেই সে স্কীম সাহায্য পাবে। কিন্তু বাস্তবে, লোধার কোনো অধিকারই নেই। সুধীর নায়েক আর সুরেন প্রামাণিক নামে দুটি লোধা ছেলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পড়তে পারে, জামসল ও লখিয়াসলে দুটি নৈশ বিদ্যালয় চালাতে পারে, কিন্তু যেই দুটি স্কুলে শিক্ষক পদ মঞ্জুর হল, সেই অন্যজাতের শিক্ষক বহাল হলেন। ঘরোচাটি-জামসল গ্রামে সমবেত চেষ্টায় লোধারা মাছ চাষের জন্যে একটি পুকুর কিনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা মালিক লোধাদেরকে বেচবেন না। এই পুকুরটি লোধাদের জল, মাছ জোগাতে পারে। এর চার পাড়ে তাঁরা সবজি আবাদও করতে পারেন। লোধাদের দাবী, সরকার পুকুরটি কিনে দিন, ওরা মৎস্যচাষী সমবায় করে মাছ চাষ করবে। মালিক নারাজ।

পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের অবস্থাটা যে কি, তা বোঝা যাবে লোধা হত্যার পিছনে "কেন" এবং "কেমন করে" এ ব্যাপারগুলি তলিয়ে দেখলে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে নারায়ণগড় থানার গনুয়া গ্রামে, চোর সন্দেহে ছয়জন লোধাকে হত্যা করা হয়. চারজনকে পঙ্গু করে দেয়া হয়। নিহতদের মধ্যে কয়েকজনকে জীয়ন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

উর্ধ্বসীমার বাইরে যে জমি, রাজ্য সরকার কি বৃহৎ জমিমালিকদের সে জমি হস্তান্তরে বাধ্য করতে পেরেছেন? এ প্রশ্নের জবাব মেলা বড়ো কঠিন। তবে কোথাও কোথাও লোধা ও অন্যান্য গরিবরা কিছু কিছু যৎসামান্য ভেস্ট জমি পেয়েছেন। যাঁর জমি, সেই ক্ষুব্ধ জোতদারটি অন্য ভূমিহীন গরিবদের উসকানি দিয়ে ধান কাটার সময়ে লোধাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন। নয়াগ্রাম থানাতেই ১৯৭৯ সালে ঘটে লজ্জাকর পাতিনা লোধা হত্যা। ওখানকার পুরনো ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যাবে যে একসময়ে ওখানে ধনী জমিমালিকরা বহু জায়গায় ব্যাপক হারে সাঁওতাল ভাগচাষী উচ্ছেদ করে লোধাদের ভাগে জমি দেন। তাঁরা জানতেন যে সাঁওতালরা সংখ্যায় অনেক, তারা যেমন ঐক্যবদ্ধ তেমন লড়াকু। ভাগচাষী হিসেবে জমিতে স্বত্ব পাবার ব্যাপারটি আইন হয়ে গেলে ওদের সরানো সহজ হবে না। লোধাদের জমি দেবার সুবিধে হল, ওরা নিঃস্ব কাঙাল। জমিতে ভাগস্বত্ব দাবী করবার সাহস ওদের হবে না এবং যৎসামান্য ফসল বা মজুরি দিয়ে ওদের চোখ রাঙিয়ে কাজ করানো যাবে। ফল লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালসহ অন্যদের মধ্যে একটা বিদ্বেষের বীজ বোনা গেল। আবার ওই অঞ্চলের চোরাই মালের ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা একদিকে লোধাদের একাংশকে অপরাধকর্মে নিযুক্ত রাখল, অন্যদিকে "লোধা জাতটাই চোর" এমন মনোভাবও জনজীবনে জাগিয়ে দেয়া গেল। ১৯৭৯ সালে পাতিনায় লোধারা চোরাই মাল ক্রেতাদের কাছে আশ্রয় নিতেই ছুটে এসেছিল।

১৯৮২ সালে কেশিয়াড়ি থানার খেজুরকুটি-পারিজাতপুর গ্রামে লোধারা যখন সরকারের কাছে প্রাপ্ত জমির ধান কাটতে যায়, তখন জমির প্রাক্তন মালিকরা গরিব কোরা আদিবাসীদের লোধাদের উপর লেলিয়ে দেয়। ফলে একজন লোধা নিহত হয়, বেশ কিছু জন জখম হয়। ১৯৮২ সালের জুলাই মাসে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত সরো, বাঘরাঁপা ও চাকুয়া গ্রামে হিংস্র জনতার আক্রমণে ছয়জন লোধা নিহত হয়। এর পিছনে যে কাহিনী জানা যায়, তা চমকপ্রদ। প্রকৃত ব্যাপার ছিল নিকটবর্তী চন্দ্রী গ্রামের ধনী জমিমালিকদের জমি অধিগ্রহণ করে কিছু লোধাকে জমি দান। ওই অঞ্চলের সকল গরিবই কমবেশি ওই গ্রামের ধনীদের ওপর নির্ভরশীল। ওই হত্যাকাণ্ডের প্রধান নায়ক যিনি, তিনি কিছু লোধাকে দিয়ে চুরিডাকাতি করিয়ে মাল কিনতেন। ইনি লোধাদের শিক্ষা দিতে চান, একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে চান তাঁর এক পরিত্যক্তা রক্ষিতা প্রৌঢ়াকে, যে নাকি বেজায়

পোলমাল করছিল। এঁর বেতনভোগী কিছু লোক জঙ্গলে মেয়েটির উপর অত্যাচার করে। একদিন কেটে যায়। তারপর এঁর নায়কত্বে প্রচার হয় যে লোধারা শুধু চুরি করে ক্ষান্ত নয়, মেয়েটিকে তারাই ধর্ষণ করেছে। ইনিই জিপগাড়ি ভুলে এক হিংস্র জনতা নিয়ে এসে লোধাদের কাটেন। সমগ্র ব্যাপারটি প্রকাশ পায় তাঁরই বেতনভোগী একজনের মুখ থেকে। প্রকাশ পায়নি এক নির্মম সত্যও। জানা যায়, যে হতভাগিনী প্রৌঢ়াটি আদপে ধর্ষিতাই হয়নি। আমি যখন যাই, তখন ঝাড়গ্রামে আপামর জনসাধারণ বলেছিল, লোধারা ধর্ষণ করেছে, এ তারা বিশ্বাস করে না। সরো, বাঘবাঁপা ও চাকুয়াতে যা দেখেছি, যা শুনেছি তা আর নাই বা বললাম।

একটিবারও কোনো রাজনীতিক দল লোধা হত্যার প্রতিবাদ করেনি। কখনো সততা ও আন্তরিকতায় সাঁওতালদের কেউ বোঝায়নি, যে লোধা তার শত্রু নয়। শত্রু হল চোরাই মালের ব্যবসায়ীরা, ধনী জমিদারেরা, যারা পরিবেশ পরিবেশ লড়িয়ে দিয়ে কারবার গুছায়। সাঁওতালদের আজ এই রূঢ় সত্য বুঝতে হবে, যে শুধু সাঁওতাল নয়, সমগ্র আদিবাসী সমাজের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। সংখ্যালঘু আদিবাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া মানে অন্যের ঘরে লাভের ফসল তুলে দেয়া। আদিবাসী সমাজে যত অনৈক্য থাকবে, কায়েমি স্বার্থের ততই ভাল হবে। সংখ্যাগুরু সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুণ্ডা জাতির কর্তব্য, সংখ্যালঘু লোধা, খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, কোরা, মাহালি, এদেরকে ভরসা দিয়ে কাছে এনে আদিবাসী ঐক্য গঠন করা। লোধা যদি সাঁওতাল ঘরে চুরি করে, সাঁওতাল যদি লোধাকে কাটে, তা থেকে যে লাভবান হয়, সে কিন্তু আদিবাসী নয়। আদিবাসী অনৈক্য তার স্বার্থকেই পুষ্ট করে।

লোধা সমস্যার সমাধান কি? লোধারা নিজেরা সে বিষয়ে কি বলছে, তা আমি পরবর্তী প্রবন্ধে বলব। তবে বহু ব্যয়সাধ্য বৃহৎ পরিকল্পনা দিয়ে সমাধান আসবে না। শুনেছি যে লোধা নিয়ে অনেক চিন্তা করে রাজ্য সরকার নাকি ঝাড়গ্রামের কাছে বৃন্দাবনপুরে একটি বাঁজা, কাঁকুরে, জলহীন জমিতে কয়েকটি লোধা পরিবারকে বসত করাতে চান। ওই রুক্ষ প্রান্তরে নাকি কাজু বাদামের চাষ হবে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সেটা হবে সরকারী অর্থের অপচয়। এমন প্রকল্পের জন্য লাখ টাকা দিয়ে নিশ্চয় অন্য কাজ করা যায়। কাজু চাষ লাভজনক হতে পারে, কিন্তু যতদিন না গাছ বড় হচ্ছে, ফল দিচ্ছে, ততদিন লোধারা খাবে কি? অল্প টাকার ছোট

স্কীমই ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে ভালো। অজস্র টাকার বৃহৎ প্রকল্প করতে যাওয়া অবাস্তব।

পুরুলিয়াতে সংথ্যালঘু খেড়িয়াশবররা জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্রের সহায়তায় ছোট ছোট স্কীম নিজেরা কেমন উদ্যোগে রূপায়িত করছেন, তা তো আমি দেখেছি। পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্র এমন সব প্রকল্প সংথ্যাল্প বিরহড় ও পাহাড়িয়াদের জন্যও তৈরি করছেন। লোধারা তুলনায় খেড়িয়াদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। বৃহত্তর জনসমাজের পাশাপাশি শতাধিক কাল বসবাস করছেন বলে লোধারা বর্তমান রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিতে শিখেছেন। লোধা জানে যে আজ আর অরণ্যজননী তাকে বাঁচাবে না, কেন না অরণ্য নেই। সে এ কথাও জানে যে মাছ ধরে, চাষ করে, ছাগল পালন করে সে আজও বেঁচে থাকতে সক্ষম। দুঃখের কথা হল, লোধা যা জানে, সে কথা তার মুখ থেকে কেউ শুনতে পায় না। লোধা যেহেতু আদিবাসী, সে হেতু তাকে করুণার দানের জন্যে হাত পেতেই থাকতে হবে। পণ্ডিতরাই প্রকল্প রচনা করবেন এবং ঠিকাদাররাই কাজগুলি করবে।

এই নৈরাশ্যজনক চিত্র এবং মাঝে মাঝে লোধা হত্যা, এতকাল ধরে এই ছিল লোধা কাহিনী। কিন্তু লোধারা নিজেরাই লোধা কাহিনীটি নতুন করে লিখতে চায়। আজ লোধা জাতির অস্তিত্ব থাকবে, না মুছে যাবে, তা প্রধানত নির্ভর করছে লোধাদের উপর, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিষ্ঠ আদিবাসী জাতিগুলির শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতার উপর।

(মূল ইংরেজী রচনা ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলিতে ২৮-৫-১৯৮০-তে প্রকাশিত। বঙ্গানুবাদ লেখক ও সমীক ঘোষ)।

পশ্চিমবঙ্গের লোধাশবর (২)

মহাশ্বেতা দেবী

লোধারা মনে করে তাদের জাতির আদি পিতা ও আদি জননী হলেন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শবর রাজা কালকেতু ও তাঁর পত্নী ফুল্লরা। ষোড়শ শতকের মহান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে ব্যাধখণ্ডে কালকেতু কাহিনী গভীর মমতায় লিখেছেন। কিন্তু এটাও বুঝে দেখতে হবে যে এর উপাদান তিনি সেদিনের জঙ্গল ঢাকা রাঢ় দেশের লোকবৃত্ত থেকেই পেয়ে থাকবেন।

লোধাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীটি সামান্য অন্য রকম। অরণ্য মাতৃকা, উর্বরতাদায়িনী দেবী অরণ্যচণ্ডীর আশীর্বাদে ব্যাধ কালকেতু রাজা হলেন। কিন্তু ধূর্ত ও কৌশলী বহিরাগতদের কূট চক্রান্তে কালকেতু রাজ্য খোয়ালেন, শবররা আবার গরিব হয়ে পড়ল। কিন্তু অরণ্যমাতৃকা শবরদের শরণচ্যুত করলেন না। তাদের জন্য রইল বনের পশু পাখি, পাতা, ফল, ফুল, কাঠ, কন্দ, মূল, মধু, ধুনা, ওষধিলতা গাছ। যে সকল লৌকিক দেবদেবী গাছপালা ও পশুপাখিকে রক্ষা করেন ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে শবরদের বাঁচান, তাঁদের পূজা করেন লোধারা। অনেক মন্দিরে দেখা যাবে লোধাই পুরোহিত, এবং সকল জাতির মানুষ দেবতার আশীর্বাদ কামনা করে লোধার হাত দিয়ে পূজা দেয়াচ্ছেন। বম্বে রোডে গুপ্তপিণ্ডে বড়াম মায়ের মন্দিরটি অতি বিখ্যাত। ওই পথের সব যানবাহন দেবীর ভরসা করে পথ চলে। স্থানীয় লোক বিশ্বাস করেন, যে ড্রাইভার গাড়ি, বাস বা লরির গতি কমিয়ে মন্দিরে প্রণামী ছুঁড়ে দিতে ভুলে যাবেন, তিনি দুর্ঘটনায় পড়বেন। লোধারা ব্রাহ্মণদের মানেন না। লোধা শবররা মনে করেন, জগন্নাথ বিগ্রহ একদিন লোধাদের কাছেই পূজা পেতেন। ধূর্ত ব্রাহ্মণ সুকৌশলে শবর পুরোহিতের সুন্দরী যুবতী কন্যার মন জয় করল। তারপর বিগ্রহ চুরি করে অরণ্যশবরীকে বিয়ে করে পালিয়ে গেল। লোধারা আজও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন না। লোধা জাতি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব উপেক্ষা করে চলে, সে জন্যও উচ্চ জাতির গ্রামীণ মানুষ লোধাদের বিষয়ে এতটা উগ্র কি না, তা ভাববার কথা।

ব্রাহ্মণরা জগন্নাথকে না হয় "চুরি" করে নিয়ে যায়। একজন মহাক্রোধী লৌকিক দেবতা। রাঙাহাড়ি-বিষয়চণ্ডী না কি স্বেচ্ছায় সাঁওতাল পুরোহিতকে ছেড়ে লোধা পুরোহিতের কাছে চলে আসেন। লোধারা বলেন, এ ঘটনা ঘটেছিল নয়াগ্রাম থানার জামসল গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছিল। চরকা সাঁওতাল যথেষ্ট যত্নে রাঙাহাড়িকে পূজা করতেন, কিন্তু কোনো কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে দেবতা বেছে নিলেন রাঙা ভক্তা নামক লোধাকে। এ দেবতা যখন ক্ষেপে যান, তখন তিনি "গিরান" নামে এক পিশাচের রূপ ধরেন এবং লোধার শরীরে ঢুকে তার কলিজা কাটিয়ে রক্ত চুষে খেয়ে নেন বলে লোধাদের অনেকের বিশ্বাস। তবে অন্য অর্থে এই রক্তপিপাসু গিরান তো লোধা জীবনে এক বাস্তব সত্য। লোধার জীবনের উপর হুমকি তো থাকেই, কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে।

গত বছর কাপাসগেড়িয়া গ্রামের এক যুবক লখিয়াসল গ্রামের এক লোধা যুবতীকে ধর্ষণ করে। লখিয়াসলের লোধারা স্থানীয় রাজনীতিক নেতার কাছে গিয়ে বিচার চাইল। নেতা অপরাধী যুবককে আটশো পঁচিশ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দিলেন, কেন না সে লোধা মেয়েটিকে বিয়ে করল না। লোধারা এমন বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে পরে রাজনীতিক নেতা ক্ষেপে গেলেন। লোধারা পঞ্চায়েত থেকে আর কাজ পায় না, রেশনে পায় না কেরোসিন। লোধারা সমবেত হয়ে সিদ্ধান্তে এল যে সমগ্র ব্যাপারটির জন্যে একা মেয়েটিকে দোষী করা অন্যায়, সে কথা তারা মেয়ের বাবাকেও জানাল। ব্যাপারটাকে ওই নেতা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি বলে ধরে নিলেন। অতএব ক্রুদ্ধ নেতা একদল সশস্ত্র আদিবাসী নিয়ে লোধাদের ভয় দেখাতে এলেন এবং ওদের পাঁচশো (৫০০) টাকা জরিমানা করলেন। সন্ত্রস্ত, মৃত্যুভয়ে ভীত লোধারা এই মানুষ গিরানকে তিনশো (৩০০) টাকা দিয়ে শান্ত করল। ফলে ওদের যার যা ছিল, বেচতে হল। এক হতভাগ্য লোধার একমাত্র গর্বের জিনিস এক পুরনো সাইকেল, তাও নামমাত্র টাকায় বাঁধা দিতে হল।

এরপরেও কথা থাকে। কতবার কত লোধা আমাকে বলেছে যে বর্তমান রাজ্যসরকার ক্ষমতায় আসার পর পুলিশী হানা ও নির্যাতন খানিক কমেছে। আগে মার খাবার ও ধরা পড়ার ভয়ে চাষী মজুর লোধা পুরুষরাও জঙ্গলে ঘুমাত। এখন তারা রাতে বাড়িতে থাকতে পারছে।

পুলিশের ক্ষেত্রে "ধর লোধাকে, মার লোধাকে" একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আমি মনে করিনা এ চিত্র খুব একটা পালটেছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অপ্রীতিকর বা অপরাধমূলক কিছু ঘটলে প্রথমেই সন্দেহ পড়ে লোধার উপরে। একটি নিন্দনীয় ঘটনার কথা বলি। আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর গাড়িটি কে বা কাহারা পথে অবরোধ করেছিল। পরদিনই খবর বেরোল যে এ জন্য তেরজন (১৩) লোধাকে ধরা হয়েছে। ওই পথটি চুরি, ছিনতাই ও সশস্ত্র ডাকাতির নিত্য দর্শক। ব্যাপারটা আইন শৃঙ্খলার অভাব। এটা লোধাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ নয়, তারা যেমন বলেছে, তেমন লিখছি। অপরাধ কর্মে নিযুক্ত লোধারা চুরি, ডাকাতি করে, তবে তা ছোট মাপের। আজ অবধি তারা তেমন অপরাধ করে নি, যার জন্য ঠাণ্ডা মাথা, পরামর্শ, সংগঠন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লাগে। লোধা জাতির স্বভাব বৈশিষ্ট্য হল ওরা লাজুক, ভিতরচাপা, বাইরের জগত বিষয়ে বড় ভীত সন্ত্রস্ত।

যখন সে নিজ সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে, তখনো লোধা নিরাপদ নয় ১৯৮৩-র ২১শে মার্চ চারটি লোধা ছেলে প্রহ্লাদ ভুক্তার বাড়ি যাচ্ছিল লোধাশবর কল্যাণ সমিতি নিয়ে কথা বলতে। ওদের একজন ছিল মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সে সময়েই ঘটনাক্রমে কাছাকাছি কোনো গ্রামে চুরি হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশজন লোক এই চারটি ছেলেকে ধরে, তাদেরকে কৃষকসভার সেক্রেটারির কাছে নিয়ে যায় এবং তাদের বাড়ি তল্লাসী করা হয়। তল্লাসীর ব্যাপারটি লোধাদের কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়। লোধা মেয়েরা তীর ধনুক হাতে প্রতিবাদ করতে বেরিয়ে আসে। তা দেখে কৃষকসভা সেক্রেটারি এবং অন্যেরা পালান। তারপর দুই গ্রামের কৃষকসভার দুই সেক্রেটারি এক মিটিং ডাকেন, (ক) তাঁদের দলভুক্ত লোধাদের পার্টিবিরোধী আচরণের জন্যে অভিযুক্ত করেন; (খ) ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের লোধা সেক্রেটারিকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন; (গ) বলেন, যে কোথাও আশেপাশে চুরি হলেই লোধা ঘরে তল্লাসী হবে, সে জন্য কোনো কারণ দর্শানো হবে না।

আজ লোধারা পশ্চিমবাংলে ক্ষমতাসীন বৃহত্তম দলের সমর্থক হতে পারে। কিন্তু গ্রামে যাঁরা এই দলের প্রতিনিধি, তেমন অনেক ভদ্রলোক বাবু এখনো সুযোগ পেলেই লোধাকে বুঝিয়ে দেন, লোধা যেন ভুলে না যায় যে তারা অপরাধপ্রবণ জাতি। আজ তারা সরকারী রেকর্ডে "বিমুক্ত জাতি" বলে

উল্লেখিত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তারা যেমন ব্যবহার পায় তা এমন অবমাননাকর ও অমানবিক, যে সরকারী ঘোষণাটির কোনো মানে হয় না। গিন্নান, লোধার রক্তপিপাসু গিন্নান, সে যে শতরূপে ফেরে।

গ্রামের প্রভাবশালী চোরাইমাল কারবারীরাই হচ্ছেন ভীষণতম গিন্নান। এরা সব সময়ে লোধাদের পিছনে লেগে থাকে। লোধা যদি চুরি করতে নারাজ হয়, এরা ওদের পুলিশ ও গণপ্রহারের ভয় দেখায়। লোধা জেলে গেলে কখনো উকিল দিয়ে, কখনো দুঃস্থ পরিবারকে কিছু সাহায্য করে এরা বুঝিয়ে দেয় যে আপৎকালে আমি ছাড়া তোর কেউ নেই।

শুনেছি যে নয়াগ্রাম থানার পাতিনা, ফুলঝরি, চামারবাঁধ এ সব গ্রামে চোরাইমাল রিসিভার কিছু আছেন। সিংধুই এবং অন্যান্য গ্রামের লোকেরা মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে পাতিনাতেই দৌড়েছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালের সেই রক্তাক্ত দিনে (নিহত আঠারো) লোধাদের চোরাই মালে ধনী রিসিভাররা এদেরকে আশ্রয় দেয় নি।

লোধাদের এবং আদিবাসীদের আবাসিক ব্যবস্থা বা হস্টেলের বা চেহারা কেমন? ডেবরা থানার চকসাহাপুর হস্টেলে সতেরোটি লোধা ছেলে এবং তিনটি সাঁওতাল ছেলে থাকত। সুপার নিরঞ্জন ভক্ত জানিয়েছিলেন যে ঘরটি জীর্ণ, বর্ষাকালে দেয়ালের ফাটলে সাপ ঘোরে। একবার রাতে একটি বালককে সাপ কামড়েছিল। সে বহু প্রার্থনা করেছে, পঞ্চায়েতের লোকজন ও অন্যান্য অফিসাররা বহু পরিদর্শন করেছেন, কোনো সুরাহা হয়নি। অবশ্য গ্রামে গ্রামে আদিবাসী হস্টেলের অবস্থা এমনই, কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

তবু, লোধা ও অন্য গরিব প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে হস্টেল ব্যবস্থা হলেই তবেই ওরা স্কুলে যেতে পারবে। লোধা শিক্ষার্থীর নিজের ইচ্ছা থাকলেও পড়া চালানো বড় কঠিন। সরকারের ও সমাজের কাছে অবহেলা পেতে পেতে লোধা জাতি নিজের বিষয়েও নিরাশ ও উদাসীন হয়ে পড়েছে। হতাশার অন্ধকারে এ জাতি যেন ডুবে যাচ্ছে। একবার এক লোধা জননী আমাকে বলেছিল, তুমি কি ভরসা দিতে পারো যে আমার ছেলে বুড়ো হবে? তার আগেই কাটা পড়বে না?

আমি জবাব দিতে পারিনি। ১৯৮২ জুলাইয়ে সরো গ্রামে মীরু নামে একটি নিষ্পাপ, উজ্জ্বল তরুণ নিহত হয়। তার শাশুড়ি আমাকে বলল, রোজ সে এসে তার শ্বশুরকে হাসপাতালে নিত ইনজেকশান দেয়াতে।

এমন ধরামারা যার, সে কেমন করে বর্ষণের মতো ঘৃণ্য কাজ করতে পারে ?

সত্যিই তো নানা সময়ে মীরু কত সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। লোধা নরনারী মীরুকে হারিয়ে কেঁদেছে। মীরু এবং আরেকজনের দুই কিশোরী বিধবাকে দেখেছিলাম। সবার লোধা মেয়েরা সাহসী, তেজী ও স্পষ্টবক্তা। লোধা মেয়েরা দেখতেও ভালো। তারা বলেছিল, বুড়োমানুষকে অত্যাচার করবে কোন্ দুঃখে ? লোধা বউরা কি যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয় ? ওরা এ কথাও বলেছিল, ছেলে স্কুলে পাঠাব কেন ? যতদিন বাঁচে ঘরে রাখি, চোখে দেখি। একজন বলল, আমাদের ছেলেরা স্কুলে যায় না, তাতে তুমি কেন কষ্ট পাও ? আমাদের ছেলেরা স্কুলে গেলে, সার্টিফিকেট পেলে, এমপ্লয়মেন্টে নাম লেখালেও তো চাকরি পায় না।

এ সব নৈরাশ্যভরা কথাবার্তা থেকে রূঢ় বাস্তবটা জানা যায়। চাকরির ব্যাপারে অধিক পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিবেচনা নেই, এটি দুঃখজনক। কোনো লোধা তরুণ মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পড়ল, এমপ্লয়মেন্টেও নাম লেখাল, কিন্তু ঝাড়গ্রাম / বেলপা / খড়্গপুর বা মেদিনীপুর এমপ্লয়মেন্ট থেকে সাত বছরেও ডাক পেল না। ফলে সে নিজে তো হতোদ্যম ও নিরাশ হল, আর অন্য লোধা ছেলেমেয়েও ওদের দেখে বুঝে গেল যে স্কুলে গেলেও লোধার কপাল ফেরে না। যেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোধারা সংখ্যায় খুবই কম, সেহেতু এদের চাকরি হতে পারত। "বর্তিকা / লোধাশবর ও সুন্দরবন" সংখ্যায় আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত, এমপ্লয়মেন্টে নাম লিখানো দুইশো চৌদ্দ (২১৪) লোধার নাম ঠিকানা ছেপেছিলাম। এটা খুব বিস্ময়জনক, যে লোধাদেরকে জঙ্গলরক্ষী বা অন্তত চতুর্থ শ্রেণীর কাজও দেয়া হয় না। অষ্টমশ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত লোধা ছেলেমেয়েদের লোধা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষকের কাজ যা কেন দেয়া যায় না ?

কোনো কোনো লোধা এলাকা আবার বিশেষ ভাবে অবহেলিত। লালগড় ব্লকের সাত ও আট নম্বর অঞ্চল তার মধ্যে পড়বে। পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একা লালু শবর চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়েছে, অন্যেরা নিরক্ষর। রাঙামাটি, তরকি ও করমসল গ্রামগুলির কোনটিতে প্রাথমিক স্কুল নেই। প্রতি গ্রামে মাত্র দুটি বা তিনটি পরিবারের একটি করে বলদ ও একটি করে লাঙল আছে। অন্যেরা জঙ্গলে কাঠ কেটেই দিন চালায়। তবু সরকারের দিক থেকে কত ব্যবস্থা ! ব্লক, পঞ্চায়েত, ছোট ছোট পঞ্চায়েত

ইউনিট আছে। এ গুলির এ সব কাজ করার কথা। "লোধা" নামে টাকাও আছে। লোধাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এ জন্য দরকার, যে তুলনায় অন্য আদিবাসী জাতি কোথাও বা লোধার চেয়েও গরিব হতে পারে। কিন্তু "অপরাধপ্রবণ" জাতি হিসেবে লোধা যে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত, অন্য জাতি তেমন নয়। লোধাকে ভালবাসতে হবে, শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, তাকে তিলে তিলে বুঝাতে হবে, যে সমাজে বাস করছ তুমিও তার এক অংশ। লোধা জাতিকে এতকাল সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটা নিষ্ঠুর সত্যই বুঝতে দিয়েছে যে লোধারা খরচের খাতায়। তারা মরলেও কারো কিছু এসে যায় না। গণহত্যা মাঝে মাঝে "খবর" হয়। আবার গনুয়া, খেজুরকুটি, সুনসুনিগেড়িয়ার মতো কত লোধা হত্যা কাগজে ওঠে না।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর সমিতি পুনর্জীবন লাভের পর থেকে লোধাদের এক নতুন ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, ক্ষেতমজুর, জঙ্গলের বেগার মজুর, এমন সব লোধারাই নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে এবং সমিতির পাঁচটি শাখা খুলে ফেলেছে। ওরা ভালই বোঝে যে সকল লোধা চাকরি বা চাষের জমি পাবে না। ওরা নিজেরা যা শিখে জানিয়েছে, আমি সেই কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি।

১) যেহেতু অনেক লোধা ছাগল পালে ও হাটে মাংস বা পাঁঠা বেচে, সেহেতু ব্লকে লোধাদের ছাগল দেবার যে স্কীম আছে, সেই মতে এই সব লোধাদেরকে ছাগল সরবরাহ করার ভার দেয়া হোক। লোধা নীরোগ ও সবল ছাগলই বেচবে, কেন না সে জানে যে অন্যথা করলে প্রাপক তাকে ছেড়ে দেবে না।

২) অনেক লোধা মাছ চাষ করে ও বেচে জীবন চালায়। লোধাদের বাঁজা পাথুরে জমি দেয়ার বদলে পুকুর কেটে দিলে তারা মাছ চাষ করে বাঁচতে পারে।

লোধা খুব বোঝে, তার সাধ্য কি, কতটুকু সে করতে পারবে। যদি সুযোগ পায় তবে তা করে সে দেখিয়ে দেবে যে লোধা কাজ করতে পারে। স্বাভাবিক, প্রকৃতিজ জঙ্গল যত কাটা পড়ছে, যত ইউক্যালিপটাস বন সৃজিত হচ্ছে, শিকার, ফল-কন্দ-মূল-পাতা-বীজ-ঘুনা-ওষধি গাছ আহরণ করে জীবন যাপনের ব্যাপারটা ততই হারিয়ে যাচ্ছে। লোধা মেয়েরা ইউক্যালিপটাসকে তুলনা করে শহরের নাইলন পরা মেমসায়েবমার্কা বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে,

যারা গ্রামজীবনে বেমানান। যে গাছ পরিবেকে ফল, পাতা, বীজ, কিছুই দেয়না, সে গাছ ওরা চায় না। লোধা-খেড়িয়ার একদিনের অরণ্যজীবী জীবন আজ স্বপ্নকথা মাত্র। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই যে ভাবে হোক, বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজতে লোধারা আজ মরিয়া। নিরক্ষরতা এক অভিশাপ। ওরা নৈশবিদ্যালয় চালাচ্ছে। অপরাধকে জীবিকা করে তোলা ভুল। সে কথাই ওরা বোঝাচ্ছে।

কি চমৎকার, সাবলীল' ওদের লেখা। প্রহ্লাদ ভুক্তা, যুগল কোটাল, প্রশান্ত আড়ী, চুনীরানী কোটাল, শঙ্কর কোটাল, তরুণ কোটাল, মন্মথ শবর, সুদাম বাগ, এমন অনেকেই চমৎকার লেখে। "বর্তিকা"র প্রকাশিত চুনীরাণীর আত্মকথা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তেমনি কৃতজ্ঞ "বর্তিকা" কঠোর পরিশ্রমী ললিতমোহন মাহাতর কাছে, যাঁর "অপরিচয়ের অন্ধকারে লোধা উপজাতি" এবং প্রহ্লাদ ভুক্তার অসম্পূর্ণ আত্মকথা লোধা জীবন সম্পর্কে বহু কথা জানিয়েছে।

লোধারা তাদের সমস্যা বিষয়ে আজ কি ভাবছে, তাও জানা দরকার। ওরা লেখে, "আমরা নিহত, পঙ্গু ও অন্ধ হতে আর রাজী নই, নিরন্তর শশ্রাসন ও উৎপীড়ন বন্ধ হোক। চিরকাল সমগ্র জাতিকে অপরাধপ্রবণ মনে করা হবে, এ আর চলবে না।" তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গবাসী সাধারণত মনে করেন, লোধা মাত্রেই অপরাধপ্রবণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে চিন্তা করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। আমি বরাবর বলছি যে লোধারা তীক্ষ্ণ অনুভূতি-সম্পন্ন, ভালোবাসবার মতো জাত, ওরাও প্রাণ ঢেলে ভালবাসা দিতে জানে। যেখানে পায়, সেখানে দেয়। আদিবাসী মাত্রেই মূলত যে সব গুণে বিশিষ্ট, সারল্য, শত বঞ্চনা সত্ত্বেও ভালোবাসবার ও বিশ্বাস করবার অপার ক্ষমতা,—সে সব গুণই লোধারও রয়েছে।

আমি মনে করি না অনেক টাকা লগ্নী করে বৃহৎ প্রকল্প করলে লোধার কোনো উন্নয়ন হবে। ওদের সব চেয়ে আগে দরকার ভালবাসা ও বিশ্বাস। তবে সরকারী কর্মচারীদেরকে তো "যাও, লোধাকে ভালবাসো" বলে হুকুম দিয়ে সে কাজ হবে না। তবে এটুকু তাঁরা পারেন, লোধাকে বোঝাতে পারেন, যে লোধাকে তাঁরা বিশ্বাস করেন। কেমন করে সে কাজ করবেন? তাকে দায়িত্ব দিন, উন্নয়নের জন্য পুকুর সে নিজে কাটুক, পথ তৈরী করুক, ঘর বেঁধে নিক, গাছ লাগাক। পুরুলিয়া দেখে এসেছি বলে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে যে এ কাজ করা খুবই সম্ভব। পুরুলিয়ার

খেড়িয়া শবররা (এদের বিষয়েও ললিতমোহন মাহাত "বর্তিকা"তে দীর্ঘ তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছেন) লোধাদের মতই হতভাগ্য। জঙ্গল বিভাগ ও থানা এদেরকে সমানে তাড়ায়, ধরে, নির্যাতন করে, জেলে ঢোকায় ও ফেলে রাখে। তবে খেড়িয়া হত্যা সেখানে খুব হয় না। পুরুলিয়ার জনসমাজও অনেক সুস্থ মনোভাব সম্পন্ন। পুরুলিয়ার সাঁওতালরা নিজেরাও অবহেলিত, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়াদের প্রতি মমতাসম্পন্ন। জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র অফিসার অমলেন্দু রায় আক্ষরিক অর্থে বিজ্ঞানকে গ্রামীণ গরিবের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এমনটি ভারতে কোথাও হয় নি। এই দুরন্ত খরার মধ্যেও তিনি খেড়িয়াদের দিয়ে গাড়াসাগমা গ্রামে কাঁচা কুয়া কাটিয়েছেন, তারা সবজি চাষ করছে। আমি তো দেখে এলাম যে মাত্র দশ / বারো ফুট কাটলেই জল উঠছে। রায় খেড়িয়া ও বিরহড়দের জন্যে চমৎকার সব স্বল্প টাকা সাধ্য ছোট ছোট স্কীম করেছেন। তাঁর লক্ষ্য হল, যার জন্য স্কীম, সে যেন তার মজুরি বাবদ সব টাকাটা পায় ও উন্নয়নের কাজ খেড়িয়ারা যেন নিজেরা করে।

পুরুলিয়াতে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার, দরদ ও বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে এগিয়েছেন বলে এমন সব বাস্তবসাধ্য স্কীম হয়েছে। মেদিনীপুরে লোধাদের পাশে এমন কোন অফিসার নেই। যিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে স্কীম করবেন, কাজটা তাকে দিয়ে করাবেন। আবার লোধারা নিজেরাই গ্রাম কে গ্রাম সমীক্ষা করে চমৎকার সব ছোট ছোট স্কীম করছে। একটু উৎসাহ, একটু সাহায্য, একটু নির্দেশ পেলে ওরা নিজেরাই এ সব স্কীমকে রূপ দিতে পারে। ফল ও সমজি চাষ, মাছ ধরা, কুয়া কেটে ধান ও অন্য ফসল চাষ, ছাগল-ভেড়া-মুরগি পালন, এ ওরা বোঝে, করতেও পারে, যদি করতে দেয়া হয়।

কিন্তু মেদিনীপুরে তো সেটি হবে না। প্রকল্প হবে বৃহৎ (দূর, লোধা কি বোঝে কি জানে ?)। ঠিকাদার থাকতেই হবে (আর কাকে ভরসা করা চলে ?)। লোধারা হাত পেতেই থাকবে। তাদের কিসে ভালো হবে সে কথা তাদের কাছে শোনা হবে না (লোধাদের কি মন বলে বস্তু আছে ? নৃতত্ত্ববিদ লোধা বিজ্ঞানীরা ও পণ্ডিতরা কি বলেন ?)। আমরা যা করব, ওদেরকে তা মেনে নিতে হবে। এই যে একটা গোটা মানবজাতিকে নিরক্ষর পাতা না দেয়া, যে জাতটা যেমন বুদ্ধিমান তেমন নির্যাতিত, এর পিছনে আছে এক সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী জাতির বিষয়ে অসীম তাচ্ছিল্য।

লোধা জাতির একটাই অপরাধ। তারা কয়েক হাজার, কয়েক লক্ষ নয়। কয়েক লক্ষ হলে এমন তাচ্ছিল্য দেখাতে কোনো সরকার সাহস করতনা। যে আদিবাসী জাতিতে কয়েক লক্ষ ভোটদাতা, তাকে অবহেলা করবে কোন্ সরকার? শেষ অবধি লোধা, খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, এদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল ঐক্যবদ্ধ আদিবাসী সমাজ, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলি এদের বাঁচাবে। সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুণ্ডারাই সে কাজ করতে পারেন। যেদিন তাঁরা বুঝবেন, যে আদিবাসী সত্তাই সামগ্রিক ভাবে বিপন্ন, সেদিন তাঁরা ঐক্যের পথে এগোবেন বলেই বিশ্বাস রাখি। আমি জানি যে লোধাদের আজ বড়ই দরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল ও মুণ্ডার সাহায্য।

(ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি / ৪. ৬. ১৯৮৩-তে প্রকাশিত। অনুবাদ : লেখক)।

সংযোজন

এই লেখাগুলি প্রকাশের পরে (ক) পশ্চিমবঙ্গে লোধা উন্নয়নে কাগজে কিছু কাজ এগিয়েছে, বাস্তবে ব্লক ও পঞ্চায়েত কি ভাবে তা রূপায়ণ করছে তা দেখার অপেক্ষা রাখে। ঠিকাদারী প্রথাতেই কাজ হচ্ছে, তবে হয়তো তাদের "ঠিকাদার" বলা হচ্ছে না। লাভের গুড় আজও পিঁপড়াই খাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। (খ) ১৯৮৩ সেপ্টেম্বর থেকে চুনীরাণী কোটাল সহ আরো কয়েকজন লোধা সমাজকর্মী নিযুক্ত হয়েছেন, যদিও লোধা সেলে অন্তত একশো লোধা সমাজকর্মী এখনি দরকার। (গ) চক-সাহাপুরের হস্টেলটির নতুন ঘর হয়েছে। (ঘ) চুনীরাণী কোটাল বি. এ. পাশ করেছেন। লোধাশবর সমাজে ইনি দ্বিতীয় গ্রাজুয়েট, মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট। প্রহ্লাদ ভুক্তা প্রথম লোধা গ্রাজুয়েট। (ঙ) চক-সাহাপুরে সাঁওতাল গঙ্গারাম হেমব্রম ও লোধা বঙ্কিম ভক্তার যুক্ত নেতৃত্বে গঠিত সমিতি অন্য আদিবাসী, তপশীলী, হিন্দু, সকলকে নিয়ে গ্রাম কল্যাণ কার্য করছেন।

—মহাশ্বেতা দেবী॥

'বিচার কর বাবু, দোষীদের ধর'

মহাশ্বেতা দেবী

বর্ষা এবার হয় নি, শস্য ক্ষেত্র শুকনো আর বিবর্ণ। আকাশবিহারী নীরদবাহন জল সব উত্তরবঙ্গে। তবু ঝাড়গ্রামের বন এখনো সবুজ ও সুন্দর। আমাদের চোখে বন এক সুন্দর আশ্বাস। লোধা ও অন্য গরিবদের কাছে এই বনই একমাত্র ভরসা। আবার অরণ্য বনে ঘেরা গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতাই প্রশাসনের কাছে কোনো জরুরি সঙ্কট সময়ে এক দুশ্চিন্তার কারণ।

সোরো, চাকুয়া ও বাঘরাঁপা। সোরো থেকে চাকুয়া ও বাঘরাঁপার মাঝে মাঝে পাতলা ও ঘন বন। এ সব গ্রাম থেকে চন্দ্রীর মাঝে ঘন বন, আহারমুড়ার মাঠ। চারদিকেই ঘন বন।

শেষ অবধি চলেই গেলাম। ভোরের ইস্পাতের মত চমৎকার ট্রেন বিরল। কাউকে জানিয়ে যায় নি তবে রাজু সঙ্গে ছিল। ঝাড়গ্রাম ও লোধা গ্রাম বলতেই সবাই বেশ ভয় পাচ্ছিল। আমার বোনদের ধারণা যে আমি নিজের ভালো মোটেই বুঝি না। ছেলেকে তো কিছুই বলি নি যাবার আগে। ও ভাল করেই জানে মা যেটি করবে বলে ঠিক করে তা করবেই, আর এও জানে যে আমি অত্যন্তই অস্থির ছিলাম।

ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক নারায়ণ চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেই বোঝা গেল, কলকাতায় যা বুঝেছি তা সঠিক। লোধাদের বিষয়ে এবার সরকার, সমগ্র জাতিটির প্রসঙ্গেই কোন স্থায়ী সমাধান চান। ছয়জন লোধার মৃত্যুর ফলে যদি এতদিনে এই লোধাদের জীবনের গতির নিরন্তর নিচে তলিয়ে যাওয়ার কাজ থামা যায়, অবিচার-অত্যাচার-অন্যায়ের অন্ধকার যবনিকা যদি সরতে শুরু করে, তাহলে বলব মায়ের চোখের জল, বিধবার চোখের গভীর দুঃখ বৃথা গেল না। ঝাড়গ্রামে মহকুমা প্রশাসন লোধাদের জন্য সাধ্য মতো করছেন। প্রশংসনীয় ভূমিকা দেখলাম ৫নং পঞ্চায়েতের প্রধান জলধর মাহাত এবং সদস্য অনাদিচন্দ্র খিলারির। দুই লোধা যুবক, সরকারী কর্মী প্রহ্লাদ ভুক্তা ও গান্ধী মল্লিক জলধর ও অনাদি-চন্দ্র আপাগোড়াই আমার সঙ্গে ছিলেন। অনেক অসুবিধা করে এক

ভদ্রলোক আমাদের জীপে মোহরা পৌঁছে দেন। জীপ সারপি যেভাবে খানাখন্দ, প্রান্তর ও জঙ্গল ভিঙে গাড়িটি নিয়ে গেল, তা দেখার মত জিনিস। জীপ আমাদের ছেড়ে দিয়েই চলে আসে, নিরুপায় হয়ে। কেননা ২০।৭।৮২ তারিখে গোপীবল্লভপুর—১ অঞ্চলে পাঁচকাহানিয়া গ্রামে শিক্ষক সুনীল মুদীকে কে বা কাহারা খুন করে যায়। ১৩-৭ তারিখে আমি যখন ওখানে, তখন এ হত্যার এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে গোপীবল্লভপুরের ১ ও ২নং অঞ্চল বন্ধ ছিল। জানা গেল নিহত শিক্ষক ছিলেন অঞ্চলের প্রিয় মানুষ। সংসারে তিনি একাই ছিলেন উপার্জনশীল। সেদিন সরকারী গাড়িগুলিকে গোপীবল্লভপুর দৌড়তে হচ্ছিল।

মহকুমা হাকিমের এজলাসের সামনে বাঁধানো গাছতলায় বহুজনের সঙ্গে দেখা হল। কোড়া আদিবাসী একজন, খড়িকার ভীমার্জুন মহাকুল তপশীলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত্রিলোচন মাহাত। এর আগে দেখা হল ঝাড়খণ্ড পার্টির মনোরঞ্জন মাহাতর সঙ্গে। এছাড়াও আশৈশব চেনা প্রিয় শহর ঝাড়গ্রামের বহুজনের সঙ্গেই কথা হয়। এরা অনেকে যা বলেন, তার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। (১) লোধারা ধর্ষণ করেছে বলে এঁরা বিশ্বাস করেন না। (২) ধর্ষণকারীরাই নিহত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। (৩) মনোরঞ্জন বলেন, লোধারা ধর্ষণকারী এ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে তা খুব নতুন ও অঘটিত-পূর্ব ব্যাপার। তখন ভাবতে হবে, এমন কাজ এরা করল কেন। পুলিশী তদন্তে কিছু বেরোবে না। বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।

সবাই এ বক্তব্যে একমত : লোধা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সরকারকে করতে হবে।

পরে যখন গ্রামে ঘুরলাম, তখন দেখলাম, অ-লোধা সাধারণ মানুষ কেউ বিশ্বাস করেন না যে লোধারা ধর্ষণ করেছে। জনৈক গ্রামবাসী বললেন, ওরা চুরি ছিনতাই করে, মেয়েদের গা থেকে গয়না কাড়ে। কিন্তু কখনো কোন মেয়ের ইজ্জতে কোন লোধা হাত দেয় নি। কলকাতায় ফিরে ওই অঞ্চলের এক যুবা যুবকের চিঠিতে দেখছি, লোধাদের নামে এই মিথ্যা অপবাদ উদ্দেশ্যপূর্বভাবে চাপানো হয়েছে।

ধর্ষিতা বৃদ্ধা এখনো অসুস্থ বলে শুনলাম। আমি যুগান্তরে প্রথম যে চিঠি লিখি, তাতে শুধু একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম খুব ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, (একজনের পত্রে জানলাম), মহিলা হয়ে তিনি ধর্ষণের ব্যাপারে কিছু বললেন না? —এটি খুব হাস্যকর। কেননা ধর্ষণের ঘৃণ্য ব্যাপারটিকে

আমি নিশ্চয় নিন্দা করেছি। তবে ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরার পর মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, গণ-ধর্ষণকারীদের এভাবে মারাই যদি সমাধান হয়, তাহলে সেদিনের ধর্ষণ কার্যের বুদ্ধিদাতা ও ধর্ষণকারীরা সকলেই ঘাড়ের ওপর যে যার মাথা নিয়েই ঘুরছেন এখনো সদর্পে।

আরেকটা কথা। এই হত্যা বিষয়ে একটি ধারণা জন্মেছে বলে মনে করি, যে এটি করেছেন অন্য আদিবাসীরা। সেদিন যে জনতা এসেছিল চন্দ্রী থেকে লোধাদের মারতে, তার মধ্যে ধনী ও ভীষণ প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভূমি মালিক, ভূমিজ, মাঝি ও গোড় সম্প্রদায় সবাই ছিলেন। সেই সঙ্গে কিছু আদিবাসী থাকলেও থাকতে পারেন কিন্তু তারা এর নায়ক, স্থপতি বা কার্যনির্বাহক নন এ বক্তব্যও ঝাড়গ্রাম শহর ও গ্রামের লোকদের।

এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর যদি কোনো একটা কাহিনী বার বার ঘটনার ক্ষেত্র ও সমীপ অঞ্চলের মানুষের মুখে শোনা যায়, তাহলে সেটিকে গুরুত্ব দিতে হয়। বিশেষ যখন একই কাহিনী অন্য জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষরাও চিঠিতে লিখে জানাতে থাকেন। এ কাহিনীটি একমাত্র যুক্তি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা এবারের লোধা নিধনের এবং এটিকে যথাযথ গুরুত্বে উদ্ঘাটন করার দায়িত্ব প্রশাসনের।

এ কাহিনীটি যেমন জেনেছি তা বলার আগে, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের এইসব কথার তীব্র প্রতিবাদ করছি, 'লোধারা অসাধু, সত্য কথা বলে না, হিংস্র, একথা যেমনি ঠিক, তেমনি বিশ্লেষণ করলে একথাও হয়ত ফাঁস হয়ে যাবে—এরা এরকম ছিল না।' (উপত্যকা—১৯৮১-৮২) 'লোধারা' সবাই অসাধু, মিথ্যাবাদী ও হিংস্র? ওই কাগজেই অবশ্য এক নারী ধর্ষণ ও কয়েকটি হত্যার খবর বেরিয়েছে। দুষ্কৃতকারীরা কি লোধা? বর্ণালীর ধর্ষণ ও হত্যা, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক খুন, ডাকাতি, সন্ত্রাস সৃষ্টি যারা করছে, তাদের জাত উল্লেখ করে কেউ কি বলবে যে অমুক জাতের সবাই খুনে, ধর্ষণকারী বা ডাকাত? আমার সঙ্গে যে ব্যাপক লোধা সমাজের অন্তরের সম্পর্ক, যাদের চিঠি ও লেখাতে আমার টেবিল বোঝাই, যাদের ঘরে আমরা বাস করে এলাম এই ক'দিনে, আগে তারা কেউ অসাধু, অসত্যবাদী ও হিংস্র নয়। ওই লোধাদের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ, তাঁরা কখনো এমন রূঢ় এবং অসত্য মন্তব্য করবেন না। যিনি লিখেছেন, তিনি লোধা হত্যাকে নিন্দা করেছেন আবার এমন এক মন্তব্য করেছেন।

এবার সেই কাহিনীটি শোনাই। এবং কাহিনীর আগেই বলি, বাম-

ফ্রন্ট সরকারের গত মন্ত্রীত্বকালে সমাজের দরিদ্রতম স্তরের মানুষদের এক অংশের মনে একটা ভরসা এসেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এই ভরসা যারা পেয়েছে, লোধারা তাদের মধ্যে পড়ে।

ঝাড়গ্রাম থানার বাঘকাঁপা ও চাকুয়া গ্রাম গায়ে গায়ে লাগানো। একটি ১৩নং আগুইবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। সোরো ৩নং লেধা-বহড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। ৩নং পঞ্চায়েত প্রধান জলধর মাহাতর নিজের গ্রাম কেঁউদিশোল। চন্দ্রী কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এক বিশাল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উৎকলীয় ব্রাহ্মণ কর ও ছোতাদের গ্রাম। জানা গেল এই ধনী জোতদারদের জমিজমা ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রায় সব পঞ্চায়েত অঞ্চলে আছে, অনেকে জলকর। এও নাকি সবারই জানা যে চন্দ্রীতে আছেন বহু চোরাইমালের রিসিভার। এরাই লোধাদের এক অংশকে চুরিতে নিযুক্ত রেখে নিজেরা ধনী হচ্ছেন এবং যারা চুরি করে সে সব লোধারা অসীম দারিদ্রে থাকছে, জনসাধারণের বিরক্তি ও রোষের সামনে পড়ছে।

এরপর কয়েকটি প্রশ্ন। ওই চন্দ্রী গ্রামের অনৈকের সঙ্গে ধর্ষিতা স্বর-বারির দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল কি? লোধা হত্যার পর একজন মাঝি সম্প্রদায়ের লোক ছুটে এসেছিল কি সোরো গ্রামে? তার সঙ্গে কি লোধা-দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল ও আছে? সে কি মনস্তাপে অস্থির হয়ে এই কথা বলেছিল? যে ধর্ষিতা মেয়েটিকে (মেয়েটি মাঝি সম্প্রদায়ের) ত্যাগ করে উক্ত ব্রাহ্মণ যখন অন্য কৃপাপাত্রী বেছে নেয়, মেয়েটি খুব অশান্তি করছিল? তাই ব্রাহ্মণটি এই বক্তা লোকটি ও অন্য পাঁচজনকে কি বলেছিল যে তোরা সবাই ওকে চূড়ান্ত বেইজ্জত করবি এবং তারপর বলবি, আমরা সোরো আর বাঘকাঁপার লোক? তারপর কি বক্তা বলেছিল যে তারাই এই জঘন্য এবং নারকীয় কাজ করে টাকার বদলে? সে কি এ কথা বলে খেদ করেছিল যে, সেই হতভাগিনী নিরপরাধ বৃদ্ধাকে ধর্ষণের কারণে লোধা নিধন হবে তা সে বোঝে নি?

কয়েকটি প্রশ্নের আকারে আমি বহুজনের কাছে শ্রুত কাহিনীটি রাখলাম। আপনারা যাঁরা এ কাগজ পড়বেন, অন্তত একবার এ কথাটি ভাববেন, যে কথাটি এক সৎ গ্রামকর্মী আমাকে বার বার বলেছে।

তা হল, লোধা নিধনের পরদিন, (বেশ কয়েকজন লোক এ ঘটনার সাক্ষী আছে) চন্দ্রী গ্রামের ভূস্বামীরা বন্দুক হাতে, জনা ৫০ লোকসহ সোরো গ্রামে এসে সদ্যোবিধবা, পুত্রহারা, জায়া ও জননীদের হুমকি দিতে থাকে

যে এখনি, সোমবারের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। লোধা থাকতে দেব না।

হত্যা হল, তারপরেও হুমকি। গ্রামকমীটির প্রশ্ন আমারও প্রশ্ন। একটি গরিব বৃত্তার ওপর এ জঘন্য অত্যাচারে জমিদার শ্রেণীর লোকদের এমন ছুটাছুটি কেন? তারা কি গরিবের ওপর নির্যাতন সইতে পারেন না?

গুরবারি খামরাই এক গরিব, হতভাগা স্ত্রীলোক। সে চন্দ্রী গ্রামেরই বাসিন্দা। বর্বালী দত্তের ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদ জানাতে যে সব মহিলারা আমার কাছে আসেন, তাঁদের আমি বলেছিলাম যে গরিব কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী এ সব শ্রেণীর মেয়েদের ধর্ষণের শিকার সর্বদা হতে হয়। তার প্রতিবাদও হওয়া উচিত।

আজ বহুজন যদি মনে করেন যে লোধারা এ ধর্ষণ করেনি, তাহলে এ ধর্ষণের রহস্য উদ্ঘাটিত করে অপরাধীদের গুরুতর শাস্তি দিতে হবে।

নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্তে বের করতে হবে কে এমন কাজ করল এবং জাতি-গোষ্ঠী সম্প্রদায় উপেক্ষা করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। গুরবারির জীবনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্ট হল, তার ক্ষতিপূরণ কে করবে?

প্রবল প্রতাপান্বিত জোতদারদের প্রভাব উপেক্ষা করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার কি সম্ভব হবে?

এরপর এক সদ্যোপুত্রহারা লোধা জননীর উক্তি, 'আমাদের মরদরা ই কাজ করে নাই বাবু, বিচার কর বাবু, দোষী ধর। মায়ের মত মানুষকে কখনও ই কাজ করা যায় বাবু? ই খারাপ কাজ?'

লোধা মেয়েরাও নারী জাতির এ অসম্মানের বিচার চাইছেন কেমন করে? তাঁরা জানেন যে তাঁদের পুরুষরা এ দোষটি করেনি। সেই জোরে তাঁরাও বলছেন, বিচার কর, দোষী ধর।

কিন্তু এর সঙ্গে লোধা নিধনের সংযোগ কোথায়?

সে কথাটিই পরের বার বলব।

হায় লোধা জাতি। হায় জোতদারকবলিত গ্রাম সমাজ। হায় পশ্চিমবঙ্গ।

২০ | ৭ | ৮২ যুগান্তর

পুলিশ লাশগুলি কেন ফেলে দেয়

মহাশ্বেতা দেবী

গতবার শুরবারি খামরাইয়ের বর্ষণ বিষয়ে যে কথা শুনে ও জেনে এসেছি তা বলেছি। ওর সঙ্গে লোধা হত্যার সম্পর্ক কোথায় ?

চাকুলিয়া গ্রামে ২১ ঘর। ঝাড়বাঁশপা গ্রামে ১২ ঘর। সোরো গ্রামে ২২ ঘর লোধার বাস। এদের নিজেদের তেমন চাষের জমি নেই। কেউ কেউ বর্গা করে কিন্তু কাগজপত্রে বর্গাদার অধিকার পায় নি। জমি মূলত চন্দ্রীর ব্রাহ্মণ কর ও ছোতাদের। শোনা যায়, ছোতারাই সুদূর অতীতে লোধাদের এনেছিল। এখানে কি করেছিল জানা নেই। তবে আমার কাছে প্রমাণ আছে যে অন্ত ব্যবসায় সাঁওতালদের সরিয়ে তৎকালীন জমিদাররা লোধা বসিয়েছে এবং এ ভাবে কৌশলে দুটি গরিব আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা ও বিদ্বেষের বীজ বুনে নিজেরা লাভের ফসল ঘরে তুলেছে।

গত ফ্রন্ট আমলে লোধারা কাগজপত্রে বর্গাদার হতে চায় ও মালিকদের বর্গা-ভাগ দিতে চায়। তখন থেকেই মালিকরা ক্রুদ্ধ এবং লোধাদের উচ্ছেদ করতে কৌশলে খুঁজতে থাকে। এ সময়ে কিছু ভূমিহীন লোধা অপারেশন বর্গার সুযোগ নিয়ে জমি দখল করে বসে। এ গ্রামগুলিতে ৮/১০ বিঘা জমির মালিকও চন্দ্রীর মালিকদের জমি চাষ করে ভাগ দিত। ফ্রন্ট সরকার আসার পর এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, মধ্য চাষী কেন ভাগে চষবে ? এ হক ভূমিহীনদের। গরিব ক্ষেতমজুররা এ সব জমির দখল নেয়। এদের অধিকাংশ লোধা। ফলে চন্দ্রীতে মালিকরা এবং এসব গ্রামের মধ্যবিত্তরা লোধাদের ওপর চটে থাকে ও প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খোঁজে।

সুযোগ নিতে হলে অনুকূল জনমত চাই। লোধাদের একাংশ নিশ্চয় রিসিভারদের নিয়ন্ত্রণে চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত। এদের ওপর আশপাশের গ্রামের লোকরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ। সোরো গ্রামের কুখ্যাতি বেশি। এরা এর আগে তীরধনুক নিয়ে পুলিশকে বাধাও দিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, পুলিশ ও জনসাধারণ চুরির ব্যাপারে লোধা গ্রামে এসেছে, হয়তো সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু ঝাড়গ্রাম বা মেদিনীপুর অঞ্চলে চুরি ডাকাতির ব্যাপারে কিছু লোধারা নাকে বরে এ কাজ করলেও, এই 'অপরাধ' নামক বৃহৎ শিল্পে চনোপুঁটি লোধারা। রাঘববোয়াল যা আসল মাল তা রসিভাররা। গ্রাম-বাসী পুলিশ প্রশাসন, সবাই জানে সোরো গ্রামের কিছু লোধা যদি চুরি করে, দূর কারা মাল নেয়। কারা লোধাদের বলে, খাটবি কেন? মাথায় ভাং মারলেই টাকা পাবি

এদের ধরা, এদের কাছ থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করা, এদের গায়ে হাত দেয়ার কথা কোন লোকই ভাবে না। গ্রামসমাজের মাথা এরা এদের জমিতে মজুর খেটে বা বর্গা করে কত জন বাঁচে। তাই লোধাদের মারে। লোধাদের মারলে কেউ ভাবে সবাই ধরে নিয়েছে এটা লোধাদের পাওনা।

সম্ভবত লোধাদের ওপর হামলা করার এই না ছিল বলেই, তাদের দিয়ে চুরি করানোর ব্যাপারটিও গত কয়েক মাসে খুব বেড়ে যায়। এ চুরির জন্য মানুষের মনেও বিদ্বেষ জমতে থাকে।

এভাবে পটভূমি তৈরী করার পর ওই ঘটনা। ঘটনের অনেক পরে কে বা কাহাদের প্রচার, এ কাজ লোধাদের। তারপর ধরো তাড়াও মাথা কাটো।

লোধারা বড় দুর্ভাগা। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের পর আত্মীয়দের দেয়া হয়নি। লোধারা গরীব পলাতক। কিন্তু ঝাড়গ্রামে কি কাঠের অভাব? পুলিশ লাশগুলি কেন জ্বালায় না, কেন ফেলে দেয়?

এখন নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে, এবারকার লোধা হত্যার মূল কোথায়? এ হত্যা যারা করিয়েছে তারা রাজনীতিক দলের আলোতে বিচার্য নয়। তারা বেলচি ও নাপরার হরিজন হত্যাকারী জমিমালিকদের স্বগোত্র। তাদের আক্রোশ সেই সব দুঃখী মানুষের ওপর যারা এক টুকরো কাগজ হাতে পেয়েছে, আর রুক্ষ ও অনুর্বর এক টুকরো জমিতে লেগেছে দখল।

কেন এত লোক তাদের কথায় জোট বেঁধে এসেছিল? কেন আসবে না? চন্দ্রীর চারদিকের সোনামুখী, আশপাল, কুমারী, পাথরডাঙা এসব গ্রামের গরিবেরা চন্দ্রীর ব্রাহ্মণদের ওপরেই নির্ভরশীল। তাদেরও নিরন্তর কি বোঝানো হয়েছিল সুকৌশলে। যে দেখ! এই সরকার লোধাদের পাট্টা দিচ্ছে? কে বলবে?

বস্তুত চাকুয়া ও বাঘঝাঁপাতে লোধাদের কিছু লোককে পাট্টা ও দখল

প্রধান এ হত্যার কারণ। উপলক্ষ্য চাই তাই ওই নারকীয় ধর্ষণ। তারপর হত্যা।

ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে ২১/৫/৮২-তে কেশিয়াড়ির খেজুরকুটিতে। সেখানে পারিজাতপুরে কোড়া আদিবাসীরা কোন জোতদারের জমি চষত। ট্রস্ট সরকার ওই জোতদারের জমি ভেস্ট করে লোধাদের পাট্টা দেয়। জোতদার তখন গরিব কোড়াদের সশস্ত্র করে লোধাদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। ১৯৮১-তে লোধারা ও জমিতে নামতে পারেনি। এ বছর নেমেছিল। জোতদারের মদতে সশস্ত্র গরিব কোড়ারা আক্রমণ করে গরিব লোধাদের, যখন এরা মাঠে। ৩জন জখম হয়। একজন, বলাই প্রামাণিক মারা যায়। অবশ্য ঝাড়গ্রামে বসে এক কোড়া আদিবাসী বললেন, একজন নয়, দুইজন নিহত।

এই জোতদারও চন্দ্রীর হত্যাকারীদের স্বগোত্র। এমন যাদের শ্রেণী চরিত্র তাদের কাছে এক গরিব বৃদ্ধার ইজ্জতটা তুচ্ছ ব্যাপারে। এরা হচ্ছে সেই লোক, যারা পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ করে তুলছে। অবাক হব না যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবার লোকরা পালাতে থাকে। অন্যত্র, অন্য রাজ্যে এদের গায়ে সব সময়ে হাত পড়ে না। এ রাজ্যে কি হবে?

সোরো গ্রামে বরদা মল্লিক ও তার মেয়ে গোলাপীর হাহাকার এখনো শুনতে পাচ্ছি। বরদা এত হতভাগিনী জননী। ওর ছেলে মীরু, চাকুয়াতে বিলাসীর মেয়ে হাসিকে বিয়ে করেছিল। মীরু তার শ্বশুরকে সাইকেল করে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যেত। তুমি বলো মা, এমন ছেলে কেমন করে কোন মন্দ কাজে থাকতে পারে?—বরদা ও গোলাপীর আর্ত কান্না ছিল ভয়ঙ্কর। কেননা তা নিরভ্র শুকনো এক দীর্ঘ হাহাকার। ছোট ছোট শিশুরা আমাদের দিকে নীরবে চেয়েছিল। সেদিন এ সব শিশু কি দেখেছিল? কেমন সে দৃশ্য?

চাকুয়া ও বাঘঝাঁপার নরনারী বালক-বালিকা ভিড় করে এল। মীরুর শাশুড়ি বিলাসী মীরুর বোন গোলাপী! এদের রং পরিষ্কার, চেহারা সুন্দর। মীরুর বউ হাসির বয়স বড় জোর ষোল। রুক্ষ চুল, পরনে খান কালো ও সুন্দর চেহারা। চাকুয়াতে মীরু মাস্রাজ ভুক্ত। মাস্রাজের দুই ছেলে কাজল ও পাড়ে। ভাই নাড়ু ভুক্তা নিহত হয়।

মাস্রাজ, নাড়ু, মীরু, কাজল, পাঁড়ে এদের পাঁচজনের বিধবাই এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকটি মেয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে সুন্দর ও লাবণ্যবতী। কাজল,

পাঁচে ও মীরুর বউ তিনজনে তো বালিকামাত্র। মেয়েরা খুব সপ্রতিভ, স্পষ্ট, বক্তা কর্মঠ।

অনেক কান্না অনেক কথার মধ্যে ওদের দাবী, এমন করে বাঁচতে পারি না। মানুষের মত বাঁচতে চাই। খেটে খাবার ব্যবস্থা করে দাও। নয়তো সকলকে মেরে ফেল। লোধা নাম মুছে দাও।

আজ লোধারা ওই তিনটি গ্রামে কতটা নিরাপদ? চাকুয়া ও বাঘরীপাল লোধাদের, বড়পাল গ্রামের জনৈক উপেন মাহাতো 'পুলিশ ক্যাম্প উঠে গেলেই লোধাদের শেষ করে দেব' বলে নিরন্তর শাসাচ্ছে বলে আমরা অনেকে শুনলাম। কেঁউদাশোল গ্রামে বসে শুনলাম, ওই লোকটি সন্ত্রাস ও গুজব ছড়াচ্ছে যে, পাঁচশো লোধা তীরধনুক নিয়ে তেড়ে আসছে।

এ হুমকি দিচ্ছে, 'ঝাড়গ্রামে খবর যেতে যেতে তোদের শেষ করে ফেলবে'।

পুলিশ ক্যাম্প থাকতেই এই সন্ত্রাসন চলছে। ক্যাম্প উঠে গেলে আবার লোধা হত্যা হতে পারে। কেননা জঙ্গলঘেরা এ গ্রামগুলি অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন। লোধারা বড়ই অসহায়। ঝাড়গ্রাম ১৬-১৮ কিলোমিটার দূরে। যারা লোধাদের বাঘের খাবার ধরে রেখেছে, সে সব জোতদার-বিসিভারদের অশুভ চক্র অনাক্রান্ত রেখে, লোধাদের উন্নয়নের চেষ্টা করলে কখনোই স্থায়ী ফল হবে না। আর উন্নয়নের ব্যাপার একটা হবেই। তাতে জলের মত টাকাও খরচ হবে। যেন কাজ হয় এবার, যেন সব টাকা ঠিকাদার দেয় না, যেন মহাপণ্ডিতদের অবাস্তব পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারী টাকা অপব্যয় না হয়।

প্রহ্লাদ ভূক্তা ও গান্ধী মল্লিক লোধা আমার ঘরের মানুষ ওরা। এবারের সফরে ওদের কথা বেশি বলব না। মনে খুব দাগ কেটেছে ৩নং পঞ্চায়েত প্রধান জলধর মাহাত। ওর সঙ্গী অনাদিচন্দ্র খিলারি। জলধর মাটি ঘেঁষা মানুষ। ও পঞ্চায়েত মাধ্যমে যথাসম্ভব কাজ দিয়ে লোধাদের এখনকার মত বাঁচাতে চেষ্টা করছে প্রশাসন এবার অনেক সজাগ। মহকুমা হাকিম শ্রীমজুমদারের কথাতেই তা বুঝেছি। সাধারণ লোকের আবার এটা কাছে শুনলে পরেও মোটেই বুঝিনি। ঝাড়গ্রামের বি·ডি-ও কেন এ-ঘটনার পর একবারও গ্রামগুলিতে যাননি, দাঁড়াননি দুর্গতদের পাশে। ১৩/৭ বিকালে হঠাৎ এক মিটিংয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে এক-ঝলক দেখা গিয়েছিল।

লোধারা এখনও সন্ত্রস্ত, ভীত তাঁদের কি হবে? এবার কি লোধা সমস্যার সমাধান হবে?

সবশেষে বলি, পুলিশ তার চরিত্রোচিত কাজ একটা করেছে। যে সব স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জলধর ও অন্যরা রাত জেগে জেগে যে সময়ে ত্রাণকার্য করছিল, তাদের মধ্যে থেকেই পুলিশ তিনটি মাহাত ছেলে ও একটি লোধা ছেলেকে হত্যা ও ধর্ষণের দায়ে ধরে নিয়ে গেছে। এ সব দেখলেই ভয় হয় পুলিশ শেষ অবধি সাপকে জীইয়ে রেখে কেঁচোর ওপরগুলি চালাবে।

পুলিশের ক্যাম্পটি যদি তুলে নেওয়া হয়, তাহলে লোধাদের বাঁচানো যাবে না এ বিশ্বাসও হয়েছে আমার। আশা করব, কর্তৃপক্ষ এ কথাটা ভেবে দেখবেন।

ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস

মহাশ্বেতা দেবী

মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণগড় ও সব্ ব্লক দুটি পাশাপাশি। দুটি ব্লকই রুক্ষ, শুকনো এবং এখানে, জলের স্তর মাটির অনেক নিচে। গত বছরের খরায় দুটি ব্লকই নির্মম মার খেয়েছে। পঞ্চায়েত সাহায্য করবে, এ ভরসায় বসে থেকে থেকে হতাশ হয়ে গত সেপ্টেম্বর থেকে এলাকার গরিব মানুষেরা অন্যান্য জেলায় চলে যায় কাজের খোঁজে। নারমা, মালিগেড়িয়া, ফুলগেড়িয়া, গামা, এ সব গ্রাম আমার বড় জানা। ওই চারটি জায়গায় আমি নিজে যাইনি, তবে ওখানকার গরিবদের সঙ্গে, বিশেষত চির অভিশপ্ত লোধা ও মুণ্ডা আদিবাসীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব গভীর। ওরা প্রায় আমার কাছে আসে, থাকে, মনের কথা জানায়। ওদের চিঠিপত্রে এবং মুখের কথায় জানতে পারি ওদের কষ্টের কথা। গামা গ্রামের গরিব চাষী গুণধর সিং একজন মুণ্ডা। আমার "বর্তিকা"র ও নিয়মিত লেখে এবং ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। মার্চ মাসের শেষাশেষি গুণধর এসে হাজির। সঙ্গে গামার আরেক মুণ্ডা খালেশ্বর। গুণধরের ছেলে সি. এম. ডি. এ-র বিরাট প্রকল্পাধীন ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাসে কাজ করতে এসেছিল। বাড়িতে নিত্য অনশন সইতে না পেরে ওর ছেলে অনিল উচ্চ মাধ্যমিকে বসার ব্যাপার ভুলে গিয়ে কলকাতা চলে আসে বাইপাসে মাটি কাটবে বলে।

গুণধর ওদেরকে আমার বাড়ির পথ চেনাল। এখন তো ওরা মরিয়া হতাশায় আমার কাছে দলে দলে আসতে থাকল। বাইপাসে কাজ করা অসম্ভব। কাজের সময়কাল বড়ই দীর্ঘ, খাটুনিও হাড়ভাঙা। এখন ওরা বাড়ি ফিরতে চায়, কিন্তু ঠিকাদার বাবুরা মজুরির টাকা দিচ্ছে না।

৬ | ৪ | ৮৩ এমন কাণ্ড ঘটল যে আমাকে দৌড়তে হল বাইপাসে। ঠিকাদার বাবু এবং তার মস্তানরা অসুস্থ মজুরদের ঝোপড়ি থেকে টেনে বের করছে, পিটাচ্ছে, কাজে যেতে বাধ্য করছে। আমার সঙ্গে ছিল এক তরুণ সাংবাদিক। বরুণ ঘোষ কলকাতেই থাকে, আর আপদে বিপদে ওকে পাই। ওকে সঙ্গে যেতে বললাম, কেননা যে জায়গায় যাব, সেখানকার মস্তানদের

হাতে গুলি ও বোমা দুই চলে বলে খ্যাতি আছে। গেলাম যখন, বাবুটি তো একেবারে বিষয়ে গলে পড়ল, বারবার ক্ষমা চাইল। কি অন্যায় মজুরদের! আমাকে এতটা পথ টেনে এনেছে। সে কি! ও তো মজুরদের সঙ্গে ঘরের লোকের মতই ব্যবহার করে। মজুরি? ছি ছি! ও ওদের প্রাপ্য পয়সা সব চুকিয়ে দেবে। তবে কি, কাজ ছেড়ে দেব, ঘরে চলে যাব, এ তো হতে পারে না। মজুররা যদি পুরো একমাস কাজ না করে, তাহলে ঠিকাদার টাকা দেবে না, এবং সে কথা খাতাদারটি ভালই জানে। ব্যাপারটা হল, মজুর আনবার বরাত পায় দফাদার, দেয় ঠিকাদার। দফাদার বাবু আবার নিয়োগ করে গ্রামবাসী খাতাদারকে। খাতাদার তার চেনা লোকজন আনে।

দফাদার বাবুর কথা যতই মিষ্ট হোক, তার মস্তানদের আর ধৈর্য মানছিল না। আমাদের সামনেই তারা মজুরদের পেটাবে বলে রুখে উঠল। হতভাগ্যের দল আমাদের ঘিরে ভিড় করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তারা ঘরে ফিরতে চায়। মস্তানরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ওদের প্রাণেও মারতে পারে।

এমন ভয় অমূলক নয়। এই বাইপাস এক ভয়ানক, নৃশংস, বিশাল বিস্তার। একটি সবুজ গাছ চোখে পড়ে না। চৈত্রের রোদে সব জ্বলছে। মজুরদের ঝোপড়ি যেন উনুনের খোঁয়াড়। তার ভিতরে অসহ্য গরম। আমরা মজুরদের বোঝালাম। বললাম, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বলে ব্যবস্থা নেয়াবার চেষ্টা করব। ওখান থেকে আমরা তখনকার মত চলে এলাম। বরুণ যোষদস্তিদার থানায় ঘটনা জানাতে গেল। আমি জানালাম শ্রমসচিবকে।

তবে খাতাদার, একটি গ্রামীণ তরুণ, সে বারবার বলছিল, দফাদারের সঙ্গে এমন কথা হয়নি, যে মজুরদের একমাসই কাজ করতে হবে। বাবু সে কথা মানছিল না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল, এই কোটি কোটি টাকার নির্মাণিত প্রকল্পে মজুর নিয়োগের ব্যাপারটিতে কোনো লিখিত চুক্তি নেই। প্রকল্প সি. এম. ডি. এ-র। মজুরদের কিন্তু দফাদার বাবুর দয়ার ওপর নির্ভর করে বসে থাকার বাইরে আর কোনো পথ নেই।

সে রাতে খাতাদার সুধীর পাড়ুই আর তার বন্ধু নগেন সিং মুণ্ডা আমার বাড়ি এসে হাজির। আমরা চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দফাদার বাবু পালিয়েছে। মজুরদের ফেলে রেখে গেছে মারমুখো মস্তানদের হাতে।

মস্তানরা সুধীর ও নগেনকে খুনের হুমকি দিয়েছে। ফলে ওরা ওই নির্জন-বিজুবনে থাকতে ভয় পাচ্ছে। রাতে ওরা আমার কাছেই থেকে গেল। এ হল ৭ | ৯ | ৮৩-র কথা।

আট তারিখে (৮ | ৯ | ৮৩) রোদ চড়তে না চড়তে পঁচিশজন মজুর তাদের কাঁথা ঝোলা নিয়ে আমার বাড়ি। আগের দিন অনেক কাণ্ড ঘটেছে। বিকেলে ঠিকাদার বাবুর এক আত্মীয় আর মস্তানরা মিলে মজুরদের প্রাণপণে উসকানি দেয়, যে ওদের ঠকাচ্ছে খাতাদার সুধীর পড়িয়া। ওকে মারো, টাকা আদায় করো, ও সব টাকাই পেয়ে গেছে।

এই নিরীহ গোবেচারা সুধীরকে মজুররা আজীবন চেনে জানে। মজুররা সে উসকানিতে কান দেয়নি, ওরা একজোটে রুখে দাঁড়ায়। সুধীর ওদের গ্রামের ছেলে। সামান্য জমিজমা থাকলেও ধরার সব জলে গেছে। ওকে ওরা কখনোই মারবে না। তখনকার মতন মস্তানরা চলে যায়। কিন্তু আজ সকালে মস্তানরা ওদের বের করে দিয়েছে, ঝোপড়ি ভেঙে বাঁশ তক্তা তুলে নিয়ে চলে গেছে। মজুরদের সকলের পুঁজি মেলালে একটি টাকাও হবে না, আর এ শহরে ওরা চেনেও না কাউকে। ধরে এসে বাইপাসে তুলেছে, শহরের পথঘাটও ওদের অজানা। সারাদিন ওদের রাখলাম, খাওয়ালাম ভাত, তারপর বিকেলে রেলের টিকিট কেটে বাসে তুলে দিলাম। বালিগঞ্জ স্টেশনের সুবিধে হল, এখান থেকে হাওড়া লাইনের টিকিট কেনা যায়, আর সিধা হাওড়া যাবার বাসও মেলে টালিমাসে। এটাই হল সংক্ষেপে মহান সি. এম. ডি. এ-র মহানতরো বাইপাস-কাহিনী, তবে এখন বিপদ বলা দরকার।

বলার আগে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে প্রণাম জানাই। একদা, টাকাকে তুচ্ছ জ্ঞানে তিনি বলেছিলেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" এর সহজ ব্যাখ্যা সবাই জানেন। পরমহংসের কাছে রাজৈশ্বর্য ও মাটি তুলামূল্য ছিল। তবে তিনি তো দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি কি ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন? যে স্বাধীন ভারতে মাটি কাটা, গর্ত খোঁড়া, নামাল জমি মাটি ফেলে সমান করা, এ সব কাজের মধ্য দিয়ে মাটি ঠিকাদারদের এবং যে সব মহানুভব এ সব ঠিকাদারদের রক্ষক ও কর্তা, তাঁদেরকে কোটি কোটি টাকা এনে দেবে? আজ স্বাধীন ভারত সত্যিই ঠিকাদারদের, কাজে মর্টগেজ হয়ে আছে। নিশ্বাস নেবার বাতাস বোধ হয় একমাত্র বস্তু, যা ঠিকাদাররা দু'নম্বরী টেন্ডার দিয়ে বাবুদের টাকা খাইয়ে কবজা করতে পারে নি।

বাইপাস প্রকল্পে, মাটি কেটে জমি সমান করার জন্য হাজার হাজার মজুর নিযুক্ত হয়েছে। এটা সি. এম. ডি. এ-র অধীন কাজ। আমি তো মাত্র একজন ঠিকাদারের কথা শুনলাম। হয়তো আরো অনেকে আছে, আমি জানি না। নিয়মটা হল, ঠিকাদার দালাল লাগায়, সে দফাদার। একজন দফাদার হয়তো সত্তর থেকে একশো মজুর জোগাড় করে ও তাদের দায়িত্ব নেয়। দফাদার নিজে সবসময়ে মজুর জোগাড় করে না সে লাগায় খাতাদারকে। একজন খাতাদার পঁচিশ তিরিশ জন মজুর আনে। এভাবে একশো মজুরের জন্যে একজন দফাদার তিন চারজন খাতাদারকে লাগায়। খাতাদার খাতায় মজুরদের নাম ঠিকানা সহ সব হিসাব রাখে। মজুরদের সব সম্পর্ক খাতাদারের সঙ্গে। ঠিকাদার বা দফাদারের সঙ্গে মজুরের সরাসরি লেনদেনের সম্পর্ক নেই।

যতদূর জানা গেছে, আমার কাহিনীর দফাদার বাবুর নাম বুঝি শক্তিপদ সাউ নিবাস বাবুনপাড়া / ডাক : চণ্ডীপুর / থানা : নন্দীগ্রাম / মহকুমা : তমলুক / জেলা : মেদিনীপুর। এ ব্যক্তি কেমন করে বাইপাসে মাথা গলান তা কর্তা-ব্যক্তিরাই জানবেন। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে এই লোকটি এক খাতাদার লাগিয়ে গামা, নারণ, সাগরিয়া, সধং ও মঙ্গলপুর থেকে বত্রিশজন মজুর আনায় এবং মাটি কাটা কাজে তাদেরকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজে লাগায়।

আইন হল, জমি কাটার মাপ অনুযায়ী মজুরি হবে, দৈনিক মজুরি বেআইনী। আইনমতে আট ঘণ্টা খেটে একজন মজুর বারো টাকা মতো পায়। এ সবই আমি যেমন শুনেছি তাই লিখছি। কোলাঘাট প্রকল্পে মজুরি বেশি হবার কথা। এই দফাদার মজুরদের বলে, যে তারা রোজ খেতে পাবে, এবং সাড়ে তিন টাকা রোজ। এই নিয়ম চলে বলেই ঠিকাদার-দের কপালে মাটি থেকে টাকার কল্পতরু গজায়। মজুরদের নির্লজ্জ লোভে ঠকানো হয়। খাতাদার বাঁধা মাইনের কাজ করে। দফাদার তাকে মাইনে দেয়। মজুর ঠকিয়ে দফাদার নিজের ঝাট্টা কেটে নেয়। ঠিকাদার সবচেয়ে বেশি লাভ করে। কেননা মজুর খাটে হাজার হাজার মজুররা যা পায় তা না-পাবার মতোই। তারা দাসমজুর হয়েই খাটে। বহুল প্রচারিত সরকারী প্রকল্পও দাসমজুরের শ্রমে তৈরি হয়।

কোলাঘাটে তার কাজের সময় (যেমন চুক্তি ছিল তার সঙ্গে) শেষ হলেও এই বিশেষ দফাদারটি মজুরদের টাকা দেয়নি। কিছু লোক চলে

যায়। কিছু লোক থেকে যায়। খালি হাতে ঘরে ফেরে কেমন করে? সুধীর পড়িয়া এখানে মজুর খাটছিল। দফাদার তাকে বলে, তুমি মাসে সাড়ে তিনশো টাকা এবং খেতে পাবে। বাইপাসের জন্যে মজুর আনো। মজুররা রোজ চার টাকা পাবে, খেতে পাবে।

এখানে বলা দরকার, দফাদার এক থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে টাকা দেয়না, খাতাদার মজুরদের কাছে বেইজ্জত হয়, সেহেতু নতুন নতুন খাতাদার খুঁজতে হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, কোলাঘাটে যারা টাকা পায়নি, তেমন কিছু লোকও বাইপাসে এসেছিল সুধীরকে দফাদার বুঝিয়েছিল, পাওনাদার তুমিও যেমন, ওরাও তেমন। বাইপাসে চলো, সব পেয়ে যাবে।

অবশ্য বাইপাস থেকে বিতাড়িত মজুররা বলেছে, পেটভরা ভাত ওরা নিয়মিত পেয়েছে, খাবার বিষয়ে ওদের কোনো নালিশ নেই। দফাদার যখন সুধীরকে বলল, বাইপাসে যেয়ে আগে কোলাঘাটের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেব, সুধীর তখন একান্ন জন মজুর নিয়ে বাইপাসে এল। সবং থানার তিশিন্দিপুর থেকে এল বুধরাই কিসকু, মলিন নাথ ও কালীপদ নাথ। খেজনা থেকে এল মাণিক সিং, লক্ষীকান্ত সিং, হরিপদ সিং ও সন্তোষ সিং। জলপুর থেকে এল বিধু বাস্কে। সুন্দরপুর থেকে বঙ্কিম সিং সহ কুড়িজন এল। নারায়ণগড় থানার সরিষা থেকে এল নগেন সিং। তেঁতুলিয়া ডুঙ্গাম থেকে আলি হোসেন সহ পাঁচজন। সোনামুই থেকে এল দামোদর মণ্ডল ও বাদল সাঁতরা। জগন্নাথপুর থেকে রাম মাইতি সহ চারজন। কুঞ্জগেড়িয়া থেকে সুরেন বাস্কে সমেত চারজন। গামা থেকে অজিত আদগিরি সমেত তিনজন। অনেকে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে কাজে লাগে। আরো দুজন সহ অন্যরা মার্চের শেষ সপ্তাহে কাজে যোগ দেয়।

যোগ দেবার পরে ওরা আবিষ্কার করল, বসবাসের ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। রাতে ঘণ্টা ধ'রে কাজ করতে হয়, ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি কাজ চলে। মাঝে পনেরো মিনিট ছুটি মেলে সকালের টিফিনের সময়ে আর স্নান ও ভাত খাবার ছুটি ঘণ্টা খানেক, কচিৎ দেড় ঘণ্টা। দফাদার আগাম মজুরি দিতে নারাজ হয়। তাহলে ঘরে বউ ছেলেমেয়ে খাবে কি? অনেকে চলে যায় কাজ ছেড়ে। ৮ই এপ্রিল অবধি মাত্র পঁচিশজন টিকেছিল। যারা চলে যায়, তাদের বেলা দফাদার খাতাদারের হাতে ওদের রেলভাড়াটা মাত্র দেয়। প্রথমটা মজুররা খাতাদারের ওপর বেজায় খাপ্পা হয়েছিল তবে সহজেই তারা বুঝল যে কমবয়সী, সাদাসিধা

সুধীর পক্ষিয়ার পক্ষে ধূর্ত সাউয়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব। মজুরদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার জন্যে খাতাদার যত চাপ দিতে থাকল, দফাদারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ততই বিষিয়ে উঠল। তারপর যে কি হয়, তা তো আগেই বলেছি।

৮।৪।৮৩ অবধি দফাদারের কাছে খাতাদারের পাওনা ছিল মজুরদের জন্যে কোলাঘাটের দরুণ ৮৪১·৭৫ পয়সা, বাইপাসের জন্যে ১,৭৮২·৫০ পয়সা। তার নিজের মাইনে কোলাঘাট ও বাইপাস মিলিয়ে ১,২২৫ টাকা। সবশুদ্ধ দফাদার খাতাদারকে ৩,৮৪১·২৫ পয়সা দেবার কথা। খাতাদার পীড়াপীড়ি করতে থাকল, দফাদার যেমন বলেছে তেমন রেটেই মজুরদের পাওনা মিটিয়ে দাও। আমার মাইনে না দিলে নাই দেবে।

এই মজুরির রেট তো অনেক রকম। সরকারী রেট এক রকম, কণ্ট্রাক্টর সেই রেট দেবে বলে সরকারকে, কার্যকালে অনেক কম দেয় দফাদারকে, দফাদার আবার তাতেও ভাগ বসায়। এই সব মজুর যে বেগার বা দাসমজুর, তা নিশ্চয় বলতে হবে না। ঠিকাদার আনীত মজুর মাত্রেই দাসমজুর। ঠিকাদার আনীত মজুর সরকারী রেট পাচ্ছে, এমনটা কেউ আশাও করে না, বাস্তবেও তা ঘটে না। এদের ব্যাপারটি নিয়ে রাজ্য-সরকারের শ্রমদপ্তরে সকলের স্বাক্ষর, টিপছাপ সহ আবেদন দেয়া হয়। এ সব মজুরদের কেউ কেউ তো নেহাৎই বালক। বোধহয় ওদের ভেরো বছর বয়সও হয়নি, আবার তেঁতুলিয়া ভুরামের মহম্মদের মতন অনেকে বুড়ো।

গামা গ্রামের মেষরাই হেমব্রমের অবস্থা ওদের মধ্যেও বিশেষ করে শোচনীয়। সত্যি বলতে কি, গামা গ্রামের কিছু সাঁওতালের অবস্থা মেষরাইয়ের মতন। এক সময়ে ওরা এমন একটি বামপন্থী দলের সমর্থক ছিল, যেটি প্রথম বামফ্রন্টে মন্ত্রীসভায় আসে নি, পরের বার এসেছে। সে সময়ে ওদের রাজনীতিক আনুগত্য গ্রামের অন্য প্রভাবশালী দলটিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। গ্রামে বাস রাজার দলে থাকবে না, তা কি হয়? তাই শম্ভু মুর্মু নামে একটি তরুণ, হৃদয়বান, সমাজকর্মী ছেলেকে নির্মম ভাবে বুকে বাটখারা পিষে হত্যা করা হয়। মেষরাইয়ের মতো অনেকেরই ঘরদোর লুট করা হয়, সামান্য যা জমি ছিল ওদের তা কেড়ে নিয়ে বিলি করে দেয়া হয় অন্যদের। অথচ মেষরাইরা প্রান্তিক চাষী।

মেঘরাই কিন্তু বলছিল না, অন্যেরাই ওর জীবনকাহিনী বলছিল। মেঘরাইয়ের পায়ে এখনো মার খাবার ফলে দগদগে ঘা। এখন তো তৃণমূলে তৃণমূলে রাজনীতিক চেতনার সেচ হয়েছে। ফলে গরিব আদিবাসীরাই এ-ওর শত্রু হয়ে গেছে। রাজনীতিক দলের মদতে আজ সাঁওতাল সাঁওতালকে কাটে, মুণ্ডা তার জাতভাইকে বর্গা থেকে উচ্ছেদ করে। আমরা গর্ব করতে পারি যে এতদিনে আমরা গরিব আদিবাসীদের একটা অংশকে আমাদের মতোই বিষাক্ত, লোভী ও নিষ্ঠুর করতে সক্ষম হয়েছি।

কেন বাইপাসের কথা লিখতে বসেছি? বণ্ডেড লেবার সিস্টেম বা দাসমজুর প্রথা নিষেধক আইনে পশ্চিমবঙ্গে দাসমজুর আছে বলে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ কৃষিনির্ভর জগতে নানা রকম নামে শর্ত বা চুক্তি বা কাবন্ধ দাস-মজুর আছে। আর ঠিকাদার গ্রাম থেকে যে বেগার মজুর আনছে, তারা দাসমজুর ছাড়া কিছুই নয়। আজ আইন করে কৃষি ভারতের দাসমজুরদের মুক্ত করার কথা বলা মোটেই যথেষ্ট নয়। ভারতের সর্বত্র এক নতুন দাসমজুর প্রথা গজিয়ে উঠেছে, বেড়ে চলেছে। খুঁটিয়ে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে যে ঠিকাদার আনীত বেগার মজুররা বাস্তবে দাসমজুর ছাড়া কিছুই নয়। এদেরকে সর্বত্র পাওয়া যাবে। যে কোনো নির্মান প্রকল্পে, বাঁধে, পথ তৈরি ও মেরামতিতে, মাটি কাটায়, ইট-খোলা ও টালি ভাটায়। রাঁচি থেকে বেগারমজুর যখন পশ্চিমবঙ্গে ইটভাটায় খাটতে আসে, তারা হয়তো "মাইগ্রেটরি লেবার অ্যাক্ট" আইনের আওতায় পড়ে। অবশ্য এ শুধু সরকারী খাতায়, বাস্তবে তাদের বেলা আইনের কোনো আশ্রয় মেলে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যখন এ-জেলার লোক ও-জেলায় যায়, তখন? তাদের জন্য কোনো কাগুজে আইন কি আছে?

এই মেট্রোপলিটান বাইপাস্ প্রকল্প কত কোটি টাকার? আমোঘ ক্ষমতাশীল ঠিকাদার, যাদের প্রবেশ ঘটে কর্তাব্যক্তিদের মদতে, তাদের বাদ দিলে যখন চলবেনা, তখন শ্রমিক স্বার্থ যাতে থাকে, সে সব আইন কার্যকরী করবে কে? সে দায়িত্ব কার?

কোটি কোটি টাকার প্রকল্পে যখন অজিত আদগিরির মতো ছোট ছেলেটা চব্বিশ দিনের মজুরি পায় না, তখন ঠিকাদার, দফাদার ও দফাদারের মস্তানদের মুনাফার অঙ্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কলকাতার মতো শহরের উপকণ্ঠে হাজার হাজার হতভাগা বেগার মজুর খাটছে। তারা

এসেছে কেন ? দেশে খরা চলছে বলে এসেছে। ওদের দেখবে কে ? শুধু পেটে ভাত পাচ্ছে, আর কাটকাটা রোদে ওরা বারো ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটনি খাটছে। সেই রাত নামে, অন্ধকারে শুরু হয় অন্য খেলা। মস্তানরা মদ বেচে, মদ খায়। দেশে ঘরে পঞ্চায়েত যদি পঞ্চায়েতের কাজ করত, তাহলে তো ওরা আসত না। এখানে কাজের ব্যাপারটা যদি মানবিক হতো, তাহলে ওরা চলে যেত না। বাইপাসে এমন কতজন বেগার মজুর এসেছে, ঠকেছে, ফিরে গেছে, তার হিসেব কোথায় ? হিসেব রাখবার ব্যবস্থাই বা কোথায় ? স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের অভিভাবকরা বা কি করেন ? খেটে খাওয়া প্রলেতারিয়েতকে বাঁচাতে মস্তানদের তাড়িয়ে দিতে কেন তাঁরা পারেন না ? সত্যি কথাটা এই কলকাতা ও আশপাশে যে বেগার মজুররা খাটছে, তাদের দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। বেশ তো, ঠিকাদার ছাড়া চলবে না, তো তারাও টাকা পেটাক মোটা হাতে। গরিবের কালাকড়ি মারা কেন ? রাজনীতিক নেতাদের কাছে যান, তাঁরা ঘোষণা করবেন, "পশ্চিমবঙ্গ অন্যরকম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার নয়। আমরা মন্দ কাজ করি না। সে সব করে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি।"

এ যদি কথার কথা হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু ঘোষণার পিছনে যদি কোনো সত্যতা থাকত, বাইপাস-কাহিনী তাহলে নতুন ভাবে লেখা যেত।

(ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি / ১৬-২৩/৪/৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত। অনুবাদ : লেখক)।

তপশীলী, আদিবাসী ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

মহাশ্বেতা দেবী

বিমলা হরির বয়স ছিল চব্বিশ। সে কাঁচড়াপাড়ার এক গরিব হরিজন মেয়ে। ডেঙাপাড়া মেথর কলোনির বাসিন্দা। কল্যাণী কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে ও ১৯৭৯ সালে নাম লেখায়। আজ আর তার ডাক আসার জন্য বসে থাকার দরকার নেই। বিমলার সমস্যা ও নিজেই সমাধান করেছে আত্মহত্যা করে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডেঙাপাড়ায় গিয়েছিলাম তরুণ, সাহসী সমাজসেবী হরিজন তরুণ রাজেন্দ্র বাপকোরের নির্মম হত্যার পর। তখন বিমলাকে কি দেখেছিলাম? মনে করতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার হরিজন বসতিগুলিতে চুল্লুর ঠেক বসিয়ে যে মস্তানরা দাপটে রাজত্ব করছিল, "চোলাই কারবার বন্ধ করো" বলে রাজেন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় দুঃসাহসে। হরিজন কল্যাণ সমিতি অনেক কিছুর জন্য লড়ছে, চোলাই কারবার তার অন্যতম। ডেঙাপাড়ার হরিজন প্রাথমিক স্কুল ভেঙে পড়ছে, পথ বলতে কিছু নেই, কাঁচা নর্দমাগুলো ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর, দারিদ্র আর সরকারী ও পৌর ঔদাসীন্যের নগ্ন ছবি চারদিকে। অথচ কাঁচড়াপাড়ায় হাজার হাজার হরিজন থাকে। তাদের বসতি হয় রেলের জমিতে, নয় পৌরসভাধীন এলাকায়। ওরা নিজেদের জীবন বদলাতে চায়, সত্যিই চায়। কিন্তু অন্যেরা তো চায় যে ওরা ওই ভাবে পচে মরুক। বিমলা হরিও বাঁচতে চেয়েছিল। চার বছর ও অপেক্ষাও করেছিল। এক্সচেঞ্জে ওর ডাক এল না। কখনোই আসে না।

আমার হাতের সামনে যে তালিকা, তাতে কল্যাণী, ব্যারাকপুর ও নৈহাটি এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পঁয়তাল্লিশ জন হরিজনের নাম আছে। অনেকে ১৯৭৮-এ নাম লিখিয়েছেন, আজও সাড়া পাননি।

পুরুলিয়া হল যেমন গরিব, তেমন পিছিয়ে থাকা জেলা। পশ্চিম-বঙ্গের সব চেয়ে অবহেলিত জেলা। জেলার মধ্যে বান্দোয়ান ও মান-বাজার-২ আবার তার মধ্যেও অবহেলিত দুই ব্লক। ওখানেই থাকে হতভাগ্য

খেড়িয়া, বিরহড়, পাহাড়িয়া, সাঁওতালরা। ওই দুটি ব্লকে আজও কোনো পাকা রাস্তা নেই যাতে সদরে যাওয়া চলে। মানবাজার-২তে তো কোথাও যেতে হলেই মাইল মাইল পায়ে হাঁটতে হয়। স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছরেও পুরুলিয়া নগ্ন ঔদাসিন্যে অবহেলিত। যে সব জায়গার নাম করলাম, ওগুলি প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। সাঁওতালরা অবশ্যই ওদের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রগামী এবং ওদের মধ্যে শিক্ষার হারও তুলনায় বেশি। ওদের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি চেতনাও বেশি। চুরকু গ্রামে থাকেন স্বাধীনতাসংগ্রামী বৃদ্ধ কানুরাম সরেন। উনি একটা বৃত্তি পান বটে, কিন্তু এই খেড়িয়াসরেন বৃদ্ধের ছেলেরা পুরুলিয়া এক্সচেঞ্জের বান্দোয়ান শাখা থেকে কোনো ডাক পায়নি।

বান্দোয়ান এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো পঞ্চান্ন জনের তালিকা দেখছি। কয়েকজন গ্রাজুয়েটও। সাঁওতাল জীবন চন্দ্র মুরমু ১৯৭০ সালে নাম লেখায়। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অনেক নামও আছে। সাঁওতাল গ্রাজুয়েট হতে পারে, এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পারে, তবু কাজের সুযোগ সে পায় না। নাম লেখানো ছেলেমেয়েদের গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়, শিক্ষক নেয়া হয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী কিন্তু বেকারই থেকে যায়। তারপর বহু বছর ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ওরা শিক্ষাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মেদিনীপুর অনেক বেশি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে অনেক আদিবাসী। এখানে আছেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভুমিজ, লোধা, হো, মাহাতী, কোড়া, বাইগা ও অন্যরা। দারিদ্রের কারণে গরিবরা ভাতকা-ড়ের বিনিময়ে শিশুদের গরুবাগালী কাজে পাঠান। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন বটে, তবে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। তা সত্ত্বেও যখন কোনো গরিব ছেলে বা মেয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, তাতে পরিবারকে অনেকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয়। কেননা ওই ছেলেমেয়েদের রোজগার থাকে না শিক্ষাকালে। যখন লোধা জাতির গান্ধী মল্লিক ডালকাটি গ্রাম থেকে, বা কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তা চাকুয়া গ্রাম থেকে অষ্টম বা নবম শ্রেণী অবধি পড়ে, ঝাড়গ্রাম এক্সচেঞ্জে নাম লেখায়, ততদিনে তারা চাকরি পাবার বয়সে পৌঁছেছে। ওদের মতো আর যারা আছে, সকলেরি মনে হয় যে পড়ার জন্য পারিবারিক দায়দায়িত্ব অনেক অবহেলা করা হয়েছে, এখন কাজ পাওয়া দরকার। গান্ধীর নাম ১৯৭৬

থেকে এবং কৃষ্ণপ্রসাদের নাম ১৯৭৮ থেকে লেখানো আছে।

ঝাড়গ্রাম, বেলদা, মেদিনীপুর ও খড়্গপুর এক্সচেঞ্জে লেখানো ১৭৭ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত কুর্মী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা ও মাহালি ছেলের নাম আমার সামনে। মাহালিরা সংখ্যায় খুবই কম। ১৯৭৫ থেকে লেখানো অন্তত একশোটি নাম দেখছি। তার মধ্যে ছয়জন মাহালি হতভাগ্যের নামও আছে।

মুর্শিদাবাদের পরমেশ্বর মারাণ্ডি সাঁওতাল। এই উৎসাহী সমাজকর্মী যুবকটি বহরমপুরের কৃষি আয়কর আপিসে কর্মী এবং স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে নানা কাজ করে। মুর্শিদাবাদ জেলা হিসেবেই অত্যন্ত উপেক্ষিত, অতি অনুন্নত। পর্যটন স্থান হিসেবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, সে বিষয়ে চূড়ান্ত অবহেলা। বিখ্যাত হাজারদুয়ারী প্রাসাদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, অন্তত সেখানে পৌঁছবার পথঘাটের ব্যবস্থা, এজন্য জেলাবাসী আজও অপেক্ষা করে বসে আছে। সাঁওতালরা কবে কেমন করে মুর্শিদাবাদে এল, তা জানবার জন্যই পরমেশ্বর প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জেলার বেশ কিছু সাঁওতাল দীর্ঘকাল ধরেই ক্রীশ্চান। তাদের মধ্যে শিক্ষার হারও যথেষ্ট উন্নত। ভাবলে অবাক লাগে, দুঃখও হয়, আজও আমাদের সমাজে অনেকে আদিবাসী মানেই সাঁওতাল বলেন। কত শুনেছি যে বীরসা মুণ্ডা সাঁওতাল বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রতিবেশীকে আমরা এত কম চিনি কেন?

পরমেশ্বরের পাঠানো এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো শিক্ষাপ্রাপ্ত সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের একশো নয়টি নামের তালিকায় দেখছি, মুর্শিদাবাদের এক্স-চেঞ্জগুলি এঁদের কোনদিন ডাকে নি। ধোবাগুড়িয়া গ্রামের দুবেন মুর্মুর নাম ১৯৭৩ সালে লেখানো। বহু ছেলে, বহু মেয়ের নাম ১৯৭৫ থেকে লেখানো আছে।

পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কাঁচড়াপাড়া, মুর্শিদাবাদ, এ তো সামান্য কয়েকটি মাত্র। বলা চলে বিন্দু পরিমাণ, ওই সব জেলা ও অন্য জেলাতে সিন্ধু পরিমাণ এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ও তপশীলী নিশ্চয় আছেন।

এই সব নাম যাঁদের, তেমন কয়েক শত জনকে তো আমি চিনি। চিনি বলেই ওদের বেকারত্বের ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সত্যি।

স্বীকার করছি যে সারা পশ্চিমবাংলায় বেকারি আজ এক নিদারুণ,

ভয়ংকর সমস্যা। যুব সমাজের সামনে এক বিরাট অন্ধকার অনিশ্চয়তা। যাঁরা তপশীলী বা আদিবাসী নন্, তাঁদের সমস্যা নিশ্চয় বিশাল, অপার। একথাও সত্যি যে সংরক্ষিত পদের বিরুদ্ধে অনেক চিঠিপত্র খবরের কাগজে দেখি।

মজা হচ্ছে, "এই সব আসন সংরক্ষিত", এ ঘোষণা কিন্তু সত্যি সত্যি আদিবাসীর বেকার সমস্যার সমাধানে কোনো সাহায্য বলতে গেলে করছে না। আদিবাসীর শিক্ষালাভের সুযোগটা দেখুন। প্রাথমিক পর্যায়ের পর যে পড়বে, মাধ্যমিক বা কলেজ তার গ্রাম থেকে অনেক দূরে। আবাসিক ব্যবস্থা এত কম, যে সেজন্যও সে পড়তে পারে না। তারপর সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, বাণিজ্যিক বা বিজ্ঞান শাখায় আদিবাসী শিক্ষার্থী খুব কম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চতরো শিক্ষা, বা প্রযুক্তি শাখায়, তার কাছে স্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গে কয়জন আদিবাসী বি. এস. সি. / এম. এস. সি / বি. কম / এম. কম / ডাক্তার / ইঞ্জিনিয়ার / বিজ্ঞানী হয়েছেন? অথবা হাই স্কুলে শিক্ষক / শিক্ষিকা, বা কলেজে অধ্যাপক / অধ্যাপিকা কয়জন?

তাই যে সব চাকরিতে স্নাতক / স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দরকার, বিশেষ করে স্পেশালাইজ্‌ড স্টাডিতে, সেখানে সংরক্ষিত পদের ঘোষণাটি আদিবাসী ক্ষেত্রে প্রহসনমাত্র। কোন্ আদিবাসী মেরিন বায়োলজিস্ট, নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট বা হেমাটোলজিস্ট পদে চাকরি পান? ওঁরা তো বাণিজ্যিক পাঠক্রমেও বলতে গেলে পড়েন না, সুযোগই পান না। ইকনমিক্স, অ্যাকাউন্টেন্সি বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন, এমন আদিবাসী কোথায়?

সাধারণত আদিবাসীর শিক্ষা প্রাথমিক স্কুলেই শেষ হয়। বড় জোর ছয় ক্লাস, নয়তো আট ক্লাস। লোধা বা মাহালি কচিৎ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক অবধি পৌঁছান। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা বা ভূমিজ হয়তো মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শেষ করতে চেষ্টা করেন। যখন পারেন না, সে তো দারিদ্র্যেরই কারণে। সাঁওতালরা সব চেয়ে অগ্রণী। তাঁরা যদি বা সামান্য কয়জন বি. এ. বা এম. এ. পড়েন, তাও আর্টসে, বিজ্ঞানে বা অন্য বিষয়ে নয়। তাই যখন চাকুরি যাঁরা দেবেন, সেই সংস্থা আদিবাসী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান, চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন, একশোর মধ্যে নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে "আদিবাসী যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেল না" বলে বাইরে থেকে লোক নিতে হয়। যে কোনো নিরপেক্ষ সমীক্ষায় প্রমাণ হবে

ভালো মাইনের প্রতিযোগিতামূলক চাকরিতে আদিবাসী প্রার্থী বাস্তবে পাওয়া যায় না।

অবশ্যই এমন চাকরিও আছে যাতে আদিবাসী ও তপশীলী প্রার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেন। ব্যাঙ্ক ও সরকারী অফিসে কেরানীর কাজ যেমন। এ সব চাকরির বিজ্ঞাপন যখন বেরোয়, তখন সুদূর গ্রামে বসে তার খবর পাওয়াও কঠিন, এবং খবর পেলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম পূরণ ও দাখিল (সহস্র নিয়ম মেনে) করাও কঠিন। আদিবাসীর জন্যে এখানেও পদ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু জেলার এক্সচেঞ্জ সে সব খবর রাখেন না আমি জেনে খুব অবাক হয়েছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রকে খোদ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে একটি আদিবাসী এমপ্লয়মেণ্ট সেল্ আছে। এই সেল্ কি কাজ করে, আদিবাসীদের চাকরি পেতে কি সাহায্য করে, তা কেউ জানে না।

এই সেলের তো উচিত, প্রথমত রেজিস্টার্ড আদিবাসী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা। আদিবাসীদের বিভিন্ন সংগঠনই বেকার ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো ছেলেমেয়েদের তালিকা জোগাতে সক্ষম। তারপর এই সেলের উচিত, কোথায় আদিবাসীর জন্য চাকরি খালি আছে সে খবর (ক) সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছানো ; (খ) জেলার এক্সচেঞ্জকে নাম পাঠাতে চাপ দেয়া।

ব্যাঙ্কের রেক্রুটমেণ্ট বিভাগে আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনারা আদিবাসীর জন্য যে সংরক্ষিত পদ রাখেন, তাতে আদিবাসী কিভাবে নিয়োগ করেন। তিনি বললেন, যে তাঁকে না কি কয়েকটি আদিবাসী সংগঠনের নাম তালিকা দেয়া আছে, তিনি সেখানে জানান। জানতে চাইলাম, ও ভাবে কোনো আদিবাসীকে কোনোদিন চাকরি পেতে দেখেছেন কি না। তিনি মাথা নাড়লেন। কোথা থেকে তাঁর কাছে সংগঠনের তালিকা এল, সে সব সংগঠনের ঠিকানা কি, আর কোনো কথাই বের করতে পারিনি। সরকারের আদিবাসী এমপ্লয়মেণ্ট সেল্ এ বিষয়ে কি বলেন ? রাইটার্সের ওই সেল্ কাদের নিয়ন্ত্রণে ? ওই সেলের সাহায্যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বা কতজন আদিবাসী কাজ পান, সবই আমরা জানতে ইচ্ছা করি।

জেলার এক্সচেঞ্জগুলিকে তো চাপ দিয়ে জানতে চাওয়া উচিত, যে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ মার্চ, এই এক দশকে ওই সব এক্সচেঞ্জে কতগুলি আদিবাসী সংরক্ষিত পদের খবর ছিল, এবং সঠিক কতজন আদিবাসী চাকরি

পেয়েছেন।

এটা কেমন কথা, যে আট-নয়-দশ বছরেও আদিবাসী এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক পান না? আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত চাকরিগুলি কারা পাচ্ছেন? যা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি? শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে তপশীলী ও আদিবাসীর পক্ষে জাতি পরিচয়পত্র পাওয়া এখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে ঘুষ দিয়ে অন্যেরা তপশীলী বা আদিবাসী সার্টিফিকেট নিচ্ছেন এবং সংরক্ষিত পদে চাকরি পাচ্ছেন। এক্সচেঞ্জগুলিও এখন চরম দুর্নীতির কেন্দ্র। টাকার লেনদেন না হলে ডাক আসবে না, এ তো জেলায় জেলায় শুনি।

সংরক্ষণ নীতি অতীব উদার। কয়েকটি চাকরির উদাহরণ দিই। হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকস্ লিমিটেড চেয়েছেন মেডিক্যাল অফিসার (সার্জন) এবং সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার। দ্বিতীয় চাকরিটিতে MIG এয়ারক্রাফট-এর ১ থেকে ১০০ অবধি খুঁটিনাটি জানা আবশ্যিক।

ইফকো চান সিকিউরিটি সুপারভাইজার। যে কোন বিষয়ে স্নাতক চাই, চাই সেনাবিভাগে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং কোন শিল্প কারখানায় উক্ত যোগ্যতায় কাজ করবার অভিজ্ঞতা থাকলে আরো ভালো।

ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম চান অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার / জুনিয়র ম্যানেজার / ফিনান্স ও অ্যাকাউন্ট্স একজিকিউটিভ। এর জন্য ভারত সরকারের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্স ফার্মের সদস্য তো হতেই হবে, আরো মহাভারত আছে।

এখন দেশ জোড়া লক্ষ লক্ষ বেকার যখন দেখেন যে সব কাজেই কিছু পদ "সংরক্ষিত", স্বভাবতই চাকরি না পাবার হতাশা থেকে তাঁদের মনে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত" ব্যাপারটি বিষয়ে ক্ষোভ জমার, সেটা স্বাভাবিকও।

এ সব কাজ প্রতিযোগিতামূলক। বিজ্ঞাপিত সত্তর ভাগ কাজ তাঁরাই পান, যাঁদের অভিভাবকরা তাঁদের দামী, স্কুল-কলেজ স্পেশালাইজ্ড ধারায় পড়িয়ে বর্তমান ক্ষুধিত বর্বর সমরের ক্ষুরের ফলার উপর দিয়ে দৌড়বার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন। এ কথাও খুব সত্য, যে বড় বড় কলকারখানায় এমন সব চাকরিতে যাঁরা ঢুকছেন, তাঁরা প্রায়শ আদিবাসী নন, এবং বিহারের শিল্পাঞ্চলে আদিবাসীকে টাকা খাইয়ে তার উত্তরাধিকারী সেজে সেই শ্রমিক অবসর নিলে তার ছেলে / মেয়ে বা অন্য ন্যায্য উত্তরাধিকারী যে কাজ পেতে পারত, তাতে অন্য জাতি কত ঢুকে যাচ্ছেন, কেউ তার হিসাব

রাখবে না কেননা এই দুষ্টচক্রে বহু বাঘ সিংহ ও ইউনিয়ন নেতা জড়িত। জামসেদপুর টেলকোতে কত আদিবাসী নেবার কথা এবং প্রকৃত আদিবাসী কতজন নিযুক্ত আছেন? এ কথা কি সত্যি, (পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি যা বলছেন), হরিজনদের জন্য যে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ, সেই সেবক, ক্লীনার, জমাদার পদে বহু অন্য জাতি ঢুকে বসে আছেন। তাঁরা নালা নর্দমায় বা পায়খানায় ঝাঁটা ধরেন না। সে কাজ সামান্য হরিজনরাই করছে, এঁরা না কি তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাচ্ছেন, যাবেন।

"সংরক্ষিত পদ" দেখে যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা নিশ্চিন্ত হোন। বেশির ভাগ চাকরি এমন, যে অন্য জাতিকেও ভীষণ ভাবে তৈরি হয়ে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ দিতে হয়, এবং এ কথা কে না জানে যে পিছনে "দাদা" না থাকলে কোনো কাজই মেলা মুশকিল।

আদিবাসীর অস্তিত্ব কি রকম পশ্চিমবঙ্গে? বেঁচে থাকার তেল-নুন-লাকড়ি জুট করাক, এর জন্যই যে প্রতিযোগিতা, সে ভীষণ রণে হার মেনে তাঁরা নামাল খাটতে যান। তিনি যে স্কুলে পড়েছেন, তাতে তিনি এমন শিক্ষা লাভ করেন নি, যা তাঁকে ও রকম কোনো বড় কাজে প্রার্থী হিসেবে তৈরি করে।

সোজা কথা, কি কেন্দ্রীয় সরকারে, কি রাজ্য সরকারে আদিবাসী প্রার্থী এখন অবধি অধিকাংশই চতুর্থ শ্রেণীতে কাজ পাবার উপযুক্ত। আজকাল একটি অভিযোগ সকল জাতি নির্বিশেষে জেলায় জেলায় শোনা যায়, যে স্থানীয় রাজনীতিক ক্ষমতাশালী "দাদাকে খুশি" করতে পারলে তবেই আঞ্চলিক এক্সচেঞ্জ থেকে ডাক আসবে এবং এক্সচেঞ্জ আপিস থেকে কর্মদানকারী সংস্থা অবধি "খুশি করার" ব্যবস্থা খুবই চালু। যদি কোনো আদিবাসী কপাল জোরে স্থানীয় ব্যাঙ্ক বা আপিসে চাকরি পেলও, সে চাকরিতে ঢোকার ও থাকার জন্যে তাকে পার্টিমদত্ত পুষ্ট ইউনিয়ন দাদাদের "খুশি" রাখতে হবে। এর মধ্যে কি কোনো সত্যতা নেই? কয়েকটি ঘটনার বিষয়ে চিঠি তো আমার হাতেই আছে।

শোনা যায় যে পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের একাংশে ঝাড়খণ্ডী হাওয়া আছে। এবং এ কথাও সত্যি যে রাজ্য সরকার বড় দরের মস্তান, ঠিকাদার, অসাধু ব্যবসায়ী, কালোবাজারী, তেলের ডীলার, অত্যাচারী পুলিশ, জাল বর্গা রেকর্ড, সব সইতে পারেন, "ঝাড়খণ্ড" নাম সইতে পারেন না। ভালো, খুব ভালো। তবে এ কথাটাও তো ভাবতে হয় যে পুরুলিয়ার

বংশীর মতো কোনো শিক্ষাপ্রাপ্ত, নাম লেখানো তপশীলী বা আদিবাসীকে যদি তেরো বছরেও এক্সচেঞ্জ থেকে ডাকা না হয়, তাদের মনে হবে যে তারা ইচ্ছাকৃত নির্মম ঔদাসীন্যের ফলে অবহেলিত হচ্ছে ? তখন তারা কেন বিক্ষুব্ধ হবে না ? বিক্ষোভের কারণ তো অপসারণ করলেই হয়।

রাজ্য সরকারের নীতি যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসীদের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল হয় (যা শোনা যায়), তাহলে চার থেকে আট ক্লাস পড়া লোধা বা খেড়িয়া কেন বনরক্ষী কাজের জন্যেও বিবেচিত হয় না ? তারপর বিগত সাত / আট বছরে ঘোষিত আদিবাসী এলাকায় যে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক / শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কেমন ? কতগুলি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন, এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো আদিবাসী ওই সব চাকরি পেয়েছেন ? বহু অ-আদিবাসীও বলেছেন, "উপযুক্ত আদিবাসী প্রার্থী নেই বলে অন্য জাতি থেকে লোক নেয়া হল" এটি অনেক সময়েই মিথ্যা দ্বারা সত্যকে ঢেকে রাখা।

এ রাজ্যের শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসীদের বিষয়ে ঈর্ষা করার কোনো ভিত্তি নেই। যাঁরা জানেন না, তাঁরা মনে করেন যে এরা হল রাজ্য সরকারের আদরের সন্তান। দুর্গম, দূরবর্তী আদিবাসী এলাকায় কষ্ট করে ঘুরলেই এ ধারণা মুছে যাবে। দেশের অগণিত বেকাররা ক্ষুব্ধ, আদিবাসীরা চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদ পাচ্ছে। বাস্তব ঘটনা হল, তা তো তারা পাচ্ছেই না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে যে কাজ তার যোগ্য, সে কাজের বেলাও সে সংরক্ষিত পদের সুবিধা পাচ্ছে না। লোধা ও মাহালিদের লেখাপড়া শেখা ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানোর অভিজ্ঞতা এমন নৈরাশ্যজনক যে লেখাপড়া ব্যাপারটাতেই ওরা আগ্রহ হারায়। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান মহকুমার যে সাঁওতাল মেয়েরা মাধ্যমিক অবধি পড়েছে, বা পাশ করেছে, তারা পড়েছে উভয় সঙ্কটে। চাকরি পাবার সুযোগ নেই, কোনো কার্যকরী প্রশিক্ষণ মাধ্যমে ওরা স্বয়ম্ভর হবে এমন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেন নি। এতটা লেখাপড়া শিখে দিনমজুর হিসেবে খাটতে ওরা যেমন চায় না, তেমনি জমিমালিক ওদের নিয়োগ করতে নারাজ। যারা লেখাপড়া জানে, তারা ন্যায্য মজুরির দাবী তুলতে পারে। স্কুলে শিক্ষাসমাপ্ত আদিবাসীর ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধক, তার সহায়তা নয়।

গোমস্তাপ্রসাদ সরেন লিখেছে, "তালিকাটা দেখুন। ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করুন। ওরা অনেকেই পুরুলিয়া থেকে অনেক দূরে জংলা বা

পাহাড়ী এলাকায় থাকে। পথঘাট নেই। রেডিও বিরল, ওরা খবরের কাগজও রাখে না। ডাক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, ফলে কাজের চিঠি এলেও তা সময়ে ওদের হাতে পৌঁছয় না। এখন এক্সচেঞ্জগুলি দুর্নীতির ডিপো। এক্সচেঞ্জ এবং রাজনীতিক দলগুলি এদের প্রতি উদাসীন। ওরা এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করার পরেও ডাক পায় না। ওরা কি করবে, কোথায় যাবে ?"

গোমস্তার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমি শুধু জানি যে আদিবাসী ও তপশীলীদের বেকারির সমস্যা এক ভয়াবহ সমস্যা। কলকাতায় সব চেয়ে বেশি কাজের খবর থাকে। কলকাতার এক্সচেঞ্জগুলি জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আদিবাসী তপশীলী সংরক্ষিত কোটা পূরণের জন্য তালিকা চাইবে, এমনটিই হওয়া উচিত, তা হয় না। আদিবাসী কলকাতায় বাস করে না, জেলায় বাস করে। সে খবর পায় না। কলকাতায় যে আদিবাসী-তপশীলী সংরক্ষিত কোটা বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলি কারা পায় ? রাইটার্সের আদিবাসী কর্মবিনিয়োগ সেল কি সরকারী খরচে রাখা এক দারুভূত জগন্নাথ মাত্র ?

জেলায় এক্সচেঞ্জগুলি এদের কোনো সাহায্য করে না। সমগ্র অবস্থাটি আদিবাসী ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভে কোনো উদ্যম যোগায় না। যে কোনো সরকারের পক্ষেই আদিবাসীকে খানিক শিক্ষাদান, তারপর তাকে বছরের পর বছর বেকার ফেলে রাখা কিন্তু বিপজ্জনক। এর ফলে প্রথমে মনে জমে হতাশা, হতাশা থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ। ফলে ওদের ও সরকারের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বাড়তে থাকে। চার দশক ধরে আদিবাসী স্বার্থ যেভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, যে আদিবাসীরা দৃঢ় বিশ্বাস করে, যে রাজা আসবে, রাজা যাবে, কিন্তু তাদের স্বার্থ কিসে রক্ষা হয়, সে কথা কেউ ভেবে দেখবে না।

(ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি / ৯. ৭. ১৯৮৩ প্রকাশিত।
বঙ্গানুবাদ : লেখক)।

ভারতের দরিদ্রদের কল্যাণ সমিতিগুলিকে সরাসরি উন্নয়নের ভার দেয়া হোক

মহাশ্বেতা দেবী

অন্য সকলের সঙ্গে আমিও এক সময় বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম যে ভারতের স্বাধীনতালাভ অন্তত কিছুটা পরিমাণে দেশের গরিবের আশা-আকাঙ্খা মেটাতে সক্ষম হবে। ১৯৪৭ সালে তখন আমার বয়স মাত্র একুশ। আজ, ১৯৮৪-তে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই যে ভারতের গরিবদের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা, একের পর এক পাঁচসালা পরিকল্পনা, কর্মসূচী, প্রকল্প ও পার্লামেন্টের একাধিক আইন—এর কোনো কিছুই আদপে কিছু করতে পারেনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এমন জায়গায় পৌঁছেছি যখন আর কিছু করা অসম্ভব, নাকি এখনও আশার ক্ষীণ আলো রয়েছে? এটাও আমি দেখেছি যে ভারতের গরিবেরা অধিকাংশই নিরক্ষর কিন্তু তাঁরা মোটেই নির্বোধ নন। হয়তো এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন যে অনাদি অনন্তকাল ধরে তাঁদের দারিদ্র্যের মধ্যে নির্বাসিত করে রাখা এমনই এক ধুরন্ধর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যে চক্রান্তটির আগাপাছতলা চিনতে পারা তাঁদের সাধ্যের অতীত। জনগণের দারিদ্র্যই হচ্ছে সেই ভিত্তি যার সুবাদে প্রকল্প তৈরি হয়, পরিকল্পনা পাস হয়, পরামর্শদাতা সেজে পণ্ডিতেরা ভিড় জমান এবং টাকার বন্যা বইতে শুরু করে যদিও কড়া নজর রাখা হয় যাতে এই উন্নয়ন খাতে এই বরাদ্দ যাদের জন্য, তাদের হাতে না পৌঁছয়। হতদরিদ্র মানুষ আমাকে এই কথাই বলেছে। হতে পারে অপ্রিয় কিন্তু বড় নির্মম এই সত্য।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা

ক্ষমতায় যাঁরা আসীন তাঁরা বোধহয় এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে যদিও এখনও দু একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অফিসারের দেখা মেলে। কিন্তু এঁদের সচরাচর আস্থাভাজন বলে মনে করা হয়না এবং প্রথম সুযোগেই এঁদের ভারপ্রাপ্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত জেরবার হয়ে ওঠার ফলেই শেষ অবধি পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয় এবং অন্তত পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বলতে পারি যে এই পঞ্চায়েতই হচ্ছে জেলা স্তরের

সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা। নিজের অভিজ্ঞতায় এটুকু আমি বলতে পারি যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হলেও আমার রাজ্যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভাল কাজ দেখিয়েছে। যদিও এখানেও ভাল কাজের ফর্দ খুব লম্বা নয় এবং অন্যান্য রাজ্যের কথা ভাবলে তো গায়ে কাঁটা দেয়। আমার রাজ্যেও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রশাসনিক উজির-আমলাদের রণ-পাতে পরিণত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার এক শক্তিশালী ভরকেন্দ্রতে। ফয়দা উঠিয়েছে সব রাজনৈতিক দল। মার খেয়েছেন জনগণ।

প্রসঙ্গত স্পষ্টাস্পষ্টি বলে নেওয়া ভাল যে প্রধানত মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার গরিব জনগণ ও আদিবাসীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি যোগাযোগ থাকার জন্য পরিষদের মধ্যে যারা কাজ করেন সেরকম কোনো সহায়তাদানকারী সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার কোনো প্রয়োজন আমার ঘটেনি। মাটির খুব কাছে কাজ করে এ রকম বহু সংগঠনের সঙ্গে আমি সরাসরি যুক্ত। তার মধ্যে কয়েকটির কথা মাত্র আমি বলব যাতে করে বলার কথাটা ভালভাবে বোঝাতে পারি।

লোধা ও খেড়িয়া উপজাতি

এদের আমি বড় কাছ থেকে জানি। তাই এদের কথাই আমি বলব। প্রথমেই বোঝা দরকার যে কোন লোধা-শবর ও খেড়িয়া-শবরদের মত পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু আদিবাসীরা নিজেদের সংগঠন তৈরি করতে গেল। দুটিই হল সংখ্যালঘু আদিবাসী উপজাতি এবং যদিও লোক গণনার হিসেবে লোধা ও খেড়িয়াদের নাম একসঙ্গে রয়েছে তবুও খেড়িয়াদের লোধাদের চেয়েও বেশি অবহেলা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কোনো অজ্ঞাত কারণে লোধা, বিরহড় ও উত্তরবঙ্গের টোটোদের বিশেষভাবে আরক্ষিত আদিবাসী বলে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে খেড়িয়াদের প্রতি অধিকতর অবহেলার কারণ। এমন কি নিতান্তই এই কাগুজে মর্যাদাও খেড়িয়াদের দেওয়া হয়নি। বিরহড় ও পাহাড়িয়াদের সঙ্গে লোধা ও খেড়িয়াদের অনেক মিল দেখা যায়। এদের জীবনধারা বহুদিন ধরে ছিল অরণ্য-নির্ভর এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের তুলনায় কৃষিতে এসেছে এরা পরে। মূলধারার সঙ্গে এদের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতায় এবং মূলধারার ছলচাতুরি ও অশুভপন্থা অনেক বেশি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীদের ওপরে আঘাত হেনেছে।

মেদিনীপুরের লোধা ও পুরুলিয়ার খেড়িয়াদের এক সময় অপরাধ

প্রবণ আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল পরে যদিও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও সমাজ, প্রশাসন ও পুলিশের চোখে এরা অপরাধী। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নানা জেলখানায় বিনা অপরাধে যে কতজন খেড়িয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে তা কেউ কোনোদিন খতিয়ে দেখেনি। বলাই বাহুল্য যে আদিবাসীদের বিশেষত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল ধরে ন্যূনতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। লোধা ও খেড়িয়াদের অস্তিত্ব বড়ই বিপদসঙ্কুল কারণ গ্রাম ও শহরের প্রভাবশীল লোকেরা এদের মধ্যে একাংশকে চুরি ও ডাকাতির কাজে লাগায়। মারা পড়ার সময় লোধাদের নিয়ে খবর হয় এবং অচিরেই তা লোকে ভুলে যায়। পুলিশ ও বনবিভাগের কর্মীরা এত লোধাকে প্রাণে মারল, এত খেড়িয়ার ওপরে নির্যাতন চালাল কিন্তু চোরাই মাল যাদের কাছে যায় সেই ধনী ও ক্ষমতাশালী শয়তানদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করলনা। অতএব সমস্যাটির মূল যেমন ছিল তেমন অবস্থাতেই রয়ে গেছে।

সরকারের ঘোষিত অরণ্য নীতির সঙ্গে এর বেশ মিল দেখা যায়। অরণ্য সম্পদ বিলুপ্ত হওয়ার জন্য যে হাতটি কুঠারাঘাত করে তাকে দায়ী করা যায় না। কাঠের ব্যবসাদার ও বনবিভাগের কন্ট্রাক্টররা প্রায়শই বনবিভাগের কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজসে জঙ্গল তছনছ করে ও কাঠ ও অন্যান্য জিনিস চোরাচালান দেয়। জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে এদের যথেচ্ছাচার ফুলেফেঁপে উঠতে দেওয়া হচ্ছে। শীঘ্রই যে জঘন্য অরণ্য সংক্রান্ত আইন অনুমোদন পেতে চলেছে তাতে দেখা হয়েছে, যে গরিবরা গাছ কাটবে তারা যেন শাস্তি পায় অথচ প্রকৃত ডাকাতদের গায়ে যেন আঁচড়টিও না লাগে।

এই পরিস্থিতিই মাটির কাছাকাছি হতদরিদ্র মানুষকে তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে বাধ্য করেছে। সমাজ, সরকার ও অন্যান্যদের পরিপূর্ণ অনীহা এদের এমন হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যে এরা ভর পাচ্ছে টিকে থাকতে পারবে কিনা। সত্যি কথা বলতে এরা মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি করতে পেরেছে যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এদের বাতিল বিধায় খরচের খাতায় তুলে দিয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে পালামৌ এর মতো কৃষিজীবীরা নিজস্ব সমিতি গঠন করেছে। একই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও খেড়িয়াদের বেলায়। সংগঠনগুলি তাদের সমস্ত মানুষদের কি দিতে পারে? এদের ইতিহাসে তো পালামৌ-এর-নীলাম্বর, পীতাম্বর বা সাঁওতাল

পরগণার সিধু, কানহু অথবা রাঁচির বীরসা মুণ্ডার মত নাম নেই যাকে ঘিরে এরা তাদের লুপ্ত আত্মচেতনা ফিরে পেতে পারে। সমিতি এদের দিয়েছে একটা আত্মসম্মানের বোধ এবং তাই তারা একান্ত আপনের মতই সমিতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। মানুষ হিসেবে নিজেদের সম্বন্ধে—সচেতন হওয়ার জন্য তারা অবশ্যই চেষ্টা করতে পারে। এই হল আমার অভিজ্ঞতা। আমি নিজের চোখে এই চেষ্টা দেখেছি।

কিভাবে এবং কেন

এবারে বলি কখন এবং কিভাবে এই সমিতিগুলির গঠনের খবর আমার কাছে এসেছিল। এর পরে বলব যে এগুলি কি কি কাজ করতে পারে এবং কি ধরণের বিপদের সম্মুখীন এদের হতে হয়। এবং তারপরেই আসবে আমার বক্তব্য যে এই সব বিভিন্ন নামের সমিতিগুলিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিলে কিভাবে সর্বনিম্ন স্তরে দারিদ্র্য কিভাবে এখনও লাঘব করা যায়।

১৯৮১ সালের পয়লা মে চৈনপুর পুলিশ থানার অধীন সেমরা গ্রামে পালামৌ জেলা বন্ধুয়া (দাস) মুক্তি মোর্চা প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু গ্রামের দাস শ্রমিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও রামেশ্বরম নামে জনৈক স্থানীয় সাংবাদিকদের মূল্যবান ভূমিকার ফলেই মূলত এটা সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। দর্শক হিসেবে আমার মত কতিপয় বহিরাগত উপস্থিত ছিল। আমার মনে হয় যে ভারতে এই প্রথম কৃষিক্ষেত্রের দাস-শ্রমিকরা এই জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

ভাবলে ভয় করে এমন এক অবস্থায় নাজেহাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোধারা অনেক আগেই একটি সমিতি গঠন করেছিলেন যা ১৯৬২ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। নানাবিধ প্রতিকূলতার জন্য সমিতিটি কাজ করতে পারেনি। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২-র মধ্যেই ৩৩ জন লোধাকে খুন করা হয়। বাধ্য হয়ে লোধারা তাঁদের প্রাক্তন সমিতি পুনরুজ্জীবিত করে এর পাশে এসে দাঁড়ান। ১৯৮২, জুলাইয়ের লোধা হত্যার পর লোধা সমিতি গোপালী গ্রামে একটি সভার আয়োজন করে যাতে ন'টি পুলিস থানার অধীন গ্রাম থেকে বক্তারা যোগ দেন। এঁরা আমাকে একটি সুলিখিত সনদপত্র পাঠিয়েছিলেন যাতে বহু লোধার টিপছাপ ও কয়েকটি স্বাক্ষরও ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা যে খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টভাবেই বলা ছিল যে স্বাধীনতালাভের ৩৫ বছর পরেও জীবজন্তুর মত জীবন-

ধারণ করা লোধাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়।

১৯৮৩-র নভেম্বরে পুরুলিয়ার মালতি গ্রামে খেড়িয়া-শবর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে হাজারে হাজারে খেড়িয়া এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এঁদের দাবী ছিল খুব স্পষ্ট। তাঁরা মানুষের মত বাঁচতে চেয়েছিলেন।

ষাটের দশকেই মুণ্ডাদের সামাজিক সমিতি পশ্চিমবঙ্গ মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঁটরা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এটি রেজিস্ট্রিকৃত হয় ১৯৮১ সালে।

সমিতির ভূমিকা

এই সমিতিগুলি কি ধরণের কাজ করতে সক্ষম? কি কাজই বা তারা করেছে? প্রসঙ্গত এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে পালামৌ-এর যে দরিদ্র মানুষেরা দাস নয় তারাও জেলা মোর্চাকে তাদের নিজেদের সংগঠন বলে মনে করে। অতলান্ত দারিদ্র্যই হচ্ছে এখানে ঐক্যের সূত্র। বিভিন্ন গ্রামে জেলা সমিতির "মুখিয়া" বা প্রতিনিধি রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এরা শত শত তালিকা তৈরি করেছে। এদের তালিকায় রয়েছে—(১) দাস শ্রমিকদের নাম, দাস-মালিক ও দাসদের বিষয়ে বিশদ খবর, কতদিন দাস করে রাখা হয়েছে, প্রাথমিক ঋণ কত ছিল, মুক্তিপণ কত মালিক চাইছে, কত প্রজন্ম ধরে দাস করে রাখা হয়েছে এবং (২) যারা দাস নয় তাদের ভূমিহীনতা, সেচ ও পানীয় জল, ছোট জমির মালিকদের ক্ষেত্রে কৃষির জন্য সহযোগিতার দাবীর বিশদ বিবরণ।

লোধা-শবররা খুবই ভাল তৎপরতা দেখিয়েছে। কোনোরকম সহায়তা ছাড়াই এরা জমি, রোজগার, সরকার প্রদত্ত সাহায্য, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, আক্রমণে আহত লোধাদের তালিকা—এই সব কিছুই বিশদ তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছে।

খেড়িয়ারাও অনুরূপ তালিকা তৈরি করেছে এবং সংসহ বনাঞ্চল থেকে যাদের উৎখাত করা হয়েছে তাদেরও তালিকা বানিয়েছে। পুরুলিয়ার বহু খেড়িয়া গ্রামে ছোট ছোট নালাই হচ্ছে পানীয় জলের একমাত্র উৎস।

যে যে জায়গায় সেচ ব্যবস্থা চালু হওয়ার দরকার মুণ্ডা গঁঠরা তার তালিকা বানিয়েছে। এবং এই প্রত্যেকটি সমিতিই শিক্ষিত বেকারদের নাম লিপিবদ্ধ করেছে এবং নথিভুক্ত করেছে। অন্যান্য উপজাতি, বর্ণগোষ্ঠী ও সংগঠনের শত শত নাম আমার কাছে রয়েছে কিন্তু স্থানাভাবে

তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপরোক্ত তিনটি সংগঠনের সমিতিগুলি যে কাজ করছে তা করার কথা ছিল সরকারের।

পালামৌ-এর বেলায় দেখা যায় যে জেলা প্রশাসন সমিতির সম্ভাব্য সদর্থক ভূমিকা স্বীকার করতে এতটুকুও রাজী নয় এবং মুষ্টিমেয় সদয় সরকারী কর্মচারী বাদে প্রশাসনের মনোভাব খোলাখুলিভাবেই বৈরি। প্রশাসনিক মনোভাব এতই শত্রুতাপূর্ণ যে দাস-শ্রমিকদের ভয় দেখান হচ্ছে যে সমিতিতে যোগ দিলে সাংঘাতিক পরিণাম ঘটবে। এদের দিয়ে জোর করে বিবৃতি দেওয়ানো হচ্ছে যে তারা নিজেরা কোনো তথ্য দেয়নি, সমিতির লোকেদের চাপ তাদের ভ্রান্ত তথ্য দিতে বাধ্য করেছে। পালামৌ-এর দাস ও অন্যান্য দরিদ্রদের সহায়তা দিতে হলে সমিতির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তথ্যাদি বিচার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দাস-শ্রমিকদের পুনর্বাসন বলতে কি বোঝানো হয় আমি জানি না। এমনকি এদের খুঁজে বের করার কাজও খুব সামান্যই এগিয়েছে। কোনটা প্রথমে আসে? সনাক্তকরণ না পুনর্বাসন? এবং দাস-শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ অর্থ অঢেল বলারই বা মানে কি?

লোধা সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের তরফে একটানা চেষ্টার ফল ফলেছে খুবই সামান্য। কয়েকজন লোধা চাকরি পেয়েছে। তাদের একটি দাবী ছিল যে উন্নয়নমূলক কাজে কন্ট্রাক্টর-প্রথা বাতিল করে সমিতিকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। তা করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্তত এটুকু স্বীকার করেছেন যে লোধা মাত্রেই অপরাধী নয় এবং তাদেরও উন্নয়নের দরকার।

চমৎকার সাড়া

খেড়িয়া সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খেড়িয়ারা প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুরুলিয়ার খেড়িয়ারা ভাগ্যবান কারণ জেলার বিজ্ঞান কেন্দ্রের অফিসার (কেন্দ্রটি ভারতীয় সংগ্রহশালা জাতীয় পরিষদের অধীন) তাদের স্বল্প খরচের পরিকল্পনা দিয়ে ও কৃষিকার্যে লাগিয়ে সাহায্য করেছেন। এই বিবেকবান অফিসারের সাহায্য ও সুপরামর্শের ফলে তারা কুয়ো খুঁড়েছে, নদীতে মাটির বাঁধ দিয়েছে, বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে পাওয়া বীজ ও কৃষিযন্ত্র নিয়ে ধীরে ধীরে চাষবাসের পথে এগিয়েছে। একথা সত্য যে আজ

খেড়িয়াদের ওপর নির্যাতন ও হামলা হ্রাস পেয়েছে। উপরোক্ত দুটি শবর সমিতিই দেশের মূলধারার কাছে জানতে সক্ষম হয়েছে তাদের হত্যা করা, তাদের ওপর নিপীড়ন ও শোষণ চালানো আর চলবে না, অন্যের মুনাফার জন্য তারা আর নিজেদের ব্যবহৃত হতে দিতে রাজী নয়। এটাই হল এদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

একের পর এক বাধা

সাধারণভাবে পশ্চিমবাংলার এই সব সমিতি (যাদের নাম অনুল্লেখিত আছে তারাও) কি ধরণের বাধার সম্মুখীন হয়? প্রভাবশালী সমাজ এবং শাসকবর্গ এই আদিবাসী ও উপজাতীয় সংগঠনগুলিকে সাধারণত বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে সন্দেহ করে। এমনকি মুণ্ডারা যখন প্রথম বীরসা মুণ্ডা দিবস উদযাপন করেছিল তখনও রাজনৈতিক দলগুলি সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। সামাজিক উন্নয়নের জন্যে উপজাতি সংগঠনগুলি কোনো সভা ডাকলে সচরাচর সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই শত্রুতা হ্রাস পাচ্ছে। এবং এরা যখন সেচ, পানীয় জল, আবাসিক বিদ্যালয়, উপজাতিদের কেড়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দেওয়া ও ঘোষিত সংখ্যানুযায়ী চাকরির দাবী জানায় তখন পঞ্চায়েতগুলির অনীহাই প্রকট হয়ে ওঠে অথচ আঞ্চলিক এই দাবীগুলি তোলার কথা ছিল পঞ্চায়েতেরই। উপজাতিদের পক্ষে জাতি পরিচয়পত্র যোগাড় করাও বড় কঠিন ব্যাপার।

কেবলমাত্র এই সমিতিগুলিই তাদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারে। লোধারা যেমন করেছে তেমন স্বল্প খরচের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে এরা সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। বার বার এ জাতীয় পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে দেওয়া হয়েছে যদিও তার কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

আমি জানি যে দারিদ্র্য-সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নে ভ্রান্তির ভিত্তিই রয়েছে বিষয়টি সংক্রান্ত মনোভাবে। আমি যেমন দেখেছি তাতে ভারতের হত দরিদ্রেরা নিরক্ষর ও স্বল্প সাক্ষর হতে পারে কিন্তু তারা বুদ্ধিহীন নয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অবাস্তব নয়। তারা তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন এবং কি হলে তারা উপকৃত হবে তাও তারা সুন্দর গুছিয়ে বলতে পারে। কিন্তু ভারতের মতই, পশ্চিমবঙ্গেও যার উপকারের জন্য এত মাথাব্যথা তার সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা করা হয় না। পরিকল্পনা

তৈরি করেন পণ্ডিতবর্গ কিন্তু যাদের সাহায্য করার জন্ত এই পরিকল্পনা তাদের সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা এঁদের নেই। এবং পরিকল্পনা তৈরি হওয়ার পর এমন ভাবেই তার বাস্তবায়ন হয় যে যার জন্যে এত কিছু সে যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

যে সম্পদ আছে তাকেই সবচেয়ে বেশি করে কাজে লাগানোই হওয়া উচিত একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি। ভূমিহীনদের কোনো সরকারই পর্যাপ্ত কৃষিযোগ্য জমি দেবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। গৃহসংলগ্ন জমি থাকা একান্তই আবশ্যক। লোধারা যেমন আমাকে বার বার বলেছে—"আমাদের চাই কয়েকটা ফল, কাঠ ও গরু ছাগলকে পাতা খাওয়াবার গাছ যেমন মৌয়া, কেঁদ, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁঠাল ও মাত্র কয়েকটা ছাগল।" সত্যি কথা বলতে, এখনও, যাকে সাহায্য করা দরকার তার সঙ্গে কথা বলে স্বল্প খরচের পরিকল্পনা তৈরি করা ও সমিতির পরিচালনাধীনে তার বাস্তবায়ন অবস্থার কিছুটা সুরাহা হয়তো করতে পারে। এখনকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা হল দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। যে জনগণের জন্য এই এলাহি কারবার তাকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে। কখনোই দায়িত্ব না দিলে কিভাবে তারা দায়িত্ববান হয়ে উঠবে? সবথেকে বিস্ময়কর এটাই যে লোধারা নিজের যা চেয়েছে তার সঙ্গে পুরুলিয়ার জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রদত্ত স্বল্প খরচের পরিকল্পনার কিন্তু খুব বেশী ফারাক নেই। কয়েকটি ফলের গাছ, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা কিছু ছাগল (পঞ্চায়েত যে ছাগল দেয় সেগুলি প্রায়ই স্বল্পজীবী হয়), মাছ ধরার পুকুর ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে প্রণোদনা—হয়তো এর ফলে ঠাঁইনাড়া গরিবেরা কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে। পরে হয়তো এর ফলে কাজের সন্ধানে ঘরছাড়া মানুষের সংখ্যাও ক্ষিবছর কিছুটা কমবে। সঠিকভাবে কোথায় কি দরকার তা এই সমিতিগুলিই জানাতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি যে সেই সময় এসে গেছে যখন দরিদ্রদের হিতার্থে এই সব সমিতির ভূমিকা অবিলম্বে স্বীকার করে নেওয়া হোক। এবং তারপর যতদূর সম্ভব উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে দিয়ে দেওয়া হোক। নিজেদের উন্নয়নের জন্য

সংগঠনগুলিকে পঞ্চায়েতের কাজ করতে দেওয়া দরকার। খেড়িয়ারা দেখিয়ে দিয়েছে যে বরাদ্দ টাকায় যে ক'টি কুয়ো খোঁড়া সম্ভবপর বলে মনে করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কুয়ো তারা নিজেদের ঘাম ঝরিয়ে খুঁড়তে সক্ষম হয়েছে।

যে সমিতিগুলিতে আমার আগ্রহ রয়েছে, তার সঙ্গে আমি জড়িত সেগুলি হল মাটির কাছের মানুষের সংগঠন। এদের যদি না জড়িত করা হয়, এদের জন্য যদি শুধু ওপর থেকে প্রসাদ বিতরণই চলতে থাকে—তাহলে না হবে এদের মঙ্গল, অন্যদিকে সমাজও লাভবান হবেনা। সমিতিগুলি কিভাবে কাজ করবে? কারা তাদের সাহায্য করবে? এদের ভূমিকা অবিলম্বে এবং অনতিবিলম্বে মেনে নেওয়া হল একান্তই দরকার। কারণ একটা সত্য হল এই যে স্বাধীনতার চার দশক ও দু'টি পাঁচসালা পরিকল্পনা এদের হতাশ করার ফলেই সে পালামৌ এর বন্ধুরাজাই হোক আর পশ্চিম-বঙ্গের যমজ শবর উপজাতিই হোক, ওরা ছাড়াও আরও অসংখ্য অসংখ্য মানুষ একেবারে অনন্যোপায় হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রাণস্পন্দন রয়েছে তার গ্রামে, শহর নগরে নয়। তবে কেন সেখানে চিরস্থায়ী অন্ধকার বিরাজ করবে?

(যোজনা কমিশনের ইংরেজি কাগজ "যোজনা / নভেম্বর ১৯৮৪" সংখ্যায় প্রকাশিত / অনুবাদ : নবারুণ ভট্টাচার্য।

উপন্যাস

স্বেচ্ছা সৈনিক

মহাশ্বেতা দেবী

বিছানা থেকে উঠে আসতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল। ফলে চেয়ারে বসে প্রসাদ অনেকক্ষণ হাঁপান। এ বয়সে প্রস্ট্রেট অপারেশন্ করানো তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লতিকা শোনেন নি।

—ভেবো না। তোমার লাখ টাকার লাইব্রেরিতে কাউকে ঢুকতে দেব না।

—তুমিও পরিষ্কার করতে ঢুকো না।

—তাই ঢুকি? ধুলো আর পুরনো কাগজের গন্ধে আমার অ্যালার্জি আছে, জানোনা?

প্রসাদ গভীর সন্দেহে লতিকার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দুজনে দুজনকে বাহাত্তর বছর ধরে সন্দেহ করছেন বোধহয় যমজ ভাই বোন। যেহেতু প্রসাদের বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি, সেহেতু তিনি লতিকার হেফাজতে।

বাবার এলেমে কুলোত না। ঠাকুরদা ছোট বাড়িটা করে রেখে যান একতলায় ওঁরা, দোতলায় ভাড়াটে। অপারেশনটা করাবার জন্যে লতিকাই টাকা দিল। চাকরির পেনশান ও বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে ও কেমন করে বাঁচায়, তা প্রসাদের কাছে গভীর রহস্য।

এখন প্রসাদ মাঝে মাঝে উঠে আসছেন, বাইরের ঘরে বসছেন। ঘরটি নামেই বাইরের ঘর। এ ঘরে পারতপক্ষে কাউকে ঢুকতে দেন না প্রসাদ। কেন না এ ঘরেই তাঁর, লতিকার ভাষায় 'লাখ টাকার লাইব্রেরি'। লোকজন তাঁর কাছে হরদম আসে। লতিকার কাছেও। যে আসে সে বারান্দায় বসে। সেকালের লোক বাড়িতে বারান্দা ও উঠোন রাখত। লতিকার ছেলে কানাডায় থাকে। সে যখনি আসে তখনি বলে, তোমরা চলো আমার সঙ্গে। কয়েক মাস থাকো। বাড়িটা ভেঙে ফেলে একেবারে ফ্ল্যাট সিস্টেমে তৈরি করে ফেললে দেখবে এ বাড়ি থেকে কত পাচ্ছ।

—কি লাভ! তুমি তো ফিরছ না।

—যখন ফিরবে তখন দেখা যাবে।

ভাবলে প্রসাদের খুব অবাক লাগে। লতিকার ছেলের এ বাড়িটার

বিষয়ে এতটুকু মমত্ব নেই। অথচ বিধবা হয়ে লতিকা ছোট ছেলে নিয়েই এ বাড়িতে এসেছিল।

বারান্দাটি সুপরিসর। চারটি বেতের চেয়ার, টেবিল, সব রেখেও নড়াচড়ার জায়গা আছে। লতিকা ছেলেটিকে ওখানেও বসাতে পারত। কেন এ ঘরে ঢোকাল?

—ও ঘরে ঢোকালে?

—শুভময়ের চিঠি এনেছে।

—আনলেই বা।

—শুনলেই বুঝতে পারবে

লতিকা ও প্রসাদ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকেন। যমজ ভাইবোন। প্রসাদ তিন মিনিটের বড়। লতিকা কেমন করে যেন সক্ষম ও সচল থেকে গেছে। প্রসাদ ভেঙে গেছেন।

লতিকার এমন উদ্যম ও সচলতার কারণ কি? লতিকা গম্ভীর গলায় বলেন, নিয়ম মেনে চললেই ভালো থাকা যায়।

লতিকার হাতে হরলিকসের পেয়ালা। প্রসাদ এক চুমুকে হরলিকস্ মুখ মোছেন, তারপর বাইরের ঘরে এসে বসেন।

চেয়ারে বসে হাঁপান কিছুক্ষণ। পাখা খুলে দেয় লতিকা। নিজে বসে মোড়ায় সামনে উপবিষ্ট যুবকটি একটা চিঠি এগিয়ে দেয়।

—শুভময় রায় দিয়েছেন।

শুভময়, শুভময়! স্বভাব আর গেল না। মস্ত একটা কাগজে এক ছত্র, অরণি দত্তের সঙ্গে কথা বলো।

ইংরিজিতে লেখা। শুভময় কখনো তারিখ দেয় না।

—বলুন!

—আমার নাম অরণি দত্ত।

—ও।

—আমার বাবাকে আপনি চিনতেন।

—তাঁর নাম?

—সুনাম দত্ত।

—সুনাম···সুনাম...ও! দুর্নাম!

—হ্যাঁ, আপনারা তাই বলতেন বটে।

—সুনাম কোথায়? কি করছে?

চল্লিশ বছরের ব্যবধান। চল্লিশ বছর অনেক সময়। স্মৃতি থেকে চলে যায় কত কি! মেদিনীপুরে কোথায় যেন বাড়ি.. কলকাতা চলে এসেছিল...প্রথম দেখেন দুর্ভিক্ষ ত্রাণ স্কোয়াডে। না না, তারপরেও দেখেছেন প্রথম সোভিয়েত ছবির একজিবিশনে? না 'ধরতি কে লাল' ছবির প্রদর্শনিতে? আন্দামান ফেরত অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং এসেছিলেন দেখতে। কোথায় হয়েছিল ছবিটা?

—বাবা তো মারা গেছেন অনেকদিন।

—মারা গেছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি করেন?

অরণির মধ্যে প্রসাদ কোনো চেনা মুখের আদল খোঁজেন। না, সুনামের মুখ মনে পড়তে না পড়তে আরেকটি মুখ মনে পড়ে। চৌকো মুখ, শক্ত চোয়াল, মজবুত কাঠামো, মজবুত হাড়। কালো মুখ, ছোট ও কোঁকড়া চুল। না, সে মুখের পুরুষ্ দার্ঢ্য, বা বাঁকড়া ভুরুর নিচে চোখের উজ্জ্বলতা নেই।

অরণির চেহারা যে কোনো বুদ্ধিমান যুবকের মতো। চুল রুক্ষ এবং ছোট করে ছাঁটা। বেশ কৃতী এবং গম্ভীর চেহারা।

—পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ, মানে উনিশ শো পঞ্চাশ, এই সময়ের কৃষক আন্দোলন নিয়ে কাজ করছিলাম।

—শুভময়ের কাছে?

—না, বিরাম সামন্তর কাছে।

—আমার কাছে কেন?

—আরেকটু খুলে বলি। আসলে আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকতা আর ভাল লাগছে না। ওই কাজটাই করছিলাম···কাগজে ঢুকে গেলাম। তারপর ভাল লাগছে না।

আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি

—আমার জ্যেঠামশাই ছিলেন মহানাম দত্ত। তাঁর বিষয়ে যদি কিছু বলতে পারেন।

—মহানাম দত্ত!

—তাঁকে তো চিনতেন।

ঘরে সময় থেমে যায়। সব নিস্পন্দ হয়ে যায়, নিশ্চল। লতিকা

অস্ফুট শব্দ করেন।

—সে তো অনেক কাল আগে।

—তিনি কোথায়?

—আমি কি করে জানব?

—জানেন না। সত্যিই জানেন না?

—…না।

ছেলেটি বিচলিত হয়ে পড়ে। ওর চোখে অসহায় বিস্ময় ফুটে ওঠে।

—কেউ বলতে পারে না কেন?

সুদূর অতীত থেকে মনে করে করে বলার কষ্ট বড় নিদারুণ। প্রসাদ তো দীর্ঘকাল নেই রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি। তিনি সমর্থক মাত্র। অন্তত তাঁকে যারা জানে তারা তাঁকে পার্টির ভাবধারার সমর্থক বলেই মনে করে ভাবধারা শব্দটিও এখন অনবয়ব. হারিয়ে যাওয়া। তাঁদের সময়ে কেমন বিশ্বাস ছিল, তা বর্তমান উত্তরসূরীদের বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রসাদ নিজেই কি জানেন? তিনি রাজনীতির গতিবিধি দেখে হতাশ, বড় হতাশ বহুদিন। সুদীর্ঘ জীবনের সবটাই তো সক্রিয় রাজনীতিক জীবন হতে পারত, হল না।

মন তো সক্রিয় থাকে, মন তো মরে যায় না। এই যে হতাশা বোধ, এও তো সক্রিয় মনেরই লক্ষণ। নইলে তো চলে যেতে পারতেন দার্জিলিং। চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন। শুভময় বলেছিল, এ বাড়ি বেচে দাও। দার্জিলিং-এ ছোট একটা বাড়ি কেনো। নয়তো নৈনিতালে। একজন এজেন্ট বিক্রি করছে।

বাকী জীবনটা হিমালয়ের শোভা দেখে কাটাতেন কি করে? পারে, তারা পারে।

—না হে। কলকাতা ভাইরাস যার রক্তে ঢুকে গেছে, তার রোগ সারানো সম্ভব নয়।

না, এ বয়সে সম্ভব নয় হিমালয়ের মৌনমহিমায় মনকে সমাধিস্থ করা। হিমালয় ভালো, যাও, দেখে এসো। মনকে প্রসাদ নিয়োগ করেছেন অন্যত্র। এটাও কাজ।

বিগত দিনের কাগজপত্র, পত্রিকা, কৃষক আন্দোলনের ওপর বই, যুক্ত বাংলা ও বিভক্ত বাংলার জেলা ও মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত ছোট ও বড় বই, এই সব সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি 'জনবার্তা' বা অগ্রগামী' কাগজ

দেখতে হলে তাঁর কাছেই আসতে হয়।

লাখ টাকার লাইব্রেরি!

নয় কেন? আর কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বিলুপ্ত নাম, বিগত আন্দোলন, অতীতকে?

না, দাম দিয়ে কেউ কিনবে না নিশ্চয়। দান করেই যাবেন। কাকে দেবেন, কে এর মূল্য দেবে! বন্ধু বান্ধব যদি দায়িত্ব নিয়ে এ বাড়িতেই রাখে সংগ্রহটি, এই ঘরে।

কিন্তু যারা হাটতোলা, তোলাবাটি বা নানকার আন্দোলনের ওপর বই দেখতে আসে, তাদের সাহায্য করা সহজ।

এই ছেলেটি সুনাম দত্তের ছেলে, এতো কোনো বই বা পত্রিকার খোঁজে আসে নি। এ এসেছে একটি মানুষের খোঁজে।

—মনে পড়ল কিছু?

প্রসাদ চশমা মুছে তাকাল।

—তুমি মহানাম দত্তকে কেন খুঁজছ?

—ওই একটা নামেরই তো হিসেব নেই।

—এতদিন পরে তার খোঁজ কেন?

—এটা তো আপনি দেখেছেন।

প্রাচীন, অবলুপ্ত, হারিয়ে যাওয়া সংবাদ সব। কোথাও রক্ষিত কোনো সংগ্রহশালায়। মৃতদের কে মনে রাখে, কার স্মৃতি ধরে রাখে জীবিত বা মৃত বা বিস্মৃত অতীতের সংগ্রামীকে?

—হ্যাঁ। আমার কাছে কপি আছে।

ইতিহাস শুধু অহিংস সংগ্রাম ও সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস নয়। ইতিহাস নয় স্মৃতিসভা, পথপাশে মূর্তি, কেওড়াতলা বা স্মৃতিফলকে মাল্যদান। কোনো হল বা ঘরে তিরিশজন রুগ্ন বা অশক্ত বৃদ্ধের উপস্থিতিতে কোনো ধূসর ছবির সামনে বক্তৃতা দান শুধু ইতিহাস নয়। একদা অজয় ঘোষ, মোহন সিং ভাকমা, ডাঙ্গে, নাম্বুদ্রিপাদ, ভূপেশ গুপ্ত, জহরলাল নেহরুর হাতে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলেন।

—ইতিহাস।

'দীর্ঘমেয়াদী রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি চাই।'

ইতিহাস।

কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলা। দশজন। ১৯৬১-র একত্রিশে আগস্ট অবধি

কতজন প্রায় বারো বছর জেল খেটেছিল।

ফিরে গিয়ে তারা কেমন কাকদ্বীপ দেখেছিল? তাদের রক্তে বোনা ধান, তাদের দখল করে নেয়া জমি, তাদের সংগ্রামক্ষেত্রে চন্দনপীড়ি, বুধাখালি, লালগঞ্জ, কাদের দখলে?

ইতিহাস।

দমদম-বসিরহাট-জেসপ মামলা। বাইশজন। প্রীতিশ রায় বা বিদ্ধিয়া সিঙের মত কতজন প্রায় তেরো বছর জেল খেটেছিল?

ফিরে এসে তারা বদলে যাওয়া যে ভারত তাদের ভুলে গেছে। তার সঙ্গে কোন ভাষায় পরিচয় করেছিল?

ইতিহাস।

তিরুনেলভেলি ষড়যন্ত্র মামলা। তেরোজন। আজ তারা বর্তমান তামিলনাড়ুর কোথায় কোন মাটিতে আবার পুনরোপিত? ওদের মধ্যেও তো কতজনকে আলাদা আলাদা ষড়যন্ত্রে আসামী করা হয়। এগারো বছরের বেশী কারাবাস।

ইতিহাস।

বিহার। নক্ষত্র মালাকর, জগধর ঝা, বাচুলাল, দিগওয়াড়ি কলিয়ারি কেস, ধরমবাঁধ কলিয়ারি কেস, কৃষক সংগ্রাম···এগারো জন।

ইতিহাস।

অন্ধ্রপ্রদেশ, দু'জন। পাঞ্জাব, পাঁচজন।

ইতিহাস।

প্রসাদের মুখে হাসির রেখা। হ্যাঁ, এসব কথা বলার সময়ে তিনি হাসতে পারেন।

—স্বাধীনতার পরে রাজনীতিক কারাবাস, বিনাবিচারে আটকের ইতিহাস লেখা হয়নি।

—আপনি কখনো লেখার কথা ভেবেছেন?

—না। যদি কেউ লেখে···

—আপনারা চলে গেলে আর কে!

—যে মনে করবে, সে লিখবে।

প্রসাদ আবারও আশ্চর্য হল। এটা এই সময়ের, স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্মের, বহুজনের মধ্যে দেখা যায়। সেদিনই সঞ্জীবন এর ভালো জবাব দিয়েছে।

—বুঝলেন! আমাকে সমানে বলা যায়, আপনি কারখানা নিয়ে লিখবেন, লিখছেন। আপনার উচিত কৃষকদের নিয়ে লেখা। আমি বলি, ভাই! আমার ক্ষমতাও কম। বয়সও হল সাতষট্টি। সব তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লেখো, তোমরা লেখো।

প্রসাদ আবার বলেন, কেউ চলে গেলে কিছু কি থেমে থাকে? আসলে ব্যাপারটা দায়িত্ববোধের। যে মনে করবে সে করবে। এখন তো কত কাজ হচ্ছে।

—যাঁরা পলাতক ছিলেন, তাঁদের খবরও তো একে একে পাওয়া গেছে।

—হ্যাঁ। পাঞ্জাবের পাঁচজন।

—বাংলার অশোক বোস।

—হ্যাঁ···অশোক বোস···প্রকাশ রায়।

মৃত! মৃত! কাকদ্বীপের অশোক বোস মধ্যপ্রদেশে প্রকাশ রায় নামে মৃত।

ইতিহাস।

—মহানাম দত্তের নামও তো নিখোঁজের তালিকায়।

—ওই তালিকায় তার নাম নেই।

—তবু নিখোঁজ সে। আমি রেকর্ড দেখেছি। উনিশ শো পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন পলাতক। তারপর নিখোঁজ।

—আমি জানি না।

—কে বলতে পারেন?

—তাও জানি না।

—খোঁজ করব কি সূত্র ধরে?

—আমি জানি না। সে সময়ের কাকদ্বীপ···বেরোবার সব পথ বন্ধ··· সর্বত্র পুলিশ···কংগ্রেসের গ্রামরক্ষী দল···নদীনালা···নৌকো নেই···

—মারা গেছেন?

—হতে পারে।

—তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ নেই?

—মনে হয় না। তবে খোঁজ করে দেখ। দেখতে হলেও তোমাকে ও সব জায়গাতেই যেতে হবে। আমি যতদূর জানি, দধিমঙ্গলের হাটে সে প্রথম ধরা। আঘাত মারাত্মক ছিল।

—অথচ হাসপাতালে নেয়া হয়নি।

—পায়নি তো।

—মরে গেলে তখন জলে ফেলে দিত ?

—শুনিনি তো কখনো।

—জলে ফেলে দেয়নি ?

—দেখ ! মারা গেলে মৃতদেহ লোপাট করবে কেন কৃষকরা ? তারা তো ভয় পায় নি।

—কোনো দুর্ঘটনাও তো হতে পারে।

—আজ থেকে অত বছর আগে। অমন একটা বিক্ষুব্ধ সময়ে সেদিনের কাকদ্বীপেরও পিছনে দধিমঙ্গলের মতো দুর্গম জায়গায় কি যে হয়েছিল, তা কে বলতে পারে ?

—যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এত বছরে তাঁর খবর পাওয়া গেল না !

—তুমি বোধহয় জানো না, ও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় পরে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন করেছিল, জেলও খেটেছিল কিছুকাল।

—আপনি বোধহয় জানেন না, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে উনি যোগ দিয়েছিলেন বলে আমাদের গ্রামের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। বাড়ি-টাড়ি বেদখলই হয়ে যায়। ঠাকুমাও মারা যান। জ্যাঠামশাই, বাবা, সবাই তো দাবী ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে উনি ছিলেন, তা আমি জানি।

—ফিরে আসার, নিজ পরিচয় জানাবার কোনো অসুবিধে তো দীর্ঘকাল নেই।

—না।

অরণিও হাসে। হাসলে ওকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগে দেখতে। প্রসাদ যে কি বলবেন ওকে, কি বোঝাবেন। অরণির সময় এখন বিস্ময়।

—জ্যাঠামশাই তো দু'ভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর বৃত্তি পেতে পারেন, কি বলেন ?

—কেমন করে ?

—বাঃ ! বেয়াল্লিশে জেল খেটেছেন, রেকর্ড আছে। পরে কৃষক আন্দোলন করেছেন, তাও সত্যি।

—দু'বার কেউ পায় না কি ? কতজন তো একবারও পায় নি।

—সে আপনার গরিব, নিরক্ষর লোকেরা। যারা পুরুলিয়া অথবা বাঁকুড়া অথবা কাঁথির গরিব, নিরক্ষর লোক। ভদ্রলোকরা সব পেতে পারে

পাচ্ছেও। জেল খেটে হোক, না খেটে হোক, কংগ্রেসী হোক, অকংগ্রেসী হোক, যে পেরেছে সে গুছিয়ে নিয়েছে। নিচ্ছে।

—তোমার কি কোনো রাজনীতিক বিশ্বাস নেই? কোনো বিশ্বাস?

—না। বড় লজ্জায় বলি। রাজনীতিক দল দেখে দেখে···

—অরাজনীতিক কেউ হয় না কি?

—কোনো দলে বিশ্বাস রাখতে পারি না। আর, বিশ্বাসের কথা থাকুক। মহানাম দত্তের কথা বলুন।

ছেলেটি তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আর কি বলব বলো?

—চা খাও।

লতিকা চা নিয়ে ঢোকেন। কখন যে তিনি উঠে গেলেন, তা বুঝতেই পারেন নি প্রসাদ।

—দাদা, চা খাবে?

—একটু খাই।

লতিকা চা আনেন, বসেন।

—আপনি চা নিলেন না?

—আমি চা ছেড়ে দিয়েছি।

—আপনি কি আমায় সব কথা বললেন?

—কেন বলো তো?

—আপনি তো কয়েক বছর আগে ওঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলেন।

—ওর কাছ থেকে?

—শুভময় বাবু তাই বললেন।

—তাই বলো!

—লতিকা হেসে ফেলেন। বলেন, শুভময় ঠিক এক রকম থেকে গেল। সেই চিঠি!

—কেন, ওঁর চিঠি নয়?

—দেখাতেও পারব না। কোথায় যে···দাঁড়াও···লতিকা, ওই ফাইলটা দেখি।

ফাইলটা খুলে একটি কাগজ দেন প্রসাদ। ছেলেটি গভীর আগ্রহে দেখে।

কোন সম্বোধন বা স্বাক্ষর নেই। গোটা গোটা হরফে লেখা মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি হল, ভালই হল। কিন্তু অহল্যা, কৌশল্যা, এদের মূর্তি কবে হবে?'

খাতার পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

—এই চিঠি?

—হ্যাঁ।

—এ দেখে কি বোঝা যাবে?

—তুমিই বলো।

—তাহলে?

ব্যাপারটা বলি। আমার এ বাড়ি অনেক দিনের। এখানে সে সময়ে নিশ্চয় কমরেডরা এসেছে মাঝে মাঝে।

—মাঝে মাঝে বোল না দাদা। যথেষ্টই এসেছে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে মাঝরাতে ভাত রাঁধিয়েছ অনেক বার।

—হুঁ···সে সময়ে তো এ সব করা হতই। যা হোক, কলকাতায় মহানামের খুব বেশী চেনাজানা ছিল না। এখানেই যা···

—এ চিঠিটা ওঁর, তা মনে হল কি করে?

—আরে! রাস্তার নাম ঠিক, বাড়ির নম্বর ভুল, খামে আমার নাম লেখা···যখন এল, তখন শুভময়, আমি, বরেন, আর কয়জন আড্ডা দিচ্ছিলাম। বলতে কি, ওরা সেদিন এখানে খেল।

—হুঁ। আমিই বলেছিলাম।

—আঃ লতু! বলতে দাও।

—বলো বলো।

—বরেন তো বাইরেই থাকে। ও এলে একেকজনের বাড়িতে একেকদিন···তাও কয়েক বছর বাদে বাদে আসে···চিঠিটা এল···সে সময়ের কথা কে মনে করে লিখেছে···আমরা ভাবছিলাম। যার নামই করি, মন সায় দেয় না। শেষে আমি খুব হালকা ভাবেই বলেছিলাম, দেখ, সেই মহানাম কি না! তার তো খোঁজ মেলেনি।

—কোত্থেকে এসেছিল চিঠিটা?

—খামটার ছাপ দেখে কিছু উদ্ধার করতে পারিনি, জানো! পোস্টাপিসের ছাপ খুব অস্পষ্ট। সে চেষ্টাও করেছিলাম।

—খামটা নেই?

—না···রাখা হয় নি।

অরণি ভাবতে থাকে।

—শুভময় সেই কথার ভিত্তিতেই তোমাকে বলেছে? না, ওর আর বড় হল না।

—তবু তো টুকরোটা রেখেছেন!

—ওই তো করে যাই। টুকরোটিও ফেলি না।

প্রসাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, সব সময় সার্চ হতো! আমরাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম। এখান থেকে ওখানে···আবার অন্যত্র···এভাবে কত কি দুর্মূল্য জিনিস হারিয়ে গেছে।

—কি যে করি!

—এই যে যাও বা রেখেছি···এগুলো জেরক্স্ করানো দরকার। কোনো ব্যবস্থা করা দরকার···

—যারা সংগ্রাম করেছিল সে সময়ে, তারা বেঁচে আছে কি না কখনো খবর নিয়েছেন?

—ন্···ন্···না!

—শুভময় বাবুও তাই বলেন।

না, খবর নেওয়া হয়নি কৃষকদের, মৃত শহীদদের পরিবারবর্গের। নেয়ার দায়িত্ব যে তাঁরও ছিল, সে কথা প্রসাদ ভাবেন নি কখনো। ওই ছেলেটির চোখের সামনে হঠাৎ নিজেকে দোষী মনে হয়।

এখন তো প্রসাদ দীর্ঘদিন ধরে সব কিছুর বাইরে। এই সংগ্রহ করে চলার কাজটাকেই বিশ্বাস করেন। মন পারে না বিশ্বাস ছাড়া বাঁচতে।

—সংগ্রহ···খুব দরকারী···

প্রসাদ ওর বক্তব্যটি মনে মনে বলেন, মানুষের খোঁজ রাখা আরো দরকার।

—তবু তো করেছেন···

—দেখ! তুমি বুঝবে না।

—'না' বলে ধরে নিয়েছেন?

—জেনারেশন গ্যাপ।

—সব কিছুতে গ্যাপ।

—তুমি বুঝবে না। আমার সময়ের মানুষজনের যাদের একটা রাজনীতিতে বিশ্বাস ছিল, বিগত বিশ পঁচিশ বছরে তিলে তিলে তাদের সে

বিশ্বাস খোয়া যাওয়া···

—খুব, খুব মর্মান্তিক।

—তার পরে কেমন করে নিজেকে সজীব রাখা যায়। বিশ্বাস রাখা যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিলেক সংযোগ নেই যাদের···

—অথচ যারা অতীতকে ভাঙিয়ে রাজনীতিক কেরিয়ার করতে পারছে হ্যাঁ, তাদের যন্ত্রণা খুব বেশি। সেটা তো বোঝা যায়।

—খুব খুব বেশি···কেন এত কথা বলছি তোমার সঙ্গে? সুনামের ছেলে মহানামের···আমাদের অবস্থা দেখেছ? সুনামের কোন খবর রাখি নি।

—যোগাযোগ তো কেটে যায়।

—কিন্তু পুরনো লোক যারা, যারা আজ নেতা হয়ে আছে···

—তাঁরাও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

—হ্যাঁ। তারাই কি নিজেদের কাছে নিজেদের এই বদলে যাওয়াটা সমর্থন করতে পারে?

—বিবেক টিবেকের কথা জানি না। তকেদেশকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেরা তো দিব্যি আছেন। যে কোনো প্রতিবাদী গলাকে টিপে ধরছেন।

লতিকা হঠাৎ বলেন, ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে তুমিই লিখেছিলে!

—হ্যাঁ!

—তাই 'অরণি দত্ত' নামটা চেনা চেনা লাগছে। আমি পড়েছিলাম।

—ও!

প্রসাদ বলেন, যা হচ্ছে, তার জন্য খুব বড়ো দাম দিতে হবে।

—দামও দেবে জনগণ!

—না, তা বোধহয় নয়।

—মার খাবার সময়ে তো গরিবই মার খায়।

—কি হবে জানি না।

—আপনি তো একটা দরকারী কাজ করছেন।

—কি জানি!

প্রসাদ বিশ্বাস করেন এই সংগ্রহ করে রক্ষা করে রেখে যাওয়াতে। চূড়ান্ত, চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা মানুষের প্রতি!

মনকে আজও পীড়িত করে। বিশ্বাস করতে হয় কিছু কিছু জিনিস নবজাগরণ, উনিশ শতক···তাঁর সময়ের মানুষজন আজ দেউলে।

রাজনীতির ভয়ংকর পাশা খেলায় দেশকে ভিখারি করে দিচ্ছে এ দেখাও যেমন মর্মান্তিক···তেমনি মর্মান্তিক, নবজাগরণের উনিশ শতকের অসৎ মূল্যায়ন হচ্ছে তা জেনে যাওয়া।

তাঁরা তো জানতেন, কিছু ব্যাপার প্রশ্নাতীত। এখন কেন সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, বারবার প্রশ্ন ওঠে?

বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে।

—কি ভাবছেন?

—না। মন কত কথা ভাবে!

—আমি তাহলে ও'র বিষয়ে কেউ খোঁজ দিতে পারেন কি না, এই মর্মে কাগজে একটা চিঠি লিখি। কয়েকটা কাগজে বেরোলে যদি সাড়া পাই কিছু। তাহলে দেখব।

—মনে হয় না। আবার, পেতেও পার।

—দেখি!

—কোনো খোঁজ পেলে আমাকে জানিও।

—নিশ্চয় জানাব। আমার নাম ঠিকানাটা দিয়ে, কেমন?

—তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—বর্তমানে মা, আমি। দিদিমা বরাবরই আমাদের কাছে থাকেন।

—তোমার আর ভাইবোন নেই?

—দাদা বিদেশে। বোন বিবাহিতা।

—তোমার মা···

—না, মা ও'কে দেখেননি। বাবা তো পরে বিয়ে করেন। এ সব পাগলামি আমার নিজস্ব। মা ও'কে দেখেনও নি, স্বাভাবতই ও'র বিষয়ে কোনো কৌতূহল নেই।

—সুনাম কি করত?

—বাবা একটা ছোট্ট স্কুল করেছিলেন। প্রধানত মার চেষ্টায়···মা বাবা দুজনেই পড়াতেন···প্রধানত মার চেষ্টায় স্কুলটা ভালো দাঁড়িয়ে যায়।

লতিকা কৌতূহলী হন, কি স্কুল?

অরণি নাম বলে।

—হ্যাঁ। বেশ পুরোনো নার্সারি স্কুল।

—মা খুব উদ্যমী। বাবার কাছে দেশের কথা, জ্যাঠামশায়ের কথা, সবই শুনেছি। খুব অধাস্তব লাগে। আমরা তো কোনো দুঃখ কষ্টও

জানিনি। ভাল ভাবেই মানুষ হয়েছি। বাবা অবশ্য নেই···

—হ্যাঁ, বললে তো।

—মা এখনো খুব অ্যাকটিভ। পড়ান না। অফিস দেখেন। ব্যস্ত মানুষ। চলি।

—এসো।

লতিকা হঠাৎ বলেন, আবার এসো।

—আসব।

অরুণি বেরিয়ে যাবার পর লতিকা বলেন, 'আপনি' বলে শুরু করেছিলে। পরে 'তুমি' চালিয়ে গেলে। সতি, খুব অবাক হয়েছি।

—'তুমি' বলছিলাম ?

—একেবারে শেষ অবধি।

—কি জানি !

—ছেলেটা তাকে খুঁজছেই বা কেন।

—জানি না।

প্রসাদ সেই চিঠিটা আবার দেখেন, ফাইলে রাখেন, ফাইল বাঁধেন। বাবা নাড়েন।

—না, বেঁচে নেই নিশ্চয়। বেঁচে থাকলে কোনো না কোনো ভাবে জানা যেত।

—তাই হবে। চলো, ঘরে চলো।

—শুভময়ের কোনো বুদ্ধি হল না।

—সে তো হুটপাট এসেও পড়ে।

কয়েকদিন বাদেই শুভময় হাজির হন। যথেষ্ট মোটা হয়েছেন। যথেষ্ট সক্রিয় আছেন। ইতিহাস অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। কয়েকটি বই তাঁকে খ্যাতিও দিয়েছে। গত কয়েক বছর হল একটা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র খোলার কথা ভাবছেন। আসলে ওটা উনি পেরে উঠবেন না। অত উদ্যম ওঁর নেই। একটি অভিজাত প্রকাশনা সংস্থার অংশীদার হয়েছেন। সেখানেই সময় দেন।

প্রসাদ বলেন, বাজে কাজ।

শুভময় বলেন, কেন ?

—সব ইংরিজি বই, ভীষণ দাম।

—আরে এ সব বইয়ের বাজার আছে। বেচে তো মোহন। আমি

তো সম্পাদক মাত্র।

—বাংলা তো নয়।

—বাংলায় এ সব বই কতদিনে হাজার কপি কাটবে তা জানো? আঠারো বছর।

—সত্যি?

—সত্যি।

এই আপসে মতান্তর ও বিতর্কটা অনেকদিন ধরে চলছে।

শুভময় সুখী। অত্যন্ত সুখী। কিছু কিছু লোক সুখী হবেই হবে। তারা ভাল খেতে ভালবাসে, ভাবনাচিন্তা করে না। কি পাইনি সে হিসাব মেলায় না কখনো, নিজেকে সর্বদা 'লাকি' মনে করে।

শুভময় ঢোকেনই এক বাক্স পেসট্রি নিয়ে। বলেন, খাও খাও, আনন্দ করো।

—কেন?

—বাঃ, অপারেশন ভাল ভাবে হল। তোমাকে তো বেশ ভালই দেখাচ্ছে!

—কি যে বলো!

—কি লতিকা, ভুল বলেছি?

—অত পেসট্রি কে খাবে?

—তোমরা না খেলে আমিই খাব।

প্রসাদ বলেন, বয়স! বয়স!

—বয়স তো হয়েছেই। তবে বলতে নেই, ছেলে আর বউ, দুই ডাক্তার বারবার দেখেও কোনো বয়সের রোগ আবিষ্কার করতে পারে নি।

—সত্যিই খাচ্ছ?

—কি করব ভাই। বেলার যা ডায়াবেটিস্ ওর জন্যে বাড়িতে মিষ্টি নিই না। খেতে ভালবাসত অত, আমি টপাটপ খাব, ও খাবে না!

—ছেলে বউও তো আছে।

—না, তাঁরা অত্যন্ত সাবধানী, মিষ্টি খান না। ছেলেটা ছোট তা সাবধান করে।

—চা করব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, তারপর?

—কিসের পর?

—অরণি এসেছিল ?

—হ্যাঁ। আচ্ছা শুভময়! তোমার কি কোনদিন ছেলেমানুষী কাটবে না ?

—কেন, কেন ?

—আমি তো বলিনি যে ওটা মহানামের লেখা চিঠি, কথার কথা বলেছিলাম মাত্র।

—আরে তাই হবে।

—ওকে এ কাজে ভাতাল কে, তুমি ?

—না হে! ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান, রেজাল্টটাও ভাল ছিল। কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে কাজ করতে শুরু করল···ছেড়ে দিয়ে গেল খবরের কাগজে... খুব অস্থির আর কি!

—এই তো এখনকার ছেলেদের

—না হে। ঠিক তাও নয়।

শুভময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। বলেন, তা নয়। একটা সম্পর্কে আমি ওর শ্বশুরও হই। মানে আমার এক পিসতুত ভাইয়ের মেয়ে ওর ব··· উ

—ও!

—বড় মেজাজী মেয়ে ওই বর্ষা। এই চলে আসছে, এই ফিরে যাচ্ছে, আবার আসছে, খুব অশান্তি···খুব! বর্ষাই ওকে এ রকম উদভ্রান্ত করে দিচ্ছে। তা আমিই বললাম, যা করতে ভাল লাগে, তাই করো। যদিও, হঠাৎ মহানামের খোঁজ করাটা আমার কাছে···

—খানিকটা অবাস্তব।

—কেন, কেন ?

—ধরো যদি পায়ও খুঁজে···তাতেই বা কি ? দুজনে দুই জগতের মানুষ না ?

—আরে, ছেলেপিলে আজকাল এ সব অশান্তি না থাকলেও অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছে, ড্রাগ করছে, সে সব দিকে তো অরণি খুবই ভালো ছেলে। বর্ষা বলছে সে কাজ করবে। আমি বলেছি খুব ভালো। তোমার যা ভালো লাগে করো, ওর যা ভালো লাগে করুক, এ-ওকে নিশ্বাস নিতে দাও।

লতিকা বলেন, বুঝেছি এখন। মুকুলের মেয়ে তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—খুব মিষ্টি দেখতে ছিল।

বাপই অত্যধিক আদর দিয়ে···তা আজকাল এ সব অশান্তিও ঘটনা। অত্যন্ত বাস্তব। তা, কোনো কারণ ছাড়াই আজকাল মদ বলো···ড্রাগ বলো···সে সব করছে না অবশি, তার জ্যাঠাকে খুঁজছে···এতে প্রসাদের আপত্তি কি?

—আপত্তি নয়, তা বলিনি।

—যাকগে, ওর জ্যাঠা, ও বুঝবে। আমি ওকে খুব পছন্দ করি বরাবর।

লতিকা বলেন, আগেই বুঝেছি ওর মনে কোনো দুঃখ আছে।

প্রসাদ বলেন, আবার!

শুভময় বলেন, লতিকা হয়তো বুঝেছে।

—তুমি লতিকাকে চেনো না। সব সময়ে ও বুঝতে পারে কার মনে কি দুঃখ আছে। ওই তো, দুঃখী দুঃখী চেহারা দেখে গলে গিয়ে য়রাজকে এনেছিল। সে দিব্যি কাজে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে দেয়ে মোটা হয়ে চুরি করে পালাল।

—সব সময়ে সেই কথা!

—করেছিল তো!

শুভময় বলেন, আজ আমি উঠি। তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হয়ে ওঠো প্রসাদ। একদিন আড্ডা হোক। ইশ্! দেরি হয়ে গেল।

—কিসের এত তাড়া?

—আরে! তোমাদেরও তো বলতে বলেছিল। একদম ভুলে গেছি। আজই, মানে এই তারিখে, আমাদের তেতাল্লিশতম বিবাহবার্ষিকী। তাই তো ভাবছি···মানে এখানে যে আসতে হবে সেটা মনের মধ্যে আছে, কিন্তু কেন আসতে হবে, তা ভুলে গেছি। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা।

লতিকা ভুরু কোঁচকান, ইন্টারেসটিং?

—এই যে আমার মনের ব্যাপারটা!

—থামো তো। বাড়ি যাও।

—বাড়ি তো যাব। কিন্তু বেলাকে বলব কি? সে তো ক্ষেপে যাবে।

বিচলিত শুভময় মাখনের ফুলবসানো পেসট্রিটি বাহাই করে দু'আঙুলে তুলে খেয়ে ফেলেন।

—কি যে করি!

—এখন বাড়ি যাও।

—বেলা!

লতিকা বলেন, লিখে দিচ্ছি যে দাদা তো যেতে পারবে না, আমি গেলেও চলে না, সব বুঝিয়ে···

বাঁচালে।

প্রসাদ বলেন, বিয়ের দিনেও তো গোল বাধিয়েছিলে। আমরা অপেক্ষা করছি, তুমি নেই।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—সত্যি!

—বেশ কেটে গেল হে বছরগুলো।

ডাক্তার ছেলে এবং ইঞ্জিনিয়ার মেয়ের পিতা শুভময় মাথা নাড়েন বারবার, বেশ কাটল।

—ডাক্তারদের আন্দোলন, ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলন, এসব বিষয়ে তোমার ছেলে, বউ, মেয়ে কি বলছে? তাদের কি মত?

—নানা, ওদিকে ও নেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা, মানে প্রত্যেকটি বন্ধু বান্ধবের কথাই বলছি, খুব নিরাপত্তা বোধে, সিকিউরিটি মাইণ্ডেড, রাজনীতির গন্ধ আছে, তাতে নেই।

—হ্যাঁ। এরা অন্যরকম।

—আরে, এরা অন্য গ্রহের মানুষ।

—আমরাও তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আর···

নিরাপত্তা, স্থিত জীবন, এ সবকে কোনো অন্য চিন্তা দিয়ে বিপন্ন করা চলে না। অবশ্য অতীতেও তাঁরা, প্রসাদরা, সত্যিই বিপন্ন ছিলেন? একদা রাজনীতি করা, আজ তাঁদের স্বীকৃতি ও সামাজিক নিরাপত্তা দিয়েছে।

যারা বিপন্ন ছিল, তারা আজও বিপন্ন। সরকারী জলাধার জল ছাড়ছে, জেলার পর জেলা বিপন্ন। এসব খবর কাগজে পড়েন প্রসাদ, কিছুতে নিজেকে কল্পনায় নিয়ে যেতে পারেন না গ্রামে, শস্যক্ষেত্রে, বাঁধভাঙা বন্যায় দুর্গত মানুষদের কাছে।

ও সব অন্য গ্রহে ঘটছে।

অথচ সেদিনই পড়েছেন মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা'। গ্রামীণ

কৃষক, অত কষ্টে ধান জোগাড় করে ঢেঁকিতে কুটে চাল বানিয়ে তবে পার্টি কমরেডদের মুখে ভাত দিয়েছে।

তারা কি খেত?

অসম্ভব সব ফারাক। দ্বীপ, দ্বীপ, সবাই। কেউ কারো কাছে যেতে অক্ষম, কেন না প্রসাদরা নিজেরাও দ্বীপবাসী। তাঁদের নিজেদের মধ্যে কত না বিভেদ। তাঁদের মতো বসে যাওয়া মানুষদের সঙ্গে সক্রিয় মানুষদের তফাৎ।

আবার নেতাদের সঙ্গে ক্যাডারদের। নেতাদের সঙ্গে, বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে অগণিত জনগণের কোনো মিলবার মতো বিন্দু নেই।

দ্বীপের পরে দ্বীপ। কলকাতায় বসে জনগণ বা দেশের হাল জানতে চাও? কাগজে ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্ট পড়ো।

এদের খবর সত্যি, ওদের খবর দু'নম্বরী।

ভাবতে গেলে মনে হয় অতীতের কাকদ্বীপ। নদী, গাঙ, খাল না পেরোলে কোথাও যেতে পারছ না। যখন চারিদিকে জলের, জঙ্গলের, লাটদার গোমস্তার লক্ষ বাধা। তখন সব বাধা ঘুচিয়ে ঐক্য এসেছিল।

এখন অনেক কম কষ্টে তুমি যেতে পারো কাকদ্বীপ, বুধাখালি, চন্দনপীড়ি, বড়জোর খানিক নৌকো চাপলে, খানিক হাঁটলে ভিতরে যেতে হলে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক পাকা।

অথচ আসলে দ্বীপ হতে দ্বীপে পৌঁছনোর কোনো পথ নেই।

—কি ভাবছ, প্রসাদ?

—না, কিছু না।

—অরণি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে?

—বলছিল তো দেবে।

—ব্যাপারটা খারাপ নয়। নিখোঁজ, হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্ত ডাক পাঠানো। হঠাৎ যদি এসে হাজির হয়?

—কে? মহানাম?

—ধরো সে! খুব রোমান্টিক হবে।

—হ্যাঁ। খবরের কাগজের গল্প।

—চলি। ভালো বোধ করলে একদিন এসো। বাড়িতে সব স্বাস্থ্য-সম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রান্না হয়। এ বিষয়ে আমার বউমা অত্যন্ত

পারদর্শিনী।

—ভালো তো!

দূর দূর। বিস্বাদ।

লতিকা বলেন, সে জন্যেই তো বাইরে গবগবিয়ে খাচ্ছ আর মোটা হচ্ছ।

—যদ্দিন বাঁচব, খেয়ে যাব। ছি ছি মেয়ে পোলারয়েড নিয়ে আসছে, বাবা মার ছবি তুলবে! আমি যে কি···অভিনন্দন!

ঘামতে ঘামতে চলে যান শুভময়। কেন অভিনন্দন, এবং তা ব্যাখ্যা করেন না।

দুই

বম্বের কোনো শিল্পপতি গোষ্ঠীর সর্বভারতীয় কাগজের কলকাতা আপিসে অরণি কাজ করে। বিজ্ঞাপনটা ও বাংলা কাগজেই দিয়েছিল।

অরণির মা অত্যন্ত ভদ্র এবং ছেলের ব্যাপারে কথা বলেন না। তবে বর্ষা ওকে বলে, এটা কি হচ্ছে?

—কি জানি!

—এ সব করে কি হবে?

—আমি কি বলব, বলো?

অরণির মা যথেষ্ট সহিষ্ণু ও নরম গলায় বলেন। অরুন বিদেশে, সীমান্তিনীর বিয়ে হয়ে গেছে। অরণি তাঁর কাছে থাকতে চায়, এতেই তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। বর্ষা ও অরণিকে দোতলার ঘর বারান্দা ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে নিচে থাকছেন নিজে।

বর্ষার ইচ্ছে, ওপরে রান্নার ব্যবস্থা করে।

করলে করুক। যা ওদের ভাল লাগে, তাই করুক। বড় খেয়ালী বর্ষা, বড়ই আবেগপ্রবণ। ওর মা বাবাও ওকে বারবার স্থির হতে বলেন। স্থিরতা ওর স্বভাবেই নেই।

—আপনি আপনার ভাসুরকে দেখেছেন?

— না, উনি তো সেই কবেই চলে যান।

—মৌরিপুরের সম্পত্তি আপনারা কখনো ফিরে পাবার চেষ্টা করেননি?

তোমার শ্বশুর তা চাননি। যা গেছে তা গেছে। সামনে তাকাও,

এই বলতেন।

—আমার গ্রাম দেখতে খু···ব ভালো লাগে। গ্রামে থাকতেও ইচ্ছে করে।

মৌরিপুর, শুনেছি এখন, ছোটখাট শহর।

—সত্যি, গ্রামগুলো বদলে যাচ্ছে···

বর্ষা খুব ভাবিত হয়ে পড়ে। তারপর বলে, চুলটা স্যাম্পু করি কেমন ?

বাথরুম থেকে ওর গান শোনা যায়। অরণির মা ভাবেন, কেমন সুন্দর, সহজ থাকতে পারে। কেন যে মাঝে মাঝে···

মহানাম দত্ত ! নামই শুনেছেন। ছবি নেই, হাতের লেখা নেই। স্বামী বলতেন, বেঁচে নেই। তিনিও সে কথাই বিশ্বাস করেন। যাঁদের দেখেন নি, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।

অরণি যে কেন তাঁর খোঁজ করছে !

করুক, করুক। যা করলে ওর মন ভালো থাকে তাই করুক।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই সময় হয়ে যায়। হঠাৎ চিঠির বাক্সটা চোখে পড়ে।

অরণির নামে চিঠি।

চিঠিটা অরণির টেবিলে রেখে আসেন। আজ ওর সকালে ডিউটি। বাড়ি ফিরতে নিশ্চয় সন্ধ্যা। বর্ষা বলেছে, ও আর অরণি সিনেমা দেখে তবে ফিরবে।

সন্ধ্যায় অরণি অবশ্য একাই ফেরে। বর্ষা হঠাৎ ঠিক করেছে নিউ আলিপুরে যাবে। পরশু ফিরবে।

না ছেলেকে আর দীর্ণ ও চিন্তাকুল দেখেন না মা। খুব সহজেই বলে ও, বর্ষা আজ ফিরল না মা।

—তোর একটা চিঠি এসেছে।

—কোথায় ?

—টেবিলে।

ছোট চিঠি। গোকুলেশ্বর রায় তাকে দেখা করতে বলছেন। ঠিকানা কসবা। বাড়ি যাবার পথ নির্দেশ দিয়েছেন। শেষে লিখছেন 'বাতের কারণে অধিক লিখিতে অক্ষম। সাক্ষাৎ করিলে মহানাম দত্ত সম্পর্কে কিছু বলিব।'

বিজন সেতু পেরিয়ে বেশ খানিক হেঁটে, বাঁয়ে ঘুরে অনেক এলাতলা

বেলতলা পেরিয়ে তবে গোকুলেশ্বর রায়ের বাড়ি পাওয়া যায়। ঘন সবুজ ঘানা বোঝাই পুকুরে টায়ার ও নানাবিধ জিনিস। পুকুরের পাশে সরু পথে গিয়ে ডান দিকে ঘুরে বাড়ি।

গোকুলেশ্বর রায় নেমে আসেন। ঘরটি ছোট। খুব খুঁটিয়ে দেখেন অরণিকে।

—আপনি ভাইপো ?

—হ্যাঁ।

—কোনো মিল নেই চেহারায়।

—বলতে পারব না।

—তাকে দেখেছিলাম···সে তো অনেক কথা। আজ অবশ্য বলতে কোনো বাধা নেই।

—আপনি বলুন না। আমি টেপরেকর্ডারে টেপ করে নেব।

—চা খান ?

—না হলেও চলবে।

—কেন এতদিন বাদে···

ধরে নিন, জানতে চাই।

—হ্যাঁ, বংশের একটা পরিচয় ! তা আপনি কি করেন ?

অরণিকে সব কথাই বলতে হয়। গোকুলেশ্বর শুনে যান। তারপর বলেন, পুলিশে ছিলাম তো ! এটা একটা অভ্যেস। স্বভাব !

—জিজ্ঞেস করুন না।

—অবশ্য বাতের কারণে রিটায়ার করি। এখানে আমাদের আদি বাস। সব গ্রামের মতো ছিল। জানলেন ? এখনো কোনো উন্নতি নেই, পথ তো দেখছেন।

—হ্যাঁ।

—কলকাতার কাছে আছি না দূরে, তা বুঝি না। অবশ্য ব্রিজের ওপারেও···

—বলবেন কি এখন ?

—হ্যাঁ। শুরু করি।

—সেটা উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আমি তখন কাঁথিতে। অর্ডার এল, এখনি আমাকে গাংনা নদী পেরিয়ে মোহনঘট থানা উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচাতে যেতে হবে।

—উন্মত্ত জনতা ?

—ও ইয়েস। আপনারা ইতিহাস পড়েছেন। আমি ইতিহাস তৈরি হতে দেখেছি। হ্যাঁ, আমি, গোকুলেশ্বর রায়, দেখেছি ইতিহাস। এখনকার ছেলেছোকরারা কি বোঝে বলুন, চাঁদা চাইবার ভাষা কি !

—তারপর, যা বলছিলেন···

—প্রথমটা বুঝলেন। বিশাল মিছিল করে যাচ্ছে সব, "বন্দেমাতরম্" বলছে, পিকেটিং চলছে···সরকারকে বয়কট···তা আদালত কাছারি, আপিস, ইস্কুল, সব বন্ধ। ও ব্রিটিশের ওপর ঘৃণা কি ! সরকারী কর্মচারী হলে, সে তুমি মহকুমার মাথা হও বা চৌকিদার, কেউ তোমায় জিনিস বেচবেনা।

—গভরমেণ্ট কি করছিল ?

—এই, থানা, আদালত, এগুলোকে প্রোটেকশান দিতে পুলিশ পাঠাচ্ছিল। তাতে কি আর থামে ? কাঁথির সর্বত্র তখন ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলন।

হ্যাঁ, তা হয়েছিল।

—রাস্তা অকেজো, টেলিগ্রাফের খুঁটি ওপড়ানো, তার কাটা, নদীতে নৌকা নেই। নৌকো ধরো আর জ্বালাও ! কিন্তু তবু বলব, চৌকিদারেরা উর্দি ফেলে দিয়ে হাত জোড় করেছে তো ছেড়ে দিয়েছে।

—এ রকম কতদিন চলে ?

—চলছিল তখনো মানুষ যাকে বলে ভায়োলেণ্ট তা হয়নি। কিন্তু যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডারে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চলতে থাকল, মানুষ মরতে থাকল···তখন শুরু হল থানা দখল, থানা জ্বালানো। আমি শুনেছি, নেতারা কিন্তু আন্দোলনকে অহিংস রাখার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। মানে···মারদাঙ্গাটা যেন জনতা না করে।

—গুলি চলার পরেও ?

—খবর তো সেই রকম। যা হোক, ভগবানপুর থানা দখলের সময়েই খুব জোর গুলি চলে। যারা জনতার ওপর গুলি চালায়, তারা পুরস্কারও পাচ্ছিল। মানে আজকাল যাকে বলে রিপ্রেসিভ, মানে দমনমূলক ব্যবস্থা

—তারপর ?

—আমাকে তো ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমায় বসে অর্ডার দিল। গাংনা পেরোও, মোহনবট থানা বাঁচাও। ন'জন সেপাই নিয়ে যাবে। জনতাকে মারমুখো দেখলেই গুলি চালাবে।

—আপনি গেলেন ?

—সরকারী হুকুম। গাংনা নদী তখন বর্ষার জল পেয়ে রাক্ষস। ঘাটে পৌঁছতে হবে হেঁটে। ফেরিবোট বা নৌকো তো পাব না। পেরোব কি করে ? ওঃ, পথও তো চলা বিপজ্জনক। শুনলাম, গাংনা পেরোলে মৌরিপুর খুব ভয়ানক গাঁট। তারপর মাইল চারেক হাঁটলে মোহনবট।

—তারপর ?

—গুরু গুরু বলে রওনা তো হলাম। হেড কনেস্টবল কানু লোক। সঙ্গে চারশো রাউণ্ড অ্যাম্যুনিশন। সে বেটা খালি বলে, বন্দুক আছে ভাবেন কেন ?

যাহোক, রাস্তা বলে বস্তু রাখে নি কিছু।

—গাংনা কতদূর ?

—তা আট দশ মাইল হাঁটলাম। নদীতে কোনো নৌকোই নেই। অনেক কষ্টে একটা নৌকো জোগাড় হল। মাঝি বলল, মারলে মারো বাবু, নৌকোয় তোমাদের পার করতে পারব না। তাহলে বন্দেমাতরম্ আমার নৌকো জ্বালিয়ে দেবে। অনেক বললাম, কিন্তু তখন দেখেছিলাম, ওই মাঝিও বিশ্বাস করে যে কাঁথিতে ব্রিটিশ থাকবে না।

—আমরা কিছুই জানি না।

—জানবেন কি করে ? খুব একটা পরিবর্তন বলতে হবে। পুলিশকে একটা মাঝি অমন কথা বলছে ! সে তো কথা বলে চলে গেল। রাতটা আমরা গাছতলায় কাটালাম। একটা সেপাই বলল, সে নৌকো বাইতে পারে রাতে খাওয়া-দাওয়া হল না মোটে।

—নদী খুব চওড়া ?

—চওড়া, বড় বড় ঢেউ ! ভোরবেলা সেপাইটা কিন্তু ম্যানেজ করে নদী পার করল। ওপাড়ে নেমে দেখি ফেরিবোটের চৌকিঘর পুড়ে ছাই। একটা মানুষ কোথাও দেখি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি চারপাশে, দূরে দূরে মানুষজন আছে। নদীর পাড়ে উলুঘাসের বন। ধানগাছও ঝাঁপালো। গ্রামও আছে। নদী থেকে দূরে।

—মনে পড়ে সব ?

—ছবির মতো। হেড কনেস্টবল জানত জায়গাটা। সে যে পথে বলল, সে পথে যাচ্ছি। শেষে চার মাইল হেঁটে মোহনবট পৌঁছলাম। পথে যে মৌরিপুর ফেলে গেছি তা জানি না।

—মোহনবট ! এখনো কি আছে ?

—বলতে পারি না। পরে শুনেছি সে বছর আশ্বিনে ঝড়ে সব ধ্বংস হয়ে যায় ওঃ, অঞ্চলটা খুব মার খায় কয়েক বছরে। বেয়াল্লিশের আন্দোলন, তা বাদে আশ্বিনে ঝড় বৃষ্টি সাইক্লোন, তারপর মন্বন্তর,-আর পুলিশের অত্যাচার...আমিও পুলিশ ছিলাম...খুব অত্যাচার !

—পৌঁছে কি দেখলেন ?

—দেখলাম মোহনবট জনশূন্য। যা ছিল থানা, সেটা তখন পোড়া ইটের পাঁজা। সেখানে তো তখন থানা রক্ষা করবার কোনো কথাই ওঠে না। অনেক ভেবে চিন্তে মনে পড়ল, মোহনবটে যে সরকারী হাসপাতাল তার ডাক্তারকে চিনতাম।

সেখানে গেলেন ?

—তার বাড়ি বন্ধ। তালামারা। হেড কনেস্টবল নিয়ে গেল ড্রেসার-কম্পাউণ্ডারের বাড়ি। সে বলল, এখানে থাকবেন না বাবু। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে কালকেই মহানাম দত্তের লোকজন থানা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কি শাঁখের বাদ্যি, কি লোক জমায়েত, বাপ রে বাপ !

—মহানাম দত্ত নেতা ?

—তখনো জানি না। তবে ওরা থানা বলুন, ডাক্তার বলুন, সরকারী লোকদের যেতে দিয়েছে। সবাই নৌকো করে কাকদ্বীপ গেছে।

—কাকদ্বীপ কাছে ?

—কাছে বা কি, দূরে বা কি ! গাংনা হয়ে চলে গেছে। আমাদেরকে তখনি চলে যেতে বলল, থাকলে পরে বাঁচবেন না। এখনো সব চোখের সামনে ভাসছে।

—ড্রেসার তো যায় নি ?

—ওর বউ অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

—তারপর ?

—সে তো আমাদের এক গেলাস জল দিতেও ভয়ে কাঁপছে। মানুষ যদি জানে যে পুলিশকে কোনো সাহায্য করেছে, তার প্রাণও যাবে। হেড কনেস্টবল খালি বলছে, ছাই ঘেঁটে দেখি যদি থানার রেকর্ড কিছু উদ্ধার হয়। কিন্তু আমি সে কথায় কান দিলাম না। আমরা ফিরছি যখন, তখন শুরু হল খেলা। ওঃ কি দিন গেছে !

—কি ?

—শাঁখ বাজতে থাকল। পরে, পড়ে থাকবেন, কাকদ্বীপেও ওরা শাঁখ বাজিয়ে জানিয়ে দিত। ওটা চিরকাল আছে। বিপদ-আপদ হলে শাঁখ বাজাবে। তাতেই মানুষ জেনে যাবে। যা হোক, শাঁখের আওয়াজ মিলে হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, কোনোদিকে চেও না, হেঁটে চলো।

—বেলা তখন কত ?

—হয়তো ন'টা হবে। মোহনঘাট ছাড়িয়ে মাইল দুই এসেছি। দেখি পথের দু'পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে। সব নিশ্চুপ। মুখে কথাটি নেই। যত এগোই, লোক তত বাড়ে। ওঃ, সে যে কি অভিজ্ঞতা! হেড কনেস্টবল শুধু আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বন্দুক নামিয়ে সামনের দিকে চেয়ে চলেছি। কিছুক্ষণ বাদেই ধানক্ষেত উপুঝুপু ভেঙে একজন জোয়ান লোক এগিয়ে এল। কালো রং, চৌকো পানা মুখ, খুব শক্ত চোয়াল, খুব হাট্টাকট্টা জোয়ান। চুলগুলো কোঁকড়া, ভুরু খুব ঝাঁকড়া। গায়ে একটা জামা গলাতে গলাতে চলে এসেছে।

—কি রকম জামা ?

—ফতুয়া হবে। মনে পড়ছে না। মালকোঁচা মারা ধুতি পরনে। সে আমার পাশে পাশে হাঁটছে একটু তফাৎ রেখে, আমিও যাচ্ছি। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ছে, চোখ সরায় না। এ ভাবে আমরা নদীর পাড়ে পৌঁছলাম। সেখানে লোকের ভীড় লেগে গেছে। মেয়েছেলে, বেটাছেলে। এ লোক কিন্তু সঙ্গে চলেছে।

—কথা হয় নি ?

একটা/কথা নয়। আমরাও তো চুপ। হেড কনেস্টবল কি যেন বলতে চাইছে, আমি মোটেই কান] পাতছি না। সে সময়ে কোনো হঠকারী কাজ করলেই মুশকিল। জনতা তো অহিংস আন্দোলন করছে। তা শত শত লোকের জনতা শুধু ঠেলা মারলেও আমরা গাংনায় তলিয়ে যাব। গাংনা যা নদী! তার কাছে সাঁতার জানলে বা কি, না জানলে বা কি!

—খুব স্রোত ?

—যেমন স্রোত, আর কুমির কামটও তো আছে। সব চেয়ে বিপজ্জনক, মাঝে মাঝে ঘূর্ণী! জল দেখলে আমি চিরকাল ভয় পাই, যা হোক, আমরা ঘাটে পৌঁছলাম। তা ওই ছেলেটি হেঁকে বলছে, পথ ছেড়ে দাও, এনারা যাবেন।

—তখন ওঁর বয়স কত ?

—বছর চব্বিশ হবে। আমার নিজের বয়সই তো পঁচিশ ছাব্বিশ।

—তারপর ?

চেয়ে দেখি নৌকো পাড়ে তুলে ছাগানো সারা। তখনো জ্বলছে। একটু বন্ধ করবেন টেপটা ? জল খাই একটু।

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

—বেশ মডেলটি তো।

—সনি।

—এদেশের ?

—এটা বাইরের।

—বেশ জিনিসটি, ছোটও বটে।

—নিয়ে ঘুরতে সুবিধে।

—আমার ছোট ভাইয়ের ছেলের আছে একটা। তা ওদের তো বিকট শখ। তাতে শুধু হিন্দী গান শুনবে। পুজোর সময় এলে ভয় করে আমার। বাপ রে হিন্দী গানের দাপট।

জল খান গোকুলেশ্বর। একটু চোখ বোজেন।

—আজ কি ক্লান্ত লাগছে ? তাহলে থাক।

—না না। কাজ কখনো ফেলো রাখবেন না। আমার তো বলতে ভালই লাগছে। এখন তো অঢেল সময় হাতে। সময় কাটানোই সমস্যা। কেই বা আসছে, কেই বা এই বুড়োর কথা শুনছে। কাগজগুলো খুব খুঁটিয়ে পড়ি। তাতেই তো আপনার চিঠিটা পড়লাম। আপনি কি বাংলা কাগজ পড়েন ?

—মাঝে মাঝে। সময় পেলেই।

গোকুলেশ্বর রায়ের গলায় একটা বিনম্র মিনতি ফুটে ওঠে। তিনি গলা সাফ করে বলেন, আমি খুব সম্পাদক সমীপে চিঠি লিখি, জানলেন ? নানা বিষয় নিয়ে। কচুরিপানা পশুখাদ্য হতে পারে, তা থেকে সার হয়, এ চিঠিটা ছেপেছিল। যত লিখি তত ছাপে না অবশ্য। তবে কয়েক বছর আগে, গোমাংস ভক্ষণ কেন ভারতের জলবায়ুতে উপযোগী নয়, তা নিয়ে একটা চিঠিও ছেপেছিল।

—ওদের দপ্তরে বহু চিঠি আসে তো।

—তাই হবে। সব কি আর পড়ে ?

—টেপটা চালাই ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্ করুন।

—বলুন।

—তখন একটা অদ্ভুত সময়। জনতা নির্বাক। নিরস্ত্রও বটে। কিন্তু আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। আর ওই ছেলেটি তো আমার সামনে। আমি পড়লাম বিষম সংকটে। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছে, এ রকম অবস্থায় পড়লে গুলি চালাবে। হেড কনস্টেবল আর সেপাইরা রাইফেল তুলে তৈরি। আমি বললেই···

—গুলি চালাবে।

—তখনি। আমি ভাবছি। কয়েকশো রাউণ্ড গুলি! একদম নিরস্ত্র জনতা। গুলি চালাব ? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। না চালালে আমিও ওপরঅলার কোপে পড়ব। কিন্তু চালাব কেমন করে ? আমি ভাবছি, আর ভাবছি, আর ছেলেটি চেয়েই আছে। শেষ অবধি আমি অস্ফুটে বললাম, ডোনট্ ওপন্ ফায়ার !

—বললেন ?

—বললাম তো ! গলা কাঠ, আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ওকথা বলে বন্দুক নামালাম। সেটাও কোনো ভেবে চিন্তে করিনি। হাত ভেরে গিয়েছিল। হেড কনেস্টবল অবশ্য পরে বলেছিল যে আমি ওদের হাতে বন্দুক দিয়ে দিয়েছি। সেটা বাজে কথা। বন্দুক ওরা ফেরতও দিয়েছিল। আমরাও ফেরত এনেছিলাম। তবু এ নিয়ে পরে জল বহুদূর গড়ায়।

—তারপর ?

—ওরা হঠাৎ আরো কাছে এল। একজন বয়স্ক লোক বলল, অ মহানাম ! এখন ? তখনি বুঝলাম যে ওই ছেলেটিই মহানাম দত্ত। সে যে কি বলল তা শুনিনি। কিন্তু ওরা আমাদের প্রত্যেককে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

বলেন কি ?

—আর কি ! খানিক নিয়ে গিয়ে কইলা নামে একটা জায়গায় একটা স্কুল ঘরে ওঠাল। মহানাম দত্ত বলল, বন্দুক আমাদের হেপাজতে থাকল। পরে ফেরত পাবেন। এখন এখানে থাকুন। ছেড়ে দিলে প্রাণে বাঁচবেন না।

—থাকলেন ?

—না থেকে উপায় ? কোথা থেকে আমাদের মুড়ি এনে দিল, জলের

কলসি। আমি ভাবছি এবারে হয়তো কাটবে। দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ঘরের চারদিকে ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। দিবিব ডিসিপ্লিন। করেক ঘণ্টা বাদে বাদে ডিউটি বদল করছে। হেড কনস্টেবল বলছে, হুজুর! যা করলেন, সাহেব তো আমাদের মাথা নিয়ে নেবে। আমি বলছি, বাপু! দায়িত্ব আমার। গেলে আমার মাথা যাবে। তোমাদেরকে আমি ঠিকই বাঁচিয়ে দেব। এখন দেখ, এখান থেকে কিভাবে মাথা বাঁচিয়ে ফিরতে পারি।

—অন্য সেপাইরা?

—তারা কিছু বলেনি। ইংরেজ আমল। পুলিশে তখন ডিসিপ্লিন ছিল। এ সব কথা হচ্ছে, এর মধ্যে মহানাম দত্ত এসে বলে গেল, আপনাদের কি ব্যবস্থা করা হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমি বললাম, আমাদের ফিরে যেতে দিন। তখন বলল, দেখুন! চারদিকে গুলি চলেছে। বিস্তর মরেছে, জখম হয়েছে। ছেড়ে দিলে ফিরতেও পারবেন না, প্রাণেও বাঁচবেন না।

—গলার আওয়াজ কি রকম ছিল?

—বেশ জোরালো।

—কথাবার্তা?

—চমৎকার পরিষ্কার। আরে! আসার আগে তো সময়ও ছিল না। আমাকে ব্রিফও করে নি। মহানাম দত্ত বি. এস. সি. পড়তে পড়তে ছেড়ে দেয়। এই সব ব্যাপারের অনেক আগেই ও ছেলেদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করেছিল। মোহনবটের এক সেপাই মৌরিপুর হাটে তোলা তুলছিল বলে ও তাকে পেটায়।

—এসব আমি জানি না।

—পুলিশ জানবে। পুলিশকে সব জানতে হয়, তাই না? জমিদার থাকত দূরে, শৈলেশ্বর গ্রামে। সেও কম জুলুমবাজ ছিল না। মহানাম একবার খাজনা বন্ধ করতেও গিয়েছিল। ওর নাম মোহনবট থানায় বেশ কিছুকাল ধরেই ছিল।

—তারপর কি হল?

—আমরা তো থাকলাম। কিন্তু সেদিন রাতেই মহানাম আমাদেরকে ওঠাল। বলল, এখানে রাখাটা নিরাপদ নয়। আপনারা যে তাণ্ডব করছেন সর্বত্র, তাতে ঘটনার ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। জইঘাটের লোকেরা ক্ষেপে আছে।

তারা যদি জানে যে আপনাদের রেখেছি, তাহলে পুলিশকে আশ্রয় দিয়েছি বলে এখানে আমাদের ওপর চড়াও হবে।

—কেন আপনাদের বাঁচাল ?

—আমিও তো তাই ভাবছি। তবে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না। সে রাতেই আমাদের নিয়ে গেল কয়েক মাইল দূরে বামুনিয়া চকে। সেখানে যিনি ডাক্তার এল. এম. এফ-অবশ্য, তিনি সরকারী হাসপাতালে চেষ্টা করেছিলেন, ফলে তিনিও নজরবন্দী। তবে সে সময়ে দেখেছি যে উনি জখমদের দেখছেন, ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।

—কেন ?

—তখন তো কেউ ভাবে নি। পরে উনি সদরে গিয়ে সব গোপন খবর দিয়ে দেন। ওঁর খবরের ওপর পুলিশ বহুজনকে ধরে। সরকার মোটা হাতে পুরস্কারও দেয়। আবার দেখুন! স্বাধীনতার পরে কেমন করে যেন, সেই যে বিপ্লবিদের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সেবা করেছিল, সেই রেকর্ড ভাঙিয়ে দিব্যি গুছিয়ে নেয়।

—এরকম কত হয়েছে।

—অনেক অনেক! তবে ওঁর বাসায় দিন দুই থাকা হয়। স্বেচ্ছা-সৈনিকরা, হ্যাঁ, মহানাম দত্ত ওদের স্বেচ্ছাসৈনিকই বলত···সে সব ছেলেরা আমাদের সব সময় নজরে রাখত। সেদিন দুই ডাক্তার খুব যত্ন করে।

—চারদিকে অবস্থা কেমন ?

—তল্লাটে সরকার বলে সত্যিই কিছু ছিল না। সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর ঘটনার রটনা চলছে। তল্লাটে ব্রিটিশ শাসন বন্ধ। স্বরাজ এসে গেছে। থানা পোড়াও, সরকারের যা পাও তাই পোড়াও! মহানাম দত্ত চরকির মতো ঘুরছে।

—অন্য নেতারা ছিলেন না ?

—ছিলেন নিশ্চয়। তবে ওর বয়সও কম, চলতে পারত খুব। ডাক্তার বলত, বিশ মাইল হেঁটে চলে যায় অক্লেশে। দু'দিন বাদে মহানাম দত্ত বলল, আজ রাতেই চলুন। এখানে আর নয়।

—কোথায় গেলেন ?

—ফুলপাই বলে একটা জায়গা। ওই যে, সেদিন কাগজে দেখলেন না, বীরেশ্বর সামন্ত নামে রাস্তা হল কোথায় ? রাজনীতি করত খুব···

—হ্যাঁ, ট্রেড ইউনিয়ন···

—ইউনিয়ন আর হয় না, তবে নেতারা ট্রেড ভালই করেন। ওই বীরেশ্বর হল ফুলপাইয়ের লোক। শুনেছি সেখানে খুব জাঁকালো বাড়ি করেছে। অবশ্য ফুলপাইয়ের আরেকটা ব্যাপারেও খুব নাম আছে।

—কি ?

—সে কি, শোনেন নি ?

—না।

—আরে ওখানে সিদ্ধকালীর মন্দির আছে। সে মন্দিরে পৌষমাসে খুব বড় মেলা হয়। আমি আগেও দেখেছি, পরে একবার···এই বছর দশেক আগে গিছলাম। ভাল লাগল না। খুব জাঁকজমক। যাত্রা হল। নেতা, মানে এম. এল. এ. এসে উদ্বোধন করলেন।

—এরা তো করে। বলে জনগণের উৎসব। পুজোর ব্যাপারে খুব উদ্যম।

—কি জানি! মানুষজন তো তখনো আসত। অবশ্য তখন কালীতলার মেলাকে কেউ জনগণের উৎসবও বলত না, রাজনীতিও ছিল না এত। এখন সব অন্যরকম। ধর্মভাব চলে যাচ্ছে।

—ভাল লাগল না ?

—নাঃ। মেলা অবশ্য বছরে একবার। তবে সিদ্ধাইকালী মন্দির থেকে বছর ভোর পাগল সারানোর বাণী দেয়া হয়।

—বাণী পড়লে পাগল সারে ?

—ও সব কপালের ব্যাপার। সারে নিশ্চয়। নইলে এত লোক যাবে যা কেন। আমি অবশ্য কাজ পাইনি···জামাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম··· আমারই জামাই···এ বড় কপালের মার, জানলেন ? ওই একটা মেয়ে··· তা ডাক্তার বদ্যি সাত দোর ঘুরে শেষে ওখানে গেলাম···নিয়ম অনেক··· এ খাবে, সে খাবে না, পূর্ণিমা অমাবস্যায় ফলাহার···তা উন্মত্ত পাগলকে কি নিয়ম পালানো সহজ ?

—আপনার জামাই ?

—হ্যাঁ। মারা গেছে অবশ্য—মেয়েটা কোনো শান্তি পেল না। এ সব ভাবলে···

—সত্যিই দুর্ভাগা।

—অথচ অনেকে ফল পেয়েছে। কি জানি। আমার পূর্বজন্মের ফল হবে।

—ফুলপাই গেলেন তারপর ?

—ও···হ্যাঁ···তা সেখানেও কয়েকদিন থাকতে হল। খুব নজরবন্দীতে রাখত। কিন্তু খাওয়া শোওয়ার কোনো অসুবিধে হয় নি। প্রাইমারি স্কুল বাড়িতে রেখেছিল। রাতে মশারি দিত। ওখানে খুব সাপের ভয়। আর, ভরা ভাদ্র মাস। চারদিক জল থই থই। সাপের উপদ্রব ও সময়ে বাড়ে।

—কদিন থাকলেন ?

—মনে হয় তিন চারদিন। তারপর মহানাম দত্ত বলল, এবারে আপনাদের ফিরিয়ে দিতে পারব। শৈলেশ্বরের জমিদার মধুময় মাইতি, লোকটা খুবই ইংরেজভক্ত। তবে এখন বেগতিক দেখে বলছে, না হে, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। সেখানে যেতে হবে।

—সেটা কতদূর ?

—আরে বাপ রে! ষোলটি মাইল হাঁটাল। পারি না, থেকে থেকে দাঁড়াই, আর মহানাম দত্ত বলে, পুলিশে কাজ করেন, ভালো মন্দ খান, হাঁটতে পারছেন না ? সাইকেলও পাবেন না গরুর গাড়িও নয়। যেতে যেতে দেখেছিলাম, লোকের মনে কেমন একটা সাহস! চাষাভুষো হাটুরে, সব একটা বেশ বেপরোয়া ভাব।

—পৌঁছলেন ?

—শৈলেশ্বরের কাছাকাছি যেয়ে মহানাম দত্ত বলল, আমি আর যাব না। আপনি চলে যান। এই নিন আপনার বন্দুক। মাইতি আপনাদের পেলে নিশ্চয় কোনো না কোনো ব্যবস্থা করবে।

—সেই শেষ দেখা ?

—বলছি।

—কি ভাবছেন ?

—আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদেরকে কোন শাস্তি দিলেন না, ছেড়ে দিচ্ছেন ?

—কিছু বলল ?

—হাতে লাঠি ছিল। লাঠিতে ভর রেখে দাঁড়াল। তারপর বলল, প্রথমত, এটা একা আমার সিদ্ধান্তে ঘটে নি। দ্বিতীয়ত, সেদিন আপনি বন্দুক চালাবার হুকুম দিলে নিশ্চয় ব্যাপারটা অন্যরকম হত। আপনাকে বেঁচে ফিরতে হত না।

—আপনি কি বললেন ?

—বললাম, আপনারা তো অহিংস সংগ্রাম করছেন বলে বলছেন। তাহলে ? তাতে ও বলল, মানুষের মেজাজ এখন সাংঘাতিক চড়ে আছে। আপনি ভাবছেন বন্দুক চালিয়ে অনেককে ফেলে দিতেন। আমি জানি, যে কিছু মরত ঠিকই, কিন্তু আপনাদের আমরা শেষ অবধি গাংনায় ফেলে দিতাম।

—আর কিছু বলেন নি উনি ?

—বলেছিল। বলেছিল, পরের গোলামী কেন করছেন ? সব ছেড়ে দিন। দেশের লোককে মেরে বিদেশী প্রভুর কাছে ইনাম নেবেন, ইচ্ছতে লাগে না ? তা আমি বললাম, আমি তো চাকরি করি। তা শুনে সে বলল, চাকরি বোধহয় করেক বছরের। এখনো অমানুষ হননি। তাই বলছি, ছেড়ে দিন।

—আপনি তো পুলিশ অফিসার। আপনার মনে এ সব কথায় কেমন ভাব হচ্ছিল ?

—বললাম, আমি হুকুমের চাকর। আপনি যা বলছেন, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমাকে তো ফিরে যেতেই হবে।

—উনি চলে গেলেন ?

—হ্যাঁ তখনি। ওই বিশ মিনিট কথা বলল, তারপর নদীর দিকে চলে গেল।

—নৌকো তো ছিল না।

—ওরা চাইলে ঠিকই নৌকো পেত। ব্যাপারটা বুঝছেন না ? নৌকো, ফেরি, গরুরগাড়ি পুলিশ কিচ্ছু পাবে না। ও তল্লাটে তখন কয়েকদিন ব্রিটিশ রাজত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল।

—জমিদার আপনাকে সাহায্য করল ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে বলল, গাংনা ধরে কাকদ্বীপে চলে যান। তাছাড়া কোনো ভাবে ফেরত পাঠাতে পারব না।

—তাই গেলেন ?

—তাই গেলাম। উপায় কি ? গাংনার তখনকার চেহারা ! নৌকো বড়সড়। কিন্তু মনে হচ্ছে মোচার খোলায় চলেছি। মাঝিটা জমিদারের ভয়ে এসেছে, কিন্তু বলছে যে আমি এখন আর ফিরতে পারব না। তোমাদের পার করে দিয়েছি জানলে দেশের লোক আমার নৌকা জ্বালিয়ে

দেবে। নৌকো গেলে খাব কি?

—কাকদ্বীপ পৌঁছলেন?

—তা পৌঁছলাম।

—এর পরিণাম কি হল?

—পরিণাম! ওঃ, সে অনেক দূর গড়ায়। ম্যাজিস্ট্রেট তো আমাকে বরখাস্ত করতেই চায়। আমি নেমকহারাম, গোপনে স্বদেশীদের সাহায্য করি, হেন রে, তেন রে। হেড কনস্টেবলও বলল, বাবু বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল। পরে বামুনিয়াচকের ডাক্তারও বলেছিল যে আমার সঙ্গে মহানাম দত্তের খুব ঘনিষ্ঠতা দেখেছে সে সময়ে।

—চাকরি তো যায় নি?

গোকুলেশ্বর কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর বলেন, ব্রিটিশ আমলে এমন কথায় কথায় কহ্‌কোতল ছিল না। অনিয়মের মধ্যেও নিয়ম ছিল। ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার ভালো রিপোর্টই এসেছিল। ফলে প্রোমোশান দেরিতে হয়, কিন্তু চাকরি যায়নি।

—আর কিছু বলবেন?

—তারপর সাইক্লোনের পর গেছি ওখানে। মন্বন্তরের সময়েও মেদিনীপুরেই। কাঁথি মহকুমায় খুব সুনাম পেয়েছিলাম মানুষের কাছে। রামনগরে একটা দোকানে পান খাচ্ছি, তা দোকানী পয়সা নিল না। বলল, আপনার নাম আমরা জানি। ও সব দিকে লোক উড়িয়া মেশানো কথা বলে, জানেন না বোধহয়। আমিও বলতাম।

—আর কিছু মনে পড়ে?

—পড়ে বই কি। চাকরি আমার যায় নি। কিন্তু মোহনবট থানার পাকা বাড়ি উঠেছিল। আর মৌরিপুরে মহানাম দত্তের, মানে আপনাদের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। মহানাম দত্ত জেলে গিয়েছিল।

—সেটা শুনেছি।

—এর পরেও উপসংহার আছে একটা। কিন্তু আজ থাকুক। আরেকদিন আসুন। অনেকদিন এত কথা বলি না। বলতে বলতে বেলাও হয়েছে···

—কবে আসব বলুন?

—ধরুন, আসছে বুধবার। কয়েকদিন একটু কাজ পড়ছে বাড়িতে। ওই যে মেয়ে···তার মেয়েকে কলেজে ভর্তি করবে। নাতনি এলে তাকে

নিয়ে দৌড় ঝাঁপ আছে। বাড়িতে আমি ছাড়া তো···

—ছেলে নেই ?

—সে তো বম্বেতে। চাকরি ছেড়ে রঙের দোকান করেছিলাম একটা। ভালই চলত। ছেলেও দেখল না···আমিও আর পারি না···বেচে দিলাম।

—আমি উঠি তাহলে ?

—হ্যাঁ। এর পরেও কথা আছে। কিন্তু কাকে বা বলি !

—আমাকে বলবেন।

—আপনার বাবাকে মনে পড়ছে না।

—যারা আপনাকে পাহারা দিত, ডিউটি বদল করত, তাদের মধ্যে ছোট ছেলে ছিল ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভেরো থেকে ষোল, তার চেয়েও বড়, সব তখন স্বেচ্ছাসৈনিক।

—ওদের মধ্যে বাবাও ছিলেন।

—ও ! বাড়ি টাড়ি ভাঙা পড়ার সময়ে ?

—বাবা আর ঠাকুমা অন্য বাড়ি চলে যান। বাবাও কোনদিন যান নি, আমারও যাওয়া হল না। অথচ আপনার কাছে শুনে···

—এখন তো যাওয়া আসা কিছুই নয়। চলে যাবেন একদিন।

—কোনো যোগসূত্র তো নেই।

—বুধবারই আসবেন।

—আসব।

অরণি ভাবতে ভাবতে ফেরে। কথাটা প্রসাদকে বলবে ? ওঁকে ক্যাসেটটা শোনাবে ? খুব, খুব আশ্চর্য দিনটা। আশ্চর্য ভালো লাগছে।

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কত যেন চেনা ওসব জায়গা কত যেন জানা।

বাবা কিছু বলেন নি।

বাবা কখনো যানও নি ফিরে। কেন যান নি ? অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পরবর্তী জীবনকে সত্য ও একমাত্র মনে করা। এ কি বাবাদের একটা মস্ত ভুল নয় ? নিজেকে জানার জন্যেও তো অতীতকে মনে রাখা দরকার।

চৌকো মুখ, শক্ত চোয়াল, ঘন ভুরু···গাংনা নদীর পাশে উলুঘাসের বন···সিঙ্কাই কালী বাড়ি···নৌকো জলছে দাউ দাউ করে···ছবির পর ছবি।

এ সবের মধ্যে অরুণি কোথায় নিজেকে মেলাবে ? সে তো গ্রহান্তরের জীব। তবু দেখ অতীতকে খুঁজে পাও যদি। তুমি তো ছিন্নমূল তুমি তো ভাসমান...দেখ কোথাও মাটি খুঁজে পাও কি না।

অরুণি ঠিক করে, ক্যাসেটটা কপি করে নেবে আরেকটা ক্যাসেটে।

তিন

প্রসাদ গভীর অভিনিবেশে ক্যাসেটটি শোনেন। তারপর বলেন, তুমি চলে যাবার পর আমার মনে হয়েছে, কম্যুনিস্ট পার্টির দু'দলের দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে পারো।

—কাদের সঙ্গে ?

—জয়ানন্দ প্রামাণিক। খুবই অসুস্থ থাকে। রাজনীতি আর করে না। করতেও পারে না। কিডনিতে কি সব হয়েছে। সে সময়ে যথেষ্ট কষ্ট সয়েছে, কাকদ্বীপে মাটি কামড়ে পড়েওছিল।

—আপনি একটু লিখে দেবেন ?

—দেব। তবে ওই ক্যাসেটটা শোনালেই সে বুঝবে সব। বলতে কি, সে ওখানে কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়েই গিয়েছিল, আর ক্রমে কৃষক সমিতিতে জড়িয়ে পড়ে। পার্টিরই কর্মী। তবে যতদূর জানি, ওখানে যাবার আগে সে কৃষক ফ্রন্টে কাজ করে নি।

—ওঁর চেহারার বর্ণনার মিলছে ?

লতিকা বলেন, একেবারে। কতুয়াটাও আমি বলে দিচ্ছি। বড় বাজারে একরকম ডোরাকাটা কাপড় পাওয়া যেত। সেটা দিয়ে কতুয়া এমন ভাবে করা হত, যে ডোরাগুলো পড়বে তেরছা হয়ে। তাতে কতুয়া নাকি শক্ত হত, টেকসই হত।

প্রসাদ বলেন, লতু ! এতকাল পরে কতুয়ার ডোরা মনে থাকা সম্ভব নয়। তুমি যড্ড বানাও।

লতিকা মোটেই চটেন না। বলেন, আমাকে বাঁচতে দিও না। একবার কেচে দিয়েছিলাম। তাতে ও আর বিপিন বলল, কেচে ফর্সা করেছেন, এখন মাটি মাখিয়ে ময়লা করুন। ফর্সা জামা পরে ঢুকলে সন্দেহ করবে।

—বিপিন কে ?

প্রসাদ বলেন, বিপিন গিরি। তোমার জ্যাঠার ওখানে নাম ছিল বটু।

—বিপিন কি আছেন ?

—না, সে তো গোড়ার দিকেই মারা যায়। মানে শেষ পর্যায়ের গোড়ার দিকে।

—মেরে ফেলে ?

—না, সাপে কেটেছিল। তখন ডাক্তার কমরেডরাও দূরে, পৌঁছনো যায় নি। কেটেওছিল ঘুমন্ত অবস্থায় গলায়। কিছু করা গেল না।

জয়ানন্দ প্রামাণিকের কাছেও যেতে পার...তবে সে তো থাকে রাণাঘাট —বানপুর লাইনে ময়নাডাঙা কলোনিতে। বাড়িতেই থাকে। নিতাই খাস্তগীর অবশ্যই বড় নেতা ছিলেন, এখনো সক্রিয়। অত্যন্ত ভালো লোক। তাঁর কাছেও যেতে পার।

—ময়নাডাঙাতেই যাই।

—গোকুলেশ্বর এর পরেও কি বলবেন। সেটা জানতে আমারও খুব কৌতূহল হচ্ছে হে। শোনো, সেই চিঠিটা জেরক্স করিয়ে রেখেছি তোমার জন্যেই। এটা সঙ্গে রাখো।

—অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

প্রসাদ ছোটছেলের মতো উত্তেজিত, যারা তাকে জানত তাদের পক্ষে হাতের লেখা চেনা তবু যা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনা খুব কম।

লতিকা বলেন, তখন তারা কি এ ওকে চিঠি লিখত ? তুমিই তো বলেছিলে যে খবর যেত মুখে মুখে। যদি বা লিখে থাকে, তারপর এত বছর বাদে বুড়ো বুড়ো লোকেরা কি সে লেখা চিনতে পারবে ? এ তুমি কি বলছ ?

—দেখুক না। যদি কোনো ভাবে তার খোঁজ পাওয়া যায়, বিভিন্ন লোকের স্মৃতি কথা থেকে, অরণি ! একটা বই ছাপতে হবে।

অরণি হাসে বলে, দেখা যাক।

নিতাই খাস্তগীর ছিয়াত্তর বছর বয়সেও বেজায় সক্রিয়। কৃষক সংগঠনের পুরনো লোক। এখন অবশ্য কলকাতা ছেড়ে খুব দূরে যেতে পারেন না। ছোট ঘর, দু'কামরার সি. আই. টি. ফ্ল্যাট। ঘর একেবারে গোছানো। মনে হল বাড়িতে স্ত্রীলোক থাকে না।

নিতাই বললেন, বাড়ি তো মেস হয়েছে এখন। হরদম লোক আসছে, থাকছে

—আপনি বেশ নীরোগ আছেন।

—প্রসাদ কি খুব বুড়িয়ে গেছে ?

—অপারেশন করালেন তো...

---কি হয়েছিল ?

যে কোন বৃদ্ধের মতোই নিতাই চেনাজানা লোকদের রোগ বিষয়ে কৌতূহলী।

—প্রসটেট।

—বরাবরই রোগা পাতলা। আমি হলাম আত্মিক মানুষ। মানে সুন্দরবনের আর সব জেলার জল খেয়ে আমাশা যে ধরেছিল আর ছাড়ে নি। তবে আমি হচ্ছি 'নো সারেণ্ডার' ম্যান। কাঁচা বেল, পাকা বেল, তাত পাতে বেল সেদ্ধ, বেলের মোরব্বা আর থানকুনি পাতার রস দিয়ে আমাশাকে জব্দ রেখেছি।

—ক্যাসেটটা শুনুন।

—কতক্ষণ চলবে ?

—দু'পিঠেই আছে।

—মুখে বলো না।

...মহানাম দত্তের খোঁজ করছি।...তিনি আমার জ্যাঠামশাই।

—টেক নেম বলো।

—বটু।

—ও ! বটু ! সে তো দধিমঙ্গলে লাঠি খায়। মাথায় লেগেছিল। মারা যায় নি ?

—মৃত বলে কেউ বলছে না।

—অ্যাবস্কনডিং লিস্টে ছিল না।

—নিখোঁজ।

—আমি কি তেমন কিছু বলতে পারব ? দধিমঙ্গল বড় ভিতরে। বহু খাল পেরিয়ে যেতে হত। দেখেছিও মাত্র একবার...

—ক্যাসেটটা অন্ করব ?

—করতে পারো।

—দেখ, কাকদ্বীপে বা বলতে পারো সুন্দরবনেই তেভাগা নিয়ে, মানে স্বাধীনতার পরবর্তী জংগী ব্যাপারটা নিয়ে ও লাইনটাকেই ভুল বলা হয়।

—ওগুলো আমি দেখেছি।

---তিরিশের দশকেই পার্টির কিষাণসভা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষক ও ভাগচাষীর মূল দাবীর ভিত্তিতে লড়াই শুরু করে। মানে ..ভিত একটা ছিলই। সুন্দরবনে লাটদার...চাকদার...সব জমিদারী কাছারিতে বেআইনী

জুলুম ও আদায় খুব চলত।

—জানি। আনি-সুনি-কড়ানি-হিসাবানা...

—হ্যাঁ, যে একশো রকম।

—ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ থেকেই তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। অবশ্য, শুধু ওখানেই নয়, অন্যত্রও।

নিতাই খাস্তগীর নিজেকে অতীত থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছেন। যথেষ্ট নির্মোহ তাঁর গলা। অথচ এক সময়ে উনি হেঁটেছেন গ্রাম হতে গ্রামে, বিরাম সামন্তের কাছে কাজ করার সময়ে তা দেখেছিল অরুণি।

সে সময়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত থেকে 'নিজ ধান নিজ খামারে তোলো' আওয়াজ উনিও দিয়েছেন। কৃষকসভা ধান বিলি করেছে।

অথচ এখন এই সৎ, নির্লোভ ও বিবেকী মানুষটি এমন গলায় কথা বলছেন, যেন সে অতীত আজ আর তাঁর কাছে এমন ব্যাপার নয়, যে বলতে গেলে গলায় আবেগ আসবে।

—নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন যায়। তবে আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ অবধি তেভাগার দাবীই জোরদার থাকে। উনপঞ্চাশ সালেই কিন্তু কৃষকরা জমির মালিকানা দাবী করে। সে সময়েই আন্দোলন জংগী হয়।

—পার্টি নীতিতে?

—হ্যাঁ। ভ্রান্ত নীতিতে।

—বটু সম্পর্কে কি মনে পড়ে?

—সে ছিল ওখানে···জানো···দধিমঙ্গল খুব ভিতরে। সেখানে ছিল সাঁওতাল ভাগচাষী অনেক। মন্বন্তরের পরও বেশ কিছু এদিক সেদিক থেকে আসে। বটু সেখান থেকেই ওই জয়ানন্দ, অমর, ওদের সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করত।

—দেখেছেন?

—হ্যাঁ...রিপোর্ট দিতে আসত।

—চেহারা মনে পড়ে?

—ওখানে থেকে থেকে ও ওখানকার লোকই হয়ে গিয়েছিল। ওদের মতই চেহারা।

—কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না?

—মনে পড়ছে না।

—কোনো ঘটনা মনে পড়ে ?

—দধিমঙ্গল খুব ভিতরে বলে সেখানে কাছারির লোকজন, মানে কাছারি জ্বালিয়ে দেবার পর সেখানে জমিদারের লেঠেল বা পুলিশ ঢোকে নিশ্চয়ই কিছুকাল।

—পরে ঢুকল ?

—হ্যাঁ। শেষ পর্যায়ে।

—কি ঘটনা মনে পড়ে ?

—বিপিন আর বটু এল বিকেলে। আমি তখন গণেশ বেরার বাড়িতে। খুব ভালো কর্মী ছিল গণেশ। গণেশ মারা যায় জেলেই।... তা বটু আর বিপিন এল। বলল, কাছারি জ্বালিয়ে দিয়েছি গোমস্তার বউ পরিবার আগেই পালিয়েছিল। গোমস্তাটাকে রাখা গেল না।

—তার মানে ?

—মেরে ফেলেছে।

—আপনি কি বললেন ?

—আমি তো পরদিন ফিরে যাব কলকাতা। ওদের জয়ানন্দর কাছে পাঠালাম। গণেশ ওকে থাকতে বলল, কিন্তু ও বলল, ফিরেই যাবে। ভাত খায়নি, মনে পড়ছে।

—আর দেখা হয় নি ?

—না। বিপিন তো অসুখে...

—না, সাপে কেটে মারা যান।

—তাই হবে। তা তারপর তো লড়াইও জংগী হল, ক্ষেত্রও সংকুচিত হল, শেষ অবধি দধিমঙ্গল অবধি পুলিশ আর জমিদারের ঠ্যাঙাড়েরা পৌঁছয়। সেটা যে ঠিক কি ভাবে হয়, মানে তারপর কি হয় আমার সঠিক জানা নেই।

—আর কিছু বলতে পারেন না ?

—না। আমরাও তো সব গা ঢাকা দিয়ে আছি। তখন পার্টি বেআইনী, নয় ?

—আর কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ। আমরা কিন্তু অপারেশন বর্গা কার্যকরী করে ভাগচাষীদের ভাগ্য সুনিশ্চিত করেছি। ক্ষেতমজুর বা দিনমজুরের মজুরি বাড়িয়েছি। এগুলোও বারবার জানা এবং জানানো দরকার।

—সব ঠিক মতো ইমপ্লিমেণ্ট হচ্ছে ?

—সব কি আর হয় ? লক্ষ লক্ষ লোকের ব্যাপার। সকলকে খুশি করা যায় না।

—ওখানকার লোকজনের সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ আছে ?

—যারা আমাদের রাজনীতি করে, তারা তো স্থানীয় আপিসের সঙ্গেই যুক্ত আছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে...

—তেভাগার সময়ে যে সব কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর লড়াই করে...

—আমি ঠিক বলতে পারব না।

নিতাই ঘড়ি দেখেন।

এখন আমার কাজ আছে, জানলে ?

—আচ্ছা ..অনেক ধন্যবাদ।

—দেখ, আমার তো মনে হয় খোঁজ করে কোনো লাভ হবে না। এসব ঘেঁটে লাভই বা কি ! যারা কাজ করে, তারাই বেঁচে থাকে।

নিতাই খাস্তগীর চশমা খোলেন, মোছেন, আবার পরেন বলেন, কি হবে !

—দেখি। যদি খোঁজ পাই !

—আচ্ছা।

'আচ্ছা' বলেই সাক্ষাৎকারটি কেটে দেন উনি। বলেন না 'আবার এসো' ওঁর জীবন প্রবহমান থেকেছে। শেষ হয়ে যায়নি রক্তাক্ত কাকদ্বীপে। এখন উনি বহু ব্যাপারে পরামর্শদাতা, কমিটি মেম্বার। সভাসমিতি হরদম করে থাকেন। জীবনে আগ্রহ খুব সজীব। অরণি উঠে পড়ে।

—প্রসাদকে বোলো ওর সংগ্রহগুলোর কোনো ব্যবস্থা করতে। দরকার।

—বলব।

—কেন যে করছে না।

—বলব।

অরণি বুঝতে পারে, ওর নিজস্ব অস্থিরতা অনেক কেটে যাচ্ছে। ভালবেসেও যে মেয়েটি সতত অস্থির, সেই বর্ষা এখন আর তাকে অশান্ত, উৎক্ষিপ্ত করে দিতে পারে না।

ওর মা বলেন, দেখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হয়তো হবে। দুজনেই পৌঁছবে কোনো সহাবস্থান বিন্দুতে। এটা

প্রথম থেকে হলে হয়তো জীবনের খানিকটা সময় অপচয় হত না।

ভেবে লাভ নেই। বাস্তবকে মেনে নেয়াই ভালো। বর্ষা এখন তাকে আগের মতো অশান্ত করতে পারে না, এটাও যেন একটা ক্ষতির ব্যাপার। বর্ষা মহানাম দত্তের ব্যাপারে অরুণির ছোটাছুটিটা আগে পছন্দ করেনি।

কাল বলল, তুমি ম্যান হান্ট করছ। সত্যি, কি ভীষণ ইন্টারেসটিং থিং স্টোরি হবে তো?

—হয়তো কোনো স্টোরিই হবে না।

—যাঃ, তা কোর না।

এ কথা বলেই বর্ষা উল বুনতে শুরু করেছিল। ও শুনেছে, উল বুনতে থাকলে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মনঃসংযোগের ক্ষমতা আসে। ফলে ও উল বুনছে। বহু প্যাটার্ন বহু মাপের কাঁটা, বহু রঙের উলের প্যাকেট এখন বাড়ির সর্বত্র।

—প্রথমে হাতে বুনব, তারপর মেশিনে।

—বেশ তো!

কই, তুমি তো ভীষণ খুশি হচ্ছ না?

—তোমার বোনা জামা আগে পরি!

—পরাব, পরাব, দেখো।

—ক্যাসেটটি শুনতে বর্ষা আগ্রহী হয় না। অরুণির মা কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে অভিভূত হন। দুটি হাত কোলে জড়ো করে বসে তিনি বারবার শোনেন। অত্যন্ত অভিভূত গলায় বলেন, জানি না, কিছুই জানি না।

—কেমন ভালো লাগে, তাই না?

—খুব, খু···ব।

—মনে হয় আরো জানা যাবে।

—তুই এটা খুব ভালো কাজ করছিস।

ওঁর গলাটা একটু কেঁপে যায়। বলেন, যদি খোঁজ পাস, তবে কি লিখবি?

—দেখি, ভাবিনি।

—লিখলে দাদাকে একটা কপি পাঠাস।

—পাঠাব।

—তোর বাবা থাকলে আজ···

—খুশি হতেন, জানি।

—কে বা আছে আমাদের, কাকে বা আনন্দ করে জানাব যে তুই তাঁর খোঁজ করছিস?

—কেন মা, আমি, তুমি জানব।

রানাঘাট থেকে বানপুরের ট্রেন ধরো। কয়লার এঞ্জিন, এই শতাব্দীর চেয়েও বুড়ো রেলগাড়িটি জনগণহিতার্থে রাখা হয়েছে। যে কোনো জায়গায় ভ্যাকুয়াম এগজস্ট খুলে বাষ্প বের করে ট্রেন থামাও। কয়লা চুরি করো, অথবা ট্রেন থেকে নামা-ওঠা যা হয় করো।

জনগণহিতার্থে এ রেলপথ। বাংলাদেশ থেকে কতজন এ ট্রেনে আসে সকালে, কতকাতায় ভিক্ষা করে ফিরে যায় আবার।

স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে লাফিয়ে নামো। প্ল্যাটফর্ম নেই। গামছাবিক্রেতা ছেলেটি বলল, ফেরার কালে ওই চায়ের দোকানে টিকিট নেবেন দাদা।

ট্রেনের টিকিট আলাদা বেচা কেনা হয়? অরণির গন্তব্য ময়নাডাঙা। কার বাড়ি যাবেন, কেন এসেছেন, এ কথার জবাব বারবার দিতে হয়। 'জয়ানন্দ প্রামাণিক' বললেও কম লোকই বোঝে। একজন বয়স্ক লোক বলে, আরে! ধীরেন বাবুর কাকা! যান, চলে যান।

—কোন পথে?

—ওই যে রাস্তা। না ইঁটের খোয়ান, না পিচের রাস্তা করল। বর্ষায় সব এক হাঁটু কাদা। এদিকে শোনেন উন্নয়ন হচ্ছে!

পকায়েতী পথ ধরে চলতে চলতে অরণি বোঝে, কলকাতা এখান থেকে অনেক হাজার মাইল দূরে। সর্বত্র কৃষিক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম।

ময়নাডাঙা অবশ্য বড় গ্রাম। হাইস্কুল একটি, প্রাথমিক দুটি। এখানে হাটে আসে কুমড়ো, বেগুন, শাকসবজি। এ বছর বারবার অতিবর্ষণে সব হেজেমজে গেছে। পথে আসতে গামছা বিক্রেতা ছেলেটি খবরাখবর দিচ্ছিল।

—তরকারির তো খুব দাম কলকাতায়।

—কিনতে দাম আপনাদের। পাইকার তো দাম দেয় না চাষীকে। আড়ংঘাটা বা রানাঘাটে যে নেবে, না পথ, ট্রেনের তো এই বেহাল অবস্থা।

ময়নাডাঙা অবশ্যই বড় গ্রাম। হাইস্কুলটি পাকা। পাকা দোকানঘর, কিছু বাড়ি। জানা যায়, ধীরেন প্রামাণিক স্কুলের হেডমাস্টার। ওঁর

দুই ভাই কলকাতা ও বর্ধমানে চাকুরিজীবী।

'প্রামাণিক ভবন' বাড়িটা দোতলা, তবে নিচু দোতলা। বেশ খানিকটা ও'চলাপড়া জমি সামনে। বাড়ির পিছনে নারকেল গাছ কয়েকটি। একটি বালিকা দরজা খুলে দেয়, অরণি ডাকে। ও'র নাম বলে।

—দাদুর কাছে এসেছেন ?

— তোমার দাদু হন ?

—হ্যাঁ তো।

— উনি ঘুমোচ্ছেন না তো ?

—না, দাদু দুপুরে ঘুমোয় না।

জয়ানন্দ প্রামাণিকের ঘরটি বেশ বড়। পরিষ্কার বিছানা পাতা খাট, আমকাঠের আলমারিতে কিছু বই। ছোট টেবিল, চেয়ার, মোড়া। ঘরে অনেক ফোটো বাঁধানো। অরণি চিনতে পারে কয়েকজনকে, সকলকে নয়।

জয়ানন্দ রোগাটে মানুষ। চেহারা দেখে বয়স ধরা কঠিন। বিছানায় পাতা মাদুরে বসে অত্যন্ত মোটা চশমা পরে উনি কাগজ পড়ছিলেন।

অরণি নিজের পরিচয় দেয়।

—কলকাতা থেকে আসছেন ? আমার কাছে ?

চশমা খোলেন উনি, নিমেষে মুখটি অসহায় দেখায়, কলকাতা থেকে আমার কাছে তো কেউ আসে না ?

চশমাটি মুখে নিয়ে পরেন আবার। বলেন, কাছে আসুন। দেখতে বড় অসুবিধে, জানলেন ? এবারে ছানিটা কাটালে হয়তো একটু ভাল দেখব। তবে ছানি তো না পাকলে কাটা যাবে না।

—আর কোনো কষ্ট আছে ?

—আর এই হাঁপানি। ভালো আছি তো আছি। হলে বড় কষ্ট।

নিশ্বাস নেবার ধরণেই বোঝা যায় পুরানো হাঁপানি রোগী।

—চিকিৎসা করান তো ?

—সে আর বলতে হবে না। ধীরেন আর তার বউ থাকতে আমার সেবাযত্নে কোন ত্রুটি হবার নয়। আশ্চর্য ! ধীরেন ভাইদের মধ্যে ছোট। ও আমাকে ছোটবেলায় দেখেই নি বলতে গেলে।

– এখানে কতদিন আছেন ?

– তা অনেক কাল হল। কলকাতায়···সেও অনেক বছর হল, কলকাতায় একটা সরকারী ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছিল···কলকাতায় থাকলেই

হাঁপানিটা ঘন ঘন হয়। বীরেন আর ওর দাদারা জোর করে নিয়ে এল। এখানে কিন্তু ভালই থাকি।

—বয়স কত হল ?

—রুশবিপ্লবের চেয়ে এক বছর বয়স বেশি, অর্থাৎ উনিশ শো সতেরো। তাহলে হিসেব করুন।

—আটষট্টি চলছে। যাক গে, বলুন কেন এসেছেন। আপনি তো আমার কাছে কোনো দরকারেই এসেছেন! না না, সংকুচিত হবেন না। দরকার না পড়লে কে কার কাছে যায় আজকাল। আমাদের সময়ের লোকজনের কাছে এখনকার কেউ···

—সাক্ষাৎকার নিতে আসে না ?

—সে সব অনেককাল আগে আসত। যখন আমি 'খবর' ছিলাম। জেল থেকে বেরোবার পর আসত। আবার আমি মরে গেলে, ছোট অথবা মাঝারি কোনো খবর বেরোবে। পার্টি তো বহুকাল ভাগাভাগি। ফলে ছোট খবরই বেরোবে। জীবনী যা বেরোবে, যদি বেরোয়, সেও বা কি লিখবে কে জানে। না না, আমার কোনো তিক্ততা নেই। তবু যে আপনি এসেছেন, কোনো দরকারেই এসেছেন, এতে আমি খুশি হয়েছি।

—শুভময়বাবু, প্রসাদবাবু। সবাই আপনার কাছে আসতে বললেন।

—শুভময় ! প্রসাদ ! ওরা আছে কেমন ?

—শুভময়বাবু ভালই আছেন।

—মোটা হচ্ছে তো ?

—তা হচ্ছেন।

—ভয়ানক খায় যে।

—প্রসাদবাবুর প্রস্টেট অপারেশন হল।

—বড় রোগা চিরকাল। তবু সতিকা আছে, দেখে। সতিকা আছে তো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে।

—ভালো, খুব ভালো। কলকাতায় থাকতে দেখা হত। এখানে আসার পর···

—নিতাই ধাত্তগীরের কাছেও গিয়েছিলাম সেদিন। তিনিও আপনার কথা বললেন।

—নিতাইদা খুব অ্যাকটিভ।

—হ্যাঁ, এখনো।

—এবার বলুন।

—আমি সুনাম দত্তের ছেলে। আমার জ্যাঠামশাই, মহানাম দত্তের কথা আপনার কাছে শুনতে চাই। তার আগে, একটা ক্যাসেট শুনুন।

—বটু! তুমি বটুর ভাইপো?

জয়ানন্দ অত্যন্ত অবাক হন। তারপর স্বগতোক্তি করেন, বটু···বিপিন ···মাতলা সরেন···তুমি, তুমি আমার কাছে এগিয়ে আসবে? আমি তো ভাল দেখি না। মানে দূরের জিনিস।

অরণি এগিয়ে যায়, ঝুঁকে দাঁড়ায়।

—কাগজের হেডলাইন পড়তে পারি কাছে ধরে·· না, তোমার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বটু···বটু···কতকাল পরে···তোমার বাবা?

—মারা গেলেন।

—কোথায় ক্যাসেট?

—বাজাব?

—দাঁড়াও। আগে একটু চা খাও। মিলি! মিলি কোথায়?

—এই তো।

—এটি ভাইঝির মেয়ে। তোর দিদিমাকে ডাক দেখি একটু। কি করছে?

—গুল দিচ্ছে।

দিদিমা হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তরুণী এক মহিলা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঢোকেন। অরণিকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকান।

—মীরা!

—হ্যাঁ ছোটকাকা?

—বটুর ভাইপো, বুঝলে তো?

—ইনি?

—হ্যাঁ। কাজে এসেছে। একটু চা করো। আর শোনো, ধীরেন কি ইনহেলারটা আজ আনবে? তোমায় বলেছে?

—দোকানে তো বলেছে আজই পাওয়া যাবে। আজ তো পেতেই হবে। ওঁর সঙ্গে কথা বললেই আপনি উত্তেজিত হবেন···ছোটকাকাকে বেশি বকাবেন না।

হেসে চলে যান মহিলা। জয়ানন্দ বলেন, আরো কথা আছে.

তোমার ক্যাসেট কতক্ষণ চলবে ?

—প্রায় দু'ঘণ্টা।

—ব্যাটারি আছে তো ? আলো আমাদের আছে, তবে কারেন্ট থাকে না বললে হয়।

—আছে।

—যুক্তির কথা শোনো। ওই ক্যাসেট শুনব। আমার কথা টেপ করবে···এখনি তো আড়াইটা বাজে···সন্ধ্যার পর যেতে পারবে না।

ট্রেন নেই ?

ভয়ানক খারাপ পথঘাট। লাইনটা দিনেই ভালো নয়। সন্ধ্যের পর একেবারে খারাপ। রাতে যদি থেকে যেতে হয়, অসুবিধে হবে ?

অরণি কি বলতে যায়। জয়ানন্দ আঙুল তোলেন, না হে ! এটা আবেগ ভরে বলছি না। যেটা ঘটনা তাই বলছি। ফিরতে হলে চারটে দশের ট্রেনই ধরতে হবে। ওই রেকর্ডারটার দাম কত, তা জানি না। তবে ওর চেয়ে অনেক কম দামের জিনিসের জন্যে এ লাইনে খুন হয়। খুন করতে পারে, ঠেলে ফেলে দিতে পারে।

জয়ানন্দ যথেষ্ট কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলেন। বোঝা যায় ইনি সেই জয়ানন্দ, ওরফে নন্দ, যিনি, বহিরাগত কর্মীদের পথ ঘাট, চলাফেরা, পানীয় জল কোথায় আছে বা নেই, কোথায় আশ্রয় নেয়া চলে, কোন জায়গা সন্দেহজনক, সব কথা ত্রিজ করতেন।

—হ্যাঁ থাকব না কেন ? কোনো অসুবিধে নেই। আপনাদের অসুবিধে না হলে···

—প্রথমত, গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে ওটাকে অসুবিধে মনে করে না। কৃষক বা ভাগচাষীও তো মনে করত না। সে সময়ে···কাকদ্বীপে···আর ধীরেন তো শিক্ষক সংগঠনে আছে। অন্য জায়গা থেকে লোক আসেও, থাকেও। মীরা খুব অভ্যস্ত।

মীরা ঢোকেন চা ও খাবার সাজিয়ে নিয়ে। জয়ানন্দ শুধু চা খান, তাও দুধ ছাড়া। অরণির জন্যে মুড়ি, কটকটে করে ভাজা ঠাণ্ডা ওমলেট, পানতুয়া। জয়ানন্দ বলেন, ময়নাডাঙার কালো জাম বেশ নাম করা। এখন অবশ্য মাপে ছোট হচ্ছে।

মীরা বলেন, সব জায়গায়।

—মিলিকে দিলে না ?

—না, ওর পেটটা ভালো নেই।

—শোনো মীরা, এ রাতে থাকবে।

—বেশ তো! তবে কষ্ট হবে কিন্তু। এখানে তো হট বলতে কিছু মেলে না। বাজার বসে সকালে একবার। এবারে মাছের বড় আকাল।

জয়ানন্দ বলেন, সর্বত্র, সর্বত্র! মাছের দেশ সুন্দরবনে এক সময়ে কত মাছ দেখেছি। এখন গিয়ে দেখ, মাছ নেইও তেমন, আর থাকলেও গ্রামের মানুষ তা ধরলে পরে হাত পুড়ে যাবে।

মীরা এসব কথা অনেকবার শুনেছেন। তিনি একটু হেসে কাজে চলে যান।

—মেয়ে একটা···ছেলেরা পরে হল। সব স্কুলে পড়ছে···

—এখানেই?

—হ্যাঁ, আর কোথায় যাবে?

—নাও, তোমার রেকর্ডার চালাও।

গোকুলেশ্বর রায়ের গলা। জয়ানন্দ গভীরতম অভিনিবেশে শোনেন।

ক্রমে ঘরের রোদে বিকেলের রং লাগে। জানলার বাইরে ঝাঁপালো সতেজ সর্বজয়া গাছে হলুদ ফুলগুলি আরো উজ্জ্বল দেখায়। ঘাসপালার গন্ধ। বাড়ির ভিতরে টিউবওয়েলে জল তোলার শব্দ। রাস্তায় কোন দোকান থেকে ফুটবল খেলার রিলে রেডিওতে শোনা যায়।

জয়ানন্দ চোখ বুজে ভুরুকুঁচকে বসে শোনেন। পরিষ্কার বিছানা, বালিশের ওয়াড়ে তোয়ালে। পরিষ্কার লুঙ্গি ও বড় হাতা ঢোলা গেঞ্জিও পরনে। দেয়াল থেকে জীবিত ও মৃত নেতা ও সহকর্মীরা চেয়ে থাকেন। বাতাস নেই, ভ্যাপসা গরমও নেই। নারকেল গাছ, পুকুর, ছোট বড় গাছ, এ সবে কোনো শান্তি আছে। কিংবা নেই।

তবু এ ঘরে বসে তার ভালো লাগছে।

খুব ভালো করে শুনে নেন জয়ানন্দ। নিতাই খাস্তগীরের কথাগুলি শুনে ঠোঁটে হাসি খেলা করে। তারপর বলেন, একটু বাইরে হয়ে আসি। তারপর রেকর্ড করো। আমি যতটা যা জানি, নিশ্চয় বলব।

চার

জয়ানন্দের ভাইপো বাড়ি পৌঁছে গিয়ে থাকবেন। কেন না জয়ানন্দ হাত মুখ ধুয়ে, হাতকাটা পাঞ্জাবি পরে হাতে নতুন ইনহেলার নিয়ে ঢোকেন।

বলেন, অন করো।

—করেছি।

—তেতাল্লিশ শেষ হয়ে গেছে। শেষাশেষি বা চুয়াল্লিশের গোড়ায় আমি সুন্দরবন অঞ্চলে রিলিফের কাজ করতে যাই। সঙ্গতি খুব কম, সম্বলও কম। চেয়ে চিন্তে কাজ করি। মন্বন্তরের আগেই সাইক্লোনে সব ভেসে গেছল। সে সময়ে সব জোতদারই বলে, মজুতে আছে কি, যে বের করবে? মানুষ তখন খুব মার খেয়ে গেছে, জানলে? কলকাতার পথে মানুষ মরছে···তবু কিছু মিশন দিচ্ছে, কিছু রেডক্রশও দিচ্ছে···সরকারী অফিসাররাও একেবারে হাত গুটিয়ে নেই···তা আমি তখন চরজাজিমে আছি···এর মধ্যে বিপিন গিরি নিয়ে এল মহানাম ওস্তকে। বেশ মনে আছে···সে সময়ে বিকেলে হা ক্লান্ত হয়ে বসে আছি, ওরা এল।

—জেলে গিছলেন না?

—গিয়েছিল। স্বাস্থ্যের কারণে ছাড়া পেয়ে যায়। ও নিজেই বলল, দেশে ফিরে দেখলাম দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। আর মৌশিপুরের হাল এমন, যে মানুষ ধুঁকছে। ওখানে থেকে যে কাজ করব, তা আমাকে তো ধরে নিয়ে যাবে আবার।

—মেদিনীপুর জেলেই ছিলেন?

—তাই শুনেছি। বলল যে মা তো মারাই গেছেন। মামাবাড়ি থেকে ভাইকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম। শশীবাবুর প্রেসে থাকল, পেটটা চলে যাবে···লেখাপড়া পারলে করবে···আমি নৌকো ধরে চলে এলাম।

—বিপিন সঙ্গে?

—হ্যাঁ, মেদিনীপুরের লোক তো কাকদ্বীপ সুন্দরবনে অগণন তখন। বিপিন না কি ওর দেশের কি চেনাজানা।

—বিপিন কি ভাগচাষী?

—না, মানে দু'পাঁচ বিঘা ওর ছিল। তাতে তো চলত না, ভাগেও করত।

—তারপর?

—বেয়াল্লিশের আন্দোলন করেছিল। জেলেও গেল, আবার আমাদের কাছেও আসছে···সে সব কথা আমি শুধোলাম। মানে, আমি তো ওকে পাকা কংগ্রেসী বলে ধরে নিয়েছি। আর এটাও জানছি যে আমরা যুদ্ধ

সমর্থন করেছি বলে ওরা আমাদেরকে বিশ্বাস করে না, আমরাও ওদেরকে বিশ্বাস করব না,। তাতেই !

— উনি কি বললেন ?

—বলল, সব খুলে মেলেই বলল। ও আগে থেকেই স্বেচ্ছাসৈনিক ···হ্যাঁ···ওই কথাটা ব্যবহার করেছিল বলে আমায় চমকে দিয়েছিল··· স্বেচ্ছাসেবক নয়···স্বেচ্ছাসৈনিক দল করে ধরো গ্রামসেবা···সমাজসেবা··· নাইটস্কুল···মড়া পোড়ানো···রোগীর সেবা···এ সব করছিল।

—অনেকদিন ?

—মনে তো হয়। তারপর বেয়াল্লিশের ওই প্রচণ্ড জোয়ার···তাতে ভেসেই গিয়েছিল···বেশ নেতৃত্ব দিয়েছিল···

—তারপর ?

—জেল ফেরত এসে দেখে প্রচণ্ড অত্যাচার, সাইক্লোন, নানাভাবে মার খেয়ে মানুষ বেশ কাবু। আর যে সব জমিদাররা তখন ওদেরকে সমর্থন করেছিল, তারাও আর ঝামেলা চায় না। বলল, রাজনীতিতে আমি এখনো অদীক্ষিতই বলতে পারেন। আপনারা কি রাজনীতি করেন তা বুঝে জেনে তবে আসব। তবে শুনেছি যে ত্রাণ ও সেবার কাজ করছেন। সেইজন্যে ছুটে এসেছি।

—আপনি বিশ্বাস করলেন ?

—আমার তখন কর্মী দরকার। ভাবলাম যে কাজের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাবে, জানা যাবে। তা কাজের দিকে সে অক্লান্ত কর্মীই ছিল।

—সেই থেকে উনি থেকে যান ?

—হ্যাঁ। আরেকটা কথা বলা দরকার মহানাম প্রথমেই বলেছিল, আপনারা আমাকে অন্য কোনো নামে ডাকবেন। মহানাম দত্ত নামটা পুলিশ জানে।

—নিজেই বললেন ?

—হ্যাঁ। তা আমি তার নাম দিলাম বটু। এটা খুব মজার ব্যাপার। তেভাগার জংগী লড়াই কালে মিটিং করে সকলের টেক নেম ঠিক হয়। ওর নাম বটুই থেকে যায়।

—তাতে অসুবিধে হয় নি ?

—না, সে তো ও মিটিঙে ছিল না। যারা বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দেবে, বা বেশি করে মানুষের মধ্যে ঘুরবে, তাদেরই নাম দেয়া হয়। বিপিন,

মাতলা সরেন, বটু, এরা সবাই কর্মীই ছিল। বটু কর্মী হয়েই থেকে যেতে চেয়েছিল।

—তারপর কি হয়?

—রিলিফ দিয়ে সত্যিকারের সাহায্য করতে হয়তো আমরা বেশি দিন পারিনি। কিন্তু ওই সঙ্গেই কৃষক সমিতি সংগঠন করার কথাটা এসে গেল। কেননা, ওই যে দুর্গতির সময়ে কাছে গেছি···পাশে দাঁড়িয়েছি···তাতেই ওখানকার গরিবরা আমাদেরকে আপনজন বলে ভাবতে শুরু করে দিল।

—সংগঠন হতে থাকল?

—হ্যাঁ। অবশ্যই পার্টির নির্দেশে।

—তাই শুনেছি।

—বটু কিন্তু তার স্বনির্বাচিত কর্মক্ষেত্র ওই দধিমঙ্গল, তার আশপাশের ভেথরা, বিবিগঞ্জ, ও সব জায়গাতেই থেকে গেল।

—সদস্য হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষকসভার সদস্য, সবাই ওকে বিপিনের ভাই বলে জানত, বিপিনের ঘরে থাকত। আমরা যেমন যা বলতাম, ঠিক তাই করত। দুর্ভাগ্য কালে এটা দেখেছি যে ও যেখানে ছিল···মানে ওটা ছিল কলকাতার মাখন বিবেদীদের লাটের মধ্যে। সে লাট আবার ভিন্ন ভিন্ন চাকদারের··· ওখানে ননী সাঁতরার কাছারি ছিল···

—ঘটনা কিছু বলুন

—একটা সময়ে···যখন ভেভাগার প্রশ্ন চলে এল, মানে আমরা ভেভাগার ডাক দিচ্ছি···সে সময়ে ঘুরে ঘুরে জনসভা হচ্ছে, তো দধিমঙ্গল এলাকা তো খুব ভিতরে, আমি বিবিগঞ্জেও গেছি। যেতে বটু অয়নকে খালের পাড়েই ধরেছে।

—আপনি একা ছিলেন?

—না, আরো দুজনা ছিল। তা আমি বলছি, বটু! তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না। একেবারে ওদের মতো হয়ে গেছ। তা হেসে বলছে, বিপিন এখন কতদিন সদা ব্যস্ত। তার জমি তো চষতে হচ্ছে। হাতে করে চষছি দাদা।

—চাষ করছিলেন?

—চাষও করেছে, মাছও ধরেছে, আবার মাতলাদের সঙ্গে শিকারও করেছে···ও যে অন্য ঘরের ছেলে তা কেউ বলবে না। তাতেই বেশ একটা

ভিস্তি করে ফেলেছে, তা পরে দেখলাম।

—বলুন!

—বলি, একটু ইনহেলার টানি...বেশি কথা বললে এমনটা.. যাক, তুমি ভেবো না। পার্টি অনেক চিকিৎসা করিয়েছে...চিকিৎসায় কি হাঁপানি সারে? ওই কমিয়ে রাখা...তবে বর্তমানে হোমিওপ্যাথি করে অনেক ভালো আছি।

—হ্যাঁ, বিশ্রাম নিন খানিক।

—না, তেমন নয়। তেমন হলে আমি নিজেই কথা বলা থামিয়ে দেব। ভেবো না। একটু চা খাবে?

—খেলে হত। একটু বাথরুমে যাব।

—ওই বাগানে যাও। মিলি!

মীরা ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে যান। বলেন, কি, চা চাই?

—একটু।

—ঠিক সন্ধেটা লেগেছে। ছেড়ে যাক?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ধীরেন কোথায়?

—মানা করলাম, তাও মিলিকে নিয়ে বাজারে গেল। বলছে, মাঝে মাঝে বিকেলে বিলের মাছ আসে। পেলে আনবে।

—দরকার ছিল না। ছেলেরা?

—ওরা তো ফুটবল ঠেঙিয়ে তবে আসবে।

—খেলুক, খেলুক। তোমার মেজ ভাসুর খুব ভালো খেলত স্কুলে থাকতে।

অরণি ঘরে ঢোকে। মীরা বলে, বাইরে যেতে টর্চ নেবেন। বলা তো যায় না। পোকামাকড়...আমি চা করে আনছি।

জয়ানন্দ বলেন, একটা কাজের মেয়ে আসে বটে। তবে সে দুপুরে ভাত নিয়ে চলে যায়। সবই সেরে দিয়ে যায়। এ বেলা কোন তেমন কাজ থাকে না। রান্না বান্না, সব মীরা সেরে রাখে।

—আমার জন্যে খানিক কাজ বাড়ল।

—এমন তো হয়ই।

—বলুন।

—তা আমাকে খালপাড়ে নামিয়ে নিল। বলছে, গোমস্তাটা টাউনে যাবে। যেয়ে নিক। আপনি কাল মিটিং করবেন। আমি বলছি, আজ

হাট ছিল, কাল লোক হবে ? ও বলছে, হবে হবে। সে আপনি ভাববেন না। কথাটা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু যে যেখানে আছে, সে তো বুঝে জেনেই বলবে। তাতেই কিছু বলছি না। তা ও কি করল জানো ?

—কি ?

—বলল, আপনাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব। সে কিছুতে মানবে না। আমাকে তুলে নিল কাঁধে। দেহে শক্তিও ছিল।

—পরদিন মিটিং হল ?

—সেটাই আশ্চর্য। অত ভিতর পানে গ্রাম! হাটের জিনিসও অর্ধেক আসে খাল বেয়ে। কি সরু সরু সব খাল। তা সত্ত্বেও অনেক লোক হয়েছিল। আমি বললাম তুমিও বলো।

—বললেন ?

—দিব্যি বলল। তারপর আমাকে নৌকোয় আগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে, দাদা! আপনার শিক্ষাই আসল শিক্ষা। মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বলেছিলেন, তাই পড়ে থেকেছি বলেই মানুষ বিশ্বাস করছে। দাদা! আগে তো এদের মধ্যে থাকিনি, এদের জীবনটা বুঝিনি।

—ততদিনে আপনি ওঁকে বিশ্বাস করছেন ?

—অনেকদিন ধরেই। তা আমি ওকে বলছি যে বটু! তুমি তো খুব ছোটর মধ্যে ওদেরকে তেভাগার কথা চমৎকার বুঝিয়ে দিলে। এটা কেমন করে পারলে ? মানে আমি ভাবছি, ও কি জবাবটা দেয় তাই শুনব। ভাবছি যে নিশ্চয় বলবে, সংগঠন থেকে, পার্টির কাছ থেকেই শিখেছি।

—তা বললেন না ?

—না। এখনো আমার চোখে স্পষ্ট ভাসছে। ওর মুখে রোদ পড়েছে, খালের বুকে লগা ঠেকিয়ে ও নৌকো থামাল। তারপর বলল, দাদা! হাতে লাঙল ধরেছিলাম না কখনো। বিপিনের জমিতে লাঙল ধরেছি। নিজে চাষ করে তবে বুঝছি যে চাষ করে সে ধান পরের গোলায় তুলে দিতে ওদের কেমন বাজে বুকের মধ্যে।

—বললেন !

—হ্যাঁ, তাই বলল। আমাকে যে কত বড় কথাটা বলল, আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। তা বাদে ফিরে যেয়ে পরে দেখা হতে নিতাইদাকে আর অন্য নেতাদের বললাম, বটু যে ভাবে কাজ করছে, যেভাবে নিজের ক্ষেত্র তৈরি করছে, তা থেকে ওকে নড়ানো ঠিক হবে না। ঘটনাটা বললাম।

তখন ও'রা ঠিকই বুঝলেন। আরো বললাম···

—কি ?

—ভয়ানক দুর্গমে আছে। ওখানটায় তো আমরা হুট হুট যেতেও পারব না। ওর হাতেই থাক। কিন্তু বটুর বৈশিষ্ট্য হল, কোনোদিন ও নিজেকে 'নেতা' ভাবে নি, 'কর্মী' ভেবেছে।

—স্বেচ্ছাসৈনিক।

—স্বেচ্ছাসৈনিকই বটে !

—সব সময়ে ওখানে থেকেছেন ?

—হ্যাঁ। আবার ওদের মুখ যে খুব জানি তা নয়, তা পরে কাজে দিয়েছে। কলকাতায় খবর পৌঁছাতে···টাকার কথা জানাতে···বার দুই গেছে। ঠিক মৌবেড়ে পৌঁছে, নৌকো ধরে চলে যেত, তারমণ্ডহারবার যেয়ে বাসে চাপত। কথা বললে কে বুঝবে ও গাঁবাসী নয় ! ফসফস বিড়ি টানছে, ঘাসের মেঝেতে বসছে···

—বিপিন মালীও ও'র সঙ্গে ছিলেন ?

—বরাবর। হ্যাঁ। ওই বটুকে তখন দেখেছি···একটু আগের কথা বলি···দধিমঙ্গল এলাকার অনেক আদিবাসী কৃষক। অনেকে আগে থেকেই ছিল, অনেকে পরে এসেছিল···তা বটু খানিক ব্যাকগ্রাউণ্ডে থাকার সুবিধেটা বুঝেছিলাম মরীখালি গুলি চালনার পর।

—কেমন ?

—গুলি চলেছে···মানুষ মরেছে···খবর পেয়ে কৃষকরা নৌকো নিয়ে খাল পেরিয়ে চলে আসছে এদিকে বুধিরাম পরুরার পায়ে গুলি, পুলিশ ধরলেও সে মরে। তাকে আগে সরিয়ে নিতে হবে, ডাক্তার কমরেডদের চাই ! বুধিরাম আগে বলল, হেঁটে চলতে পারব।

—পায়ে গুলি নিয়ে ?

—তাই তো বলল। টেনে টেনে ওকে নিচ্ছে, তা ও বলল, আমাকে তোমরা ফেলে যাও। আমি আর যেতে পারব না। একজনের জন্যে সবাই কেন মরবে ? সে সময়ে বটু ওকে তুলে নিয়ে ডিঙিতে চাপিয়ে ঠিক পৌঁছে দিয়েছিল ঠিক জায়গায়।

—তারপর ?

—ডাক্তার তো গুলি বের করল, বেঁধে দিল। হাড়ে জখম হয়নি। তারপর বটু তাকে নিয়ে একেবারে দধিমঙ্গল চলে যায়। ওর প্রাণটাও

বাঁচাল, আর এটাও বুঝলাম যে ও মাথা ঠিক রাখতে পারে।

—এরপর কি মনে পড়ে ?

—কোনোদিন ভাবতে দেখিনি···যখন আন্দোলনের শেষ পর্যায়···সব যখন ধরা পড়ছে···না কি তার কিছু আগে···খবর পেলাম বিপিন মরে গেছে। সাপে কেটেছিল, জানো ? ওদিকে কালাজ্বের বড় উৎপাত। সে হতভাগা সাপ শীত গ্রীষ্ম সর্বদা কাটে···তা বিপিন তো ঘুমোচ্ছিল, কেটেছে গলায়। খবর যখন পেলাম, তখন মরেই গেছে।

—গেলেন ?

খবর পাঠালাম। তখন পুলিশ রে···মিলিটারি রে···বললাম, তুমি, মাতলা, যারা সচল আছ, যেভাবে পার এলাকা ছাড়ো। খবর নিয়ে এল যে, সে বলছে, বটু শুনছে না।

—শুনছেন না ?

—বলল তো তাই। বলল, বিপিন মরেও গেছে তাকে খালে ভাসিয়েও দিয়েছি।

—তার আগেই তো আপনার কাছে এসেছিলেন ? নিতাই খাস্তগীর যে বললেন।

—ও···হ্যাঁ...আগেরটা পরে...পরেরটা আগে হয়ে যাচ্ছে, তাই না ?

—এ রকম তো হতেই পারে। এ পর্যন্ত একবারও আটকায়নি কিন্তু।

—আটকায় নি। তাই না ? অথচ এক সময়ে দারুণ মেমারি ছিল, জানো ! আসলে এ সব কথা জানতে তো কেউ আসে না...

—একটু বিশ্রাম নেবেন ?

—একটু জিরোই।

জয়ানন্দ হেলান দেন দেয়ালে। ঘর নিশ্চুপ। এতক্ষণ দুজনের খেয়াল ছিল না, এখন কানে বাজে রেডিও বা ক্যাসেটে হিন্দীগান।

হিন্দী সিনেমার গান সর্বত্র। ময়নাডাঙা তো বড় জায়গা। যে কোনো জায়গায়, খুব অজগ্রামেও হিন্দী গান। এ থেকে আর মুক্তি নেই। প্রতি ক্যাসেট সাক্ষাৎকারে ওই গানের পশ্চাৎসংগীত থেকে গেল। তবু এখানে আস্তে বাজছে।

মীরার কান খুব সজাগ থাকে। তিনি একবার এলেন, বললেন, এখন থাক্ না ছোটকাকা ?

—না মীরা। শরীর খারাপ হয়নি।

—এত কথা তো বলেন না।

—না না, খেইটা ধরে নিলাম।

—দেখবেন!

—একটু জল খাব।

—দিই।

মিলি জল নিয়ে আসে। অরুণি বলে, ভাইরা কোথায়? তোমরা সবাই চুপচাপ?

—ওরা পড়ছে। আমি গল্পের বই পড়ছি।

—তুমি পড়ছ না?

—আমি এখানে পড়ব কেন? সোদপুরে গেলে পড়ব। এটা তো মামাবাড়ি। তুমি ওদের ভাই বলছ, ওরা তো মামা হয়।

—বেড়াতে এসেছ?

—আমাদের স্কুল এখন বন্ধ। স্কুলের স ..ব দিদিরা ঝগড়া করে তিন দিন স্ট্রাইক করেছে।

—কবে যাবে?

—মা আসবে, নিয়ে যাবে।

মিলি চলে যায়। যাবার সময়ে বলে যায়, তোমার জন্যে মাছ এনেছে দাদু।

অরুণি সংকুচিত বোধ করে। জয়ানন্দ বলেন, তোমার হয়তো না হলেও চলে। ওদের একটা তৃপ্তি। এবারে অন্ করো।

—করছি।

—হ্যাঁ আমিই ভুল করছিলাম। পদ্মমঙ্গলের গোমস্তা ওখান থেকে ওর পরিবার আগেই সরিয়ে দেয়। ও নিজে কিন্তু থেকে গিয়েছিল, কেননা ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওখান থেকে বেরোনো সম্ভব ছিল না। ও কৃষক আর ভাগচাষীদের সব দাবী মেনে নিতে বাধ্যই হয়। বলতে কি, আত্ম-সমর্পণই করেছিল।

—তাকেই মারবেন?

—পুলিশ আসছে···মিলিটারি আসছে ..খবর জেনে ও পালাতে চেষ্টা করে। তখনি ওকে মারা হয়। হাতে করে কে মেরেছিল তা বলতে পারি না। তারপর মস্ত ঝুঁকি নিয়ে বিপিন আর বটু নিতাইদার কাছে এল। সে বলল আমার কাছে যেতে।

—তখন এলেন ?

—আমাকে পায় নি। ঘটনা জানিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। এর কিছুদিন বাদেই বিপিন মারা যায়। আমি লোক পাঠালাম। বটু বলে দিল, দাদা যেন মাপ করে দেয়। বিপিন নেই। গোমস্তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। খবরটাতো ঠিকই চলে যাবে। এখানে চোট আসবেই।

—এসেছিল ?

—সে কথায় পরে আসছি। বটু বলল। এদেরকে রেখে আমি যাব না। চোট আসবেই। তখন আমিও থাকব না ? মনে হয়, বিপিন মরে যেতে ও ডবল করে দায়িত্ব অনুভব করছিল।···সে দধিমঙ্গল নেই। বিবিগঞ্জও নেই···থাকলেও তখনকার লোকজন কেউই নেই।

—তারপর ?

—তখন ওখানে ডাকাবুকো বলতে তিন জন। বটু, বিপিনের ভাই সনাতন, মাতলা সরেন। মাঝের অবস্থা এমন, যে চারদিকে পুলিশ ছাউনি, মিলিটারি জমিদারদের ঠ্যাঙাড়েরা সেবাদল করেছে...যোগাযোগটা খুব রাখা যাচ্ছে না। একেবারে শেষ পর্যায়ের কথা বলছি।

হ্যাঁ বলুন।

—শেষ পর্যায়টা যে কেমন ছিল, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ভয়ংকর অত্যাচার চলেছে। যে সময়ে খবর পেলাম, মৌবেড়ে থেকে জমিদারের ঠ্যাঙাড়েরা পুলিশ নিয়ে দধিমঙ্গলে যাচ্ছে।

—একসঙ্গে ?

—না, পুলিশ এক নৌকোয়। ওরা আলাদা যাচ্ছে। পুলিশ তো আসছে সঙ্গে, ওরা তখন খুব নির্ভয়। সঙ্গে পথ দেখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প থেকে উঠিয়ে একজন কৃষককেই। তাকেও কাজ করতে হচ্ছে. অথচ সে মনে মনে তা চাইছে না। এটাও বুঝতে হবে যে ক্যাম্পে ভীষণ অত্যাচার সে সয়েছে। যা হোক, সেই নিরক্ষর লোকটি একটা সাধ্যমত চেষ্টা দেখাল। তার যেমন মাথায় এল···

—কি করল ?

—সেবাদলকে বলছে, পুলিশ তো আসছেই। চলুন সুঁড়ি খালে শর্টকাটে যাই। অর্থাৎ এরা যদি আগে যেয়ে নামে তাহলে তো লাঠি বসাবে ওরা। পুলিশ যেতে খানিক দেরি করলেও ওরা অন্তত জেনে যাবে যে পুলিশ আসছে, সাবধান হতে পারবে।

—ওরা সে কথা মানল ?

—মানল। ওরা তো জানে ভেতাগার লড়াই খতম। জয় এখন ওদের। এটাও ওদের ধারণাতীত যে ওই অসহায় মানুষটি এমন অবস্থায় পড়েও ধোঁকা দেবার চেষ্টা করতে পারে। ওই লোকটি বিবিগঞ্জের। খবর আনতে যেয়েই সে ধরা পড়ে। সে চাইছে না যে···

—ওর সেখানো পথে এসে...

—পুলিশ গুলি চালাতে পারে। যা হোক...কোন মতে ওরা তো পৌঁছেছে। পুলিশ বেশি, আসছেও একটু বড় নৌকোয়। যে ভাবে হোক, পুলিশ যেতে যেতে ঘণ্টা খানেকের ফারাক ঘটে যায়। কেন না ওখানে খাল আর সুঁড়ি খালের গোলকধাঁধাই বটে।

—তারপর ?

—পরে জেনেছি, সেবাদলের সঙ্গে ওদের লড়াইটা লেগে যায়। যে বেচারা এতটা করল, সে কিন্তু লাঠি বুকে খেয়ে পরে মারা যায়। পুলিশ যখন পৌঁছয়, তখন সেবাদল খুব বিপর্যস্ত। তীরে জখম, লাঠিও খেয়েছে।

—তারপর ?

—রাতের রিপোর্ট, মানে পুলিশের···মাতলা নিহত...বটু আর সনাতন, মানে বিপিনের ভাই···দুজনেই এমন জখম যে কাকদ্বীপে আনা অবধি বাঁচবে না। সেবাদলের একজনের বন্দুক ছিল···সে চালিয়েও ছিল···কিন্তু বটু যখন মাতলাকে টানছে, তখন মাথায় চোট খায়।

—তারপর ?

—পুলিশ তো ওদের ফেলে রেখে···মানে মারলে মরুক ধরে নিয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে আছে···গ্রাম ঠ্যাঙাবে।

—তা করেছিল ?

করেছিল···চারটে লাশ এনেছিল···ওখানে ছাউনি খুলেছিল···কিন্তু আবার শুনলাম যে তার মধ্যে বটু নেই। এ কথাও শুনলাম যে বটু আর সনাতনকে মেরে খালে ফেলে দিয়েছে।

—এই ?

—এখানেই শেষ। মানে বটুর কথা···

—আর কিছু জানেন নি ?

—না।

জয়ানন্দ ভাবেন, খুব ভাবেন। তারপর বলেন, সে সময়ে ওখান থেকে বেরোনো তো অসাধ্য কাজ। নৌকো যাচ্ছেরাপ্ত এলাকায় গাদ যত, পুলিশ তত। ওরা পালাবে কেমন করে?

—লাশ তো কেউ দেখেনি?

—কতটা জখম ছিল? পালাতে চেষ্টা করলেও কি পারত? এ রকম কত টুকরো টুকরো ঘটনা···তার কোনো রেকর্ড নেই!

—আর কিছু বলবেন?

—আর?···না। বটুর কথা তো আর জানি না। আর কোনো খবর পাইনি।

এখন জয়ানন্দকে বড় অবসন্ন দেখায়। অপ্রতিভ হেসে বলেন, বড্ড কথা বলা হয়েছে। ব্যাপারটা কি জানো, ওর কথাটা আজও ভাবি, খুব মনে পড়ে। হাতে করে চাষ করেছিল, তাই বুঝেছিল গোমস্তা নায়েবের সামনে সে ধান তুলে দিয়ে আসতে বুকে কত বাজে।

কথাটা খুব বড়।

অরণি বোঝে তাঁর কাছে ব্যাপারটা কত দুর্বোধ্য, কত দূরের। সে তো একটি গাছও লাগায়নি কখনো, কষ্টে লালন করেনি কোনো শিশু-চারাকে। ধানচাষ করতে কেমন লাগে, তা কি সে জানে?

তথ্যচিত্রে চাষী, বিজ্ঞাপনে চাষী, সিনেমায় চাষী, সাহিত্যে চাষী···

জয়ানন্দ বলেন, 'কৃষক বলে আগাগোড়া বলে গেলাম ওর মধ্যে বায়তী কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, সবাই ছিল।

—বুঝেছি।

মীরা বলেন, আপনি হাতমুখ ধোবেন না? এবারে কিন্তু খেতে দেব।

—একটু স্নান করতে পারি?

—নিশ্চয়। তবে টিউবওয়েলের জল বড় ঠাণ্ডা। পুকুরের জল ভালো, তবে অন্ধকারে যেতে বলি না।

—আমি সাঁতারও জানি না।

—বটু মায়ের মতো সাঁতরাত। অবশ্য ওখানে সবাই জানত সাঁতার।

টিউবওয়েলের জল তুলে নেয় অরণি বাথরুমে বয়ে নেয়। কুপির আলোয় স্নান করে বড় ঠাণ্ডা জল, বড় গা জুড়ানো।

স্নান করে জয়ানন্দের ধুতি ফেরত দিয়ে পরে। খাবার সময়ে গৃহ-কর্তাকে প্রথম দেখে। ধীরেন বলেন, কষ্ট হবে খেতে।

—কিছু না। এত ভাত!

—এত কোথায়? ও টুকু খান।

খেতে খেতে জয়ানন্দ বলেন, কোথায় গেল সুন্দরবনের মাছ। তখন তো সে মাছ ওরা বাঘের গ'-গড়ানি তেলেই রান্না করত।

আছে মাছ আছে। ওদের জন্য নয়।

—এখন তো গ্রেট বাগদা বৃহৎশিল্প চলছে। রপ্তানি হচ্ছে।

মীরা বলেন, আরেকটু ঝোল দিই? ওটা খান, মাছের ডিমের বড়া।

শোবার ব্যবস্থা হয় পাশের ঘরে। একটি খাটে বীরেনের দুই ছেলে। তক্তপোশে অরুণি। মীরা বলেন, জানলা খুলে দেব, বেশ বাতাস আসে। জানলায় জাল আছে, ভয় নেই।

—চুরি হয় খুব?

—খুবই হত। তবে ছেলেরা এখন রাতে পাহারা দিচ্ছে, দোকানীদের সঙ্গে দল বেঁধে।

রাতে শুয়ে পড়তে না পড়তে অরুণি। এমন নীরবতা, নারকেল পাতার বাতাস, কোনো রাতচরা পাখির ডাক, গাছপালার গন্ধ, ঘুম আসবে তো?

খুব তাড়াতাড়ি অরুণি ঘুমিয়ে পড়ে।

পাঁচ

প্রসাদ খুব উত্তেজিত হন। বলেন, দধিমঙ্গলের ঘটনাটা আবার শোনাওতো।

—কি মনে হচ্ছে?

—গণ্ডগোল লাগছে?

—যেমন?

—এটা কিন্তু পরিষ্কার, যে পুলিশও ওদের মৃতদেহ সম্পর্কে সঠিক "হ্যাঁ" বা 'না' বলতে পারে নি। মেরে খালে ফেলে দেবে কে? কেন তা করবে? পুলিশ তো দেখাতে চাইবে যে এদেরকে মেরেছি, তাই নয়?

—তাই ছিল স্বাভাবিক।

—হ্যাঁ···চন্দনপীড়িতে অতজন নিহত হলেও পুলিশ শুধু অহল্যার মৃতদেহই গ্রামে দাহ করতে দেয়। দেয় মানে কি, লাশ লুকানো হয়। অন্যগুলি নিয়ে যায়।

—কি মনে হচ্ছে ?

—এতকাল আগেকার কথা···কিন্তু খটকা লাগছে খুব। হয়তো··· হয়তো···

—বেঁচে আছেন ?

—জানি না। যদি বেঁচে থাকে···যদি তাকে পাওয়া যায়···

লতিকা বলেন, সেটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হবে। যাকে বলে, ভীষণ অবাক কাণ্ড।

প্রসাদ বলেন, কাগজে লিখবে তো ?

—ভাবিনি। আমি তো কোনো চমকপ্রদ খবর লেখার জন্যে খুঁজছি

—তবু লিখো।

—দেখি, গোকুলেশ্বর কি বলেন।

—দেখ, দেখ।

বুধবার গোকুলেশ্বর রায় বেশ তৈরি হয়ে বসেছিলেন।

—আর কিছু জানলেন ?

—শুনবেন ?

—কোনো পাত্তা মিলল ?

—পাত্তা বলা যায় না···

—চালান তো রেকর্ডার···

টেপে দুটি গলা। কার গলা তা অরণি বলে না। উনি যা বোঝবার তা বুঝে নিন। শুনতে শুনতে গোকুলেশ্বর থেমে ওঠেন, কপাল মোছেন।

কেন উনি বিচলিত হচ্ছেন বারবার ?

অরণি জিজ্ঞেস করে না। জয়ানন্দর কণ্ঠস্বর থেমে যায়। গোকুলেশ্বর যেন ধ্যানস্থ। চোখ বুজে বসে আছেন। বারবার আঙুলে কর গোনেন, হিসেব করেন। কি যেন মেলান মনে মনে।

তারপর চোখ খোলেন।

বলেন, স্বাস্থ্যের কারণে ছাড়া পেয়েছিল সে সময়ে ? না, স্বাস্থ্য ওর আপনা থেকে ভাঙেনি।

—বাবা বলতেন, মার খেয়েছিলেন।

—হতে পারে···হতেই পারে পুলিশ···সে সময়ে···নিশ্চয় হতে পারে।

—সব সময়েই।

—হ্যাঁ—পুলিশ আর পাবলিক সম্পর্কটা তো সেই ইংরেজের স্থাপিত ট্রাডিশন বয়ে চলেছে হতেই পারে। এখন তো

—আপনাদের সময় থেকে তফাৎ অনেক?

গোকুলেশ্বর সে কথা শোনেন না। মাথা নাড়েন, ওখানে গিয়েছিল? সে সময়ে?

—তাই তো বলেছে সবাই।

—খুব আশ্চর্য আমি তো ভেবেছিলাম যে জেল খেটে বেরিয়েছে.. সুযোগসুবিধে করে নিয়েছে মানে, সবাই তো তাই করল কিংবা কিছু লোক হয়তো করে নি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—হ্যাঁ কেন করবেন না।

—আপনি আমায় 'তুমি' বলতে পারেন। ওরা তো বললেন।

ঈষৎ হেসে গোকুলেশ্বর বললেন, সংগ্রামীরা তা পারেন, তাঁদের অধিকারও আছে। মহানামকে তো ওঁরা জানতেন। পুলিশের পক্ষে সম্মান দেয়াটাই ভদ্রতা। তা ছাড়া, ওটা আমার সুজেস।

—এবারে বলবেন?

—বলছি। অন্ করুন।

—করেছি।

—আজ থেকে বছর চারেক আগেকার কথা। জামাইয়ের কারণে মনটা ভাল নেই। মানে সবে তখন ও মারা গেছে! মেয়েটাকে এনে রাখতে চাইলাম তা শ্বশুর বললেন, বাড়ির বউ বাড়িতেই থাকবে। কি করব! মেয়ের বাপ তো মহা পাপী। বলে যে মেয়ের কপাল খারাপ বলেই ছেলের দুর্ভোগ হল।

—তাহলে তো ওঁকে রাখাই অদ্ভুত।

—বললাম অনেক। বলে না না, আমি শুনেছি আপনি মেয়েকে পাশ করাবেন, চাকরিতে দেবেন তা হবে না।

—আপনি বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, বারবার। আসতে তো দিল না। তবে স্বাতড়ি বলল, মেয়েকে আমি যত্নে রাখব। হুঁ! এখন তো সংসার ঠেলাচ্ছে সমানে আর পুজোপাটা ধরিয়েছে। এর উপোস তার উপোস

—বড় দুঃখের আপনার পক্ষে।

—সে সময়টা মনও খারাপ। বাতের ব্যাপারটাও খুব চেপে উঠল তা আমার ভগ্নীপতির ভাই বলল, 'দাদা! বাঁকুড়ায় আমার কাছে চলুন।' সে সরকারী চাকরি করে, কোয়ার্টার পায়। বলল, 'আপনাকে আমার অ্যাকাউন্ট ক্লার্কের গ্রামে রেখে দেব।'

—কেন, গ্রামে কেন?

বলতে, সেখানে একজন তেল পড়ে দেয়। তা মালিশ করলে ব্যথা সেরে যায়। সেখানে সাতদিন থাকলেই আপনি উপকার বুঝবেন।

—আপনি গেলেন?

—হ্যাঁ গেলাম। সত্যিই ছেলেটা ভালো···মানে মনটা বেশ উঁচু···ওর চাকরির জন্যে আমিও খুব চেষ্টা করেছিলাম কৃতজ্ঞতা ভোলেনি। তা ছাড়া দেবদ্বিজে ভক্তি..আমারও আছে ও সব। আপনি বোধহয় এ সব মানেন না?

—কি জানি। ভেবে দেখিনি তো।

—তা আমার বাড়িতেও বলল, ওখানে জলবাতাস ভালো। শীতকালে শরীর ভাল থাকবে। ঘুরেফিরে এলে মনটাও ভাল হবে।

—তখন গেলেন?

—হ্যাঁ গেলাম। খুব আদর যত্নই করল
মানেজার বেশ বাসাটি।

—সেই গ্রামে গেলেন?

—হ্যাঁ, গেলাম। সে কি সহজ পথ? অনেক, অনেক খানি পথ। মনে হবে পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন। দিবিা ফরেস্ট উঁচু নিচু পথ কেতুপুর গ্রামে গেলাম

—কি ভাবে গেলেন?

—আমি গেলাম জীপে. সত্যিই ব্যবস্থা করেছিল ওই যে ক্লার্কটি নাম তার দিলীপ মণ্ডল! শুনলাম বাসও আসে। তবে বর্ষায় খুব কষ্ট।

—বাঁকুড়া থেকে অনেকটা পথ?

—তা অনেকটা। কেতুপুর পর্যন্ত আসে বাসটা। তারপর ঘুরে যায় পাথরবাঁধ মানে তারপর আর পথ নেই। ফরেস্টের ভেতর দিয়ে গো-গাড়ি কষ্টেসিষ্টে যেতে পারে খানিক।

—মোটামুটি দুর্গম।

—আমার যদি আগেকার শরীর থাকত, তাহলে ওটুকু পথ কিছুই নয়।

আমাদের কালে তো এত পথ ঘাট হয়নি।

—হাঁটতে হত খুব ?

—সে কোথাও সাইকেল.. কোথাও ঘোড়া নইলে হাঁটতে হত। হাঁটলে চাকরি রাখাই যেত না। তা এখন তো বিস্তর পথঘাট হয়েছে... তবু যে ওসব জায়গা অমনি পড়ে আছে, দেখে অবাকই হলাম। আমি ভেবেছিলাম

—পথঘাট সর্বত্র হয়ে গেছে ?

—অনেকই তো হয়েছে, অনেক! যা হোক, ওখানে হয়নি। জায়গাটা বুঝলেন মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ার যেন মিটিং পয়েন্ট।

—ও!

—কেতুপুর নয়। তার পরের অঞ্চলটা।

—ওদিকে কারা থাকে ?

—সাঁওতাল অনেক।

—ওখানে থাকলেন ?

—কেতুপুর দেখলাম বড় জায়গা। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোস্টাপিস, জুনিয়ার হাইস্কুল, কৃষিঋণ মানে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

—খুব ডেভলপ্ড ?

—যথেষ্ট। দিলীপদের যথেষ্ট জমিজমা অবস্থা বেশ ভালো। কুয়োর জল যা চমৎকার ওরা যত্নও করল খুব।

—ভালো লেগেছিল ?

—খুব। শীত অবশ্য প্রচণ্ড। কিন্তু রোদ উঠে গেলেই হাঁটতাম খানিক। খিদেও বেড়ে গেল। ক্ষেতের ধানের চাল, তার স্বাদই আলাদা। তবে মাছ আপনি রোজ পাবেন না। হাট বসে। হাটে মুরগি পাবেন। সরিষা অবশ্য বাসে লোক দিয়ে মাছ পাঠাত প্রায়ই। ওঃ, কি যে ভালো লেগেছিল।

—ওর চিকিৎসার কি হল ?

—দিলীপ ফিরে গেল জীপ নিয়ে। দিলীপের বাবা! সজ্জন লোক! নিজে মাঠে যেয়ে মাঠের কাজ দেখেন উনিই সব ব্যবস্থা করলেন আর কি। সে কবরেজকে আনলেন।

—রাত আরাম হল ?

—বাড়িতে কোনো বুড়ো মানুষ আছেন বোধ হয় ?

—বাড়িতে কোনো বুড়ো মানুষ আছেন বোধহয় ?

—হ্যাঁ। পিসিমা।

—ওই যে বললেন 'আরাম হল' ? আজকাল সবাই বলে 'সারল'। বুড়ো মানুষরা বলবে, বাবা আরাম হল ? ওই যে বললেন ?

'আরাম হল' শব্দ দুটি বলে অরুণি গোকুলেশ্বরকে সবিশেষ খুশি করে দেয়।

—দাঁড়ান, চা বলে আসি।

—পরে হবে।

—আজ মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।

—পরে।

—তা কবরেজ বললেন, তেল পড়া বলছি। এ হল গে শিকড়বাকড়ের লতাপাতার নির্যাসে তৈরি খাঁটি জিনিস। দু'বেলা মালিশ করবেন। আর, মাংস, ডিম এ সব খাবেন না কিছুকাল।

—কাজ হল ?

—তখন বেশ হচ্ছিল। এখন আর···তা ঘুরে বেড়াই, হাটে যাই··· একদিন লাউ কিনেছি তো মণ্ডল বাবু বলেন, অ রায় বাবু! ঘরের লাউ খায় কে, আপনি কিনে আনলেন ? আমি বলি, তাজা জিনিস তো আমরা পাই না···দেখলেও ভাল লাগে···

—কতদিন থাকলেন ?

—সাতদিন বলে গিছলাম। তা পনেরো ষোলদিন তো বটেই। ছাড়তে কি চায়। বলে আমরা আপনার মত মানুষ পাই না। পাকুন কেন এক বছর। বাঁকুড়ার শীত দেখলেন, গরমটা দেখে যান। সত্যি, বড় ভালো ছিলাম।

—তারপর

—বাসটা এসে দাঁড়ায়, ঘুরে যায় আবার। সকাল দশটায় একবার, বিকেল তিনটেয় একবার···বিকেলে যেয়ে রাস্তায় কালভার্টে বসি। মানুষজন দেখি। সাঁওতালরা বা অন্যরা, যারা ধরুন, শালগেড়্যা, পাথরগেড়া, বাঁধনি, এ সব গ্রামে থাকে, তারা তিনটের বাসে নামে, ফরেস্টের পথ দিয়ে চলে যায়।

—হাঁটা পথ ?

—হ্যাঁ, খুব কষ্ট করে। তা আমি মণ্ডলবাবুকে বলছি, আপনারা পাঁচজন চেষ্টা করলে পথ হয় না ? তিনি বলছেন, গিন্নিবাবু তো খুব

করছেন, দেখি কি হয়।

—গিরিবাবু!

—শুনুন না। মণ্ডলবাবু লোক ভাল, কিন্তু গ্রামের ব্যাপার তো! কেতুপুর অবধি যোগাযোগ হয়েছে, বাস! তারপর কি হল না হল, সে সব নিয়ে মানুষ ভাবে না।

—তারপর?

—আমি একদিন বসে আছি। বাস থেকে একজন লোক নামছে··· ধবধবে সাদা চুল···এই মজবুত শরীর···হেটো পাঞ্জাবি আর হেটো ধুতি পরেছে···পায়ে মুচির তৈরি মোটা নাগরা···কাঁধে একটা ঝোলা···কয়েকজন সাঁওতালের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই নামল। মুখ দেখেই···

—কি বললেন?

অরণি উত্তেজিত, বিদ্যুৎপৃষ্ট।

—মুখ দেখেই···আমার চেনা মনে হয়েছিল ..পেছন ফিরে হাঁটতে,

—কি মনে হল, বলুন, বলুন।

—ও রকম করবেন না। বলব বলেই তো আপনাকে ডেকেছি তাই না?

—মাপ করবেন, বলুন

অরণি ঘামছে বারবার। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে তার।

—হাঁটতে দেখে আমি নিঃসন্দেহ হলাম এ মহানাম দত্ত। কেন নিঃসন্দেহ হলাম? পুলিশ পুলিশই থাকে। আমার চোখ দেখে আপনি বুঝবেন না, ব্রেন আপনা থেকে সব রেকর্ড করে।

—বলুন, থামবেন না।

—ওকে দীর্ঘ ষোল মাইল আমার সঙ্গে হাঁটতে দেখেছি এক সময়ে। হাঁটার ভঙ্গি পাল্টানো খুব সোজা নয়, জানেন? সেই না জোরে, আস্তে, প্রতিটি পা ফেলা সমান ফাঁক রেখে···

—মহানাম দত্ত।

—হয় সে, নয় এমন কেউ, যে তার অবিকল প্রতিচ্ছবি। দেখে আমি পাথর হয়ে গেলাম।

—উনি চলে গেলেন?

—হাঁ হাঁ। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, গলা তখন শুকিয়ে গেছে··· তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় বললাম, ওঁরা কে গেলেন?

কি বলল ?

—লোকটা দোকানী। ও পান সাজতে সাজতে বলল, উনি গিরিবাবু।

—গিরিবাবু ?

আমি বললাম, নামটা কি ?

—কি···জবাব···দিল ?

—বলল, উনি বিপিন গিরি।

—বিপিন গিরি !

—নামটা আজ আপনার কাছে ক্যাসেটে প্রথম শুনলাম।

—তারপর কি করলেন ?

—আমি অধিক কৌতূহল দেখাতে পারি না। অথচ কৌতূহল হচ্ছে ভীষণ। মণ্ডলবাবুকে বললাম, সাঁওতালদের সঙ্গে একজন ভারি মাতব্বর, ভারি সারি চেহারার মানুষকে দেখলাম। শুনলাম, উনিই বিপিন গিরি, আপনাদের গিরিবাবু।

—উনি কি বললেন ?

—হ্যাঁ, উনি তো শলিগেড়াতে অনেক কাল আছেন। অনেককাল। তা আমি শুধোলাম, ওখানে কি করেন ? কি বলবেন জানেন ?

— কি বললেন ?

বলল, কি আর করবেন। ওই সাঁওতালদের বলুন, অন্যদের বলুন, ওদের নিয়েই পড়ে আছেন। ওখানে কেন, এদিকে গোটা দশেক প্রাইমারি স্কুল উনিই করেছেন। খানিক জমি আছে, চাষ ওরাই করে। এখন টাউনে দৌড়চ্ছেন বাকি পথটা যাতে হয়, সে জন্যে।

—'বাকি পথটা' মানে ?

—মণ্ডলবাবু বলল, কেতুপুর অবধি যতটা উন্নতি হয়েছে, এ নিয়ে গিরিবাবু খুব লড়েছেন। সে আমাদেরকে দিয়ে দরখাস্ত করায়···সদরে চলো···তা কেতুপুরে আমি ওঁকে বসত করাতে চেয়েছিলাম। বলল, ওটি পারব না।

— রাজনীতি করেন ?

—শুনলাম কোনো দলে থাকে না ! তবে অঞ্চলে ওর খাতির প্রচণ্ড।

—আপনি দেখা করলেন ?

—প্রথমে চেষ্টা করিনি। সাহসে কুলোয় নি। কেন আমি উবজে যাব বলুন ? ও আমাকে ঠিকই দেখেছে, চেনার চেষ্টা করেনি। আমি

হয়তো চেহারার বদলে গেছি

—তারপর কি হল ?

—আস্তে আস্তে জানলাম যে বিপিন গিরি অনেক কাল ইউনিয়ন বোর্ডেও ছিল, স্কুল কমিটিতে, হাট কমিটিতে, বর্তমান ফ্রন্ট সরকারে যারা ধরুন অঞ্চলপ্রধান বা সদস্য, তারা অনেকে ওর কাছেই অ-আ-ক-খ হাতেখড়ি নিয়েছে।

—পড়াতেন ?

—আগে পড়াত। তখনকার দিনকাল! ছেলেরা বান দিয়ে স্কুলে বেতন দিত। মণ্ডলবাবু বলল, আমার বয়সী লোকরাও ওর ছাত্র, এখনকার ছেলেরাও.. অর্থাৎ, ওর 'বিপিন গিরি' পরিচয়টা এখানে খুবই... যাকে বলে...

—এস্টাবলিশ্‌ড্‌!

—হ্যাঁ...আমি অবশ্য বাংলায় বলতে চাইছিলাম...আজকাল চেষ্টা করি

প্রতিষ্ঠিত।

—হ্যাঁ হ্যাঁ...'প্রতিষ্ঠিত' বললে ঠিক হত। কিন্তু কি জানেন... ইংরিজি বা বাংরেজির বুকনি যে অভ্যেস হয়ে গেছে...আমি...আপনি...

হতাশ হয়ে গোকুলেশ্বর দেয়ালে নেতৃবর্গের ছবির দিকে তাকান। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, স্বর্গত নকুলেশ্বর রায়, সব ছবির সহাবস্থান। বোঝা যায়, ছবিগুলি কারো আঁকা।

—তারপর ?

—আমি তখন সংকটে পড়লাম। কি করি! কৌতূহল না মিটিয়ে যাই কি করে ? যাবার দিনও তো হয়ে এল। শুনলাম শালগেড়্যা প্রথমত আট মাইল হাঁটা পথ। আর সেখানে গেলেই যে বিপিন গিরির সঙ্গে দেখা হবে তার ঠিক নেই।

কেন ?

—তার পায়ে চাকা বাঁধা। পাথরগেড়্যা যেতে পারে, নয় বাঁধনি। অঞ্চলে কি আছে কি নেই, কি দরকার, সব সে দেখছে। আমি তো মণ্ডলবাবুকে বেশি কৌতূহলী করতে পারি না। দেখুন, 'কৌতূহলী' শব্দটা ঠিক মনে এসে গেল! আমি যাব, দেখা পাব না।

—গেলেন না ?

বাংলায় বলার সংকল্প ভুলে গিয়ে গোকুলেশ্বর পুরনো দিনের গলায় বললেন, আঃ! আই হ্যাভ নট স্কিনিশ্‌ড্‌।

—ভেরি, ভেরি···খুব দুঃখিত।

—শুনলাম, কেতুপুরের হাটতলা কমিটি ওকে ডেকেছে। এর আগে হাটে ওকে দেখিনি। তা হাটে গেলাম।

—দেখা হল?

—সে তখন ঘুরছে, কথা বলছে, বলছে অঞ্চলকে বাঁধানো হাটতলা করে দিতেই হবে। আমি ওকে দেখছি, ও আমায় দেখছে না। শেষে বিকেল শেষ হয় হয়,...ও দোকানে এসে বসল।

—দোকানে?

—চায়ের দোকানে। দোকানীর খাতির কি! গিরিবাবুর গেলাস বের কর, স্পেশাল দুধ দে। আমিও ওর সামনে বসেছি, চেয়ে আছি।

—দোকানেই?

—হ্যাঁ। চা আমিও নিয়েছি। ও দেখছে অথচ দেখছে না···দুধ খাচ্ছে। শেষে ও উঠল তোআমিও উঠলাম। ও উঠতে না উঠতে ক'জন লোক, সাঁওতাল বেশি, তারা ওকে কি যেন বলল...ও ওদের ভাষাতেই জবাব দিল। দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—আপনার কি অবস্থা!

—আমি আর না পেরে কাছে যেয়ে বললাম, দাদা! একটু শুনবেন?

—উনি চমকে উঠলেন?

—একেবারে নয়। অবাক হয়ে বললেন, আমাকে বলছেন?—কথায়বার্তায় ওখানকার টান খুব স্পষ্ট। আমি আস্তে বললাম, আপনি... মৌরিপুরের মহানাম দত্ত, তাই নয়? আমি...গোকুলেশ্বর রায়···মোহনবট ···বেয়াল্লিশ সাল···

—উনি···কি...বললেন?

—তাজ্জব হয়ে বললেন, কি বলছেন আপনি? আমি কে ওদেরকে শুধান।। বেশ হেঁকে বলছে, আর দোকানী এগোচ্ছে, লোকজন ছুটে আসছে। 'কি হল গিরিবা?' সবাই শুধাচ্ছে।

—তারপর?

—ও আমার দিকে চেয়ে আছে, আমি ওর দিকে। শেষে ওর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। হেঁকে বলছে, কিছু হয় নাই বাপ সকল!

আমাকে ইনি কোনো মন্দ কথা বলে নাই। বলছে, আমি না কি দেখতে ওর কোন্ চিনাজানা লোকের মতন। তাতেই বললাম, আমি কে, তা এদেরকে শুধান।.. আপনি চলে যান মশায়। নিশ্চিন্তে চলে যান।

—চলে এলেন?

—হ্যাঁ...আমিও বললাম, বয়স হয়েছে, তাতেই ভুল করেছি।

—এই যা দেখা?

হ্যাঁ এই। ও তো চলে গেল রাজার মতো। আমি ঘরে এসে ভাবছি আর ভাবছি। সময় মেলাচ্ছি, বয়স মেলাচ্ছি, চোখ, নাক, হাঁটা সব বলছে যে ও মহানাম।

—ছয় বছর আগে?

—হ্যাঁ···ছয় বছর হল।

—আর কোনো খোঁজাখুঁজি করেন নি?

—না। অনেক ভাবলাম। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম, আমি তো পুলিশেই ছিলাম···লোকটা এখানে কোনো মন্দ কাজ করছে না...অঞ্চলে একেবারে অঞ্চলবাসী হয়ে আছে.. অবাক হয়েছি যে ও কেন বেয়াল্লিশের আন্দোলন কারণে সুযোগ সুবিধা করে নেয়নি

—সম্ভব ছিল না।

—তারপর ভাবলাম। জীবনে···পুলিশ ছিলাম যখন...কত পাপই করে থাকব। মেয়েটা সুখী হল না.. বিধবাও হল আমার শরীরও ভেঙে গেল...এখন এ খবর নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে তার শান্তি কেন নষ্ট করি?

—চলে এলেন?

—হ্যাঁ। মণ্ডল বাবু বলল, গিরিবাবুকে কি শুধাচ্ছিলেন গো? আমি হেসে বললাম, আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে খুব সাদৃশ্য। তাই বলছিলাম

—মণ্ডলবাবু মেনে নিলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সজ্জন লোক...ভারি সজ্জন···বলল, এ রকমটা হয় বই কি! এ সব হল ভগবানের খেলা।

—এখন তো বুঝতেন, কেন...

—বুঝছি। মানে উনিশ শো বিয়াল্লিশের আর আটাত্তরের মাঝামাঝি খানিক হিসেব পাচ্ছি।

—ওখানে কতদিন, তা জিজ্ঞেস করেন নি কোনো লোককে ?

—না। মণ্ডলবাবু কেন, সবাই জেনে গেছল আমি পুলিশে ছিলাম। ছোট জায়গা, কোনো খবরই চাপা থাকে না। লুকোবার কথা মনেই হয়নি। সরিৎ দিলীপকে বলেছে...দিলীপ বাড়িতে বলেছে ..আমি যদি আরো কৌতূহল দেখাই, তাহলে ওঁর অসুবিধে হবে।

—তা সত্যি···ঠিক করেছিলেন।

—এতকাল হয়ে গেছে···কাউকে বলিনি···

—আমাকে তো বললেন।

—আপনি ভাইপো। পুত্রস্থানীয়। আপনার যা সাজে, আমার কি তা সাজে ?

—ছয় বছর···.

—হ্যাঁ, তা হল।

—বেঁচে আছেন কি ?

—মণ্ডল বাবুর সঙ্গে চিঠিচাপাটি বছরে কয়েকবার চলে। ওনারা এসে আমার বাড়িতে থেকে গেছেন এক বেলা।

—কতদিন আগে ?

—বছর চার আগে। উনি মারা গেলে সে লিখত। খুব খুঁটিয়ে খবর দেয়। যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, কে কেমন আছে। ও খুব নিয়মিত পত্রলেখক। আর আমিও···ও কাজটা নিয়মিত করি।

—বেঁচে থাকাই সম্ভাবনা ?

—এখনো যে আট দশ মাইল হাঁটে···মণ্ডল বাবু বলেছিল, একটা বড় সড় মোরগার মাংস খেয়ে নেয় এক থালা ভাতের সঙ্গে···না, দেখে হিংসে হয়েছিল···মজবুত দেহ···পায়ের গোছ শক্ত আর মোটা...গত চারমাসের খবর জানি না। এর মধ্যে···না···মনে হয় না।

—হয়তো বেঁচে আছেন।

—হয়তো কি! আমি বিশ্বাস করি বেঁচেই আছে। তাকে মারা রোগভোগের সাধ্য নয়। মরার হলে ওই কাকদ্বীপেই মরতো।

—বিশ্বাস করেন ?

—হ্যাঁ। তবে একটা খটকা থেকেই গেল···

—কিসের খটকা ?

—বিপিন গিরি নামটা নিল কেন ?

অরণির মনে হয়, এভাবেই মহানাম দত্ত, তার সঙ্গী ও বন্ধুকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গোকুলেশ্বর বলেন, ওটাই খটকা...।

—আমি উঠি ?

—দাঁড়ান। মিষ্টিমুখ করবেন। গৃহস্থবাড়ি থেকে যাচ্ছেন···আর তো আসবেন না।

—নিশ্চয় আসব।

—ওখানে যাবেন ?

—দেখি।

—যা জানবেন, আমাকে জানাবেন তো ? মনে থাকবে ?

—থাকবে।

অরণি মিষ্টি খায় জল খায়। কত না সংশয় অরণির মনে। কি ভাবে এঁর কাছে বিদায় নেবে ? নমস্কার করবে, না প্রণাম ? নমস্কার না প্রণাম ?

নিজেকে অত্যন্ত বিস্মিত করে অরণি ওঁর হাঁটু ছুঁয়ে হাত জোড় করে।

গোকুলেশ্বরও হাত জোড় করেন। বলেন, সে যদি আপনার কাছে স্বীকার যায়, তাহলে বলবেন, আমি ওর পরিচয় গোপনেই রেখেছি।

—হ্যাঁ···বলব। আসি।

—আসুন।

ছয়

শুভময়, প্রসাদ, মা, কাউকেই এই ক্যাসেটটি শোনায় না অরণি। গোকুলেশ্বর যদি মনে মনে নিঃসংশয় হয়েও, এ কথা গোপন রাখতে পারেন, তাহলে সে কেন এ কথা চাউর করতে যাবে ? তার তো কোনো অধিকার নেই।

কোন্ পরিচয়ে। কোন্ সূত্রে সে বাঁকুড়া যাবে ? যাবে শালগেড়্যা ? অনেক ভেবে চিন্তে মনে পড়ে, অশোককে ধরা যাক। অশোক বাংলা কাগজে গ্রামীণ সংবাদ প্রবন্ধকারে, বা রম্যরচনার মতো করে লেখে বটে।

অশোক বলে, কেন, বাঁকুড়া কেন ?

—এমনি। ঘুরতে।

—তোমার তো বাপু অর্থনীতির কাগজ।

—বা, ঘুরতে যাওয়া যায় না ?

—যেও না। সেখানে কিচ্ছু নেই।

—বিষ্ণুপুর নেই ?

—বিষ্ণুপুর···পোড়ামাটির ঘোড়া...আর সহ্য হয় না, বুঝলে ?

—অসহ্য মনে হয় ?

—খুব। দাঁড়াও ..?

—কি জন্যে ?

—দাঁড়াও, দাঁড়াও বাঁকুড়া...হ্যাঁ···শ্রীহর্ষ···শ্রীহর্ষকে চেনো তো ?

—খুব।

—ও বাঁকুড়া নিয়ে কি একটা···

—অশোক, তুমি যদি মনে করতে না পারবে তো কে পারবে ?

—শ্রীহর্ষের কাছে যাও। এখন তুমদাম যে কোনো জায়গায়...মানে, শহরে যাও তো ঠিক আছে···ভিতরে গেলে...

শ্রীহর্ষের মুখ সর্বদা বিমর্ষ থাকে। সে সর্বদা মুখটি রাখে নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ। সে অত্যন্ত বিমর্ষ গলায় বলে, বাঁকুড়া।

—হ্যাঁ।

—যাবে ?

—হ্যাঁ।

—খোজখাঁজ চাও ?

—কোনো চেনাশোনা···

—আমার চেনা অফিসারকে লিখে দিচ্ছি। সম্ভবত ভূমি সংরক্ষণ, অথবা সেচ, অথবা অরণ্য, অথবা সার প্রকল্প···

—অত বাংলা বলছ কেন ?

—আমাকে বাংলায় লিখতে হয়।

—তিনি কিসে আছেন ?

—সেটাই আধ্যা। আসলে ব্যানার্জি যে কিসে আছে তা আমিও বুঝিনি। কেননা ওকে আমি সবশুদ্ধ তিনঘণ্টা ধরতে পেরেছিলাম···তিন-ঘণ্টাই ও একা কথা বলেছিল। হুংকার ঘোরে।

—তাই লিখে দাও।

—দিচ্ছি। দেখ···নামটা মনে নেই।

—দি দি।

'ছি ছি' বলা সোজা। ওরা না কি সাত ভাই এবং প্রত্যেকের নাম 'রাম' দিয়ে শুরু। দাঁড়াও, দেখি···ওর নাম রামানুগ।

-মানে রামের মতো ?

--ওই বলবে। নাম···পদবী···পিতৃপুরুষ···ও অসম্ভব! অসম্ভব!

—যা হোক, লিখে দাও।

—ঠিকানাটা দেখি। লেখো···

--কি আশ্চর্য, তুমি তো চিঠিই লিখে দিচ্ছ।

কার্যকালে দেখা যায়। রামানুগ ব্যানার্জি অত্যন্ত সহৃদয়, মিশুকে সজ্জন। তিনি একটি নামী ব্যাংকের এজেন্ট। শ্রীহর্ষের নাম করতে তিনি চিনতে পারেন। এবং বলেন, আপনি বিকেলে আমার বাড়িতে আসুন। বলে দিচ্ছি।

—এখানে থাকা যায় কোথায় ?

—হোটেল আছে। আমার ওখানে বর্তমানে অনেক লোকজন...

—বিকেলে আসুন, কেমন ?

—স্থানীয় কাগজ, মানে নিউজ পেপার আপিসগুলো কোথায় হবে ?

—এই হোটেলে উঠুন। চমৎকার বন্দোবস্ত, রান্নাও খারাপ নয়··· ওখান থেকে খুব কাছে.

—অনেক ধন্যবাদ।

রামানুগ একটু অপ্রতিভ গলায় বলেন, বাড়িতে এসেই বুঝবেন, অসুবিধেটা কোথায়।

নিশ্চয় আসব।

হোটেলটি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। সিঁড়ি সরু, তবে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্নান করে অরুণি, খায়। তারপর চৌকিতে শুয়ে শুয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যিই সে মহানাম দত্তের কাছাকাছি এসেছে কি না। সমস্ত ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত।

খুবই চমকপ্রদ এ কাহিনী।

কিন্তু সে তো কোনো কাহিনী চায় না। সে দেখতে চায়, জানতে চায়, এই সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস কেন, কি জন্যে। বিপিন গিরি, যে ছোট চাষী, আবার ভাগেও চাষ করত, সে মহানাম···না, না, বটুকে কি দিয়েছিল, সে জন্যে তাকে এমন সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি ?

কোন্ বিশ্বাসের জোরে ?

অমন একজন মানুষ এবং অরবিন্দ তো দুই গ্রহের মানুষ। কোন ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে, দুজনে বাংলা বললেও কি আদান প্রদান হবে?

রামানুগের বাড়ি পৌঁছয় অরবিন্দ। ছোট, একতলা বাড়ি। ঢুকতে না ঢুকতে ও ভিতরের কোনো ঘর থেকে একটা আর্ত, তীব্র একটানা চিৎকার শোনে।

রামানুগ বলেন, ওটা না শোনার চেষ্টা করুন।

শ্রীহর্ষ যখন এসেছিল বাড়ি খালি ছিল···আমার মা বুঝতেই পারছেন···মাঝে মাঝে পাঠাই হাসপাতালে···এখন এখানে···

—বড় দুর্ভাগ্য।

—সে তো আমাদের। ক্যানসারের যন্ত্রণা।

ঘোরটা কাটলে...

রামানুগ কি ভাবেন। বলেন, যতদিন আশা ছিল, হাসপাতালে···ধরাই পড়ল পরে।

—আমি আপনাকে এখন সময়ে···

—মা তো মুক্তি পান।

—তবু···

—বলুন, কি জানতে চান···

—পাথরবাঁধ থানার ভিতর দিকে কিছু গ্রাম দেখার ইচ্ছে ছিল···মা নে--

—কোন দিকটা?

—শালগেড়্যা নামটা শুনেছিলাম···

—শালগেড়্যা!

এখন চিৎকারটি কমতে থাকে, ক্রমশ। ধীরে ধীরে। ডাক্তার বেরিয়ে আসেন, পিছন পিছন একটি মহিলা। অরবিন্দকে দেখেই তিনি ভিতরে ঢুকে যান।

ডাক্তার বলেন, ইন্‌জেক্‌শানে এখনো কাজ হচ্ছে। তবে বোঝেনই তো···

—খুব বুঝি।

ডাক্তার চলে যান। রামানুগ বলেন, শালগেড়্যা বলছি, তবে কয়েকটা গ্রাম নিয়েই···বিপিন গিরি নামে একজন সমাজকর্মী খুব চেষ্টা করছেন ব্যাংকের সাহায্য নিয়ে আদিবাসীদের সমবায় করে একটা বাসের ব্যবস্থা করতে।

অরুণি গলাটি নিস্তাপ রাখে।

—এ রকম কি হয়েছে না কি?

—কোথায়? ওখানে?

—কোথাও?

—আমার জানা নেই। তবে শুনেছি মেদিনীপুরে কোথায় তারা সমবায় করে বাস চালাচ্ছে। গিরিবাবু তো তাই বলছেন।

—উনি আসেন এখানে?

—খুব আসেন। আমাকে বমকে সিধে করে দেন। এসব···কি বলব· টেকনিকালি ওরা লোন পেতেই পারে, কিন্তু নানান নিয়ম···

—উনি সমাজকর্মী?

—হ্যাঁ। খুব উৎসাহী লোক, বলতেই হবে। এখন তো আসছেন, নয় লোক পাঠাচ্ছেন চারা নেবার জন্যে। ওঁর না কি কয়েক হাজার চারা দরকার। হ্যাঁ। কয়েক হাজার! গিরিবাবু কোনো ছোটখাট ব্যাপারে নাই।

—ওখানে যাব কি করে?

—অল্প বয়স। কষ্ট করে চলে যান। কেতুপুর অবধি তো বাস পাচ্ছেন। তারপর অবশ্য হাঁটবেন। জল হচ্ছে, ও পথে গো গাড়ি চলবে না।

—ওঁকে পাব?

রামনুগ একটু হাসেন। বলেন, এখন সে সর্বত্র বৃক্ষরোপণ করাচ্ছে। থাকবে।

—সরকারী প্ল্যানে?

—সে যা বলেন। ফরেস্টকে যা বলার কথা, তা ব্যাঙ্ককে বলে যাবেন। আমাকে বলবেন, চাইলাম এত, দিল অত! চাইলাম আম, জাম, কাঁঠাল, মহুল, তা যত চাইলাম তত পেলাম না। যদি বলি, আমাকে বলছেন কেন? তখন হাসবে আর বলবে, ওদেরও বলেছি, বলেছি। আপনাকেও বলছি। আসলে···

—কি?

—বলে, আসলে যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি না। ওঁকে সবাই ভয় পায় মশাই। এমন লোক নেই যে গ্রামে নিয়ে যাবে না। সকলকে হাঁটাবে, আর বলবে, স্বচক্ষে দেখে যান যে পথ নেই বলে কত কষ্টে আছি।

—আমি যাব।

—শুনুন, কেতুপুর থেকে লোক নিয়ে যাবেন। হরদম লোক আসে কেতুপুর। সত্যি, রাস্তাটা হয়ে গেলে বাজার হাট ওই বাঁধনিতেই বসতে পারে। অনেক লোক, সম্ভাবনা আছে।

—ওখানে থাকার ব্যবস্থা?

—গিরিবাবু কি অন্যত্র থাকতে দেবে না কি? তার ওখানেই থাকবেন। তার আপনি সাংবাদিক···ওখানকার কথা লিখবেন···দেখবেন! লিখবেন যেন।

—হ্যাঁ, লিখব।

—খুব ভিতরে পড়েছে জায়গাটা। কেউই উৎসাহ করে ও অবধি যায় না।

—সরকারী লোকজন যায়?

—আমিও তো সরকারের চাকুরে।

—উনি ওখানে অনেকদিন আছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ···প্রাচীন ভোটদাতা।

—তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না?

—'তাড়াতাড়ি' শব্দটা এ সব জায়গায় এসে ভুলে যাবেন। কলকাতায় সব আছে, তবু তাড়াতাড়ি কোথাও পৌঁছনো যায় না। যেখানে ঠিকমতো পথই নেই···

—তা বটে।

—তা ছাড়া গ্রাম গঞ্জেও এখনো সূর্যোদয়ে দিন শুরু। সূর্যাস্তেই দিন মোটামুটি শেষ। সন্ধ্যার পরপরই।

—তাও সত্যি।

—খুব সত্যি।

—সব বলে দিচ্ছি। কোত্থেকে বাস ধরবেন, কেতুপুরে গিয়ে মোড়ে চায়ের দোকান, অথবা বাজার, অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নয়তো পঞ্চায়েত···

—আমি খোঁজ করে নেব।

সব বলে দেয় রামানুগ। তারপর বলে, কোনো আতিথ্য করতে পারলাম না···সকলটা তো আমার স্ত্রীর ওপর দিয়েই যায়···

—না না, কথাই ওঠে না।

—বিপিন গিরি কিন্তু অঞ্চল কল্যাণ সমিতির জন্যে চাঁদা নিয়ে নেবে।

—নিশ্চয় নেবেন।

—মদ মহুয়া চাইবেন না।

—না। আমি খাই না।

—আচ্ছা···।

এ ভাবেই ক্রমে ক্রমে অরুণি কাছে যেতে থাকে মহানাম দত্তের, অথবা বটুর অথবা বিপিন গিরির। কাছে না গিয়েও কাছে চলে যায় অনেক। রাতটা কাটুক, ভোর হোক।

বাসটি পথে যথেষ্ট যাত্রী তোলে, ভাত ভরে যায়। অরুণি বোঝে যে কথাবার্তার মধ্যে বৃষ্টির কথা বারবার আসছে।

বাঁকুড়ার প্রত্যাশা পুরিয়ে বৃষ্টি হয়নি, তবে কিছুটা হয়েছে। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলবে ও? না, চুপ করে থাকবে?

কেতুপুর পৌঁছে বাসটি থামে। যতলোক নামে, তার চেয়ে বেশি লোক ওঠে। চায়ের দোকানের দোকানীটি বলে, গিরিবাবুর কাছে যাবেন।

—হ্যাঁ।

—হেঁটে যেতে পারবেন?

—আর তো উপায় নেই।

—উপায় এবার হবেই একটা। গিরিবাবু যখন লেগে আছে, তখন রাস্তা হবে।

—কেউ কি ওদিকে যাবেন?

—দাঁড়ান একটু, লোক আসবে।

—ওখানকার?

—হ্যাঁ, দেখলাম তো চন্দ্র আর মোহনকে। ওরা ফিরবে।

—ওই গ্রামেরই?

হ্যাঁ। হাসপাতালে খবর নিয়ে গেল। চন্দ্রের বাপ। সেই কতদিন হাসপাতালে···

একটি প্রৌঢ় ও একটি যুবক সাঁওতালকে দেখা যায়। দোকানী বলে, এই বাবু···ইনি গিরিবাবুর কাছে যাবেন।

—সরকারী লোক?

—না···কাগজের লোক।

—তিনি কি ঘরে আছেন, না বাঁধনি···চলুন। পথ বিস্তর খারাপ।

—চলুন।

ফরেস্টের পথ মানে ইউক্যালিপটাস ও শালের বনের মধ্য দিয়ে পথ। বয়স্ক লোকটি বলে, চলতে চলতে আর গো গাড়ি চালাতে চালাতে যা পথ হয়েছে।

—চওড়া তো আছে।

—শুনছি বর্ষা কাটলে কাজ হবে।

পথ চলতে চলতে ঘাসে হারায়। তারপর লাল মাটি ও কাঁকরের কর্দমাক্ত ওঠা নামা। বয়স্ক লোকটি বলে, দেখে দেখে যাবেন। গর্তে পড়লে পা খোঁড়া হবে।

না, দেখে দেখে পা ফেলে অরূপি। এ পথেই ওই ভীষণ জেদী মানুষটি যান আর আসেন।

বনের চিত্র বদলে যায় ক্রমশ। ছোট ও মাঝারি শালগাছ। কোনো একটা ঘোরে বুঁদ হয়ে চলে অরূপি। চটি ছিঁড়ে গোবর।

চটি খুলে হাতে নিন-যুবকটি বলে।

সামনে কাদা। অরূপি চটি খুলে হাতে নেয়। যুবকটি বলে, বাবাকে ছাড়বে কবে?

—থাক না এখন।

ক্রমে জঙ্গল পাতলা হয়, ফুরায়। কোথাও জলের ঝরঝর শব্দ। প্রৌঢ়টি বলে, কুনাই নালা। জল খানিক পেয়েছে কি নাচতে লেগেছে।

—আপনারা কি বাংলাই বলেন?

—না না। তবে আমাদের কথা তো আপনি বুঝবেন না। উলটা-পালটা ভাববেন।

—কি ভাবব?

—থাক সে কথা।

—আপনারা কি করেন?

যুবকটি হেসে বলে, এক্সচেঞ্জে নাম রিনিউ করি আর চাষ করি। ইনি ফরেস্টে অনেক কাল, যাকে বলে...কি বলে?

—ওই হল, কি যেন বলে! বছরে কয়েক মাস...তা আর কিছু নেই তো মজুরি খাটি।

চলতে চলতে ক্রমশ পথ ফুরায়। শালগেড়্যা গ্রামটি কয়েকটি ভিহি বা পাড়ায় বিভক্ত। মানুষ অনেক। এ সব খবর যুবকটিই দেয়। ওর নাম চন্দ্র বেসরা। ওর সঙ্গীর নাম মোহন টুডু।

—এ গ্রামে সবাই সাঁওতাল।

—না না। আরো আছে। চলুন বাঁ দিকে চলুন। গিরিবাবু ঘরে আছে কি নেই চলুন।

চারচালা ঘর। উঁচু দাওয়া। কিন্তু ঘরটি চোখে পড়ে না আগে। গাছ, অনেক গাছ। একটি অতিকায় শাল গাছ। প্রৌঢ়টি নিশ্বাস ফেলে বলে, দেখে নিন। এমন গাছ আজকাল দেখতে পাবেন না।

—কে, মোহন?

অরুণি থমকে দাঁড়ায়, গাছে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন কে?

—গিরিবাবু, ইনি আপনার কাছে এসেছেন।

—আমার কাছে?

চৌকো চোয়াল, মজবুত কাঠামো। ছোট করে ছাঁটা চুল সাদা। ঘনভুরু এখনো কালো।

—আমি বিপিন গিরি। আপনি?

—আমি ..অরুণি দত্ত ..

—কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে।

—কেন?

—আমি সাংবাদিক।

অরুণি এগিয়ে আসে। এখন তাকে সহজ হতে হবে, স্বাভাবিক।

—শ্রীহর্ষ সেন বাঁকুড়ার ওপর কিছু রিপোর্ট করেছিল এদিকটায় আসা হয়নি ওর। আমার বাঁকুড়া আসার কথা শুনে ও বলল, আর এই যে, রামানুগ বাবুও বললেন...

—আসুন আসুন বাইরে কেন?

—আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না···আমি তো বয়সে অনেক ছোট···

—ও বাবা! তাই পারি? কলকাতার সাংবাদিক, এত পথ হেঁটে শালগেড়্যা

সাঁওতালীতে ওদেরকে সম্ভবত এই কথাগুলিই বলেন। ওরা হাসে। তারপর উনি বলেন, না বাপু। এবার সামনে বাংলা বল বামেলা এখন অনেক, জানলেন? আসুন।

বাইরে থেকে দাওয়ায় উঠতেই যেন ছায়া গভীর হয়ে আসে। উনি বলেন, যে যার ভাষায় কথা বলবে, অ্যাঁ? তা যারা বুঝে না, তারা বলে, ও কি ভাষা? তোমরা কি ঝাড়খণ্ডী?

—ঝাড়খণ্ডী?

—এখন তো সব ভূত দেখছে।

—আমার প্রেসক্রাইব দেখাও।

—ইংরিজি তায় ছোট হরফ বুঝব? না, চোখটা দেখাতে হবে। চশমা নিলাম, জানেন? ছাত্রের দাদা, পয়সা তো নিল না... কিন্তু চশমায় সুবিধে হচ্ছে না।...দেখি! অ এ কাগজ.. ইংরিজি?

—হ্যাঁ.. অর্থনীতির ওপর জোর বেশি কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিও আমি লিখি।

বেশ বেশ! তা কেন্দুপুর অবধি?

যাবে।

—ওঃ নাচাতে নাচাতে এনেছে তো?

—হ্যাঁ, খুব ভীড়।

—এই তো? এসে বুঝবেন তো আমরা কেমন অবস্থায় থাকি খাস্তা নিয়ে কবে থেকে···দাঁড়ান, আগে হাত মুখ ধোন।

চন্দ্র ও মোহন এখনো দাঁড়িয়ে। ওদের সঙ্গে কথা বলেন খানিক। বলেন টাউনে নিতে হবে চন্দ্র।

—এখন তো ভাল আছে।

—না, একবার দেখানো দরকার।

—ছেড়ে দিলে আর ঢোকাবে?

—নয় সদরে ঢুকাব। কেন্দুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র···আমি যাব···ঢুকাবে না মানে?

ওরা চলে যায়। উনি বলেন, দাঁড়ান,, অতিথি সেবা করি আগে। কই গো, চরণের বউ?

—কেন, নাম বলতে কি হচ্ছে?

এক শক্তসমর্থ প্রৌঢ়া এসে দাঁড়ায়।

—ওই হল। ইনি হলেন ভাস্তিমণি। ভাস্তিমণিটুডু। এতদিন কুসের মা বলতাম। তা যখন থেকে ছেলের সঙ্গে বিবাদ করছে, ওকে চরণের বউ বলছি।

—নাও, বলো।

—ইনি কলকাতার লোক···অতিথি···কুয়োপাড়ে নিয়ে যাও···জল তুলে দাও···মুড়ি দাও। চা আবার চলে না, জানলেন? এবার চলে। চা করে দিও জানলে?

—তুমি কোথায় চললে?

—আসছি, আসছি। আমাদের এখন গাছ লাগান চলছে, জানলেন?

—সরকারী স্কীমে?

—ওই হল। খুব বক্তৃতা কেতুপুরে···একটি গাছ···একটি প্রাণ···তা আমি বললাম, যে যার ঘরে···বাঁধ পড়ে গাছ লাগাবে, তা আমি তো কবেই গাছ চেয়েছি। দিচ্ছ তো নাই?

—হ্যাঁ, রামানুগবাবুও বলছিলেন।

—তা, দিয়েছে কিছু···

—চলুন না, আমিও যাই?

—ক্যামেরা আছে? ফোটো নেবেন?

—আছে, চলুন।

জাহ্নবমণি বলে, না না। উনি বসুক। তুমি যা পার, উনি তাই পারে?

—বেশ তো, ঘুরে আসি আমি। তুই একে জল দে, চা দে···

উনি নেমে যান।

জাহ্নবমণি বলে, এই এক লোক বটে! তা তুমি কেন বসে আছ ছেলে, এসো।

অরুণি বলে, ব্যাগটা রাখি।

—ঘরে রাখো।

অরুণিও তো দেখে নিতে চায় সব। ওঁর ঘর, ওঁর থাকার জায়গা। এখানেই তো···রাঙা মাটির দেয়াল, অর্ধেকটা সমান্তরালে কালো রং করা। ঘরের দু'পাশে দুটি চৌকি। মাঝ দিয়ে দড়ি টাঙানো। যৎসামান্য জামা কাপড়।

—ঘরের দু'দিকেই টানা দালান। উঠোনে অজস্র শিশু চারা। গোড়ায় মাটি, পৌটলা করে গোড়া বাঁধা। ও পাশে আরো ঘর, পরপর। জাহ্নবমণি বলে, কুয়াতে চলো।

অরুণি স্নান করে নেয়। নিজেই জল তোলে। কুয়োতলা বাঁধানো

সেখানে নালা কাটা। ওই জল গিয়ে জমছে কোনো জলাশয়ে···

—ওটা কি পুকুর নাকি ?

কুয়ার পাড়ের জল জমছে তো জমছে। সে তো নষ্ট করতে দিবে না কিছু। ছেলেরা ওটা বড়ই করল। জল থাকে...খরা দেশ···সে বলে, তোমাদের মাছ চাষ করে দেখাব।

স্নান করে দেহ জুড়ায়। ওই ছোট ঝর্ণা ধারের পাশেও গাছ।

—এ গ্রামে গাছ অনেক, তাই না ?

—সে গুঁড়া মেরে মেরে···

অরণিকে দাওয়ায় বাবুই ঘাসের চড়িতে বোনা মাদুরে বসায় জাস্তিমণি। দালানের কোণে অনেকগুলি খেজুরপাতার চাটাই গুটিয়ে রাখা। দরজার ঝনকাঠের মাথায় চোখে পড়ে অঞ্চল কল্যাণ পরিষদ/রেজে ···লেখা কাঠের তক্তা।

মুড়ি, চা, দুধহীন।

—আপনি সব করেন ?

—আমিই করি। আর যে যেমন পারে...

দাওয়ার আরেক কোণে লাঙল, শাবল কোদাল।

—ওঁর চাষ আছে ?

—আছে।

—কি করে ?

—যে যেমন পারে। সমিতির নামে। ও র কি ! তার খেলেই হল।

—উনি কোথায় গেলেন ?

আকাশের দিকে তাকায় জাস্তিমণি। বলে, এই এসে পড়বে, যদি না বাঁধনি গিয়ে থাকে। এখন তো বেলা ক'টা ? বারোটা হবে ?

—বেজে গেছে।

—ছেলে ! ওই ঘড়িটা চাবি দিয়ে দাও। আমি পারি না গো ! কতবার শিখাল।

শক্ত কাঠের তাকে কাগজপত্র, ফাইল, ডট কলম, সরকার প্রকাশিত আইন বিষয়ক বই। মৎস্যজীবী, ক্ষেতমজুর, পঞ্চায়েত, নানারকম বই।

—ওতে হাত দিও না ছেলে।

জাস্তিমণি দরজার দু'দিকে হাত রেখে দাঁড়ায়। বলে, সব অঞ্চল সমিতির রেকর্ড বটে, হ্যাঁ। ছোট ছেলেও হাত দেয় না। গিরিবাবু

গদাগদ মারে।

—না, দেখছি

—তুমি দাওয়ায় বোস।

জাতিমণি রান্না করতে চলে যায়।

—উনি কোথায় গেলেন?

—তা সেই জানে।

এমন সময় একটি কিশোর আসে। চলেন চলেন, গিরিবাবু ডাকছে।

জাতিমণি হেঁকে বলে, সে কোথায়?

—ইস্কুলবাড়ি।

—তবে তো হয়ে গেল।

—ক্যামেরা নিয়ে চলেন।

শালগেড়্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়। জীর্ণ ঘর। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উনি বলেন, আহুর দেখুন! ইস্কুল তো জমিদারী আমলের···দেখে নেন, ছবি তোলেন। হ্যাঁ ভাল করে তুলবেন। দেখেন, এই স্কুলে দুই শতাধিক ছেলেমেয়ে পড়ে, চারটা ক্লাস।

—কোথায় বসে?

—শুকনা দিনে গাছতলায়। বর্ষা হলে তো ছাত্র পালায়। এখন সমিতির ঘরে··· ইনি মাস্টার। একজন মাস্টার ছানলেন?

—ইনি?

—হ্যাঁ। সুদীন পাঠক। তা এই ছেলে এসেছিল বলে আট বছর স্কুলটা চলছে। সব কাগজ দিয়ে দেব মিশায়। চন্দ্রটার হাতের লেখা ভাল। সে কপি করতে লেগেছে।

অরণি ছবি নেয়।

—কে খুঁটা দিল, কে খড় দিল, এভাবে কি ইস্কুল চলে? মাস্টার তো মোটে দিচ্ছে না। সাতাত্তর সালে সেই যে বনপতি সরেনকে বদলি করল, তা সে পোস্টে লোক পাঠায় না।

—সাত বছর ইনি একা চালাচ্ছেন?

—একা! সমিতি থেকে আমরা জেলায়, কলকাতায় দরখাস্ত করেই যাচ্ছি, তারা বলছে, হ্যাঁ, দিব। কিন্তু আজও···

—এগুলো বিষয়ে কাগজ পাব?

—সব দিয়ে দিব। এটা আদিবাসী এলাকা। সমিতি থেকে দাবী উঠাচ্ছে। যুক্ত পদে শিক্ষক দাও। দু'জন আদিবাসী শিক্ষক দাও। ইস্কুল বাড়ি পাকা কর।

হবে?

—এখনো হয় নাই। আদায় করতে পারবে কি পারবে না তা সমিতি বুঝে দেখুক কেন।

—আপনি তো সঙ্গে আছেন।

—কোন্ চুলোয় যাব? চলেন, গাঁও দেখাই।

হাঁটাটায় কোন্ বৈশিষ্ট্য? অরণি গোকুলেশ্বর নয়। মানুষকে চিনে নেবার চিত্র বা লক্ষণ তার মস্তিষ্ক ফোটোগ্রাফ করে না। এ লোকটি যে বিপিন গিরি, সে সম্মান গোকুলেশ্বর রক্ষা করে চলেছে। অরণি কি পারবে না?

লম্বা, দীর্ঘ পুকুর। চারদিকে ঘন করে বুনে দেওয়া গাছ। একদিকের চালে, শাকসবজির চাষ।

—ওগুলো এরাই করেছে। বাঁধটা, হ্যাঁ, অকল থেকে সংস্কার করিয়েছে এরা, আর নিজেরা কাজ করেছে।

—এত গাছ!

—তা বছরের পর বছর এরাদের দিয়ে গাছ লাগাচ্ছি, নয়? সরকারকে তো বলি, এ পুকুর হে! গরিবকে, বেশি কিছু চাই না কয়েকটা মহুল কেঁদ, কয়েকটা জাগল দাও, তাতেই চলে যাবে।

—মহুল দিতে চায় না।

—এখন দিচ্ছে কিছু। তারা বলে, মহুল বড় হতে বিশ বছর। আমি বলি, সে তারা বুঝবে। এখন তবু···চলেন চলেন...

সমিতি স্থাপিত, ক্লাবঘর। এই মাঠে খেলা হয়, মেলা পরব হয়, সাঁওতালরা তীর চালায়, সে অনেক···

মাথা নেড়ে বলেন, ইস্কুলে তো চন্দ্রকেই নিতে পারে। জাহিমণির মেয়ে পথমণিটা পাশ করেও কাজ পেল না, তো এতদিনে বুনিয়াদী শিক্ষা কলেজে গেছে।

—শালগেড়্যা কত বড় গ্রাম?

—কয়েকটা তো ডিহি। ওই পাথরগেড়্যা, ওই বাঁধনি, দূরে দূরে গ্রাম ওগুলো। সব দেখতে পারবেন না, আকাশও ঝাঁপ টানছে। কয়েকদিন

থাকলে···

—আবার আসব।

—কি, আজই যাবেন?

—না না। কাল, বা পরশু।

—স্নান করে নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কি চমৎকার জল।

—কিছু ছিল না···দিনে দিনে···বারতী জমি, তাও তো কতজন ছেড়ে দিল···

—আপনি এখানেই জন্মেছেন?

—জন্মালে জন্মেছি, না জন্মালে না জন্মেছি, এটা দেশ তো বটে। কোথা জন্ম নিলেই সেটা দেশ হয়? যেথা বসবাস সেটা দেশ নয়? তাহলে পূর্ববঙ্গ থেকে যারা এল, তাদের এটা দেশ নয়?

-নিশ্চয়।

—বাঁধের ফটো নিলেন?

-নিলাম।

—এই অর্জুন গাছটার ফটো তোলেন। এই যে মহীরুহ গাছটা।

অরণি ছবি তোলে।

—অর্জুন সিধা উঠবে ইনি খানিক উঠলেন, তা বাদে চারদিকে ছড়াচ্ছেন।

—ভারি সুন্দর গাছটি।

—ও বাবা! অর্জুন হল দেবতা গাছ।

—শাল নয়?

—শাল হল এদের জীবন। অর্জুন গাছের ছাল বাকল অনেক ওষুধে লাগে···

—এ গ্রামে অনেকই গাছ।

বিপিন গিরি সগর্বে বলেন। খরা অকালেও দনাদন ব্যক্তিমালিকানার গাছ বেচতে দেই না। খুব বুকাই। পেটের কাছে বুক মানে না। তা, একটা কাটলে তো দশটা লাগাও। ওই, ওই মাস্টার। ও শিক্ষা বেচছে কত? এখন ওর দেখাদেখতা সবাই একটা দুটা!

অরণি চলতে থাকে। 'নিজে চাষ করে···তবে জেনেছিলাম···' এখানে কি লোকটা শুধু গাছ পুঁতেছে? নিজেকে পুঁতে দিয়েছে। তাতেই বেঁচে

আছে, সঞ্জীব আছে।

—কি ভাবছেন ?

—আপনাকে দেখছি।

—দেখুন···আমিও আপনাকে দেখছি।

—কি দেখছেন ?

—আমরা জঙ্গল এলাকায় থাকি বাইরের মানুষ এলে হাঁ করে দেখি। আসুন।

ক্রমে ওরা একটি বাড়ি উচ্চ টিলায় ওঠে

—বড় পবিত্র স্থান, জানলেন ?

—পূজা হয় ?

—না। দেখেন সাঁওতাল যুদ্ধের কালে এখানে সিংরাই আর কারো, দুই মুর্মু ভাই যুদ্ধ করেছিল।

—কোনো তথ্য পেয়েছেন ?

—লিখা তথ্য পাই নাই।

—তাহলে ?

অসীম উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যে উনি হাসেন। বলেন, লিখেন তো আপনারা। ওরা গান বাঁধে। যারা লিখে না, তারা যা বলে, সেটা সত্য নয় ?

জাতিমণির মা খুব বুড়ী ছিল। মেঘ গরজালে সে বলত, ওই সিংরাই ডাকে, ওই কারো ডাকে। তা এটা ইতিহাস নয় ?

—নিশ্চয় তেমন কিছু ঘটে থাকবে।

—আটাত্তরের কুমারি নালা সব ভাসিয়ে দিল। তা নিয়েও ওরা গান বাঁধে।

—হ্যাঁ, সে বন্যা তো আজকের ঘটনা।

—আপনারা বুঝবেন না। তখন কি হয়েছিল...সব ঘটনা কে লিখে রেখেছে ?

—এটাও সত্যি।

অরুণি চোখ কুঁচকে দুঃসাহসে বলে ফেলে, তেভাগার ব্যাপারেও তো সব কথা জানা যায় নি। সব লেখাই হয় নি।

উনি সেটা শুনেও শোনেন না। বলেন, লেখাপড়া জানা লোক, অন্যে কি লিখেছে, ঠোক মেরে পড়ল···এ ঘটা আয়না তিন ঘন্টায় দেখে নিল···নয়

টাউনে বসে যা জানবার পেলে নিল···ব্যস্ লিখে দিল ! বই ।

—হ্যাঁ তা হয় তো

—আপনারা বুঝবেন না । আপনারা আমাদের ভাষাই বুঝেন না । এই দেখেন, পাথর ঢিবা দিয়ে বেড় দিয়েছে ওরা । সিংকাসু দিবসে এখানে ওরা ফুল পরব মনায় ।

—অনেক লোক হয় ?

—শালগেড়্যা···পাথরগেড়্যা···বাঁদনি···সেদিন তো কেতুপুরেও হয়··· তা খানিক লোক হয় বটে । আমাদের শালগেড়্যার প্রবীণ মাহাত এ সব লিখছিল । তা দেরে দেরে মোরা সার, কে তার বই ছাপছে···ছেলেটা চাকরি পেয়ে চলে গেল । চলেন !

—কোথায় ?

—মেঘের ফাঁকে রোদ দিলছে । ওই, ওই মেঘটায় জল আসবে । চলেন চলেন···জ্যোৎস্নাবাবু আমাকে খ্যাচাবে ।

—খুব রাশভারি মহিলা । আমাকে সাবধান করছেন, সমিতির কাগজে হাত দিও না ।

—বলেনি, গিরিবাবু গদাগদ পিটাবে ?

—তাও বলেছেন ।

—না, এখন আর পিটাই না । চলেন ।

—জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না ।

—এখান থেকে সূর্য ডুবা দেখতে বড় ভাল । না, ওই পাথর চাটাতে উঠবেন না । ওখানে সিংরাই আর কারো এসে মরেছিল ।

—কোনো ফলক ?

—গাছ বুনে দিতাম । পাথরে তো গাছ হবে না । ঘের দিয়ে এ বছর শাল চারা···বড় হবে না, বড় পাথর । দেখি !

—চলুন ।

—চলুন, চলতে চলতে জ্যোতিমণির কথা বলি । পদ্মমণির কথা তো বললাম । চরণ অনেকদিন জ্যোতিমণিকে ছেড়ে চলে গেছে ।

—কোথায় ?

—সে বোধহয় মরেও গেছে.. খড়গপুর গিয়েছিল.. তা জ্যোতিমণির ছেলে কুশ, সে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে বউ নিয়ে···আমি দোষ দিই না । রেলে চাকরি পেয়েছে, ছোট হলেও বাসা···তা চরণ অমন করেছিল বলে

ওকে 'চরণের বউ' বলা যাবে না। ও ছিল 'কুশের মা'। এখন রেগে আছে তাই তাও বলা যাবে না ফলে উনি এখন জাহ্নবমণি।

—চাকরি পেয়েছে চলে যাবে

—জাহ্নবমণিই বলবে। চলুন, আমি তো স্নান করব।

—আমিও যাই?

—চলেন চলেন তবে জল এখন খানিক ঠাণ্ডা বটে।

—হোক।

—সাঁতার জানেন?

—পাড়ে ডুব দেব।

গাছের ছায়া ঘেরা বাঁধে, অবশ্য পুকুরকেই এরা বাঁধ বলছে, সে বাঁধে নেমে বিপিন বেরা মাটি দিয়ে গা মাজেন। বলেন, কাদা মাটি একটু পেলেও গা পরিষ্কার।

অরুণি ডুব দেয় কয়েকবার। ওর গামছায় গা মোছে। উনি বলেন, আজ আর কিছু করব না। আপনার সঙ্গে কথা বলব। চলুন, দেখি জাহ্নবমণি কি রাঁধল?

—রান্নাঘরের দাওয়ায় খেজুরপাতার চাটাইয়ে বসা। ঝকঝকে ভারি অ্যালুমিনিয়ামের থালায় লালচে গরম ভাত, শাক ভাজা, কুমড়োর তরকারি, কলাই ডাল।

বিপিন মালী ভাত শুকনো খান, তরকারির টাকনা দিয়ে। শালপাতার দনাতে ডাল ও তরকারি। বলেন, মেখে খান আপনি, যেমন অভ্যাস।

জাহ্নবমণি আরো ভাত আনে।

— আর পারব না।

—পারবে পারবে। অ ছেলে, কুয়ার জল খুব হজমী। খেয়ে বলতে পারবে জঙ্গলে কি খেয়ে এসেছ।

খেতে খেতে তিনটে বাজে।

বিপিন বলেন, আমার সময় এইটা। সকালে পান্তা, এমন সময়ে ভাত, রাতে দুটো মুড়ি খেলাম কি খেলাম না।

—আমি তো দু'বেলার মতো খেলাম।

—হ্যাঁ...কলকাতার জলে পেট মেরে দেয় বটে! কি জাহ্নবমণি, কুশের উপর রাগ কেন তা বাবুকে বলো।

—সে গেল গেল, বউ নিবে কেন?

—থাকবে না রে বাপু। সবাই সংসার রেখে যাচ্ছে, ও বা বউ রাখবে কেন? এটা একটা ব্যাপার বটে, জানলেন? ভালো চাকরি পেলে শহরবাসী হবে, গ্রামকে ছেড়ে দেবে, অন্তত মনের সম্পর্ক কমে যাবে। কুশ তেমন করবে না গো! সামান্য কাজ পেয়েছে, বউকে শহর দেখাতে গেছে।

জাস্টিসদি বলে, সংসারটা তুলে নেবে না তো? আমার সেই চিন্তা।

—আমি আছি না? কি! কুশকে চাকরি ছাড়া করাব?

—না না না, তাই বলেছি?

—তবে কি বলব, কুশের মা?

—সে আসুক আগে।

ওঁরা আঁচিয়ে দাওয়ায় এসে বসেন। বৃষ্টি নামে। ক্রমে বৃষ্টির ঝালর সব ঝাপসা করে দেয়। বিপিন মালীর মুখে কথা নেই। উনি কি যেন ভাবছেন আর ভাবছেন।

অরুণির মনে হয়, দুজনের মধ্যবর্তী শূন্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে। কোনো উত্তেজনা। ও অপেক্ষা করে। চেয়ে থাকে।

—আপনি কে? কেন এসেছেন?

—আমি···আমি···সুনাম দত্তের ছেলে।

—কে সুনাম দত্ত?

—আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন···

—তা পারি।

—আপনাকে একটু বলি···

—বলুন।

—অরুণি বলতে থাকে...বলে চলে···ঘন ভুরুর নিচে কালো চোখ, চৌকো চোয়াল শক্ত হয়।

—কোথায় সে সব ক্যাসেট?

—এই তো।

—আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি না।

—করবেন না।

—এখন আমি চাইলে আপনার মেশিন কেড়ে রেখে আপনাকে বের করে দিতে পারি। ধরুন, মেরে ধরেও···

—সব পারেন। শুধু একবারটি শুনুন।

—বৃষ্টির শব্দ! আঃ, বাঁধটা ভরুক, তারপরে থামিস রে! বান

মজাস না। কই, চলুন! ঘরে চলুন। হ্যাঁ, আমার সামনে বসুন। বেশ মেশিন, নয়? যেমন কথা শুনা যায়। প্রবীণ একটা কিনেছে। করম কারাম, সহরার পরবের গান তুলেছে। এলে পরে শুনায়। কই, আপনার মেশিন কোথায়?

শিকার এখন বাঘবন্দী। বিপিন গিরি এখন বাঘ।

অরণি ও'র হাতে বন্দী।

—কেন, কি, সব বলি।

—বলেছেন তো।

—বেশ! কাগজে লিখি···

—বলেছেন। যা বলেছেন, তা দু'বার বলবেন না। টেপ চালান। গোকুলেশ্বর রায়, তারপরে নিতাই খাস্তগীর, তারপরে জয়ানন্দ প্রামাণিক, তারপরে গোকুলেশ্বর রায়।

মাঝে মাঝে থামতে হয়। উনি একবার উঠে হ্যারিকেন জ্বালেন। একবার বাইরে যান। অরণিকেও একবার যেতে হয়। হ্যারিকেনের আলোতে ও'র মুখ খুব নৈর্ব্যক্তিক। যেন কে কার কথা বলছে।

বহু সময় যায়।

সন্ধ্যা কেটে রাত এসেছে। চারদিক নিঃশব্দ।

বিপিনের মুখে দুর্বোধ্য হাসি।

—শুনলাম।

—শোনাতেই এনেছিলাম।

—আপনি সঠিক কি জানতে চান?

—আমি···আপনার সম্পর্কে একটি কথাও লিখব না···কাউকে বলব ···শুধু একবার বলুন, আমাকে বলুন...

—আমি তো মহানাম দত্ত নই।

—বিপিন গিরি। আমি জানি। আপনি বিপিন গিরিই থাকবেন। কেউ আসবে না অতীত জানতে। শুধু আমার...

অরণির ঠোঁট কাঁপে। চোখ ভিজে ওঠে।

—সে কি! এমন খবর রটালে আপনার কত নাম হবে, কত যশ—

—না। গোকুলেশ্বর পেরেছেন। আমি পারব না? বেশ! আপনি বিপিন গিরি। বিপিন গিরি কেমন করে কাকদ্বীপ থেকে এখানে এলেন, তাই বলুন। শুধু তাই।

—কেন বলুন তো ?

—তখনকার মানুষজন সবাই প্রায় হতাশ অনেকে জীবনে খুব সফল কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগাযোগ কারো নেই আজ আমি যাঁদের দেখলাম

—আপনারও তো নেই।

—আমার নেই, আমাদের নেই···আপনি বেঁচে আছেন···এদের নিয়ে বেঁচে আছেন···এটা মস্ত বড় জিনিস···এটাকে শ্রদ্ধা করব না ? কি বললে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন ?

—বেশ, বিশ্বাস করছি।

—করছেন ? আমাকে বিশ্বাস করছেন ?

—কেন করব না ? বিপিন গিন্নির বিষয়ে তো কিছু গোপন নাই। সবাই জানে।

—বেশ। বিপিন গিন্নি···আপনি···সেই লোক তো···

—হয়তো।

হঠাৎ হেসে ওঠেন বিপিন। বলেন, এত এত সাক্ষ্য প্রমাণ না বলি কি করে ?

—কেমন করে এখানে এলেন ?

—বলব। তবে টেপ চালাতে দিব না। আর আমাকে মহানাম দত্ত বলে মানুষকে ভুল বুঝাবার কোনো চেষ্টা করতে দিব না।

— না, করব না।

—করলে সুবিধা হবে না। শালগেড়্যা ছেড়ে কোথায় যাব তা কেও জানবে না।

—না না, এতকাজ করছেন ! এদের সঙ্গে অমন কি আপনাকে করতে দিই ?

—বেশ ! আর যা ছাতামাথা রেকর্ড করেছেন, তা নিয়ে কি করবেন ?

—ব্যবহার করব না।

—না, করবেন না। এখানকার মানুষজনকে আমি বড় ডরাই গো, শিক্ষিতকে ভয় পাই। মোটে তো সাতষট্টি বছর হল। এখনো জীবনটা পড়ে আছে না ? বাঁচতে হবে না ?

—বলবেন ?

—দাঁড়ান, একটু মুড়ি খান। রাতে তো ভাত খাবেন না, রাখিও নাই।

তা জল ভাত আছে।

—না না, পারব না।

—আমি তো খাব। আর বাইরে যেতে টর্চ নেবেন। এ সময়টা...

—খুব উৎপাত ?

—খুব।

—মরে অনেক ?

—মরে। হাসপাতালে নিতে পারলে...তবে অত পথ হেঁটে নিতে নিতে.. রাস্তা চাই। চাই ইস্কুল। ছ মাইল যেয়ে কে পড়বে জুনিয়র হাই স্কুলে ? গরিবের পড়া পড়তেই দিত না ঘরে ভাত নেই ..যা হোক, যদি যা যাচ্ছে এখন, তখন প্রাইমারিতেই শেষ। আমি যখন আসি, তখন গরিবে কেউ অ-আ চিনত না, জানেন ?

বিপিন খুবই আত্মস্থ। কুয়োপাড়ে যান, হাত মুখ ধোন, এক বালতি জল আনেন। তারপর জল ঢেলে মুড়ি খান। আবার জল খান ঘটি থেকে। তারপর বসেন দরজা দুটি বন্ধ করে। বলেন, বলুন।

—বসেছি।

অরুণিও আত্মস্থ বোধ করছে। না, ওঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে জল ঘোলা করবার কোনো অধিকার তার নেই। যাঁরা সত্যতায় জানতে চান, তাঁদের কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা মিটাবার জন্যেও নয়।

বিপিন বলেন, বলছি। খুব সংক্ষেপে।

সাত

বাইরে ঝিমঝিমে বৃষ্টি। চৌত্রিশ বছর আগেকার কোনো রক্তাক্ত অন্ধকার মাটি থেকে পর্দা উঠছে। এর কোনো প্রমাণ থাকছে না।

গভীর, গভীর শান্তি।

—বটু দত্তের কথা জানি না। বিপিন গিরি, আমি, সাপে কেটে মারা যাইনি। ওরা কি বলছে তা মুছে ফেলে দিন।

—দেব।

—ভুলে যান।

—যাব।

—তাহলে বলি। মাতলা সরেন মরেই যায়। দুর্ভিক্ষের পরে যারা ওখানে গিয়েছিল, মানে যে সব সাঁওতালরা···তব খুব ডাকাবুকো ছিল ও

আমাকে আর সনাতনকে টেনে নিয়ে নৌকোতে ওঠায়···ওখানে থাকলে নাও চালানো জানতে হবে···ভব সরেনও জানত। ওখানে খালগুলোর জাত হচ্ছে, কোয়ারে ভাসবে, ভাঁটায় কাদায় ডোবাবে। সেভাবে খালে বেয়ে গুঁড়ি ধরে আংনায় পড়া গেল ..তা সনাতনের তত লাগেনি···সেও লগা ধরে এভাবে ওরা কোনোমতে পরদিন বিকালে বাঁধাঘাটে পৌঁছয়। বাঁধা-ঘাটে কিছু সাঁওতাল ছিল।

—বাঁধাঘাট কোথায় ?

—স্বভাবতই মেদিনীপুরে।

—তারপর ?

—সেখানেই থাকা হয়। শুনছি চারদিকে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে। কয়েকদিনে চলবার মত হলে ওদের সঙ্গে, যেন খাটতে যাওয়া সাঁওতাল, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছি। পথে কাজ মিললে করছি। ওদের ভাষা বলতে তো কোন অসুবিধে নেই···

—কেউ চেনে নি ?

—আমরা কি নেতা, যে ফটো থাকবে ? °ভাগচাষীর ফটো উঠাবে কে ? ঘুরতে ঘুরতে শেষে পৌঁছাই ময়ূরভঞ্জের কাছে। ময়ূরভঞ্জ থেকে সুবর্ণরেখা পারালেই নয়াগ্রাম। ভবর আত্মীয়রা ছিল। সেখান থেকেই ঠিক হল যে ভবর গ্রাম পাথরগেড়্যা যাওয়া হবে।

—এই পাথরগেড়্যা ?

—না, এখন যা কেতুপুর, তাই ছিল পাথরগেড়্যা। মানে মৌজাই ছিল পাথরগেড়্যা। পাথরগেড়্যা-কেতুপুর, পাথরগেড়্যা-সাতডিহা, এমন। তা সনাতন নয়াগ্রামে থেকে যায়। পরে ফিরে গেছে কি না জানি না।

—ভব সঙ্গে এলেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন প্রবীণের মাতামহ বিকর্ণ মাহাতর অনেক জমি... সে বলল, বসত তো করবেন···আমাদের ছেলেদের যদি লেখাপড়া শিখান তো আমি আপনাকে বসত করাব। বললাম, শিখাব। তা হাঁস, খড়, সব চেয়ে চিত্তে ইস্কুল হল। পাঁচ বিঘা জমি দিল···তা বলি, ইস্কুলকে দান করুন।

—ভব বেঁচে আছেন ?

—না।

—এখান থেকে কাকদ্বীপ গিছলেন ?

—ভাতের জন্য। তাছাড়া এরা তো চির উদ্বাস্তু। বন কেটে হাসিল করে জমি···কি যত্নে আছে তা বুঝে না···জায়গা বড় হয়···এরা উচ্ছেদ হয় ···আকালে গিয়েছিল···একে জানে, অমুক কুটুম, এমন সুতো ধরে চলে যায় ভাতের জন্যে এরা আসাম যায়, জলপাইগুড়ি যায় ওখানেও গিয়েছিল।

—তারপর ?

—কেতুপুর বড় হল। পাথরগেড়্যা নাম মুছে গেল। তখনি শালগেড়্যাতে আসার ইচ্ছা···এখানে ইস্কুল নাই···পথ নাই···কেতুপুর আমাকে ছাড়তে চায়নি। তা ধিকর্ণকে বললাম, ভাই! আমার তো বিদ্যা নাই, ডিগ্রি নাই···স্কুল মজুরি পেয়েছে আমাকে বিদায় দাও। কেতুপুর অবধি রাস্তা, বাস, সব নিয়েই করেছি।

—সেই থেকে এখানে ?

—হ্যাঁ···তবব কারণে ওদের সমাজে পরিচয় তো বিস্তর। আর যে লোক ওদের ভাষা বলে, ওদের ভালবাসে···তাকে ওরা আপন জন ভাবে। এটা ওদের মস্ত গুণ।

—তারপর ?

—আর তো কিছু নাই। আজ বহু বৎসর এখানে। দ্বিতীয় নির্বাচন থেকে ভোট দিচ্ছি···আর যে কি পাগলামি করছি, তা তো দেখলেন।

—খুব বড় কাজ করছেন।

—কাল অনেক কাগজ দিব। চন্দ্র কপি করছে। ইস্কুলের কথা··· শিক্ষক চাই রাস্তা.. তা বাদে জাতি পরিচয় পত্র পাচ্ছে না জুনিয়র হাইস্কুল নাই বলে শিক্ষা আগাচ্ছে না সব নিয়ে রাতদিন আমরা লেগে আছি।

—দেবেন।

—ইংরাজিতে নয় ..বাংলায় লিখবেন···সমিতির নাম দিয়েই লিখবেন ···আমার নাম নয়। আগে এরা ভাবত গিরিবাবু নির্বাচনে দাঁড়ায় কি না···আমি বলি, না না।

—আপনি তো স্বেচ্ছাসৈনিক।

—বেশ কথাটি বললেন তো!

—বটু বলতেন।

—তা হবে।

—সেখানে আপনার···বিপিন গিরির···পরিবার তো ছিল।

—সব নিয়ে যায় সনাতন। এই বিপিন গিরির এখন মস্ত পরিবার। মৌজা জুড়ে।

আর কিছু বলবেন না?

—না না। আরে, জোয়ান বয়স আপনার। পিছনে তাকান কেন? সামনে তাকান। কি হয়েছে, আপনার জ্যেঠা মরে গেছে..কি হয়েছে, বিপিন গিরি, শালগেড়্যার পড়ে আছে এগুলো কোনো বর্তব্যের ব্যাপারই নয়। ভুলে যান।

—আপনার সমিতির উদ্দেশ্য?

—কিচ্ছু না। টাকার শ্রাদ্ধ কোর না। গরিবকে দিয়ে তার উন্নয়নের কাজ করাও। সমিতি মাধ্যমে করো। তা যে করা যায়, তা তো শালগেড়্যাতে বাঁধনিতে করে দেখাচ্ছে এরা, নয়?

—আবার আসতে হবে।

—কার কাছে?

—আপনার, গিরিবাবুর কাছে।

—চলেন একটা জিনিস দেখাই।

—চলুন।

—দাওয়ায় দাঁড়ায় ওরা। বিশাল শালগাছটি দেখান উনি, দেখছেন?

—হ্যাঁ।

—কত উপকারি, কত বার ও গাছ কাটবে···মোটা দামে কিনবে! ঠিকাদার কোম্পানি। বহুবার ও ফাঁসির হুকুম হয়েছে, জানেন?

—ও!

—কেউ মারতে পারে নি। সব বলত, ওটা না কি আমার মতো। আমি বলি, ওটা ওদের মতো। ওদেরকে মুছে ফেলার কত না চেষ্টা, তবু তো আছে।

—আমার কাছে···গাছটা আর আপনি···এক বলে মনে হচ্ছে।

—চশমা কোনোদিন খুলতে পারলে···খোলা চোখে দেখলে বুঝবেন··· আমার কথাটা সত্য, আপনার কথার চেয়ে অনেক সত্য।

এই প্রথম ওর পিঠে চাপড় মারেন বিপিন গিরি, আস্তে। বলেন, চশমা খুলতে জানুন। সবই তো লিখতে হয়।

—হ্যাঁ···সব···

—চলুন, শোবেন।

শুয়ে পড়ে অরুণি। ঘুম আসে, এর পরেও ঘুমআসে। বড় শান্তি এখানে, বড় নিরাপদও। এখানে ওর অস্তিত্ব নিয়ত বিপন্ন নয়।

—আপনি ঘুমোন, কোন চিন্তা নেই।

ঘুমোয় অরুণি। হাতটা এগিয়ে দেয়। চৌকির বাইরে হাত। কে যেন ওর হাতটা তুলে দেয় বিছানায়। গায়ে টেনে দেয় কাঁথা।

পরদিন বাস ধরতে হবে বিকেলে। জাস্তিমণি সকালে এসে বলে, চন্দ্র একটা মোরগা কেটেছে। বলে, এই ছেলেকে খাওয়াবে।

—দূর বেটা চন্দ্র! বেচলে কত পেত?

চন্দ্র একহাতে নিহত মোরগা এবং আরেক হাতে পলি বোঝাই করে ওদের সমিতির দাবীদাওয়ার কপিগুলি আনে।

অরুণি ওর কাছে বসে সব বুঝে নেয়। বিপিন হেঁকে বলেন, মশলা দিস জাস্তিমণি, শুধু হলুদে সিদ্ধ করিস না। তাড়াতাড়ি করবি, একটার মধ্যে;বেরাতে হবে।

—অরুণি অপ্রতিভ হেসে বলে, আপনি কি আজও তিনটের খাবেন?

—না। আপনার সম্মানে আজ সকালে জল ভাতপ্রাই নি। আপনার সঙ্গে খাব।

—চলুন, বাঁধে যাওয়া যাক।

—চলুন।

বাঁধে ছোট ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করছে, সাঁতার কাটছে। বিপিন বুক জলে। ওরা ওঁর গায়ে জল ছেটায়। অরুণি দেখে, শুধু দেখে।

তারপর কেমন করে যেন সময় কেটে যায়। খেতে বসলে জাস্তিমণি বলে, সাঁকাস্তিতে এসো। তখন পিঠা খাওয়াবো।

—আসব।

—হ্যাঁ, তুমি আর এসেছ!

—দেখবেন।

—খুব তাড়াতাড়ি সময় কেটে যায়। বিপিন হাতকাটা পাঞ্জাবি ও হেটো ধুতি পরেন, লাঠি নেন। চন্দ্র ছাতা নিয়ে সঙ্গে চলে।

—সকলকে নমস্কার করে অরুণি।

—ওরা বলে, জোহার।

বিপিন আজ ওর ঘাড়ে হাত রেখে চলেন। আশ্চর্য আশ্চর্য অনুভূতি এই

দেখেন, এগুলো কেঁদ, এটা মহুল, পিয়াসাল চিনেন ? সব লাগিয়ে গেছি জঙ্গলে যা নাই, এখানে তা আছে। এই দেখেন, এই লতাটায় গোড়ার কাছে আলু হয়। খুব স্বাদ। রাস্তা হলে মেয়েদের দিয়ে শালপাতার ডিশ তৈরি করাবার ওয়ার্কশপ করাব।

—নিশ্চয় করাবেন, বিশ্বাস করি।

একবার শুধু একবার ঘড়ি ওকে 'তুমি' বলতেন।

—কেতুপুর পৌঁছে যায়।

—আমরা হেথা বসি। চন্দ্র, পান কিনে আন্ তো। যা যা, বাস আসছে। দূরে বাসের শব্দ।

অরুণি ওঁর দিকে তাকায়। দু'চোখ ভরে দেখে নেয়। উনি সামনে চেয়ে থাকেন।

—বাস আসছে।

—হ্যাঁ।

—সময় হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ···হয়ে গেল···

ও নিচু হয়, পায় ছোঁয়। বিপিন গিরি ওর দুই কাঁধে হাত রাখেন মুখোমুখি দাঁড়ান। ওর মুখে চুলে, চোখে কাউকে খোঁজেন কি ? তারপর বলেন, আবার এসো বুঝলে ? এসো।

—আসব।

ওর গলা বুজে আসে। 'এসো' বললেন।

—কার কাছে ?

—গিরিবাবুর কাছে।

আর কিছু বলেন না উনি। বাসে উঠে পড়ে ও। চন্দ্র দৌড়ে এসে হাতে কচি শাল পাতা মোড়া পানের খিলি দেয়। কি যেন বলে। অরুণি মুখ বাড়ায়।

সাদা চুল, বলিষ্ঠ দেহ বৃদ্ধ সৈনিকটি হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন মুখে হাসি।

হঠাৎ বাস মোড় নেয়। কেতুপুর অদেখা হয়ে যায়। তবু অরুণি চেয়ে থাকে।

(পূজা মহানগর / ১৩৯১)

একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

মহাশ্বেতা দেবী

ডঃ অমল দাশের কাছে প্রেরিত কপি, চিঠি, তালিকা

ক্রম	তারিখ	কাকে কি বিষয়ে লেখা
১	১০।৫।৮২	মাননীয় পার্থ দে। ৬৯ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত ও এক্সচেঞ্জে
১ পৃঃ		নাম লেখানো লোধা ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের অনুরোধ।
২	৮।১১।৮২	মাননীয় শম্ভু মাণ্ডি। উনিশটি গ্রামের উনপঞ্চাশজন
২ পৃঃ		শিক্ষাপ্রাপ্ত ও এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো মুণ্ডা আদিবাসীর বিষয়ে রাইটার্সে আদিবাসী এমপ্লয়মেণ্ট সেল ও জেলা এক্সচেঞ্জ মাধ্যমে চাকরির জন্য অনুরোধ। সংরক্ষিত কোটা যথার্থ পূর্ণ হচ্ছে কিনা দেখতে বিশেষ অনুরোধ।
৩	১১।১।৮৩	মাননীয় বিনয় চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ মুণ্ডা সমাজ
২ পৃঃ		সুগাড় গঠড়ী এবং লোধাশবর কল্যাণ সমিতির কাজকর্ম বিষয়ে আঞ্চলিক পার্টির সন্দেহ সংশয় অপনোদনের জন্য এবং এ সকল রেজিস্টার্ড সমিতিকে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি দানের অনুরোধ। ঝাড়গ্রামে বীরসা মুণ্ডার মূর্তি স্থাপনে অনুরোধ। ভাঙড় থানার অন্তর্গত তারদা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন তিনটি গ্রামের ১৫০ জন ভূমিহীন আদিবাসী (তালিকা সহ) বিষয়ে পঞ্চায়েত মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ।
৪	১১।১।৮৩	উপরের কপি ডাঃ শম্ভু মাণ্ডিকে প্রদত্ত।
১ পৃঃ		শম্ভু মাণ্ডিকে পথে আক্রমণে দুঃখ জ্ঞাপন।
৫	১৪।১।৮৩	শ্রীআদিত্যচরণ কোল / ডিরেক্টর S. C. S. T হুগলী
১ পৃঃ		জেলার তেঘরিয়া গ্রামের ঝুনুকা বড়াইক সহ পাঁচটি অনাথ চিকবড়াইক আদিবাসী ছেলেমেয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও ঝুনুকার কর্মসংস্থানের অনুরোধ।
৬	২।২।৮৩	শ্রীসুনীল কেরকেটা / B. D. O. নারায়ণগড়।
৩ পৃঃ		অনুরোধ (১) লখিয়াসল গ্রামে লোধাদের হাতে মাছ চাষের জন্য

পুকুর স্বত্ব লোধা সমবায়ের হাতে দান। (২) গামা গ্রামে মাদুর-কাটি বুনন ও চাষের জন্য গরিব আদিবাসী ও অন্য জাতির সমবায় সংক্রান্ত সকল কাগজ (অসিত রায় করে দেন) পাঠানো এবং সমবায় রূপায়ণে অনুরোধ।

৩.২.৮৩ **প্রহ্লাদ ভুক্তা / যুগল কোটাল / শংকর কোটাল।** নারায়ণগড় ডহরপুর সহ অন্যত্র লোধাশবর সমিতি মাধ্যমে সমীক্ষা ত্বরান্বিত করার অনুরোধ।

৮ ৭।৫ ৮৩ **মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।** গ্রাম / থানা / পরিবার /
৩ পৃঃ সদস্য তালিকা সহ পুরুলিয়ার সাঁইত্রিশটি ভূমিহীন খেড়িয়াশবরদের পুলিশী নির্যাতন হতে রেহাই দিতে ও নিষ্ক্রিয় পঞ্চায়েতকে ওদের বিষয়ে সক্রিয় করতে অনুরোধ।

৯ ৮।৫।৮৩ **প্রহ্লাদ ভুক্তা।** লোধাশবর বিষয়ে।
৪ পৃঃ

১০ ৩০।৫ ৮৩ **অসীম বর্মন / A.D.M. L.R. মেদিনীপুর।** (১) শংকর
২ পৃঃ কোটাল প্রেরিত তালিকা থেকে শংকর কর্তৃক প্রস্তুত লোধাশবর লেবার কো-অপারেটিভ গঠন করা ও লোধাশবর কল্যাণ সমিতি অধীন এই সমবায় দ্বারা লোধা উন্নয়নের কাজ হাতেকলমে করতে দিয়ে তাদেরকে দায়িত্ববান হবার সুযোগ দেবার অনুরোধ। (২) সাহারা গ্রামের পরাণচন্দ্র নায়েক (লোধা) প্রস্তুত তিনটি স্বল্প টাকালগ্নী সহজ স্কীম দ্বারা ১৮টি লোধা পরিবারকে লোধা খাত থেকে এগারো হাজার টাকা দানের অনুরোধ। (৩) পরাণ নায়েকের তালিকামতে বাস্তহীন ১২ জন লোধাকে বাস্তদানের অনুরোধ। তালিকা পুনঃপ্রস্তুত ও প্রেরিত।

১১ ৩০।৫।৮৩ একই মর্মে ডাঃ শম্ভু মাণ্ডিকে পৃথক পত্র এবং সঙ্গে
২ পৃঃ তালিকা। স্বল্পশিক্ষিত লোধা যে স্কীম রচনায় সক্ষম, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ।

১২ ৩১।৫।৮৩ একই মর্মে ডাঃ অমল দাশকে পৃথক পত্র।
৩ পৃঃ

১৩ ২।৬।৮৩ **রামমোহন চট্টোপাধ্যায় / উখরাডিহি / সিস্টার**
৩ পৃঃ নিবেদিতা কল্যাণ সমিতি / বাঁকুড়া। R.D.C সহায়তায় আদিবাসীদের জন্য ব্যাপক সেচ পানীয় স্নান জলের ব্যবস্থা করার জন্য

অভিনন্দন। আদিবাসী সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানতে কি ভাবে তালিকা করতে হবে, বিশদ নির্দেশ। পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র কিভাবে খেড়িয়াশবর উন্নয়নে কাজ করছে তা দেখার অনুরোধ।

১৪ ২।৬।৮৩ ডঃ অমল দাশ। বিষয়ঃ (১) পুরুলিয়া জেলা
১ পৃঃ বিজ্ঞান কেন্দ্র অফিসার অমলেন্দু রায় যে ভাবে বিজ্ঞানকে গরিবদের, বিশেষ খেড়িয়াশবরদের উন্নয়নে কাজে লাগাচ্ছেন, সেই অভিজ্ঞতাটি লোধা উন্নয়ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার জন্য রায়কে ঝাড়গ্রামে আসতে বলা ও অমলদের পুরুলিয়া যাবার জন্য অনুরোধ। (২) নয়াগ্রামে লোধা হত্যার সম্ভাবনা শুনে সেখানে যেয়ে সমীক্ষা করে নয়াগ্রাম লোধাদের বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন।

১৫ ৩।৬।৮৩ অমলেন্দু রায় / জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র / পুরুলিয়া।
১ পৃঃ (১) ১৩ নং পত্রে উল্লেখিত R.D.C. সঙ্গে যোগাযোগ করে খেড়িয়া-শবরদের নিদারুণ জলাভাবের জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ। (২) বাঁকুড়ার এক আদিবাসী মহিলা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ। (৩) লোধারা কোনো সহায়তা ব্যতীত তালিকা ও স্কীম করছে বলে তারা ডাকলে ঝাড়গ্রামে যেতে অনুরোধ।

১৬ ১২।৬।৮৩ গোমস্তাপ্রসাদ সরেন / উদলবনি / পুরুলিয়া।
৩ পৃঃ (১) পুরুলিয়াতে স্বাধীনতাসংগ্রামী কানুরাম শবর ও সাঁওতাল সাহিত্যিক কবিদের সংবর্ধনা বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব। (২) সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী সমাজ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী সমাজের ঐক্য যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলা। (৩) গরিব আদিবাসী গ্রাম ও বসতিতে উন্নয়ন জন্য যে ভাবে তালিকা প্রস্তুত দরকার, তার বিশেষ নির্দেশ দান।

১৬-ক ২৩।৬।৮৩ H. K. Mukherjee/Addl. Chief Mechanical
১ পৃঃ Engineer. বেকার লোধা ছেলেদের খড়্গপুর Rly ওয়ার্কশপে চাকরি প্রার্থনা।

১৭ ৪।৭।৮৩ অমলেন্দু রায় / পুরুলিয়া। (১) গ্রামীণ উন্নয়ন
৩ পৃঃ (২) স্বাস্থ্য ও জল ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ১০ পয়েন্ট প্রস্তাব। (৩) ১৪টি গ্রামভিত্তিক স্বউদ্যোগে গঠিত কল্যাণ সমিতির ঠিকানা। (৪) ৩টি গ্রামোন্নয়নে সম্ভাব্য সাহায্যকারী সংস্থার ঠিকানা।

৮৪।৭।৮৩ **লক্ষ্মীকান্ত সিং (মুণ্ডা) / বড়কলংকই / মেদিনীপুর।** মেদিনীপুর ও পুরুলিয়াতে গ্রামীণ সংগঠন বিষয়ে বিশদ প্রস্তাব। ওর কর্মক্ষেত্র আদ্রা থেকে ১৭নং পত্রের রায়ের সঙ্গে যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দান।

১১ ৪।৭।৮৩ **ডাঃ অমল দাশ।** ১৮ নং পত্রের লক্ষীকান্ত সিংয়ের
২ পৃঃ স্বগ্রামে ক্লাব ও সমিতি চালনা বিষয়ে কি কি অসুবিধা, কি কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে ৬ পয়েন্ট চিঠি। পুরুলিয়াতে আদিবাসীর জমি বেআইনী হস্তান্তরের বর্ণনা।

১৫।৭।৮৩ **প্রহ্লাদ মুক্তা / যুগল কোটাল / কপি অমল দাশ।** ১১।৭ ৮৩ তে শাঁকরাইল হতে মুণ্ডার চিঠিতে নয়াগ্রামে লোধা ও সাঁওতালের মধ্যে উত্তেজনা বিষয়ে গভীর উদ্বেগ। লোধা কল্যাণ সমিতির পক্ষে নয়াগ্রামে গিয়ে অচিরে লোধা নির্যাতন বন্ধ ও লোধা ও অন্য আদিবাসীর মৈত্রী সম্পর্ক বাড়াতে কাজ করতে নির্দেশ।

২১ ২৭।৯।৮৩ **অমিতকিরণ দেব / জেলা শাসক / মেদিনীপুর।**
৩ পৃঃ গামা গ্রামের ১১ জন আদিবাসী সহ অন্য জাতির প্রান্তিক চাষীদের
চিঠি টিপ / স্বাক্ষর সহ নিজে তালিকা প্রস্তুত করে জমির দাগ নং দিয়ে প্রান্তিক চাষীদের সাহায্যার্থে ৩৯০ খতে / ৭২৭ দাগে / ৪২ শতক জমিতে স্যালোর জন্য প্রার্থনা।

২২ ৭।১০।৮৩ **নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার / S. D. O. ঝাড়গ্রাম।**
১ পৃঃ ১) নয়াগ্রাম লোধাদের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জ্ঞাপন। তদন্ত / সমীক্ষা / উন্নয়ন প্রার্থনা। ২) ১৩ ও অন্যান্য পত্রে উল্লেখিত অমলেন্দু রায়কে ঝাড়গ্রাম উন্নয়নের সাহায্যার্থে একবার আমন্ত্রণের প্রার্থনা।

৭।১০।৮৩ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি।** ১) গ্রামীণ মহিলা সমিতি দ্বারা মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র গঠনে সমাজকল্যাণ দপ্তরের ঔদাসীন্যে দুঃখ জ্ঞাপন। ২) বড়কলংকই গ্রামে সর্বজাতি মিলিত মহিলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ স্কীম বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য। ৩) ডহরপুর লোধা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব ও লোধা বিষয়ে মনোযোগী হবার জন্য শম্ভু মাণ্ডিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪) ৭ পয়েন্ট কারণ দেখিয়ে অমলেন্দু রায়কে একবার ঝাড়গ্রাম উন্নয়নে আমন্ত্রণ করে তাঁর স্বল্প খরচার স্কীমগুলি দেখতে অনুরোধ।

৫) ২১নং পত্রে উল্লেখিত গামা গ্রামে স্কালো জন্য I.T.D.P. স্কীম প্রার্থনা। নারায়ণগড় B.D.O এবং গামার অঞ্চল (৩নং নারমা) প্রধানের নাম দান।

২ ৭।১০।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। পুরুলিয়া মালডিতে ১২/১৩।১১।৮৩-
২ পৃঃ তে অনুষ্ঠিতব্য খেড়িয়াশবর মেলা সম্পর্কে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা। পুরুলিয়ার খেড়িয়াদের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন।

৭।১০।৮৩ গোপীবল্লভ সিং দেও / রাজনয়াগড় / পুরুলিয়ার খেড়িয়া মেলা ও খেড়িয়াশবরদের মধ্যে কাজ বিষয়ে ২১ পয়েন্ট ৫ পৃষ্ঠা চিঠি।

২৬ ২৩।৬।৮৩ পরিমল মিত্র। বনবিভাগে বেকার লোধা নিয়োগের
১ পৃঃ অনুরোধ।

২৭ ৯।১০।৮৩ ডঃ অমল দাশ। ডহরপুর হতে শবর কোটাল প্রেরিত
৩ পৃঃ ৬০ জন ভূমিহীন লোধার বিশদ তালিকা+স্কীম প্রেরণ এবং ১২ পয়েন্ট চিঠি লোধা বিষয়ে।

২৮ ১০।১০।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ২৭নং বিষয়ে বাস্তু ও ভূমিহীন
২ পৃঃ লোধা (ডহরপুর) তালিকা। চিঠি।

২৯ ৮।১০।৮৩ শংকর কোটাল। নারায়ণগড়ে কিভাবে কাজ করতে
২ পৃঃ হবে সে বিষয়ে বিশদ প্রস্তাব সহ চিঠি।

৩০ ১০ ১০।৮৩ শ্যামগোবিন্দ দাশ। ডহরপুর। তার প্রেরিত
২ পৃঃ লোধা স্কীম বিষয়ে চিঠি।

৩১ ২৮।১০ ৮৩ অমিতকিরণ দেব। ১০, ১৪ ও ২২নং পত্রের বক্তব্য
২ পৃঃ আবার বিশদ করে লেখা।

৩২- ২৮।১০।৮৩ অসীম বর্মন, S.D.O. ঝাড়গ্রাম ও ডাঃ অমল দাশকে
৩৪ ৩১নং চিঠির কপি।

৩৫ ২।১১।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ৩নং নারমা অঞ্চল / মালিগেড়িয়া
২ পৃঃ গ্রামের ৩০টি আদিবাসী পরিবারকে অবিলম্বে I. T. D. P. স্কীম প্রদানের জন্য আবেদন।

৩৬, ৩৭ ২।১১।৮৩ ৩৫ নং পত্রের কপি মৈনাক বসু ও অমল দাশকে।

৩৮ ১৭ ১১।৮৩ শ্রীপরিমল মিত্র। পুরুলিয়ার চন্দ্রমোহন শবর ও
১ পৃঃ হাবুলাল শবরের উপর জঙ্গল বেত্র অফিসারের নির্যাতনের প্রতিকার

প্রার্থনা। ওরা অরণ্যবাসী খেড়িয়াশবর।

৩৯ ১৭।১১।৮৩ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি**। পুরুলিয়ার সাতটি থানার
৩ পৃঃ চৌত্রিশটি খেড়িয়াশবর পল্লীর বিশদ তালিকা সহ পানীয় ও সেচ জল সহ অন্যান্য ক্ষতিবাসী বেনিফিট প্রার্থনা। পরিবার সাতশো আটান্ন।

৪০ ১৫।১২।৮৩ **নিত্যানন্দ শবর**। পাটাঘর। বাঁশপাহাড়ী। পাটাঘর
২ পৃঃ ও অন্যান্য খেড়িয়া গ্রামে পানীয় জল নাই বলে কিভাবে কোথায় আবেদন করতে হবে সে বিষয়ে বিশদ চিঠি।

১৫।১২।৮৩ **অমিতকিরণ দেব**: নয়াগ্রামে গিয়া না পাঠিয়ে লোধা হত্যা হতে পারে, মৃণ্ডার কাছে জেনে সত্বর অবস্থার গুরুত্ব জেনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জরুরি আবেদন।

৪২ ১৫।১২।৮৩ **S.D.O. ঝাড়গ্রাম**। ৪১নং পত্রের বক্তব্যের
১ পৃঃ পুনরাবৃত্তি। ৮০নং পত্রমতে পাটাঘরে কুয়ার জন্য আবেদন।

৪৩ ১৫।১২।৮৩ **প্রশান্ত কুমার আড়ী**। দিল্লীতে শ্রমমন্ত্রক
২ পৃঃ সেমিনারে লোধা বিষয়ে কি বলব এবং লোধাদের কাছে কি সাহায্য চাই, সে বিষয়ে ১৩ পয়েন্ট চিঠি।

৫।১২।৮৩ **পরিমল মিত্র**। পুরুলিয়ার এগ্রোফরেস্ট্রি স্কীমে সেচহীন চাষ দর্শনে প্রশংসা জ্ঞাপন। বনভূমে খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি কিভাবে ওই স্কীমে আরো কাজ করতে পারে, তার বিশদ প্রস্তাব সহ আবেদন।

৪৫ ৮।১২।৮৩ **মৈনাক বসু**। নারায়ণ গড় থানার মাধবপুর ও
১ পৃঃ ভরতপুর লোধাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা, প্রশাসনিক ঔদাসীন্য উল্লেখ, প্রতিকার প্রার্থনা।

৮।১২।৮৩ **অশোক মিত্র**/ভূমি ব্যবহার শলাকার। ১) ৩৮নং পত্রের বক্তব্য জানানো। ২) ৪৪নং পত্রের বক্তব্য জানিয়ে বনজ-দ্রব্য থেকে কুটীর শিল্পের বিশদ প্রস্তাব।
২ পৃঃ ৩) অমলেন্দু রায়কে কাজে লাগাবার আবেদন। ৪) মেদিনীপুর পটুয়াদের বাস্তুহীন, ভূমিহীন অবস্থার কথা জ্ঞাপন, প্রতিকার প্রার্থনা।

ডঃ অমল দাশের কাছে প্রাপ্ত ২নং ফাইল থেকে

ক্রম ও তারিখ	কাকে / কি বিষয়ে
১ ২৩।৮।৮২	ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ১) তেঘরিয়া / হুগলীর গৌরী বড়াইক (আদিবাসী) ও তার ছেলে মেয়েদের সাহায্যার্থে আবেদন। ২, ২৪ পরগণার ওরাওঁ সংগঠন "ভারত কের আদিম জাতির ৭টি দাবীর তালিকা সহ দাবী পূরণের আবেদন। ৩ পৃঃ
২৭।৮।৮২	ডঃ অমল দাশ। ধীরেন মুণ্ডা নামে এক অন্ধপ্রায় একাকী যুবকের চিকিৎসা ও চাকরির অনুরোধ। ১ পৃঃ
৬।৭।৮২	ডঃ অমল দাশ। লোধাদের কাছে প্রাপ্ত ৪০টি চিঠির বক্তব্য ১১ পয়েন্ট-এ বিশদ করে তাদের (ক) চাকরি (খ) অন্যান্য দুর্গতি (গ) সমাজ নিপীড়ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ। ৪ পৃঃ
৭।৭।৮২	বিনয় চৌধুরী। খেজুর কুটিতে সাজানো জমি সংক্রান্ত বিরোধে ১।৭।৮২-তে লোধা হত্যার কথা ও ৬।৭।৮২-তে ঝাড়গ্রামে অনুরূপ কারণে ৬ জন লোধা হত্যার কথা। প্রতিকার প্রার্থনা। ১ পৃঃ
৭।৭।৮২	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় / রাজ্য। পঞ্চায়েত পর্যায়ে লোধাদেরকে কাজ দেবার অনুরোধ। ২ পৃঃ
১৪।৭।৮২	মুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসু। ঝাড়গ্রামে ৬।৭।৮২ চাকুয়া, বাঘঝাপা ও সরোতে ৬ জন নির্দোষ লোধা হত্যার পর সরেজমিনে নিজে ১৩/৭ ঘুরে এসে ২৬ পয়েন্টে (ক) ঘটনার প্রকৃত বিবরণ, (খ) লোধাদের বক্তব্য, (গ) তাদের প্রকৃত অবস্থা, (ঘ) এখন যে ভাবে এই গণহত্যার ব্যবস্থা গ্রহণ / লোধাদের যাতে প্রকৃত সাহায্য হবে সে জন্য স্থান, জমির দাগ নং দিয়ে পুনর্বাসন ও লোধা সমস্যার আশু প্রতিকার প্রার্থনা। ৭ পৃঃ
১৬।৭।৮২	ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ২৩ পয়েন্ট চিঠিতে ৬-এর অনুরূপ সকল বর্ণনা ও আদিবাসী দপ্তরের এই "বিশেষ সংরক্ষিত জাতি" বিষয়ে অন্তত ন্যূনতম ব্যবস্থা করার বিশদ প্রস্তাব ও আবেদন। ৭ পৃঃ
৭।৭।৮২	ডাঃ অমল দাশ। শংকর কেটাল ও অন্যান্য লোধাদের সমিতি মাধ্যমে কাজের ৩৪ পয়েন্ট বিবরণ এবং লোধাদের ব্যাপারে সরকারের অবশ্য করণীয় কাজ বিষয়ে প্রস্তাব। ৩ পৃঃ

২২।১২।৮১ ডাঃ অমল দাশ। (ক) লোধাদের বিষয়ে তরুণ বসুর উদ্যোগের প্রশংসা। (খ) সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে আদিবাসী তপশীলী ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত কাজ না করার উল্লেখ। ৮ পয়েন্ট চিঠি। ২ পৃঃ

১৮।১১।৮২ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২নং পত্রে উল্লেখিত ধীরেন মুণ্ডা বিষয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সাহায্য প্রার্থনা।

২৩।১১।৮২ ডঃ অমল দাশ। ২, ১০ নং পত্রে উল্লেখিত ধীরেন বিষয়ে যা করা হয়েছে তা জানিয়ে ওর জন্য কোনো ব্যবস্থা প্রার্থনা।

২৯।১১।৮২ ডঃ অমল দাশ। (ক) ধীরেন মুণ্ডা বিষয়ে। (খ) ভারত কের আদিম জাতি প্রদত্ত তালিকা থেকে আদিবাসীদের জাতি পরিচয় পত্র বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ।

১৬।৪।৮২ ডাঃ অমল দাশ। শংকর কোটাল ও অন্যান্য লোধা, চুনী কোটাল, এদের বিষয়ে জেলা এক্সচেঞ্জকে তাড়া দেবার জন্য অনুরোধ। অসীম বর্মণের লোধা প্রীতির প্রশংসা। ইষ্টার্ণ সার্কিট ব্যাঙ্ক রেক্রুটমেন্ট অফিসে জ্ঞাত সংবাদ, যে S.C. S-T. মাধ্যমিক পাশ হলেই ব্যাঙ্কে কেরানী হতে পারে এবং চাকরি থাকলেই ব্যাঙ্ক রেক্রুটমেন্ট রাইটার্সে আদিবাসী দপ্তরে জানায়, সে সব কাজ কারা পায় সে বিষয়ে জরুরি খোঁজ নিতে অনুরোধ। ১ পৃঃ

১৩ ২৮।৪।৮২ ডঃ অমল দাশ / মানস চৌধুরী। লোধা ছেলেকে
২ পৃঃ চিঠি দিয়ে প্রেরণ ও চাকরি ব্যবস্থার অনুরোধ।

১৪ ৩০।৪।৮২ ডঃ অমল দাশ। লোধা বিষয়ে।
১ পৃঃ

১৫ ১০।৫।৮২ ডঃ অমল দাশ। গামা গ্রামে মাদুরকাটি চাষ ও বুনন
২ পৃঃ সমবায়ের বিশদ স্কীম প্রেরণ ও সাহায্য প্রার্থনা।

১৬ ১৩।৫।৮২ ডঃ অমল দাশ। ১০ পয়েন্ট চিঠিতে বর্তিকার কর্মসূচী জ্ঞাপন—আদিবাসী বেকারদের এক্সচেঞ্জ নং সহ তালিকা
২ পৃঃ প্রস্তুত / কল্যাণ সমিতি গঠন ও রেজেস্ট্রি করা। এ সব সমিতি বিষয়ে পঞ্চায়েত ও পার্টির বিদ্বেষ ও বাধা দান উল্লেখ।

২৫ ৪।৮৩ বিনয় চৌধুরী। বিষয় (১) মেদিনীপুর নন্দীগ্রামের পটুয়াদের ভূমিহীনতা। (২) ২৩।২।৮৩ তে পুরুলিয়ার পিড়ারলেয়া

গ্রামে সাঁওতাল মেয়ে সুন্দরী বেশরার লাঞ্ছনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সি. পি. এম উপপ্রধান কর্তৃক সুন্দরীর আত্মীয়দের লাঞ্ছনা। গ্রামে বামপন্থী দলের বিভেদমূলক আচরণ আদিবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করছে।

২৩।৩।৮৩ **শংকর ও যুগল কোটাল / শশধর দেবনাথ** ৮ পয়েন্ট চিঠিতে লোধা সমিতির কাজ কি হবে তা নির্দেশ। ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার গুরুত্ব। লোধঃ সমিতি কর্তৃক বুলেটিন প্রকাশের গুরুত্ব। লোধাশবর-বস্তিকা সংখ্যা বিক্রি করে সমিতির টাকা সংগ্রহের নির্দেশ। লোধাদের বিষয়ে তারা জাগ্রত হবার ফলে সরকারের লোধা বিষয়ে মনোযোগী হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ। ৩ পৃঃ

১।৪।৮৩ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি**। নয়াগ্রামে প্রাক পঞ্চায়েত নির্বাচন বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য সম্ভাব্য লোধা হত্যা ষড়যন্ত্র বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতে অনুরোধ। খেড়িয়াদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন। সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী বিষয়ে মন্ত্রকের সহানুভূতির জন্য আনন্দ জ্ঞাপন।

৩।৪।৮৩ **বিনয় চৌধুরী**। (১) মাধবপুর ও অন্যত্র লোধারা সমিতির কাজ করছে বলে তাদের ওপর পঞ্চায়েত ও পার্টির অত্যাচারের বিবরণ। (২) নারায়ণগড়ের গামা ও অন্যত্র, মানুষ
৩ পৃঃ দেশান্তরী মজুর যাতে আর না হয়। সে জন্য কয়েকটি স্যালো প্রার্থনা। (৩) গামাতে বামপন্থী প্রভাবশালী দলের কার্য কলাপের বর্ণনা। ১১ পয়েন্ট চিঠি।

২।৪।৮৩ **সুনীল কেরকেটা**। ক) বড় কলংকই গ্রামে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের I.C.D.S. স্কীম প্রণয়ণে লক্ষ্মীকান্ত সিংহের উদ্যোগ
৩ পৃঃ সত্ত্বেও ওই দপ্তরের ব্যর্থতা। খ) গামা ও সবংয়ে স্যালো প্রার্থনা। গ) ১৬ নং পত্রের ১ অংশের উল্লেখ।

২৭।৩।৮৩ **শশধর দেবনাথ** (ডহরপুর)। ১) নারায়ণগড় B.D.O. কেরকেটার লোধা বিষয়ে দরদের কথা, তাঁর প্রস্তাব নারায়ণগড়ে সমিতির শাখা খোলা এবং মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনে বিভিন্ন বিভাগে জানানো, এ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ ও সেইমতো কাজ করতে নির্দেশ। ২) গোহালডিহির শংকর কোটাল ও সমিতির অন্য লোধাদের দ্বারা ২০।২২ টি নৈশ বিদ্যালয়ের কথা বলে

৩ পৃঃ অনুরূপ কাজ করতে নির্দেশ। ৩) ভহরপুর সহ নারায়ণগড়ে অন্ত লোধা গ্রামের ক্ষেত্রে বস্তিকার ছাপানো ফর্ম মতে (ক) ভূমিহীনতা ও অন্যান্য তথ্য এবং (খ) শিক্ষাপ্রাপ্ত লোধা ছেলেমেয়ের নাম লেখার ২৫ পয়েন্ট নির্দেশ। (৪) B.D.O. কে জানাবার ৪ পয়েন্ট প্রস্তাব।

৩।৪।৮৩ **ডাঃ অমল দাশ।** ১) পুরুলিয়াতে অমলেন্দু রায় যে ভাবে খেড়িয়াদের ও বিরহড়দের জন্য কাজ করছেন, সেটা যে

২ পৃঃ একমাত্র পথ, তা জ্ঞাপন। ২) মুর্শিদাবাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার সাঁওতাল বিষয়ে পরমেশ্বর মারাণ্ডির তালিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

২০-২২ ৫।৪ ৮৩ ২১ নং-এর ২ পয়েন্ট বিষয়ে মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জি, শম্ভু মাণ্ডি ও লালবাগের এম. এল. এ. দ্বারা ঘোষকে তালিকা প্রেরণ ও অনুরোধ।

২৩ ১১।৮২ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি।** সংরক্ষিত পদে আদিবাসীদের চাকরি জন্য প্রার্থনা। মৃত্যু যুবকদের তালিকা সহ বিশেষ প্রার্থনা। জেলার এক্সচেঞ্জ+কলকাতা এক্সচেঞ্জ+রাইটার্স এমপ্লয়মেন্ট সেল-কে একযোগে এ বিষয়ে সক্রিয় করাতে অনুরোধ।

২৩ ১১।৮২ **ডাঃ অমল দাশ।** ভাঙড় থানার তারদা পঞ্চায়েতের চারটি মূলত তপশীলী-আদিবাসী গ্রামের যোগাযোগ+শিক্ষা+ সেচ+পানীয় জল+ভূমিহীনতা+I.T.D.P. স্কীমের অভাব বিষয়ে

৩ পৃঃ জনসংখ্যা সমেত বিশদ রিপোর্ট ১৬ পয়েন্টে ঘুরে দেখে আসার পর।

২৫ ৭।৪।৮৩ **যুগল কোটাল।** ১০ পয়েন্টে লোধাকল্যাণ সমিতির

২ পৃঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্পর্কে বিশদ নির্দেশ ও ঐক্য পথে চলতে বলা।

৭।৪।৮৩ **ডাঃ অমল দাশ।** ২৫-এর কপি। পুরুলিয়াতে অমলেন্দু রায় কিভাবে ঠিকাদার বাদ দিয়ে সরাসরি খেড়িয়াদের

১ পৃঃ দিয়ে উন্নয়নের কাজ করাচ্ছেন, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ।

২৭ ১৩।৪।৮৩ **শংকর কোটাল ও শশধর জেবনাথ।** লোধাশবর

৫ পৃঃ সমিতির কাজ—লোধা উন্নয়নে ঠিকাদার বর্জন ও অন্যান্য দরকারী প্রস্তাব সহ ২৪ পয়েন্টে বিশদ চিঠি।

১৮।৪।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। পুরুলিয়াতে অমলেন্দু রায় যে ভাবে সরাসরি খেড়িয়াদেরকে দিয়ে ছোট স্কীম রূপায়ণ করছেন,
২ পৃঃ তার বিশদ বিবরণ দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রত্যেক আদিবাসী জাতিকে দিয়ে ওই ভাবে কাজ করিয়ে স্বয়ম্ভর ও দারিদ্রমান করে তোলার আবেদন সহ ৮ পয়েন্ট চিঠি। রায়ের ৩ পৃঃ স্কীম দাখিল।

২৯ ১৮।৪।৮৩ ডঃ অমল দাশ। ২৮নং-এর উপরে নোট। রায়ের
১ পৃঃ স্কীম দাখিল।

৩০ ১৮।৪।৮৩ প্রহ্লাদ ভুক্তা। লোধাদের মধ্যে কাজ করার জন্য
৪ পৃঃ ২৮ ও ২৯-এ উল্লেখিত স্কীম বঙ্গানুবাদে বিশদ দাখিল। ঝাড়গ্রামে ওইভাবে সম্ভব হলে সমীক্ষা ও স্কীম লোধা সেল থেকে করার প্রস্তাব সহ ১৪ পয়েন্টে চিঠি।

৩১ ২৫।৪।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। নয়াগ্রামে লোধাহত্যার ষড়যন্ত্রের
১ পৃঃ কথা জেনে সে বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা (সভা হলে) গ্রহণের অনুরোধ। সংবাদদাতা অ-লোধা আদিবাসী।

৩২-৩৪ ২৫ ৪।৮৩ ৩১ নং-এর কপি মুখ্যমন্ত্রী, অসীম বর্মন ও অমল দাশকে।

৩৫ ১৭।৫।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। লোধা গ্রাম সাহারা ও রাওতচকের
২ পৃঃ বস্তিকা সংগৃহীত পরিসংখ্যান সহ আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।

৩৬ ১৭।৫ ৮৩ ডঃ অমল দাশ। বস্তিকার মতো ফর্ম ছাপিয়ে
১ পৃঃ আদিবাসী তপশীলীর প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের আবেদন। ৭ পয়েন্ট।

৩৭ ১৭ ৫ ৮৩ যুগল কোটাল। লোধা সমিতির অবশ্য করণীয় কাজ
৪ পৃঃ বিষয়ে ১২ পয়েন্ট বিশদ চিঠি।

৩৮ ১৮।৫।৮৩ সুবোধ বসু রায়। পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, খেড়িয়া
৪ পৃঃ সহ অন্যান্য আদিবাসী প্রসঙ্গে ছত্রাক ও বস্তিকা কিভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে ১০ পয়েন্ট চিঠি।

নিজস্ব ফাইল থেকে

ক্রম ও তারিখ	কাকে / কি বিষয়
১ ৬।২।৮৩	যতীন মাইতি। ১) কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলনের
১ পৃঃ	অভিযুক্তদের খোঁজখবর নিতে অনুরোধ। ২) লয়ালগঞ্জের নাম "লালগঞ্জ" করার জন্য উদ্যোগী হওয়া ও জনমত গঠন করতে অনুরোধ। ৩) কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্রে অভিযুক্তদের নামের ৬ পৃষ্ঠা

তালিকা প্রেরণ।

৭।৩।৮৩ **সবুজ শবর**। ১) সমস্ত শিক্ষিত খেড়িয়া ছেলেমেয়ের নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লেখাতে বলা এবং ২) গ্রামের সেই সমস্ত নাম তালিকাভুক্ত করে পাঠাতে অনুরোধ যাতে তাদের চাকরীর চেষ্টা করা যায়।

২৭।৩।৮৩ **সুবোধ বসু রায়**। ১) জো নাচের মাধ্যমে জন-শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে গৃহীত প্রোগ্রাম বিষয়ে আনন্দপ্রকাশ ও নতুন পরিকল্পনা। ২) পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী জাতিগুলির সম্পর্কের প্রকারভেদ এবং মেদিনীপুরে কায়েমী স্বার্থের দ্বারা আদিবাসী ঐক্যে ভাঙন ধরানো বিষয়ে আলোচনা। ৭ পয়েন্ট চিঠি। ব্যক্তিক ও বস্তিকার স্ব স্ব চরিত্র কেমন থাকবে, সে আলোচনা।

২৫।১০।৮৩ **সুবোধ বসু রায়**। ১) খেড়িয়া শবরদের বিষয়ে, যেহেতু তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ আদিবাসী, সেহেতু তাদেরকে লোধা-বিরহড়-টোটোর মত বিশেষ সংরক্ষণ দেবার ন্যায্যতা এবং তা
৩ পৃঃ করবার জন্য কিভাবে সমীক্ষা করতে হবে সে বিষয়ে **গোপী বল্লভকে** যা বিশদ লেখা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি। ২) মালভিতে খেড়িয়াশবর মেলা / সম্মেলন উপলক্ষে কোন্ কোন্ মন্ত্রী, জেলা প্রশাসনের লোক, ব্যক্তি ও সংস্থাকে সাহায্য চাইতে হবে সে বিষয়ে ১৫ পয়েন্ট চিঠি।

২৫।১০।৮৩ **রামলাল সিং**। ভূমিজ আদিবাসী সমিতি কিভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে এবং অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশদ নির্দেশ সহ ১২ পয়েন্ট চিঠি।

২৭।১০।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি ১) মহিষামুড়া লোধাদের বিষয়ে বিশদ তথ্য ও অঞ্চলপ্রধান অনুমোদিত লোধা স্কীম প্রেরণ। ২) মাধবপুর লোধাদের বিষয়ে বিশদ তথ্য ও তালিকা সহ আগের
৩ পৃঃ আবেদনের পুনরাবৃত্তি। ৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ আদি-বাসী বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা (পৃথক) নেবার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন। ১১ পয়েন্ট চিঠি।

৭-১০ ২৭।১০।৮৩ ৬-এর কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুর/A.D.M.L.R

মেদিনীপুর / S.D.O. ঝাড়গ্রাম / ডঃ অমল দাশ।

২।১২।৮৩ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** (যোজনা কমিশন) ১) গ্রামীণ সংগঠনগুলিকে দায়িত্ব দেবার গুরুত্ব। ২) নয়াগ্রাম লোধা বিষয়ে পুনঃসমীক্ষার কথা। ৩) ২৩ জন লোধা রেল ওয়াকশপে নিয়োগ বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে যা লেখা হয়েছে সে বিষয়টি দেখার অনুরোধ।

১৩।১২।৮৩ **সুধীরচন্দ্র সিং ও লক্ষীকান্ত সিং**। দিল্লীতে শ্রমমন্ত্রক সেমিনারে যাবার প্রাক্কালে মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠনের কাছে কি কি তথ্য চাই সে বিষয়ে ৮ পয়েন্ট চিঠি।

২১।১২।৮৩ **পানু লাহিড়ী**। ওরাওঁ সংগঠন "ভারতকের আদিম জাতি" পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের জন্য রঙিন পোষ্টার ও ছবি জন্য ধন্যবাদ। অনুরূপ ছবি কাঁচড়াপাড়া হরিজন স্কুলের জন্য প্রার্থনা।

১৪ ৭।২।৮৪ **মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু**। ১) লোধাজাতির বিশেষ বিপন্ন অবস্থা, নয়াগ্রামে লোধা হত্যার জল্পনা বিষয়ে দু'বার মেদিনীপুর প্রশাসনকে জানাবার কথা। লোধা জাতি বিষয়ে সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের পিছনে লোধা কল্যাণ সমিতির সক্রিয় ভূমিকার কথা। ২) বাঁকুড়াতে চেলাআম স্কুলে কর্মরত অবস্থায় ২২।৪।৮৩ ধনঞ্জয় হাঁসদা বামপন্থীদের হাতে নিহত হওয়া+ তার স্ত্রী ও সন্তানদের পুরুলিয়াতে পিত্রালয়ে অমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়া+(৩) হত্যার প্রশাসনিক প্রতিকার+ (৪) ম্যাট্রিক পাশ বিধবা **জাস্তিমণি হাঁসদাকে** ক্ষতিপূরণ+ (৫) কোনো স্কুলে কাজ দেয়া বিষয়ে বিশদ চিঠি।

১৫ ৭।২।৮৪ **সারদাপ্রসাদ কিস্কু**। তার কন্যা জাস্তিমণি বিষয়ে
৩ পৃঃ এবং অন্যান্য বিষয়ে ১২ পয়েন্ট চিঠি। সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ মাধ্যমে ছোট ছোট আইনের বই সাঁওতালীতে প্রকাশের উপর গুরুত্ব দান।

১৬ ৭।২।৮৪ **কান্তি বিশ্বাস**। পত্রের ওনং বিষয়ে পুস্তক
১ পৃঃ আবেদন।

১৭ ১৩।২।৮৪ **সুবোধ বসু রায়**। বাঁকড়া পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা
২ পৃঃ ও ধেড়িয়া সম্মেলনের সাফল্য।

২।৩ ৮৪ **রাজেন্দ্রলাল সিং**। ভূমিজ সম্মেলন বিষয় পত্র।

২৮।৩।৮৪ **সনাতন মুণ্ডা**। মুণ্ডারী সমাজ সাঁওয়ার জামদা (ময়ূরভঞ্জ) বিষয়ে পত্র।

২১।৩।৮৪ **শ্রীজ্যোতিবসু**। রাধানাথ শবর (বড়চাঁদাবিলার লোধা) প্রেরিত সংবাদে ১) গিধনি ব্লকের টুলিবড় গ্রামের ডাকাতি সূত্রে ঝাড়গ্রামের সরো গ্রামে (৬।৭ ৮২-তে লোধা হত্যা হয়েছিল) পুলিশ কর্তৃক নির্দোষ লোধাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও স্থাবর মুরগী ছাগল লুঠের সংবাদ। ২) ২১।৩।৮৪তে লোধা বৃদ্ধা ছোটবালা ভুক্তার উপর আরেক আদিবাসীর অত্যাচার, পঞ্চায়েতকে
১ পৃঃ জ্ঞাপন। দুটি প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিতে এবং সরো ও অন্যত্র লোধা গ্রামে I.T.D.P. স্কীম কার্যকরী ভাবে চালু করার জন্য লোধাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন।

২১-২২ ২১।৩।৮৪ ২০ নং পত্রের কপি মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও S.D.O. ঝাড়গ্রামকে প্রেরণ।

১৬।৪।৮৪ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি**। ১) চকসাহাপুর আদিবাসী বালিকা
১ পৃঃ ছাত্রী নিবাস উদ্বোধন ও চালু না হবার মূলে স্বার্থসন্ধী দল ও গোষ্ঠীর চক্রান্ত জ্ঞাপন। ২) চকসাহাপুর স্কুলে লোধা ছেলেমেয়ে ক্ষেত্রে বিশেষ কোচিং গ্রান্ট তিন বছর না পাবার কথা।

৩০।৪।৮৪ **প্রবীর সেনগুপ্ত**। মেদিনীপুর নয়াগ্রাম ব্লকের ৩৩৬টি গ্রামে ১৯৭০-৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ চালু করার
১ পৃঃ কথা জ্ঞাপন। চিঠি লেখার তারিখ অবধি নয়াগ্রাম ব্লক ক্ষেত্রে
চিঠি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর অবহেলা। বিদ্যুৎ নাই। বারবার
২ পৃঃ কোন্ কোন্ ঠিকাদার সংস্থা বিল নিয়েছে ও কাজ করেনি, পর্ষদ
রিপোর্ট নিযুক্ত কর্মীরা কর্মাভাবে উধাও, এসব তথ্য যেমন জানা গেছে বিশদ জ্ঞাপন ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রার্থনা।

৩১।৫।৮৪ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** (যো. ক.)। দিল্লীতে ১৫।৮৪ যোজনা কমিশন সেমিনার ফেরৎ পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে আলোচনা।

২৯।৬।৮৪ **স্বামী অগ্নিবেশ**। দিল্লীতে বঙ্গেও লোধার সম্মেলনে যেতে অপারগতা জ্ঞাপন এবং সম্মেলন / সেমিনার বাদ দিয়ে

সরাসরি বন্ধুরার মধ্যে কাজ করার গুরুত্ব জ্ঞাপন।

২১৬।৮৪ ডঃ বি. এম. সহায় (যো. ক.) পুরুলিয়া বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে খেড়িয়াশবর উন্নয়ন স্কীম আনিয়ে পাঠাবার কথা।

নিজস্ব ২নং ফাইল থেকে

ক্রম ও তারিখ	কাকে / কি বিষয়ে
১ ১৯।৬।৮২	**অসীমকৃষ্ণ বর্মণ।** ১) লখিয়াশোল গ্রামে লোধাদেরকে তাদের মৎস্যচাষী সমবায় গঠন করে একটি পুকুর কেনা বিষয়ে যে সকল বাধা আসছে তা জ্ঞাপন ও প্রতিকারের অনুরোধ। লোধারা
২ পৃঃ	উদ্যোগী হয়েছে, এ কথা জানানো। ২) ওই গ্রামে লোধাদের ছাগল দেয়া বিষয়ে ঠকানো। ৩) সাহারা গ্রামের ও অন্যত্র লোধাদের অন্তত চতুর্থ শ্রেণীর কাজ দেবার জন্য অনুরোধ। ৭ পয়েন্ট চিঠি।
২ ১৮.৪।৮৩	**প্রবীর সেনগুপ্ত।** বালুরঘাটে একটি অসুস্থ বালিকার
১ পৃঃ	বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের (চিকিৎসা কারণে) অনুরোধ।
৩ ৯।৫।৮৩	**ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি।** সম্ভাব্য লোধা হত্যার কথা জানানো
১ পৃঃ	এবং লোধা বসতি থানাগুলিকে এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ রাখার অনুরোধ।
	১৭।৫।৮৩ **গোমস্তা প্রসাদ সরেন।** বান্দোয়ান থানার খেড়িয়া-শবর বিষয়ে কিভাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে যে বিষয়ে ২১ পয়েন্ট চিঠি।
	১৬৮৩ প্রহ্লাদ ভুক্তা। লোধাশবর সমিতি ও অন্যান্য লোধা সমস্যা বিষয়ে ১১ পয়েন্ট চিঠি।
	২।৬।৮৩ **অমূল্য মণ্ডল।** নদীয়ার প্রগতিবার্তা কাগজে সরকারী বিজ্ঞাপন বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে।
	৩।৬।৮৩ **কান্তি বিশ্বাস।** কাঁচরাপাড়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২ বছর হয়েছে, যাতে অনুমোদন পায়, অনুরোধ।
৪ ৩।৬।৮৩	**সুন্দরী সরেন।** চামটাগেড়্যা আদিবাসী মহিলা
১ পৃঃ	সমিতিকে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ। মহিলা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানাতে বলা।
	১২।৬।৮৩ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি।** যোজনা কমিশন আলোচনাচক্র

ভিত্তিতে, গ্রামভিত্তিক সমিতিগুলিকে তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন তা জানানো এবং পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ সমিতিগুলিকে (বিশেষ, অনুন্নত জাতিভিত্তিক / সমাজ কল্যাণ) যা দরিদ্র মানুষের স্বউদ্যোগে গড়া, তাকে স্বীকৃতি দান ও উন্নয়ন কাজে অংশ নিতে দেবার উপর গুরুত্ব। কন্ট্রাক্টর প্রথা নামে বাতিল করলেও তা বহাল থাকবে বলে আশঙ্কা। ১১ পয়েন্ট চিঠি।

১৩।৬।৮৩ **যুগল কোটাল**। লোধাশবর সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা যথেষ্ট নয়, নির্দিষ্ট কর্মসূচী ধরে কাজ না করলে লোধারা নিরুদ্যম হয়ে যাবে, সে বিষয়ে বিশদ চিঠি। থানা কমিটির গুরুত্ব।

১৬।৬।৮৩ **ডঃ অমল দাশ**। লক্ষ্মীকান্ত সিংয়ের ২২।৬।৮৩ চিঠির ভিত্তিতে লক্ষ্মীকান্ত যে ভাবে গ্রামে সমাজ সেবা মূলক কাজ করছেন, এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর সকল প্রাথমিক শর্ত পূরণ সত্ত্বেও এঁদের
২ পৃঃ কি ভাবে মহিলা সমিতির বিষয়ে সাহায্য করেন নি। কোন সরকারী দপ্তরই সাহায্য করেন নি সে বিষয়ে ৩ পয়েন্ট চিঠি।

২২ ১৬।৬।৮৩ **লক্ষ্মীকান্ত সিং**। তার ১২।৬ চিঠির উত্তরে সরকারী
৮ পৃঃ উদাসীন ক্ষেত্রে কি করনীয়, করে যেতে হবে, বিশদ নির্দেশ সহ ১১ পয়েন্ট চিঠি।

২৬।৬।৮৩ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**। লক্ষ্মীকান্তের চিঠির প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর সামনে অফিসারদের প্রদত্ত কথামুযায়ী কাজ না করার (টাকা পাকা সত্ত্বেও) জন্য দুঃখ ও অভিযোগ।

২২।৬।৮৩ **প্রভাস ফাদিকার**। ৩০।৬।৮৩ তারিখে এসপ্লানেড ইস্ট, সিধু-কানু-ডহর নামকরণ ব্যাপারটিকে সরকার থেকে তথ্যচিত্রে বিধৃত করার অনুরোধ।

২৩।৬।৮৩ **পরিমল মিত্র**। অরণ্যবন্ধুকে যন্ত্রশিক্ষিত লোধা ছেলেদের চাকরি দানের আবেদন।

২৩।৬।৮৩ **বরুকন্ত গনি খান চৌধুরী**। ১) খড়্গপুর P.W.I.M. ইয়ার্ড। নিমপুরা থেকে পাঁচজন লোধা কর্মী ছাঁটাই
২ পৃঃ বিষয়ে পুনর্বহালের অনুরোধ। ২) বেলোরে কর্মপূরণ করেও ও ছাঁটাই আদিবাসী পুনর্বহাল হয় না। ৩) বেকার লোধা ছেলেদের তালিকা তালিকা প্রেরণ ও খড়্গপুরে Rly Wk Shop-এর এইচ.কে. মুখার্জীকে

বিষয়টি বিবেচনা করতে বলার জন্য অনুরোধ।

২৩।৮।৮৩ **বরকত গনি খান চৌধুরী**। তপশীলী আদিবাসী ক্ষেত্রে সংরক্ষিত কাজে বকলমের কথা। চারটি জেলার সেই সকল
২ পৃঃ লোকদের কথা, যারা ১৯৭০ সালে নাম লিখিয়েও ডাক পায় নাই। মাহাতো ছেলেদের কথা ও তালিকা।

৪।৭।৮৩ **ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি**। ১) ঝাড়গ্রামে গিরাগ্রামে ২৭।৬।৮৩ তারিখে লোধাদের উপর অত্যাচারের কথা, পঞ্চায়েত প্রধানের ঔদাসীন্য। ২) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছয়টি লোধা মেয়েকে চাকরি দানের অনুরোধ। শঙ্কর কোটাল সহ যারা অস্থায়ী কাজ করছে, স্থায়ী কাজ দিতে অনুরোধ।

১৯ ২৫।৯।৮৩ **এস. আর রোডিকা কে. কাউল (S. C. S. T.**
১ পৃঃ কমিশনার অফিস / নয়া দিল্লী)। পালামৌয়ের দাসমজুরদের বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য, কি করণীয়।

২৮।১০।৮৩ **জ্যোতি বসু**। পুরুলিয়াতে খেড়িয়াশবর সম্মেলনের (১২/১০।১১।৮৩) প্রাক্কালে খেড়িয়া নির্যাতনের সংবাদে ১—৩ প্যারায় খেড়িয়াদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে দেখা + সেনসাসে লোধা-খেড়িয়া নাম একসঙ্গে থাকলেও লোধাকে সংরক্ষিত আদিবাসী হিসেবে গণনা করা ও খেড়িয়াকে অবহেলা বিষয়ে অবিচারের কথা। ৬—৮ প্যারায় খেড়িয়া উন্নয়ন কাজে বিজ্ঞান কেন্দ্র
৩ পৃঃ অফিসার + সুবোধ বসু রায় ও মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সভাধিপতিকে জানিয়ে কিভাবে কাজ করছেন ও খেড়িয়ারা এই প্রথম মানুষের মতো ব্যবহার পাচ্ছে তা বলা। ৯—১১ প্যারায় খেড়িয়াদের উপর নির্বোধ পুলিশী আক্রমণ ও জেলা আদিবাসী দপ্তরের ঔদাসীন্যের কথা। ১২—১৪ প্যারায় খেড়িয়াদের উপর পুলিশী আক্রমণের ৩টি বর্ণনা। ১৫ প্যারায় খেড়িয়া নির্যাতন ও শোষণে পুলিশ ও আদালতের ভূমিকা। এই রাজ্য বিহার নয় তবু জাতির কারণে খেড়িয়া নির্যাতনের দীর্ঘ ইতিহাস। আশু হস্তক্ষেপ ও প্রতিবিধান প্রার্থনা।

২১-২২ ২৮।১০।৮৩ ২০নং চিঠির কপি **মৈনাক বসু ও পুরুলিয়া জেলা কমিশনারকে**।

২৮।১০।৮৩ **যুগল কোটাল**। লোধা সম্মেলন ডাকার গুরুত্ব +

৮ পৃঃ লোধা হত্যা, নির্যাতন, গণবোলাইয়ে পঙ্গু ও অন্ধ লোধার সম্পূর্ণ তালিকা সমিতি তরফে প্রস্তুতের উপর গুরুত্ব।

২৪ ৭।১১।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ২০নং পত্রের ১—৩ প্যারার বক্তব্য
২ পৃঃ বলা। আসন্ন খেড়িয়াশবর সম্মেলনে আদিবাসী দপ্তরের সাহায্য প্রার্থনা।

২৫ ২৯।১০।৮৩ বরকত গণি খান চৌধুরী। একজন মহিলা সহ
২ পৃঃ সাতজন লোধার দরখাস্ত নং সহ খড়্গপুর রেলোয়ে ওয়ার্কশপে নিয়োগের আবেদন।

২৬ ২।১১।৮৩ ননী ভট্টাচার্য্য। মালিগেড়িয়া গ্রামের ২১ জন কৃষক
১ পৃঃ প্রেরিত দরখাস্ত সহ সকল জাতির প্রান্তিক চাষীর সুবিধার্থে চারটি স্যালো + একটি কুয়া + একটি পুকুর সংস্কারের প্রার্থনা।

১৭।১১।৮৩ ২৬ নং বিষয়ে ননী ভট্টাচার্য্য কানাই ভৌমিকের সহৃদয় উত্তর প্রাপ্তিতে সুধীর সিংকে এখন কি করণীয় তা জানানো।

২৮ ১৭।১১।৮৩ সুধীর সিং ও পরমানন্দ সিং। ২৭নং পত্রের
১ পৃঃ ভিত্তিতে ৩ প্যারার ও ৮ পয়েন্টে কি করণীয় বিশদ নির্দেশ।

২৯-৩০ ১৭।১১।৮৩ ২৭ নং পত্রের ভিত্তিতে ননী ভট্টাচার্য এবং কানাই ভৌমিককে ধন্যবাদ সহ উত্তর দান।

১৯।১১।৮৩ S.D.O. ঝাড়গ্রাম। বাঁশপাহাড়ী থানার পাটাঘর গ্রামের নিত্যানন্দ শবরের পত্রের ভিত্তিতে ওই অঞ্চলে শবর গ্রাম সকলকে এখনি স্কীম আওতায় আনা + ১৯৮১ সালে মঞ্জুর গৃহনির্মাণ
১ পৃঃ + শিল্প শিক্ষার টাকা ওরা না পাওয়ার কথা। চুনী কোটালের পত্রে কম্যুনিটি চলের সাফল্য জেনে আনন্দ।

৩২ ১৯।১১।৮৩ নিত্যানন্দ শবর। ৩১ নং এর কপি সহ পৃথক পত্র।

৩৩ ১৯।১১।৮৩ যুগল কোটাল। লোধা সমিতির পক্ষ থেকে চুনী ও শংকর ও হরেকেস্ট সহ ১) খেড়িয়া সম্মেলন (পুরুলিয়া) ২) মুণ্ডা সমাজের বীরসা জন্মোৎসবে শালবনি—আন্ডেরিতে যোগদানে আনন্দ জ্ঞাপন। ১) ডহরপুর বিদিশার স্কুল হতে ছাত্রী বিতাড়ণ তার পিতাকে লাঞ্ছনার সংবাদ সত্য হলে সে বিষয়ে খোঁজ
১ পৃঃ নেয়া ও সমিতি তরফে প্রতিবাদের প্রয়োজন। ২) সমিতি তরফে মেদিনীপুর জেলার সকল আদালতে লোধা ক্ষেত্রে সরকারী

উকিল বা ফ্রি লীগাল এডের জন্য সচেষ্ট হবার গুরুত্ব। ৩) বিনপুর-বাসী লোধা যুবকের আদালতে মৃত্যুর প্রতিবাদ সমিতি তরফে করার কথা বলা। ৪) নিত্যানন্দ শবর সঙ্গে যোগাযোগ করে শবর গ্রামগুলি সমীক্ষা করে খাদ্যগ্রাম সেলে আশু স্কীম ও প্রতিকার দাবী সমিতি তরফে।

৩৪-৩৫ ১৯।১১।৮৩ ৩১ ও ৩২ নং পত্রের কপি যুগলকে।

৩৬ ২৫।১১।৮৩ **রবিন মুখোপাধ্যায়**। কর্মরত অবস্থায় স্টেট ব্যাঙ্কের সুইপার স্টেট বাস চাপা পড়ে মারা গেলে তাঁর স্ত্রী দুলারী দেবী (হরিজন) দীর্ঘদিন ক্ষতিপূরণ না পাবার ব্যাপারে প্রতিকার প্রার্থনা।

২৪।১১।৮৩ **রোজিকা ও কাউন্সল** (নয়াদিল্লী S.C.S.T. কমিশনার অফিস)। কাঁচরাপাড়া হরিজনদের (১) সংরক্ষিত চাকরি রেলোয়ে ও পৌরসভায় না পাবার ঘটনা। ২) ইছাপুর ও কাশীপুর গান অ্যাণ্ড সেল কারখানা অঞ্চলে হিন্দী প্রাথমিক স্কুলে
৩ পৃঃ অপূর্ণ শিক্ষক পদ থাকার কথা। ৩) কাঁচরাপাড়ার হরিজন কল্যাণ সমিতির স্কুল বাসব্যবস্থা-স্বাস্থ্যব্যবস্থা গুণ্ডাদের হামলা ইত্যাদি বিষয়ে ন্যায্য দাবীর বিশদ বিবরণ ও প্রতিকার প্রার্থনা।

৩৮ ২৪।১১।৮৩ **শিউচাঁদ রাম**। ৩৭ নংয়ের কপি।

৩৯ ২২।১১।৮৩ **রথীন সেনগুপ্ত**। কাঁচরাপাড়ায় হরিজনদের উপর চোরাই ও বেআইনী মদ কারবারী গুণ্ডাদের ব্যাপক সন্ত্রাস, বীজপুর
২ পৃঃ থানার নিষ্ক্রিয়তা, রাজনীতিক দলের ঔদাসীন্য বিষয়ে বিশদ চিঠি। সঙ্গে হরিজনদের আবেদনের XEROX কপি।

২২।১১।৮৩ ৩৯ নংয়ের কপি শিউচাঁদ রামকে।

২৫।১১।৮৩ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** (যো. ক.)। শ্রমমন্ত্রক সোমনাথে যেতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন এবং লোধা পুনর্বাসন+খেড়িয়া উন্নয়ন+নারায়ণগড় ও পুরুলিয়াতে জল ব্যবস্থা+কাঁচরাপাড়া হরিজনদের সমস্যা+মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়ী মাধ্যমে মুণ্ডা উন্নয়ন +কল্যাণী হরিজন-আদিবাসীদের সমস্যা+ইটভাটা মজুরদের সমস্যা +আদিবাসী ক্ষেত্রে চাকরির ভয়াবহ পরিস্থিতি, এ সব ক্ষেত্রে ওদের সংগঠন দ্বারা কাজ করাবার জন্য কোথায় কাকে লিখতে হবে, জানতে চাওয়া।

২৫।১১।৮৩ গোপীবল্লভ সিং দেও / গোমস্তাপ্রসাদ সরেন / মহাদেব হাঁসদা / যুগল কোটাল : শ্রমমন্ত্রক সেমিনারে Grass root সংগঠন দ্বারা উন্নয়ন কাজ করাবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখার

পৃঃ ২ জন্য ১৮ পয়েন্টে বিশদ তথ্য জানতে চাওয়া।

৪৩ ২৫।১১।৮৩ **মনোহর মুর্মু / মণ্ডল হেমব্রম / চিন্ময় ঘোষ /**

২ পৃঃ **শ্রবণকুমার।** ৪২ নং পত্র মর্মে পৃথক ১২ পয়েন্ট চিঠি।

৪৪ ২৫।১১।৮৩ **পরমানন্দ সিং / রামলাল সিং / পরেশচন্দ্র**

২ পৃঃ **সরকার / সুন্দরী সরেন।** ৪২ নং পত্র মর্মে পৃথক ১৪ পয়েন্ট চিঠি।

৪৫ ২৫।১১।৮৩ **স্বামী অগ্নিবেশ / পূর্ণেন্দু মজুমদার / অজয়**

১ পৃঃ **মিত্র / সনাতন মুণ্ডা।** ৪২ নং পত্র মর্মে পৃথক ৮ পয়েন্ট চিঠি।

৪৬ ২৫।১১।৮৩ **রামেশ্বরম / বি. বাঘোয়ার / লিউচাঁদ রাম।**

২ পৃঃ ৪২ নং পত্র মর্মে পৃথক ১৪ পয়েন্ট চিঠি।

[৪১—৪৬ নং পত্র বিষয়ে বক্তব্য : ১৯৮৪-র ৫—৮ জানুয়ারিতে শ্রমমন্ত্রক আয়োজিত সেমিনারে সেশন-চেয়ার করার কথা ছিল। তাতে নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ও প্রশাসনিক দীর্ঘ ঔদাসীন্যের কারণে জনসাধারণের স্বউদ্যোগে গড়ে তোলা সমিতি ও সংগঠন মাধ্যমে সরাসরি উন্নয়নের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের তরফে তথ্য ও পরিসংখ্যান চাওয়া হয়]।

৪৭ ৩০।১০।৮৩ **নমী ভট্টাচার্য।** ২৬ ও ২৭ নং পত্রের আগে লেখা।

২ পৃঃ নারায়ণগড় থানার গামা সহ অন্যান্য গ্রামের জন্য অঞ্চল প্রধানের

সঙ্গে সুপারিশ সহ ৩২ জন গ্রামবাসীর দরখাস্ত, ন্যালো ও কুয়ার জন্য

গণ- দাখিল ও বিশদ পত্র। এ বিষয়ে বিনয় চৌধুরী / শম্ভু মাণ্ডি /

দরখাস্ত S.D.O. ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট / মেদিনীপুর A.D.M. L.R. / B.D.O নারায়ণগড় / ৩নং নারমা অঞ্চল প্রধান প্রত্যেককে ৩, ৬টি করে পত্র দেয়া হয়েছে, তা জ্ঞাপন।

৩০।১০ ৮৩ **ধীরেন্দ্রচন্দ্র বেরা।** অঞ্চলপ্রধান হিসেবে গামা, মালিগেড়িয়া ও অন্যত্র সেচ চেয়ে ও স্কীম চেয়ে B.D.O. নারায়ণগড়/ সেচমন্ত্রী / শম্ভু মাণ্ডি / S.D.O. ঝাড়গ্রামকে লিখে কাজটি ত্বরান্বিত করার অনুরোধ।

৪৯ ৫।১২।৮৩ **লক্ষ্মীধর মিশ্র** (ডিরেক্টর জেনারেল / শ্রমকল্যাণ /

১ পৃঃ নয়াদিল্লী)। ৫—৮।১।৮৪ সেমিনার বিষয়ে।

৫।১২।৮৩ এম কৃষ্ণমূর্তি। গঙ্গামনোহরপুর, চরসরাটি, বিরপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পত্রের XEROX সহ বেআইনী ইটভাটা করে কৃষিজমি দখল+গঙ্গার ভাঙন+ইটভাটার ফলে স্কুলের নিরাপত্তা
২ পৃঃ ও গ্রামের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশন দূষণ বিষয়ে প্রশাসনিক প্রতিকারের গুরুত্ব জ্ঞাপন।

৫১ ৫।১২।৮৩ বিনয় চৌধুরী। ৫০ নং এর বক্তব্য এবং সরাটি
২ পৃঃ পঞ্চায়েতের ভূমিকা জ্ঞাপন।

৫২-৫৩ ৫।১২।৮৩ ভূমিশলাকার অশোক মিত্র এবং চিত্তরঞ্জন রায়কে ৫১ নং এর কপি।

(৫০—৫৩ বিষয়ে: ইটভাটার ব্যাপারটি শ্রমসচিবকে ও কৃষি ভূমি+পঞ্চায়েতের ব্যাপারটি ভূমি পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে লেখা হয়)।

৫৪ ১৭।১১।৮৩ ডাঃ শম্ভু মাণ্ডি। ১) ১২/১৩।১১।৮৩ পুরুলিয়া শবরমেলায় খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি স্থাপনের কথা।
৩ পৃঃ ২) খেড়িয়াদের বিশেষ দুরবস্থার কথা। ৩) ৭টি থানার ৩৪টি পরিবারকে I.T.D.P. স্কীমে আনার কথা। তালিকা দাখিল।

৫৫ ১৭।১১।৮৩ কানাই ভৌমিক। পুরুলিয়ার ও থানার ১৩
৩ পৃঃ খেড়িয়াশবর পল্লীর বিশদ বিবরণ। কোনো জলব্যবস্থা নাই। নদীর জল নির্ভর ৫ ক্ষেত্রে। জলের জন্য আবেদন।

১৭।১১।৮৩ অশোক চক্রবর্তী। ৫৫-তে উল্লেখিত জলের তালিকা দাখিল ও প্রার্থনা।

৫৭ ১৭।১১।৮৩ গোপীবল্লভ সিং দেও। সদ্য স্থাপিত খেড়িয়াশবর
৩ পৃঃ খেড়িয়াশবর সমিতি বিষয়ে ৮ পয়েন্ট চিঠি।

৫৮ ৮।১২।৮৩ পার্থসারথী চৌধুরী। নদীয়ার প্রগতিবার্তা কাগজে
১ পৃঃ জেলা তথ্য বিভাগ থেকে বিজ্ঞাপন না পাওয়া বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ।

৫৯ ১২।১২।৮৩ গোপীবল্লভ সিং দেও। ৫১ নং চিঠির প্রেক্ষিতে
২ পৃঃ খেড়িয়াশবর সমিতির কাছে কি চাই তার ৬ পয়েন্ট চিঠি।

৬০ ১২।১২।৮৩ ভূমিব্যবহার শলাকার অশোক মিত্র। দরিদ্রের
৩ পৃঃ দারিদ্র্যমোচনে কি করার আছে, ওদের সংগঠন কি করতে পারে, সে বিষয়ে বিশদ চিঠি।

১২।১২।৮৩ জলধর শবর। ১) ৮টি গ্রামের ৫২ জন নির্দোষ

শবর বিহার জেলে আটক আছেন না জামিন পেয়েছেন, জানতে চাওয়া। ২) স্বাধীনতাসংগ্রামী পেনশান ক্ষেত্রে খেড়িয়াদের সার্টিফিকেট পেতে কি অসুবিধা তা জানাতে বলা।

১৬।১২ ৮৩ **রথীন সেনগুপ্ত**। যমুনা কমার্শিয়াল ফাইনান্স (T) লিঃ / ৮/৩ কে. পি. চট্টরাজ রোড / বহরমপুর কর্তৃক আমানতকারী-দের বঞ্চনা বিষয়ে তাঁদের চিঠির XEROX কপি সহ প্রতিকারের আবেদন।

৬৩ ১৬।১২।৮৩ ৬২ নম্বর I. G. পুলিশকে XEROX সহ আবেদন।

২ পৃঃ

৬৪ ১৬।১২।৮৩ ৬২ ও ৬৩ নং চিঠির কপি কল্পনা বিশ্বাসকে প্রেরণ।

৬৫ ৯।১।৮৪ **জ্যোতি বসু**। কোশিয়াড়ি থানার গরিব সি. পি. এম. কর্মীদের আদিবাসী ও দরিদ্র কৃষক সংগ্রাম সমিতির উপর সি. পি. এম. ব্লক কমিটি / চেয়ারম্যান / এম. এল. এ. সহ অন্য প্রভাবশালী সি. পি. এম. লোকদের পুলিশ সহায়তায় দীর্ঘকালীন হামলা,

৪ পৃঃ অত্যাচার, বর্গা উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি লুণ্ঠন ও জ্বালানো, গ্রেপ্তার, এ বিষয়ে সংগ্রাম কমিটির দাবী ও পত্রের কপি সহ, ধনী সি. পি. এম. কর্তৃক গরিব পার্টি কর্মীদের নির্যাতন বিষয়ে জরুরি তদন্ত ও প্রতিকার প্রার্থনা। কেসের বিশদ বর্ণনা।

৬৬ ও ২৫।১১।৮৩ ৬৫ নম্বর আগে রথীন সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি। কপি

৬৭ মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে।

৬৮ ২৫।১।৮৪ আনন্দবাজার পত্রিকায় ৬৫ পত্রের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ

৫ পৃঃ জ্ঞাপন।

৬৯ ৯।১।৮৪ **মনী ভট্টাচার্য**। ১) তাঁর ও কানাই ভৌমিকের সহৃদয় অনুমোদন সত্ত্বেও নারায়ণগড় থানার গামা ও অন্যত্র সেচ ব্যবস্থা

৩ পৃঃ না হওয়া। ২) পুরুলিয়ার ১৭টি শবরপল্লীতে জোড়বাঁধ ও অন্যান্য জলব্যবস্থার তালিকা সহ আবেদন।

৬৮ ৯।১।৮৪ **কানাই ভৌমিক**। গামা ও মালিগেড়িয়া হতে প্রেরিত চিঠির কপি সহ ওদের সেচজল না পাবার কথা জ্ঞাপন।

৬৯ ৩।২।৮৪ **সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী** (R. D. C.) মেদিনীপুরে শাঁকরাইল / কেশিয়াড়ি / নারায়ণগড় থানার উনিশটি গ্রামে সেচ

৩ পৃঃ ও পানীয় জলব্যবস্থার জন্য এবং পুরুলিয়ার ১১টি গ্রামে জলব্যবস্থার

জন্য আবেদন।

৩।২।৮৪ পরমানন্দ সিং / রামলাল সিং / যুগল কোটাল। মুণ্ডা-ভূমিজ-লোধা যৌথ সম্মেলনে সম্মতি। লেখকের সংবর্ধনায় আপত্তি।

৩ পৃঃ সম্মেলনের জন্য যা করতে হবে, নির্দেশ সহ বিশদ পত্র।

৭১ ৩।২।৮৪ ৭০ নং-এর কপি গোমস্তাপ্রসাদকে।

৭২ ১৬।২।৮৪ **কালাই ভৌমিক**। ৬৮নং পত্রানুসারে মালিগেড়িয়া
১ পৃঃ ও গামা বাদ দিয়ে অন্যত্র মঞ্জুরীকৃত স্যালোর কথা জ্ঞাপন এবং ওই দুটি গ্রামবাসীর হতাশার কথা জ্ঞাপন।

৭৩ ১৬।২।৮৪ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** (যো ক.)। লোধা বিষয়ে
২ পৃঃ বিশদ চিঠি। ৯ পয়েন্ট।

৭৪ ১৬।২ ৮৪ **দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়** (যো. ক.)।
২ পৃঃ সেমিনারে প্রেরিত আলোচনার বিশদ বক্তব্য।

৭৫ ২৫।২।৮৪ **যুগল কোটাল**। ৭০ নং পত্রের বক্তব্য বিষয়ে
২ পৃঃ বিশদ চিঠি।

৭৬ ১।৩।৮৪ **পরমানন্দ সিং**। মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়াঁর সম্মেলন
২ পৃঃ বিষয়ে বিশদ নির্দেশ। গঠড়াঁর মুখপত্র "আঁসি" বিষয়ে নির্দেশ।

তুরিলি-সিরমারে (ষাট বছরে) মারাংদাই (বড়দিদি) মহাশ্বেতা দেবী

১) ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর, ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্ম জয়ন্তীর আয়োজন করেছে প্রহ্লাদ সিং, দীনবন্ধু সিং প্রমুখ 'মুণ্ডা সমাজ সুধার গঠনী'র পশ্চিমবঙ্গের সদস্যবৃন্দ। স্থান চক্রধরী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। উৎসব আরম্ভের আগে কথা বলছি কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে। কালীদাদু (কালীপদ সিং) একটি বই দিলেন। নাম, 'অরণ্যের অধিকার' লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। অনিচ্ছুক মনে কয়েকটি পাতা ওলটাতেই বুঝলাম, বীরসা মুণ্ডাকে নিয়ে লেখা বই। বইটি পড়ার জন্য মনটা আনচান করে উঠলো। সকলের কাছ থেকে নিজেকে চুরি করে একান্তে বসে দ্রুত পাতা উলটে যেতে লাগলাম, শেষও করলাম।

পরের খেতে খামারে গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মা করমি, বাবা সুগানা, মুণ্ডা আদিবাসী. তাদের সন্তান বীরসা। বিপ্লবী বীরসা, জমিদার, মহাজন, ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর বীরসা। কিন্তু এক অবহেলিত আদিবাসী সন্তানের কেই বা খোঁজ রাখে। মুণ্ডা আদিবাসীরাই পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নাম তেমন জানে না। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী নিজ স্বভাবগুণেই খুঁজে নিলেন বীরসাকে। জগৎ সমক্ষে তুলে ধরলেন ভগবান বীরসা মুণ্ডাকে। অজানা, অচেনা সেই লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হল।

আজ পশ্চিমবঙ্গের মুণ্ডারা বীরসার নামে গর্ব করে, জন্মদিনে উৎসব করে, বীরসার নামে ছেলের নাম রাখে, ক্লাবের নাম রাখে। বীরসার নামে মুণ্ডারা নিজেদের খুঁজে পেতে চায়, আত্মসচেতন হতে চায়, ভাবে তারা বীরসার বংশধর, নেহাৎই দয়ার পাত্র তারা নয়। তার সঙ্গে তারা এও মনে করে, তাদের ব্যথাবেদনার কথা ভাবেন, লিখেন, এমন মহীয়সী নারীও বর্তমান আছে। তাই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী আজ মুণ্ডাদের মারাংদাই (বড়দিদি)।

তাঁকে একটু দেখার জন্যে, তাঁর দুটো কথা শোনার জন্য মনপ্রাণ আটুপাটু করতে থাকে। কিন্তু কত নামীদামী লোক, কলকাতার লোক, দেখা কি

পাওয়া যাবে ? পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে, কি জানি, হয়তো না। অরণ্যের অধিকারের লেখাগুলো কিন্তু প্রতিবাদ করে ওঠে, কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। দেখা করতে যাও, দেখা হবে। সাহস পেলাম। একটা ইনল্যাণ্ড লেটারে 'মুণ্ডা সমাজ সুধার গঠনী / পশ্চিমবঙ্গ'-র পক্ষে মুণ্ডাদের অভিনন্দন জানালাম তাঁর অরণ্যের অধিকারের জন্য। কিন্তু ঠিকানা লিখতে গিয়ে হলো গোলমাল মায়ার বুক সহায়, পথ একটা চোখে পড়ল। করুণা প্রকাশনীর প্রকাশক মশায়কে লিখলাম, চিঠিখানা তাঁকে দিতে। তারপর অপেক্ষা। জানি না কি ফল হয়, মনটা উসুখুসু করতে থাকল। প্রতিদিন ডাকঘরে খোঁজ নিই অবশেষে সেই বহু আকাঙ্খিত চিঠিটা পেলাম ২৭ | ১২ | ৭৯-তে লেখা, পেলাম ২৯ | ১২ | ৭৯-তে। সেটাও ইনল্যাণ্ডে লেখা। প্রকাশক মহাশয় সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁকে চিঠিটা দিয়েছিলেন। ঝকঝকে হাতের লেখা, চিঠির ভাষা আরও ঝকঝকে, কোনো বোঁয়াশা নাই। চিঠি পড়ে মনে হলো, তিনি যেন কতকালের চেনা, কত আপনার জন, অজানা অচেনার কোন সীমারেখা নাই। তখন "আপনি" করেই আমাকে লিখেছিলেন, "আমার বুক আপনি গর্বে আনন্দে ভরে দিয়েছেন। আমি সগর্বে বলে বেড়াব, বীরসা ভগবানের স্বজাতির হাতে আমার বই পৌঁছিয়েছে, আমার লেখক জীবনে সব চেয়ে বড় এক জয়ের দিন। আমার বাড়িকে নিজের ঘর মনে করবেন। যখন ইচ্ছা আসবেন এবং এলে আমার কাছেই থাকবেন। আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমার দ্বারা আপনাদের কোনো সাহায্য হলে বলবেন। সাধ্যমতো করব।"

মনটা ভরে উঠল এ কাজ সে কাজ। সবাইকে এ সংবাদ জানালাম। আমার মত সকলেই খুশি।

তারপর একদিন চিঠি পেলাম তাঁকে তাঁর অরণ্যের অধিকারের জন্য সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। যেতে লিখলেন পুরস্কার অনুষ্ঠানে। শরীর অসুস্থ ছিল, যেতে পারিনি। নিতাইকে পাঠিয়েছিলাম। নিতাই এসে সব বলল। যেতে না পারার দুঃখ ভুলতে পারিনি।

তিনি লেখিকা এবং বোধহয় খুব খোঁচা মারা লেখিকা। তাঁর লেখক জীবনের কথা লেখার মত বিদ্যার পুঁজি আমার নাই। চোখে দেখার পুঁজিতে যেটুকু তাঁকে জেনেছি তাই দিয়েই আজকে তাঁর ষাটের কোঠায় পা রাখার দিনে শ্রদ্ধা জানাতে চেষ্টা করছি।

প্রথম সাক্ষাৎ। মনোহর মুর্মু মহাশয়ের "আবোয়ার গাওতা"

সম্মেলনে, হাওড়াতে। অপেক্ষা করছি কখন আসবেন। কিছুক্ষণ পরে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। দুজন মহিলা নামলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম কোনজন মহাশ্বেতা দেবী, অপর মেয়েটি লাকু জোংকো, সিংভূমের একটি হো আদিবাসী ছাত্রী। কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলাম, নাম বললাম। দীর্ঘ অদর্শনের পর মা যেমন ছেলেকে কাছে টেনে নেন, তিনি তারও যেন অধিক করলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁর বাসায় এলাম। তখন অনেক রাত। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন কথা চলল, কত যে কথা, কথা যেন শেষ হতে চায় না। তিনি তখন দিদি।

মুণ্ডা, ওরাওঁ, লোধাশবর, খেড়িয়াশবর, সাঁওতাল ইত্যাদি মানুষকে তিনি কি গভীর ভাবেই না ভালবাসেন। পারলে যেন মুরগী মায়ের মত সকলকে ডানার নীচে আগলে রাখেন। অসীম তাঁর মমত্ববোধ। এদের দুঃখের কথা শুনলে তিনি গভীর বেদনা বোধ করেন। শুধু বোধই নয়, নানাভাবে নানা সময়ে তিনি সরকারের কাছে এদের জন্য আবেদন নিবেদনও করেন। আমাকে আজ অবধি যত চিঠি লিখেছেন, তা একত্রিত করলে বেশ বড়সড় একটা বই হয়ে যায়। প্রত্যেক চিঠিতেই লিখেছেন, "সরকারী সাহায্য পাও বা না পাও, নিজেরা সমাজের কল্যাণকর কিছু কাজ করে যাও। গ্রামে গ্রামে ক্লাব, পাঠাগার, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোল। লেখাপড়া ছেলেমেয়েরা অন্তত একজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করুক। মহিলা-সমিতি কর, মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত কর, সমাজের কাজে প্রেরণা দাও, বনবিভাগ থেকে চারা নিয়ে ঘরে ঘরে গাছ লাগাও।' ইত্যাদি নানান পরিকল্পনা। আমাকে শাসন করে লিখেছেন, "পরমানন্দ, তুমি ভীষণ ঘুমাও, ঘুমালে চলবে না, তুমি লিখ। লিখ গ্রামের কথা, দুঃখী মানুষের কথা, তোমার সমাজের কথা, কোন্ গ্রামে কি আছে না আছে, কি হলে চাষীমজুর সকলের ভাল হবে তার কথা।"

একবার প্রায় বারোজন মত মুণ্ডা আদিবাসী চাষী ভাই আমার সঙ্গে দিদির ওখানে গেছিল। ওদের নিয়ে হাওড়ায় নামলাম। নেমেই ওরা অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। অনভ্যস্ত চলা, পায়ে পায়ে বাধা। কি জানি কেমন দিদি, সকলেই যেন চিন্তিত। হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ, তারপর তাঁর বাসায় পৌঁছলাম। সকলের মনে প্রশ্ন, কি জানি কেমন জায়গায় এলাম। শুকনো মুখে সকলে আমার সঙ্গে তাঁর বাসায় উঠল। দিদি ছিলেন। সকলকে সস্নেহ আহ্বান জানালেন। ২/১ মিনিটের

বাবরুম। সকলে যেন নিজের দিদির ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছে। সবাই যেন নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছে। বলেন, জল খাবে? গরম লাগছে? পাখা নাও, দাও একটু পাখা করে দি। কাপড় ছাড়ো। ওই বাথরুম। বাথরুম আমাদের জানার কথা নয়। দিদি সব দেখালেন।

আমার সঙ্গে লুঙ্গি ছিল না। কাপড় ছাড়তে পারিনি। তিনি তাঁর নিজের একটি শাড়ি কাপড় দু-ভাঁজ করে এনে বললেন, দিদির কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরলে কোনো দোষ নাই।

পরদিন সকাল বেলা মুড়ি, গরম জিলিপি একসঙ্গে বসে খাচ্ছি, দিদি পাশে বসে পরিবেশন করছে, এমন সময়ে এক শার্ট প্যান্ট পরা ভদ্রলোক এসে আমাদের পাশেই বসে পড়লেন। দিদিই কথা বললেন। দিদির কাছে জানলাম, তিনি পার্থসারথি চৌধুরী। ঐ সময়ে রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি সচিব। দিদিই তাঁর সামনে আমাদের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পার্থবাবু আমাদের অনেক কথা শুনলেন, অনেক কথা বললেন।

পুরুলিয়াতে খেড়িয়াশবরদের সামাজিক সম্মেলন। দিদি সেখানে গেছেন। কিন্তু ১৫ই নভেম্বর (১৯৮৩) তাঁকে আসতে হবে মেদিনীপুর শালবনী থানার শালবনী গ্রামে। শালবনী আদিবাসী ক্লাবে বীরসা মুণ্ডা জন্মোৎসব ও মুণ্ডারী সংস্কৃতির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এলেন সরাসরি পুরুলিয়া থেকেই। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। বাস থেকে নেমে ২/৩ মাইল আল রাস্তা পার হয়ে এলেন। স্নান খাওয়া নাই, ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে। আমাদের দড়ির খাটিয়ায় ছেঁড়া কাঁথায় গা এলিয়ে দিলেন। তারপর সামান্য ক'টি শুকনো মুড়ি মুখে দিলেন। আমাদের মাটির হাঁড়ির পান্তাতেও তাঁর অরুচি দেখিনি। ক্লাবের ছেলেমেয়েরা মাদল দামসা বাজিয়ে মিছিল সহকারে তাঁকে উৎসবস্থলে নিয়ে গেল। মুণ্ডা মেয়েরা মুণ্ডারী প্রথায় পা ধুইয়ে অভ্যর্থনা জানালো। সেদিন সেখানে আজকের সদস্যাতক চুনী কোটাল সহ অন্যান্য লোধা ভাইরাও উপস্থিত ছিলেন। জেনে আনন্দিত হলাম যে লোধাশবর সমিতির সভাপতি ও চুনীর বড়দাদা যুগল কোটাল অন্যদের নিয়ে খেড়িয়া সম্মেলনেও গিয়েছিলেন।

দিদি বীরসা ভগবানের ন্যায় দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য সকলকে সংগ্রামী হতে আহ্বান জানালেন, সমাজ কল্যাণের কাজে এগিয়ে আসতে তিনি মহিলাদেরও আহ্বান জানালেন। রাত্রি একটা পর্যন্ত

তিনি উৎসবস্থলে ছিলেন। পরদিন তাকে কলকাতা ফিরতে হবে। আদিবাসী উন্নয়ন বিষয়ক কমিশনারকে দিদি আদিবাসী বিষয়ে কথা বলবেন, পরিকল্পনা জানাবেন। কতটুকুই বা ঘুমালেন, ভোরে উঠে আবার সেই এবড়ো খেবড়ো, হাঁটাপথ রাস্তায় ২ মাইল হাঁটা, তারপর বাস। একবার তার বাসায় দেখি একজন হো-মেয়ে এসেছে চক্রধরপুর থেকে। শীতের সময় মেয়েটি শীতে কষ্ট পাবে, তাই দিদি তাঁর সোয়েটারটি পরিয়ে দিলেন ফেরার সময়।

এক ভিখারী খাবার চাইতে এসেছে ; সঙ্গে কোন পাত্র ছিল না, দিদি তাকে একটি পাত্রসহ ভাত দিয়ে বিদায় করলেন।

নারায়ণগড় থানার গামা গ্রামের কয়েকজন গরিব লোক দালালের মোটা মজুরির টোপ গিলে কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইবাসে মাটি-কাটা কাজ করতে গিয়েছিল। ২/৪ দিন কাজ করার পরই ওদের ভুল ভাঙে। ওদের সঙ্গে ঠিকাদারের লোকেরা ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে লাগলো। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর সামান্য কিছু পয়সা দেওয়া হত খাবার কিনে খাওয়ার জন্য। কোনপ্রকার দাবী, প্রতিবাদ করা চলবে না, কাজ ছেড়ে চলে আসবার স্বাধীনতা নেই। তাদের মধ্যে একজন মুণ্ডা ছেলে দিদির বাসার ঠিকানা জানত। নানা ফন্দি ফিকির করে তারা একদিন দিদির ওখানে পালিয়ে আসতে পারলো। দিদি তাদের খাওয়ালেন, বিশ্রাম করতে দিলেন। বাড়ি যাওয়ার গাড়িভাড়া দিলেন, খরচ হলো ২০০ টাকার মত।

আমার ছোট মেয়ের বিয়ে। পাত্র বিহারের বনকাটা গ্রামের ছেলে। দিদিকে আসতে অনুরোধ করেছি। আগেভাগেই তিনি এসে গেলেন। এসেই এটা গোছান, ওটা গোছান, উঠোন ঝাঁটান, যেন তিনি তাঁরই ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে সব করবেন। একসময় দেখি আমার ছেঁড়া পাঞ্জাবী রিপু করতে বসেছেন। রাত্রে বর এলো। বরপক্ষকে অভ্যর্থনা জানালেন। খাবার ঠাঁই করা, খাবার দেওয়া, তাদের সঙ্গে কথা বলা, এটা করা ওটা করা, সবেতেই তিনি আছেন। বরযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক ছিল। সবাই মুণ্ডা ছেলে, বিহার এবং উড়িষ্যার। পশ্চিম-বাংলায় মুণ্ডা বরযাত্রীতে এইরকমটা সাধারণত দেখা যায় না। ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে আর ভাবছে ভদ্রমহিলাকে তো মুণ্ডা বলে মনে হয় না, কে ইনি। একজনের প্রশ্নের উত্তরে আমি ওঁর পরিচয় দিলাম,

আমার এবং আমাদের মুণ্ডা সমাজ সুগাড়ে গঠড়া পঃ বঃ এর মারাংদাই। কেওনঝাড় কলেজের অধ্যাপক তথা 'মুণ্ডারী সমাজ সাঁওরার জামদা' উড়িষ্যা এর সভাপতি সনাতন মুণ্ডা ঐদিনই তাদের মারাংদাই রূপে তাঁকে বরণ করলো। আমন্ত্রণ জানালো উড়িষ্যার তাঁর মুণ্ডা ভাইবোনেদের মধ্যে যাবার জন্য। পরে তিনি সে আমন্ত্রণ রেখেছিলেন।

"মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়া পঃ বঃ এর মুখপত্র রূপে মাসিক পত্রিকা "আরশি" প্রকাশ করা হবে ঠিক হলো। ঠিক হলেই সব ঠিক হয় না। পত্রিকা প্রকাশের জন্য টাকার দরকার। এই মুহূর্তে টাকা নেই। দিদির কানে কথা উঠলো। আমার হাতেই ৮০০ টাকা দিলেন পত্রিকা প্রকাশের কাজ শুরু করার জন্য। দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে।

প্রয়াতা মা ধরিত্রী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গরিব চাষীদের জমিতে সেচের জন্য তিনি একটি স্যালো করে দেবেন। আমার হাতে ২২০০/- টাকাও দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা গুণধর সিং এর গ্রাম গামাতে স্যালোটা হোক। আমাকেই সব ব্যবস্থা করে দিতে বলেছেন। কিন্তু গুণধর জানিয়েছে গামাতে স্যালো করতে খরচ হবে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। কাজেই কাজ এগোতে পারিনি। কি করা যাবে ঠিক হয়নি।

তিনি রাজনৈতিক নেতা নন, পদীর মোহ তার নেই, টাকার মোহ নেই। তবে কেন তিনি নিজের শরীর মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এসব করে বেড়াচ্ছেন? হ্যাঁ করছেন এবং করবেনও। তিনি যে দিদি, তিনি যে আমাদের মারাংদাই। তিনি যে প্রদীপের মত জ্বলে মরার দলে।

"দিদি, আমাদের দুঃখ বড্ড বেশি করে তোমার বুকে বাজে। তাই তো তোমার মন আমাদের জন্য আকুলি বিকুলি করে। আজকে তুমি ষাট বছরে পা রাখলে, কি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাব, গোলাপ রজনীগন্ধা তো দেখিনি, পাবো কোথায়। আমরা আমাদের হৃদয়ের বুনো ফুল দিয়েই তোমাকে শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার মুণ্ডা ভাই বোনেদের শ্রদ্ধাঞ্জলী ও অভিনন্দন গ্রহণ কর। আমাদের সিং বোঙ্গার কাছে প্রার্থনা করি আগামী অনেক অনেক বছরে সুস্থ শরীর যেন রাখতে পার।"

দিদির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের কল্যাণকামী

অজানা অচেনা সকলের প্রতি আজকের দিনটিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি।

স্নেহধন্য
মুণ্ডা সমাজ সুধার গঠনকার
পক্ষ থেকে
পরমানন্দ সিং
সভাপতি

কুচলাদীঘি
১৪ | ১ | ৮৩

২) (সাঁওতালী) হে দেবী, আবিনা : তুরুই গেল—জানাম সেমা বত লোকাতে নাপায়রুমা, আবিন আলে তালারে জিলিং জীক্তিং-জীবন তাঁহেকাতে পরায়নি – বাহালেকা জেঁগেং জেঁপেং তাহেনবিন।

নওয়াগে আবিন লাগিং আলেয়া চাঁদ বঙ্গাবেন নেহর। মুচাদ-সানাম রুগে ॥ (বাংলা) হে দেবী, তোমার ষাটতম জন্ম বর্ষ সর্বতোভাবে সার্থক হউক, তুমি দীর্ঘায়ু হইয়া আমাদের মধ্যে শতদলের মত বিকশিত হইয়া থাক। ইহাই তোমার শুভ জন্মলগ্নে আমাদের একান্ত আন্তরিক কামনা ॥

ইতি—সদস্যবৃন্দ
কোভাডার (সিংভূম) আদিবাসী কালিক আখড়া

৩) বনভূমি ছোটনাগপুরের বনবাসী সংস্কৃতির এক সম্ভ্রম ও স্বাধিকার —যা গন্ধে স্পর্শে রূপে বর্ণে বহুলাংশে আদিম তবু অনন্য—পেরেছি পরিচয় আরও পেতে চাই, মহাশ্বেতা দেবীর কলম থেকে—তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি ও বলি, "চরৈবেতি চরৈবেতি।"

সুনীল সরকার / সাধারণ সম্পাদক / সংস্কৃতি সংসদ / ঘাটশিলা / বিহার ॥

৪) তাঁর গোটা সাহিত্য কর্মটিই আমাদের মত গ্রামগঞ্জ নিয়েই, তাই তাঁর ষাট বছর পদার্পণে আন্তরিক ভাবে খুশি। কামনা করি তাঁর দীর্ঘায়ু।

—হংসরাজ ক্লাব / হেন্দলজুরী / মহলিরা / সিংভূম।

৫) ষাট বছর পূর্ণ হোল। তার মানে যৌবন চলে গে[illegible] সেই সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরচিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই [illegible] ঠিক বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এক একজন গোটা [illegible] তথাকথিত ঠিকবেঠিককে তছনছ করে আর একটা ঠিক [illegible]

তেমনই একটা গোটা মানুষ আর একবার আমাদের চেতনাকে নাড়া দিলেন—মহাশ্বেতা দেবী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ নয়—দিনে দিনে ধারালো হয়ে আমাদের সামনে পথপ্রদর্শক। আমরা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, খুব কাছে পেয়েছি। তিনি আমাদের মা।

তাই আমরা তাঁর ষাট বছরে পদার্পণে ভীষণ খুশি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নীরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করি।

—মাদল / ঘাটশিলা / ১৩ই মাঘ ১৩৯১ ॥

৬) শবরজননী মহাশ্বেতা দেবীর ষাট বছরে পদার্পণ শুভ উপলক্ষে—

শ্রীচরণেষু মা,—পুরুলিয়া জেলার বন্য মানুষ খেড়িয়াশবর গোষ্ঠীর দশ হাজার মানুষ অপরাধীপ্রবণ মানবগোষ্ঠীর কলঙ্কতিলক কপালে এঁটে যখন বন্য পশুর মতন বনভূমি ও সমাজভূমি থেকে বিতাড়িত হতেছিল, তখন তুমি মা! এদের নিজ গর্ভজাত সন্তানের পরিচয় দিয়েছে, মায়া মমতা আর স্নেহ দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছ; লেখনী আর শক্তি দিয়ে রক্ষা করেছ। ছেলেমেয়েগুলো এখনো নাবালক; ষাট বছর আয়ুতে তো হবে না মা! হাজার হাজার ষাট বছর আয়ু কামনা করি। শ্রীচরণে প্রণাম জানাই।

—আপনার কান্ত অনুগত পুত্র—শ্রীজলধর শবর / সভাপতি: পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি / গ্রাম ও ডাক: কুদা / পুরুলিয়া ॥

৭) মহাশ্বেতা দেবী ষাট বছর পদার্পণের শুভ উপলক্ষে পুরুলিয়া বাসী ভূমিজ সমাজ কল্যাণ সমিতির পক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

১৯৮৩-তে মালডি শবর মেলায় আপনাকে আমরা দেখেছি, সেদিনই আপনাকে আমরা চিনেছি জেনেছি আপনি আমাদের একান্ত আপনজন। যখনি সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবিচার আর অত্যাচার আর শোষণের কবলে পড়েছি, তখনি আপনার স্নেহছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি। আপনার দীর্ঘ আয়ু ও কর্মচঞ্চলময় জীবনের শুভ কামনা করি। ইতি—

শ্রীমোহন সিং সর্দার / আহ্বায়ক: পুরুলিয়া জেলা ভূমিজ কল্যাণ সমিতি / ডুরকু / ডাক: দামদা / পুরুলিয়া ॥

৮) বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল জনসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহাশ্বেতা দেবীর ষাটবর্ষে শুভ পদার্পণ উপলক্ষে আমরা তাঁকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন, কামনা করি দীর্ঘ জীবন ॥

প্রগতিবার্তা / জনজীবন ও জনবিজ্ঞান পাক্ষিক / কল্যাণী / নদীয়া ॥

১) শ্রদ্ধাস্পদাসু দিদি, আপনার ষাট বছরে পদার্পণ পুণ্যলগ্নে আপনি

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও আমার মানভূম জনজাতীয় সংস্কৃতি সংসদের লোকশিল্পীগোষ্ঠীর শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমাদের বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ যুগ যুগ ধরে এ দেশের শবর, সহিস, বিরহড়, সাঁওতাল, মাল, মাহালি, ডোম প্রভৃতি এক বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে মনুষ্যত্বের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। স্বাধীনতার পর এ দেশের বিপুল বনবিবাসের হঠকারিতায় বনবাসী আমরা, প্রকৃতিনির্ভর অরণ্যসন্তানেরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

যখন আধিক জনটনের চরম অনিশ্চয়তায় নাভিশ্বাস উঠছে, ঘৃণা অবহেলায় হীনমন্য হয়ে হতাশায় ভুগছি, ঠিক সেই সময়ে অজয়ার মত আপনাকে পেলাম। করুণা নয়, আপনার প্রাণঢালা ভালবাসা আমাদের অনুপ্রাণিত করল সুদৃঢ় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। ভালবাসতে শেখালেন নিজের সংস্কৃতিকে।

সমাজের ভয়ভীতি, কঠোর সমালোচনাকে উপেক্ষা করে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি অবহেলিত জাতিগোষ্ঠীর দুষ্ট কৌশলে চেপে রাখা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তাবৎ বিশ্বের সুধীজনের কাছে তুলে ধরার পুণ্য প্রচেষ্টা করে আমাদের যোগাযোগের সেতু হয়ে আপনি দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছেন। সেই কাজে আরও বহুদিন আপনি আমাদের পথের দিশারী হয়ে থাকবেন—এই আশায় আজকের এই শুভলগ্নে আমাদের একান্ত কামনা। গোঁসাই রায়—গেরাম দেওতার কাছে আমাদের প্রার্থনা আপনাকে সুস্থ রাখুন —এই মানত করি

ইতি—আপনার স্নেহধন্য সৃষ্টিধর মাহাত / সম্পাদক : মানভূম জনজাতীয় সংস্কৃতি সংসদ সায়েন্টিফিক মেস / চাইবাসা রোড / পুরুলিয়া।

১০) মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সমাজের অত্যন্ত আপনজন। প্রকৃত অর্থেই স্বদেশী যে আদিবাসী সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার পাহাড় বুকে করে চলতে হয়, যার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজও জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়নি—মানবতালাঞ্ছিত সেই সমাজই মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীর উৎস। বহুকাল ধরে তিনি নিজেকে সেই সমাজেরই একজন হয়ে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সমাজের সরুপ উদঘাটনের কাজে। তাই তাঁর কাছে সমাজের হৃদস্পন্দন ধরা পড়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আদিবাসী, তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনআলেখ্য রচনা তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি।

বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন বলেই তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছে বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধশালী এবং ক্ষুরধারসম্পন্ন। শুধু তাই-ই নয়। তাঁর সংবেদনশীল মননের ফসল : চরিত্রগুলি কোনো গ্রন্থান্তরের কোন উদ্ভট জীব নয় বা বাস্তবতাবর্জিত স্বপ্নপুরীর নায়কনায়িকা নয়। ধূলিধূসর পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষেরিই প্রতিচ্ছবি তারা সকলে। আপনার আমার সাথে সাদৃশ্য থাকার ফলে সখ্যতা আসতে দেরি হয় না। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে যে কোনো প্রিয়জনের মতই। পলায়নী মনোবৃত্তি বা নিছক আদর্শবাদিতা নয়, জীবনমুখীনতাই মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। কালে কালে তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সমূহ নাকি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। জীবনের মূল স্রোতধারার সাথে আদিবাসী জীবনপ্রবাহকে মিশিয়ে দেবার মহান পরিকল্পনা নিয়েই নাকি দেশে বিপুল কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত হয়েছে। অথচ, ভাববার কথা এটাই, যে, স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও আদিবাসী উন্নয়ন কর্মসূচীর নীট ফল—আদিবাসীরা সেই আদিম যুগেই রয়ে গেল। সরকারী প্রচারমাধ্যমগুলিতে আদিবাসী উন্নয়নের কিরিস্তি শুনে তাতে অগাধ বিশ্বাস রাখলে, সেটা যে বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধুমাত্র অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে, আদিবাসী জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী বলেই মহাশ্বেতা দেবীর বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সূর্যসম ঘৃণার উদ্রেক স্বাভাবিকভাবে বলেই মনে হয়। বর্তমানের এই অসহনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কারা? সে কথা তিনি বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়েছেন তাঁর সাহিত্য এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মধারায়। অবহেলিত মানুষের অন্ধকারময় জীবনবোধকে আলোকে উত্তরণের প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে তিনি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন আদিবাসী সমাজকে। নিজগুণেই তাই তিনি আদিবাসী সমাজের মারাং দাই (বড়দিদি)। মারাং দাইয়ের ৬০ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—পরমেশ্বর মারাণ্ডি / সাধারণ সম্পাদক : সাঁওতাল সমাজ লাহাণ্ডি বাইসি / বহরমপুর।

১১) আপনাদের পত্রিকায় আয়োজিত, মহাশ্বেতা দেবীর ৬০তম

জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি মূল্যবান সংখ্যা প্রকাশের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই। বাংলা সাহিত্যের নব দিগন্তের পথিকৃৎ এবং সাধারণ মানুষের সংগ্রামের সাথী ও সমব্যথী লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ভবিষ্যতেও তাঁর দৃপ্ত কলম সমাজের অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বজ্রমের মতো ব্যবহার করবেন।

—সুকুমার সিং / সম্পাদক : পৃথিবীর পাঠশালা / মাস এডুকেশন / ২৩ ডি, পালিত স্ট্রীট / কলকাতা-১৯।

জীবনপঞ্জী

১) জন্ম ১৪ | ১ | ১৯২৬ ঢাকায়। পিতা কবি ও সাহিত্যিক, প্রাক্তন বার্তিকা সম্পাদক মণীশ ঘটক, যিনি যুবনাশ্ব নামেও খ্যাত। মা ধরিত্রী দেবী সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন, নিজেও লিখতেন এবং সাধ্যমতো সমাজসেবায় আগ্রহী ছিলেন। মহাশ্বেতা নয় ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। পিতা, মাতা, তিন ভাই অরীশ, অবলোকিতেশ ও শমীশ ১৯৭৩—১৯৮৪-র মধ্যে পরলোক-গমন করেন। বর্তমানে চার বোন শাশ্বতী, অপালা, সোমা, শারী ও একতম ভাই মৈত্রেয় জীবিত।

২) শিক্ষা :—শৈশবে ঢাকায় ইডেন মন্টেসরিতে স্বল্পকাল, তারপর মেদিনীপুর মিশন স্কুলে কিছুকাল। ১৯৩৬—১৯৩৮ শান্তিনিকেতনে স্কুলে। ১৯৩৯ থেকে কলকাতায় বেলতলা স্কুলে এবং সেখান থেকেই ১৯৪২-এ ম্যাট্রিক পাশ। ১৯৪৬-এ আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ.। ১৯৪৮-এ শান্তি-নিকেতন থেকে ইংরেজি অনার্সে বি. এ.। ১৯৪৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. তে ভর্তি। পরে ১৯৬৩-তে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ।

৩) বিবাহ / ব্যক্তিজীবন। ১০ | ২ | ৪৭ সালে "নবান্ন" খ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা, লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ। এ সময় থেকেই কলকাতায় স্থায়ী বাস। ২৩ | ৬ | ৪৮ সালে একমাত্র সন্তান লেখক নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম। পরে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯৬১/৬২ সালে। দ্বিতীয় বিবাহ লেখক অসিত গুপ্তের সঙ্গে। বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯৭৫/৭৬ সালে।

৪) জীবিকা : নানা অনির্দিষ্ট পেশা। রং সাবান ও রঙের গুঁড়ো বিক্রি থেকে টিউশন, আমেরিকায় বাঁদর চালান দেবার টেণ্ডার পাবার ব্যর্থ চেষ্টা অবধি। ১৯৪৯—৫০ কেন্দ্রীয় সরকারের পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন কেরানী ও কম্যুনিষ্ট সন্দেহে চাকরিচ্যুত। আগে ১৯৪৮-৪৯ পদ্ম-পুকুর স্কুলে প্রাক্‌বিভাগে শিক্ষকতা। পরে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে একবছর অস্থায়ী চাকরি। এ সকল সময়েই "সুমিত্রা দেবী" ছদ্মনামে সাপ্তাহিক সচিত্র ভারতে লেখা। ১৯৫৬-তে প্রথম বই প্রকাশের পর থেকে মোটামুটি বই লিখে জীবিকার্জনের চেষ্টা। ১৯৬৪ সালে বিজয়গড়

জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনা শুরু। ১৯৮২-৮৩ যুগান্তরে যোগদান ও কলেজে অবৈতনিক। ১৯৮৪-৮৫ স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা থেকে অবসরগ্রহণ।

৩) **লেখালেখি :** প্রথম লেখা প্রকাশ পায় খগেন সেন সম্পাদিত "রংমশাল" কাগজে ১৯৩৯ সালে, বিষয়, রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলা" প্রথম বই "ঝাঁসীর রাণী" (১৯৫৬), ঐতিহাসিক জীবনী, সাপ্তাহিক দেশ-এ প্রকাশিত। প্রথম উপন্যাস "নটী" (১৯৫৭)। ১৯৪৩/৪৬ সালে সাপ্তাহিক দেশে একটি বা দুটি লেখা বেরোয় ও সিকে টাকা পাওয়া সেই প্রথম। ১৯৫৬ থেকে আজও প্রতি বছরই লেখা হয়েছে।

মৌলিক গল্প, উপন্যাস, ছোটদের বই, পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ, সম্পাদনা, সবশুদ্ধ মুদ্রিত পুস্তক শতাধিক অবশ্যই।

উল্লেখ্য (লেখকের বিচারে)

ক) **উপন্যাস :** অমৃতসঙ্কর (ছাপা নেই) / আঁধারমাণিক (নতুন ছাপা চলছে) / তারার আঁধার। বারস্কোপের বাক্স। (দুটিই ছাপা নেই) কবি বন্দ্যঘটী গাঁঞির জীবন ও মৃত্যু / বিবেকবিদায়পালা / অরণ্যের অধিকার / হাজার চুরাশিরশ্মি / শ্রীশ্রীগণেশমহিমা / **চোটিমুণ্ডা এবং তার তীর** (লেখকের বিচারে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস) / অক্লান্ত কৌরব / ঘরে ফেরা / পলাতক / হরিরাম মাহাতো / তিতুমীর / শৃঙ্খলিত / সুরজ গাগরাই।

খ) **একাধিক লেখার সমাহার :** অগ্নিগর্ভ / নৈঋতে মেঘ / ইটের পর ইট / শালগিরার ডাকে / মূর্তি / মায়ের মূর্তি / পাকাল / গ্রাম বাংলা (২য় খণ্ড)।

গ) **গল্পগ্রন্থ :** কি বসন্তে কি শরদে (ছাপা নেই) / সপ্তপর্ণী (ছাপা নেই) / স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প (ছাপা নেই) / শ্রেষ্ঠ গল্প / বেহুলা (ছাপা নেই)।

ঘ) **অন্যরকম লেখা :** ঝাঁসীর রাণী (ঐতিহাসিক জীবনী) / জিম করবেট অমনিবাস (২য় খণ্ড / সম্পাদনা) / লুণ্ঠন—জীবন ও সাহিত্য।

ঙ) **ছোটদের বই :** পথ চলি আনন্দে (ছাপা নেই) / নেই নগরের সেই রাজা (ছাপা নেই) / বীরসা মুণ্ডা / গল্পের গরু ফাদোশ / হারে রে রে।

চ) **সহযোগিতায় লেখা :** ভারতে ভূমিদাস প্রথা (প্রবন্ধ / সহযোগী লেখক নির্মল ঘোষ) / অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত

বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে কয়েকটি নিজস্ব। অনেকগুলির সহযোগী লেখক ক্রমানুসারে গণেশ বাগচী, ভোলানাথ ঘোষ, মঞ্জুলা দত্ত ।। জাতকের গল্প (সহযোগী লেখক : অসিত গুপ্ত) ।।

ঙ) **নাটক :** হাজার চুরাশির মা ও অন্যান্য নাটক ।।

চ) **সাংবাদিকতা ধর্মী লেখা ও প্রবন্ধ ।।**

ক) **ইংরেজি :** ইকনমিক অ্যান্ড পোলিটিকাল উইকলি / বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড / সানডে / অমৃতবাজার পত্রিকা / যোজনা (যোজনা কমিশন প্রকাশনা) / নিউ রিপাবলিক (রাঁচি) ।।

খ) **বাংলা :** যুগান্তর / সত্যযুগ বসুমতী / বর্তমান / দেশ / অনুষ্টুপ / অনীক ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র পত্রিকা, শহর ও মফঃস্বলের ।।

৭) **অন্য ভাষায় অনূদিত :** হিন্দী (সর্বাধিক) / মারাঠী / মালয়ালী তেলুগু / ওড়িয়া / পাঞ্জাবী / গুজরাটী (ছাপা চলছে) ।।

৮) **পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত :** বহু উপন্যাস / বড়দের ও ছোটদের গল্প / সাংবাদিকতা ধর্মী লেখা / প্রবন্ধ ।।

৯) **সাহিত্য পুরস্কার :** অমৃত / লীলা, শরৎচন্দ্র পদক ও ভুবন-মোহিনী পদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) / তারাশঙ্কর স্মৃতি পরিষদ / সাহিত্য আকাদেমি / বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ (বর্ধমান / শেফালিকা স্বর্ণপদক) / ভ্রাতৃসংঘ "বর্তিকা" পুরস্কার ।।

১০) **সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত :** পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা / সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা / পঃ বঃ মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়ী / পঃ বঃ লোধাশবর কল্যাণ সমিতি / পঃ বঃ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (মেদিনীপুর) / পঃ বঃ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া) / পঃ বঃ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া) / পঃ বঃ খেড়িয়াশবর কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া) / মাঝগেড়িয়া আদিবাসী সাঁওতা মুদার বাইসি (বাঁকুড়া) / সান্তাল সমাজ লাহাতি বাইসি (মুর্শিদাবাদ) / ভারত কের আদিম জাতি (মধ্যমগ্রাম) / পঃ বঃ হরিজন কল্যাণ সমিতি (কাঁচড়াপাড়া) / দলিতজন মুক্তি সংগঠন (শিবপুর-হাওড়া) / কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ (সিংভূম) / মুণ্ডা সমাজ সাঁওরার জামদা (ওড়িশা) / কল্যাণী ও চাকদহ অঞ্চলের ইটভাটা মজদুর সমিতি / আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিতি / মৃৎশিল্পী কল্যাণ সমিতি এবং আরো অনেক গ্রামীণ আদিবাসী / তপশীলী / অন্য জাতি সংগঠন ও

ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। কয়েকটির প্রতিষ্ঠা পর্বে জড়িত, অন্তগুলিতে অন্যান্য পদে আসীন ।।

১১) পত্রিকা সম্পাদনা : ত্রৈমাসিক বর্তিকা (১৯৮০ থেকে)।

১২) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার : বর্ণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বহু নিপীড়িত, দুঃখী, সংগ্রামী মানুষ কর্তৃক তাদের দুঃখমোচনে অক্ষম মানুষকে "আপনজন" বলে স্বীকৃতি দান ।।

আবাসন পর্ষদের চিরনূতন সঞ্চয় প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের তৈরী ফ্ল্যাট, বাড়ী বা জমি কিনতে চলে "দ্বি-মুখী-সুবিধা-সঞ্চয় প্রকল্প" গ্রহণ করুন এই আমানত পরিকল্পনায় "ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া" মারফৎ অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

★ প্রথমে ন্যূনতম একহাজার টাকা বা তার গুণিতক জমা করতে হবে।

★ তারপর ন্যূনতম পাঁচশো টাকা বা তার গুণিতক টাকা সময়ে সময়ে জমা করতে পারেন।

★ ব্যাঙ্কের মেয়াদী জমার হারে সুদ দেওয়া হয়, তবে ন্যূনতম একবৎসর সময় পর্যন্ত টাকা জমা না থাকলে সুদ দেওয়া হবে না, প্রয়োজনবোধে টাকা তুলে নেওয়া যায়।

পর্ষদের ফ্ল্যাট বাড়ী ও প্লট বিক্রয়ের লটারীতে তারাই প্রথম সুযোগ পাবেন যারা সঞ্চয় প্রকল্পে সম্পূর্ণ মূল্য জমা রেখেছেন এবং দ্বিতীয় সুযোগ পাবেন যারা সম্পূর্ণ মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ জমা রেখেছেন।

এই সঞ্চয় প্রকল্পের নিয়মাবলী ও ছাপানো দরখাস্তের ফরম মাত্র ১ টাকায় আবাসন পর্ষদের অফিসে বেলা ২টার মধ্যে পাওয়া যায়।

আবাসন

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ

১০৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড

কলিকাতা—৭০০০১৪

BARTIKA Registration No. RN 13928/68
Price Rs. 12 00

RADHA KRISHNA

Publishers of fine books in Hindi

ANNOUNCE CLEARANCE SALE OF THEIR ENGLISH PUBLICATIONS

	Published Price	Reduced Price
WORKS OF BERTOLT BRECHT		
Poems 1913-1956	110.00	50 00
Diaries 1920-1922	45.00	20 00
Brecht on Theatre	50.00	25 00
Collected Plays Vol 1 : Baal, Drums in the Night, In the Jungle of Cities The Life of Edward II of England, A Respectable Wedding, The Beggar, Driving out a Devil, Lux in Tenebris, The Catch	60.00	25.00
Collected Plays Vol 7 : The Vision of Simone, Mechard; Schweyk in the Second World War ; The Caucasian Chalk Circle ; The Duchess of Malfi.	60.00	25 00
POLITICS		
Bhojpur : Naxalism in the Plains of Bihar, Kalyan Mukherjee & Rajendra Singh Yadav	25 00	10.00
Rashtriya Swayamsewak Sangh, Das Raj Goyal	30 00	10 00
1968 and after : Inside the Revolution, Tariq Ali	35.00	10 00
NOVELS		
The Flounder, Gunter Grass	35.00	10 00
Undesirable Alien, Regis Debray	20.00	5.00
Jake's Thing, Kingsley Amis	20 00	5.00
Act of God, Charles Templeton	20.00	6.00

LIMITED STOCKS

ORDER TODAY TO AVOID DISAPPOINTMENT

by V. P. P.

(Plus actual postage)

from

RADHA KRISHNA PRAKASHAN

2, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110 002

Published by Bijan Kumar Bhattacharya from 106, R. N. Tagore Road, Berhampore and Printed by Cygnus Printing Co-op. Society Ltd., Ber.